সমগ্র গল্প-সম্ভার

প্রথম খণ্ড

প্রেমেন্দ্র মিত্র

সাহিত্যলোক
৩২/৭ বিডন স্ট্রীট । কলকাতা ৬

Samagra Galpa-Sambhar
Collected Short Stories (Vol. I)]
Bimal Mitra

সেপ্টেম্বর ১৯৬১

প্রকাশক : নেপালচন্দ্র ঘোষ
সাহিত্যালোক। ৩২/৭ বিডন স্ট্রীট। কলকাতা ৬

প্রচ্ছদ : অমিয় ভট্টাচার্য

মুদ্রাকর : নেপালচন্দ্র ঘোষ
বঙ্গবাণী প্রিণ্টার্স। ৫৭-এ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন। কলকাতা ৬

আমার সমস্ত পাঠক-পাঠিকার

উদ্দেশে

সমর্পিত

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

আমার পাঠক পাঠিকাবর্গের সতর্কতার জন্যে জানাই যে, গত কয়েক বছর যাবৎ পাঁচ-শতাধিক উপন্যাস 'বিমল মিত্র' নামযুক্ত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। ওগুলি এক অসাধু জুয়া-চোরের কাণ্ড। আমার লেখার জনপ্রিয়তার সুযোগ নিয়ে বহুলোক ওই নামে পুস্তক প্রকাশ করে আমার পাঠকবর্গকে প্রতারণা করছে। পাঠক-পাঠিকাবর্গের প্রতি আমার বিনীত বিজ্ঞপ্তি এই যে, সেগুলি আমার রচনা নয়। একমাত্র 'কড়ি দিয়ে কিনলাম' ছাড়া, আমার লেখা প্রত্যেকটি গ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠায় আমার স্বাক্ষর মুদ্রিত আছে।

বিমল মিত্র

বিমল মিত্র : জীবন ও সাধনা

বয়স আশি ছুঁই-ছুঁই। যতিহীন নির্ঝরের মতো অবিশ্রান্ত ধারায় লিখে চলেছেন গল্প ও উপন্যাস। দেশের একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে তাঁর অগণিত গুণমুগ্ধ পাঠক। অনেক ভাষাতেই অনূদিত হয়েছে তাঁর বই। চলচ্চিত্রে দেখানো হয়েছে তাঁর উপন্যাসসমূহের কাহিনী। নাটকাকারে রূপান্তরিত হয়ে অভিনীত হয়েছে তাঁর উপন্যাস। পাঠক, দর্শক ও শ্রোতা সকলেই মুগ্ধ তাঁর বিচিত্র প্রকাশভঙ্গীতে। এ প্রকাশভঙ্গী আয়ত্ত করতে তাঁকে অনেক সাধনা, অনেক সংগ্রাম করতে হয়েছে। একদিকে নিরলস সাধনা, অপরদিকে ঘরে-বাইরে সংগ্রাম, এই নিয়েই কেটেছে ওঁর জীবন। ওঁর সাধনার পথে একদিকে ছিল পারিবারিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিকূলতা, অপরদিকে বাইরের জগতের প্রত্যাখ্যান, অবহেলা, নিন্দা, কুৎসা, আঘাত ও অপযশ। তিনি বিশ্বাস করেন যে 'সাহিত্যের বাজারে প্রত্যাখ্যান মানেই স্থায়িত্ব, অবহেলা মানে সংগ্রামের তীব্রতা বৃদ্ধি, নিন্দা-কুৎসা মানেই খ্যাতি-প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তির প্রসার। সাহিত্যের এই স্থায়িত্ব, এই সংগ্রাম-শক্তি, এই খ্যাতি-প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তি—অনেক প্রত্যাখ্যান, অনেক অবহেলা, অনেক নিন্দা-কুৎসার বিনিময়-মূল্যে কিনতে হয়।'

বিমল মিত্রের ক্ষেত্রে বাইরের জগতের এ-সংগ্রাম শুরু হয়েছিল তাঁর প্রথম উপন্যাস লেখার সময় থেকে। উপন্যাস লেখা তিনি শুরু করেছিলেন সেই সময়ে যে-সময়ে সমগ্র সাহিত্যিককুল একবাক্যে বলে উঠেছিল যে বাংলাভাষায় উপন্যাসের যুগ শেষ হয়ে গেছে, এবার এসেছে রম্যরচনার যুগ। কিন্তু বিস্ফোরকের মতো আবির্ভূত হয়ে বিমল মিত্র সাহিত্যিককুলের সে-ধারণা নস্যাৎ করে দেন। উপন্যাস লেখার ক্ষেত্রে তিনি এমন এক টেকনিক্ বা আঙ্গিক প্রয়োগ করলেন যা নিন্দা-কুৎসা ও বিরূপ সমালোচনা সত্ত্বেও তাঁর গলায় পরিয়ে দিল প্রতিষ্ঠা ও স্থায়িত্বের বিজয়মাল্য। আজ যদি তিনি সাফল্যের সপ্তম স্বর্গে উঠে থাকেন, তা তাঁর উপন্যাস লেখার বিশিষ্ট টেকনিকের সুবাদে।

এই টেকনিক্‌টা আয়ত্ত করবার জন্য তাঁকে যে সংগ্রাম ও সাধনা করতে হয়েছিল, তার পরিচয় দিতে গেলে তাঁর গোড়ার জীবনের কথা কিছু বলতে হয়। দক্ষিণ কলকাতার এক সচ্ছল পরিবারে তাঁর জন্ম। (ওঁদের আদি বাড়ি ছিল নদীয়া জেলার সেই অখ্যাত গ্রামে যেখান থেকে ভূতনাথ একদিন যাত্রা করেছিল কলকাতার উদ্দেশ্যে, 'সাহেব বিবি গোলাম'-এর নায়ক হবার জন্যে)। পিতা সরকারী উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। প্রথম দুই পুত্রকে তিনি ডাক্তার ও ইঞ্জিনীয়ার করেছিলেন। বিমলকে তিনি চাটার্ড অ্যাকাউন্টটেন্ট করতে চেয়েছিলেন। সেজন্য বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে বি.এ. পাস করবার পরই ওঁকে পাঠিয়ে দেন

অ্যাকাউন্টেন্সী পড়বার জন্য। কিন্তু ভবিষ্যতে যিনি বাঙলাদেশের একজন অপরাজেয় কথাশিল্পী হবেন, অ্যাকাউন্টেন্সীর ডেবিট-ক্রেডিটে তাঁর মন লাগবে কেন ? অ্যাকাউন্টেন্সী ছেড়ে দিয়ে বাংলা পড়বার জন্য তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এ. ক্লাসে ভর্তি হন। সসম্মানে এম.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কিন্তু এসব যা করলেন, তা সবই গুরুজনদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে। পারিবারিক অসচ্ছলতা না থাকলেও, বিমলবাবু ছাত্রাবস্থা থেকেই নিজস্ব কিছু উপার্জনে ব্যস্ত ছিলেন। সতেরো-আঠারো বছর বয়স থেকেই 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ' প্রভৃতি সেকালের প্রখ্যাত মাসিকপত্রিকাসমূহে গল্প লিখতেন। কুড়ি-একুশ বছর বয়স থেকেই গান লিখতেন। এসব থেকে যা অর্থ উপার্জন করতেন, তাতে তাঁর সারা বছরের কলেজের মাইনেটা সহজেই কুলিয়ে যেত। যা উদ্বৃত্ত থাকতো তা ট্রাম-ভাড়া, চা ও চপ-কাটলেটে ব্যয় করতেন।

ওঁকে নিয়ে ওঁর গুরুজনদের বরাবরই দুর্ভাবনা ছিল। বি.এ., এম এ. পাস করেছে বটে, কিন্তু তার জোরে তো স্কুল-কলেজে মাস্টারি করা ছাড়া, আর কোনো রাস্তা খোলা নেই। তারপর ছেলে সংগীত ও সাহিত্যচর্চার আনন্দে বিভোর। সুতরাং গুরুজনদের কাছে ওঁর ভবিষ্যৎ ছিল অন্ধকার। তাঁদের কাছে সাহিত্য আর সংগীত—এ-দুটো একজন অপদার্থ যুবককে আরও অপদার্থ করতে যথেষ্ট।

এ তো গেল বিমলবাবুর ঘরের কথা। এবার ওঁর বাইরের জীবনের 'গ্রীনরুমে' যাওয়া যাক্। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস করে উনি সোজা চলে যেতেন ঠক্কুর দত্ত লেনে চণ্ডীবাবুর রেকর্ডিং কোম্পানির আড্ডায়। সেখানে সাইগল থেকে আরম্ভ করে বহু সংগীতজ্ঞের সমাবেশ হ'ত। সংগীতের জগতের সংগে সেখানে তিনি একাকার হয়ে যেতেন। গান শুনতেন, আর গানের সুরের মধ্যে নিজেকে আত্মনিবিষ্ট করতেন। আত্ম-অবগাহন করে উপলব্ধি করতেন, সুরই সত্য ব্রহ্ম। সংগীতজ্ঞের সংগে একাত্ম হয়ে, রামকেলিতে কোন্ পর্দা লাগালে সুরের কি ক্ষতি-বৃদ্ধি হয়, ভৈঁরোর সংগে ভৈরবীর মূলগত পার্থক্য কী, দরবারি কানাড়াতে উদারার কোমল নিখাদটা এসে কতখানি দাঁড়ালে সুরের কতটা মাধুর্য বাড়ে, তারই নমুনা দেখে চমকে উঠতেন।

এমন সময়ে কলকাতায় এলেন দু'জন বিখ্যাত ওস্তাদজী—আবদুল করিম খাঁ ও ফৈয়াজ খাঁ সাহেব। দু'জনেই রাগসংগীত-বিশারদ। বিমলবাবু চমৎকৃত হলেন আবদুল করিম খাঁ সাহেবের মিহি-মিহি গলায় ভৈরবী গান শুনে। তিন লাইনের একটা গান নিয়ে তবলায় আট মাত্রার যৎ-এর ঠেকার সঙ্গে তাল রেখে ওস্তাদজী সেদিন এমন এক অলৌকিক কাণ্ড করলেন যা বিমলবাবুকে বিস্মিত করল। সেদিন-কার কথা স্মরণ করে উনি বলেন—'তিন ঘণ্টা ধরে ওস্তাদজীর সে কী কসরত ! একই কথা হাজারবার উচ্চারণ করা, একই পর্দায় বার বার ঘুরে আসা, কথাগুলো

দুমড়ে মুচড়ে পেঁচিয়ে ভৈরবী রাগের সমস্ত রসটুকু নিঙড়ে নিঃশেষ করে আমাদের সকলকে এক শাশ্বত ধ্রুবের দিকে, এক বৈরাগ্যের দিকে নিয়ে গেলেন। আর আমরা সেই ধ্রুবের, সেই বৈরাগ্যের স্পর্শ পেয়ে পরিশুদ্ধ হলাম, পবিত্র হলাম। গান গাইতে লাগলেন ওস্তাদজী, আর আমি নিজেকে আবিষ্কার করতে লাগলাম। মনে হল এ তো গান নয়, এ যেন কোনো এক এপিক উপন্যাস পড়ছি। পড়তে পড়তে মুহূর্ত, দিন, মাস, বছর কেটে যাচ্ছে। হাজার, দু'-হাজার, তিনহাজার পাতার বই। মনে হচ্ছে চলুক, আরও চলুক। এই ভালো-লাগা যেন থেমে না যায়। মূল গল্পকে পাশ কাটিয়ে লেখক যেমন ছোট একটা চরিত্র নিয়ে অন্য প্রসঙ্গ শোনান, আবার কখন নিঃশব্দে ফিরে আসেন মূল সুরে, এও যেন ঠিক তেমনি।'

অপরে যখন একমনে গান শুনছেন, বিমলবাবু তখন ওস্তাদজীর কেরামতির মধ্যে শিখছেন গানের আঙ্গিকের মধ্যে উপন্যাস লেখার টেকনিক্। আবিষ্কার করছেন শ্রোতাকে (তথা পাঠককে) মুগ্ধ করবার জাদুটা কোথায়, কোথায় সেই রহস্য ? এককথায় গান থেকে তিনি শিখছেন সৃজনশীল সাহিত্য রচনার দ্বারা পাঠকের মন জয় করবার রহস্যটা। খেয়ালের তান-বিস্তার আর লয়কারি, আর ঠুংরির তান-বিস্তারে আইন ভেঙে বে-পরদায় পৌঁছে আবার বাঁধা রাস্তায় ফিরে আসার কসরৎ-কায়দা দেখে, তিনি মনের মধ্যে সাহিত্যের নতুন আঙ্গিক সম্বন্ধে ভাবনা-চিন্তা করতেন। তাঁর মনে হত ক্লাসিক উপন্যাস আর ঠুংরির গঠন-কৌশলের মধ্যে যেন কোন তফাত নেই। ভাবতেন, ও তো আমাদের উপন্যাসেরই টেকনিক্। দু'পা এগিয়ে গিয়ে এক-পা পেছোনো। 'সুরের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে উঠতে কখনও ভেঙে পড়া, আবার কখনও উঠে দাঁড়ানো। উঠতে উঠতে আবার লুপ-লাইনে চলে গিয়ে তান বিস্তার করে তাল-লয় ঠিক রেখে সহজ সাবলীল গতিতে সমে এসে পড়া।' সঙ্গীতের অনুশীলন করেই বিমলবাবু বুঝতে পেরেছিলেন, গ্রহণ আর বর্জনের সমন্বয়ই সব শিল্পের মূল কথা, তা সে গানই হোক, আর সাহিত্যই হোক। তাঁর এই উপলব্ধির দৃষ্টান্তই তিনি বারে বারে দিয়েছেন তাঁর উপন্যাসসমূহে। উপন্যাসের আঙ্গিকে সঙ্গীতের আঙ্গিকের প্রয়োগই তাঁর উপন্যাসসমূহকে দিয়েছে এক বিশিষ্টতা (genre), যে বিশিষ্টতার গুণে তিনি ভারতীয় পাঠকসমাজের কাছে তাদের প্রিয়তম লেখকরূপে পরিচিত হয়েছেন। তবে তিনি এ-বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন যে, কথাশিল্পী হিসাবে তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের দাবীর ঐকতানে যোগ দেন না, এমন লোকেরও অভাব নেই। সেই পাঠকমণ্ডলীকে লক্ষ্য করে তিনি বলেন : 'আজ কিছু কিছু অনভিজ্ঞ বাঙালী পাঠক আমার লেখার মধ্যে 'রিপিটিশন' বা পৌনঃপুনিকতা এবং পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে গল্প বলার যে অভিযোগে আমাকে অভিযুক্ত করেন, এ বিদ্যার কারুকার্য ও ব্যাকরণ অনেক কষ্টে, অনেক চেষ্টায় আমি দুই ওস্তাদজীর কাছ

থেকেই আয়ত্ত করবার তালিম নিয়েছি। মানুষের জীবন যেমন সোজা পথে চলতে অস্বীকার করে, ভারতীয় রাগসংগীত ও 'এপিক' উপন্যাসও ঠিক তাই। জীবন-ক্ষেত্র তো সমতলভূমি নয়, চড়াই-উৎরাইয়ে চলা-ফেরার নিয়মে সে বিচরণ করে বলেই তাকে পরিক্রমা করতে হয় ঘুর-পথে। অনেকসময় ঘুর-পথ ঘুরে এসে শুরুর সংগে সাক্ষাৎকার করে তবে তার ভুল ভাঙে। তখন আবার এগিয়ে গিয়ে পরের পর্দায় দাঁড়িয়ে সে খানিকটা জিরিয়ে নেয়। কিন্তু এই চলার পথে একটা কথা শিল্পীকে সবসময় মনে রাখতে হয় যে তার গন্তব্যবিন্দুতে পৌঁছবার দিকেই যেন তার লক্ষ্য স্থির থাকে। অবশ্য শিল্পীকে নিজেই অত্যন্ত জটিল জাল সৃষ্টি করতে হয়, আবার তাকে নিজেকেই বিপদ-জাল কাটাবার মারণাস্ত্র আবিষ্কার করতে হয়। কিন্তু এই বিপদের সৃষ্টি এবং সংহারের সমন্বয় যত সুষ্ঠু এবং ওজন যত নিখুঁত হবে ততই শিল্পীর সাফল্য। কিন্তু এই সব-কিছুর ওপরেও হল সম বা 'ক্লাইমেক্স'। আর সে এমন এক 'ক্লাইমেক্স' যার ইংগিত থাকবে সেই ধ্রুবের দিকে, যা চিত্তকে বিশুদ্ধ করবে, প্রাণকে করবে পবিত্র।'

বিমল মিত্র যখন গল্প ও উপন্যাস লেখার আংগিক সম্বন্ধে ভাবনা-চিন্তায় মগ্ন, ঠিক সেই সময়ে ঘটে যায় তাঁর জীবনের চরম বিপর্যয়। একদিকে নিজেকে বাণীর শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করবার একান্ত প্রয়াস, আর অপরদিকে অর্থোপার্জনের জন্য গুরুজনদের নিয়ত তাগিদ। শেষ পর্যন্ত গুরুজনদের কাছেই তাঁকে নাতস্বীকার করতে হল। একদিন ওঁর বাবা ওঁকে সংগে করে নিয়ে গিয়ে চাকরিতে ভর্তি করে দিলেন। আরম্ভ হল ওঁর জীবনের এক বেদনাময় অধ্যায়। কেননা ওঁর মানসিকতায় চাকরিটা ছিল অত্যন্ত ন্যক্কারজনক। গোয়েন্দাগিরির চাকরি—সরকারী কর্মচারিদের মধ্যে যাঁরা দুর্নীতিপরায়ণ, তাদের ধরা। মনটা বিতৃষ্ণায় ভরে গেল। ইংরেজিতে বলা হয় out of evil cometh good। ওঁর ক্ষেত্রেও তাই ঘটল। কর্মোপলক্ষে ভারতের নানা জায়গায় যেতে হল, নানা শ্রেণীর লোকের সংস্পর্শে আসতে হল। চিরকালই তিনি দ্রষ্টা, সর্বদ্রষ্টা। তাছাড়া, বিধাতা দিয়েছেন ওঁকে তীক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ করবার শক্তি। এই চাকরি জীবনেই সংগ্রহ করলেন গল্প লেখার উপাদান। সঙ্গীত থেকে শেখা আংগিকের মধ্যে ফেলে দিলেন সেইসব উপাদান। বেরিয়ে এল নতুন নতুন বিচিত্র গল্প, যা সংগে সংগেই জয় করে নিল পাঠকসমাজের মন। কিন্তু বেশিদিন ওঁর পক্ষে ওই চাকরি করা সম্ভবপর হল না। ইতিমধ্যে চোখের মধ্যে বসন্ত হয়ে চিরকালের মতো ওঁর একটা চোখ নষ্ট হয়ে গেল। তখনও চাকরি করছেন, আর ডাক্তারের নিষেধ সত্ত্বেও রাত জেগে এক-চক্ষুর সাহায্যে লিখে যাচ্ছেন 'সাহেব বিবি গোলাম'। ঠিক এই সময়ে এল সাহিত্যের হাতছানি। চাকরির নিরাপত্তা, চাকরির সমস্ত উপস্বত্ব, যথা পেনসন ইত্যাদির লালসা পরিহার করে, চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে সাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক হলেন।

একখানা ধারাবাহিক উপন্যাস লেখবার আহ্বান এসেছিল 'দেশ' পত্রিকার তরফ থেকে। ঠিক করে ফেললেন কলকাতার সেকালের বাবুসমাজকে নিয়ে উপন্যাস-খানা লিখবেন। কিন্তু লিখব বললেই তো আর লেখা হয় না? এর জন্য দিনের পর দিন ওঁকে জাতীয় গ্রন্থাগারে গিয়ে প্রাচীন কলকাতা সম্বন্ধে অনেক পড়া-শোনা করতে হয়েছে। বাবুসমাজের সম্বন্ধে ওঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাও ছিল, ওঁর কলেজের বন্ধু সতু লাহাদের বাড়ি। এসবই মঞ্জরিত হয়ে উঠল এক অনুপম ধারাবাহিক উপন্যাসে। সৃষ্টি করলেন এক অনুপেয় উপন্যাস, যা তার স্বাতন্ত্র্য তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিল উপন্যাস লেখার প্রচলিত রীতিকে। উপন্যাসখানি পড়ে মুগ্ধ হয়ে ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে লেখককে জানালেন তাঁর আন্তরিক অভিনন্দন। তারিফ করে বললেন, বিদেশ হলে বইখানি নোবেল পুরস্কার পেত। এর পর তাঁর কলম দিয়ে বেরুতে লাগল অবিশ্রান্তধারায় একের পর এক অসাধারণ উপন্যাস—'কড়ি দিয়ে কিনলাম', 'একক দশক শতক', 'বেগম মেরী বিশ্বাস', 'পতি পরম গুরু', 'আসামী হাজির' ইত্যাদি। তাঁর উপন্যাস-সমূহের মধ্যে কোন্‌টি যে শ্রেষ্ঠ তা বলা কঠিন। আমার নিজের মনে হয় ওঁর সাম্প্রতিকতম উপন্যাস—'এই নরদেহ' উপন্যাসখানি-ই ওঁর শ্রেষ্ঠ রচনা।

উপন্যাস লেখার মাঝে মাঝে লিখেছেন সার্থক গল্প। এই গ্রন্থে সমাহৃত গল্পগুলির বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করেছেন পরবর্তী খণ্ডে বন্ধুবর সুভাষ সরকার। গল্প-লেখক হিসাবেও বিমলবাবু অপ্রতিদ্বন্দ্বী। কেবল তুলনীয় ফরাসী সাহিত্যে মোপাসাঁ, ইংরেজি সাহিত্যে সমারসেট মম এবং বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ।

কামনা করি ওঁর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু।

অতুল সুর

গ্রন্থকারের নিবেদন

জীবনে সাহিত্য-সৃষ্টিই আমার একমাত্র নেশা-পেশা সমস্ত কিছু। কারণ সাহিত্যের মধ্যে দিয়েই আমি নিজেকে জানতে চেষ্টা করেছি, তাই অন্য কিছু পেশা অবলম্বন করিনি। প্রথমজীবনে কিছুদিন অন্য পেশায় নিযুক্ত ছিলাম। কিন্তু আমার পক্ষে বেশিদিন তাতে যুক্ত থাকা সম্ভব হয়নি। প্রকৃত সাহিত্য-সাধনা কখনও অন্য কোনও মনস্কতাকে সহ্য করে না।

এ গল্পগুলি কবে কখন লিখেছি তার সাল তারিখ আমার স্মরণে নেই। ভেতরের আর বাইরের নিদারুণ তাগিদেই এগুলির সৃষ্টি। কিন্তু হিসেব আমার রক্তের মধ্যে নিহিত নেই, তাই বেহিসেবী মানুষের পক্ষে যা স্বাভাবিক আমার বেলাতেও সেই দুর্ঘটনাই ঘটেছে। আমি শুধু লিখেই গিয়েছি। কিন্তু সেগুলি সংরক্ষণের কোনও ব্যবস্থাই কখনও করিনি। যা লিখেছি তার অনেকগুলিই বেহিসেবী হওয়ার দরুন, হয় হারিয়ে গিয়েছে, নয়তো নষ্ট হয়ে গেছে। প্রকাশকদের কল্যাণে যেগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল মাত্র সেইগুলিই এখন একত্রিত করে এই 'সমগ্র গল্প-সম্ভারে' সন্নিবিষ্ট হলো।

সাহিত্য তো বিজ্ঞান নয়, তাই পাঠক-পাঠিকাদের রুচিভেদেরও তারতম্য আছে। এটা স্বীকার করে নিয়েই উল্লেখ করা ভালো যে, এ গল্পগুলি সকলকে সন্তুষ্ট করতে পারবে এমন অঙ্গীকার আমি করবো না। আমার সৃষ্টি আমারই, আর পাঠক-পাঠিকাদের রুচি তাদেরই নিজস্ব বোধের ব্যাপার। 'সমগ্র গল্প-সম্ভারে' সেইসমস্ত গল্পগুলিই সন্নিবিষ্ট করে দিলাম, যা আমার নিজস্ব বোধের আয়ত্তাধীন। তবু এই গল্পগুলিতে যদি আমার মনের কথা সকলের না হোক, অনেকের মনের কথা হয়ে উঠতে পেরে থাকে, তাহলেই আমি কৃতার্থ বোধ করবো।

বিমল মিত্র

সূচীপত্র

নীলনেশা

রায়সাহেব মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের শ্বশুরও রায়সাহেব। রায়সাহেব জে· ডি· ব্যানার্জি। শ্বশুর-জামাই দুজনেই রায়সাহেব, এমন যোগাযোগ সচরাচর দেখা যায় না। কিন্তু শ্বশুর-জামাই দুজনের বহু দুর্ভাগ্যের ফলেই বুঝি এমন ঘটেছিল।

ঘটনাটি ঘটেছিল পাটনায়।

মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় তখন পাটনা সেক্রেটারিয়েটের সামান্য একজন সুপারভাইজার থেকে পদোন্নতি পেয়ে সুপারিনটেন্ডেন্ট। শহরে এবং অফিসে বেশ প্রতিপত্তি তাঁর। সামনের সব ক'টা উন্নতির ধাপ চোখের সামনে জ্বলজ্বল করছে। একটিমাত্র ছেলে, রূপসী স্ত্রী আর একটি সুন্দর অট্টালিকার মালিক। ব্যাঙ্কের টাকায়, স্বাস্থ্যের জৌলুসে, প্রতিপত্তির প্রসারে মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের বৃহস্পতি তখন তুঙ্গী-ই বলতে হবে।

সেই সময়ে সেই চোদ্দবছর আগে চাকরি খুইয়ে রায়সাহেব জে· ডি· ব্যানার্জি মেয়ের কাছে এলেন। সঙ্গে আরো তিনটি অবিবাহিতা মেয়ে। জ্যোটি, লোটি আর রুবি। জ্যোটি, লোটি আর রুবিকে নিয়ে মিলির বাড়িতে এলেন। মিলি বড় মেয়ে।

মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় স্টেশনে গিয়েছিলেন মিলিকে নিয়ে। শ্বশুরকে চিনতেন। রাশভারী, শৌখিন, সাহেবী মেজাজের লোক। সস্ত্রীক রিসিভ্ করতে না গেলে কী ভাববেন তিনি!

শীতকাল সেটা। তাঁর পেটেন্ট স্যুট্, সাহেব-বাড়ির অভিজ্ঞ টেলারের তৈরি। হাতে স্টিক্। বাটন্-হোলে বোকে। মাথায় ফেল্ট-হ্যাট্—বাঁকানো। মুখে লম্বা চুরুট।

চায়ের টেবিলে মিলি বললে—তুমি তাহলে চাকরি ছেড়ে দিলে বাবা?

সেই সময়ে চোদ্দ বছর আগে চাকরি ছেড়ে দেওয়া চারটিখানি কথা নয়। বিশেষ করে জ্যোটি, লোটি, রুবির তখনও বিয়ে দিতে হবে। সারাজীবন মোটা মাইনে পেয়েছেন, আর দুহাতে খরচ করেছেন। না করেছেন একটা বাড়ি, না জমিয়েছেন টাকা। কেবল লাঞ্চ, ডিনার, পার্টি আর স্যুট্।

মিলির কথার উত্তরে বললেন—চাকরি আর করবো না রে, মিলি—

—তা হলে?···কথাটা বলতে গিয়ে বড় মেয়ের গলায় যেন আটকে গেল।

—বাঃ, তা তোরা আছিস কী করতে?

বলে হাসতে হাসতে চুরুট ধরালেন একটা। তার পর বললেন—আমি বুড়ো বাপ সারা জীবন চাকরি করি, এইটেই তুই চাস নাকি?

কথাটা বলে মিলি, জ্যোটি, লোটি, রুবি শেষ পর্যন্ত জামাই মৃত্যুঞ্জয়ের

মুখের ওপর চোখ বুলোলেন। কিন্তু কেউ হাসলে না দেখে নিজেই হো হো শব্দে হেসে উঠলেন। তার পর চায়ে চুমুক দিয়েই বললেন—এ কি চা রে মিলি ? কত করে পাউন্ড ? ফ্লেভার নেই তো তেমন—

আড়চোখে স্বামীর দিকে চেয়ে মিলি কুণ্ঠিত হয়ে বললে—কেন বাবা, এ তো দামী চা···

—তা হোক্‌গে দামী, আমার জিভে এ-চা চলবে না মা—

ঘাড় নাড়তে লাগলেন রায়সাহেব জে· ডি· ব্যানার্জি। সদ্য কলকাতা-ফেরত। পাটনার পাড়াগেঁয়ে মেয়ে-জামাইকে ফ্যাশন শেখাবার অধিকার আছে বৈকি তাঁর।

—আর, এ কাপ-ডিশ্‌ও চলবে না। আর কিছু না হোক, চা-টা বাপু আমাকে দিয়ে পছন্দ করিয়ে কিনো, চা-টাই যদি পছন্দমতো না খেলুম তা হলে বেঁচে থেকে লাভ ?

কিন্তু দেখা গেল রায়সাহেব জে· ডি· ব্যানার্জির কিছু পছন্দ হওয়াই ভারি শক্ত।

—লুঙ্গি দিয়ে কখনও জানলা-দরজার পরদা হয় ? মৃত্যুঞ্জয়ের দেখছি সবই পাটনাই টেস্ট—

—বাড়ি করেছ, কিন্তু ডাইনিং-হল্‌-এর স্ট্যান্ডার্ড সাইজ-ই জানো না—

—ড্রইংরুমে জর্জ দি ফিফ্‌থ্‌-এর ছবি রেখেছ, কিন্তু কুইন মেরীর ছবিটা নেই পাশে—ইংরেজদের চরিত্রে এইটে পাবে না, এই সেন্স অব প্রোপোরশনের অভাব···

—আঃ··হা···তোমাদের কিচেনের পোজিশনটাই ঠিক হয়নি, কিচেন হবে নর্থ-ইস্ট কর্নারে—মৃত্যুঞ্জয়ের দেখছি···সুপারিন্‌টেন্ডেন্ট হলে কি হবে···

পরদিন থেকে রায়সাহেব জে· ডি· ব্যানার্জি সংস্কারে লেগে গেলেন। জ্যোটি, লোটি আর রুবি আদেশ পালন করে। মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ির সামনে গেট্‌-এ ট্যাবলেট লাগানো হলো। পালিশ-করা সেগুন কাঠের বোর্ডের ওপর "রায়সাহেব জে· ডি· ব্যানার্জি" লেখা। বিকেলবেলা ড্রেসিং গাউন পরে একবার বাগানে দাঁড়িয়ে দেখে এলেন। তার পর নিজের চুরুটের আর চায়ের ব্রান্ড লিখে চাকরকে বাজারে পাঠানো হলো। নতুন নেটের পরদা এলো দরজা-জানালার জন্যে। মৃত্যুঞ্জয়ের সঙ্গে থেকে থেকে মিলিটারও টেস্ট খারাপ হয়ে গেছে। মিলির টেস্ট, মৃত্যুঞ্জয়ের টেস্ট, বদলাবার চেষ্টায় লেগে পড়লেন জীবন পণ করে রায়সাহেব জে· ডি· ব্যানার্জি। প্রথম দিনটি থেকে।

মিলি বললে—ওপরের দক্ষিণের ঘরটাতেই তোমার থাকবার ব্যবস্থা হলো বাবা—

বাড়ির শ্রেষ্ঠ ঘর সেটা।

ঘরখানা গোছানো হলো। রায়সাহেবের পছন্দমতো গোছানো হলো। শোবার

খাটের পাশে 'হোয়াট্‌নট'। চিঠি লেখবার টেবিল একটা জানলার দিকে মুখ করে। একটা ট্রিপয়। আর খাটের দিকে মুখ করে বসানো ড্রেসিং আলমারি। রায়সাহেব বললেন—লর্ড কিচেনারের বেডরুম এইরকম সিম্‌প্‌ল ছিল—

তখন কি মিলি জানতো, না মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় জানতেন। কেউ জানতো না। জ্যোটি, লোটি, রুবিও জানতো না যে, চোদ্দ বছর রায়সাহেব এ-বাড়িতে থাকবেন। শুধু থাকা নয়, সদম্ভে সগৌরবে মাথা উঁচু করে থাকবেন।

দেশী ইংরিজী একখানা দৈনিক পত্রিকা আসতো মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে। তিনি বাতিল করে দিলেন। কুড়ি বছর 'হোয়াইটম্যানে' সহ-সম্পাদকের চাকরি করে এসেছেন। ওইটে চাই। 'হোয়াইটম্যান' আসতে লাগলো পরদিন থেকে।

চায়ের টেবিলে পরোটা বা ওমনি কিছু একটা হতো। রায়সাহেব জে· ডি· ব্যানার্জি আপত্তি করলেন।

—তোদের এইটে ভারী খারাপ সিস্টেম মিলি, টেবিলে খাবি অথচ লুচি পরোটা, দু তিন টাকা বেশি পড়ে বটে, কিন্তু বেকারীতে বলে রাখলেই রোজ সকালে কেক বা পেস্ট্রি দিয়ে যায়—কোন হাঙ্গামা নেই, কত পরিশ্রম বাঁচে,···

পরদিন থেকে তাই হলো। বাথরুমটা সাজানো হলো নতুন করে। বিলিতী টুথপেস্ট, বুরুশ, হেয়ার-অয়েল আর সাবান। বাজারের শ্রেষ্ঠ জিনিস সব। টেবিলে উঠলো বিলিতী লেটার-প্যাড।

মিলির বাবা, মৃত্যুঞ্জয়ের শ্বশুর। রায়সাহেব শ্বশুর। শৌখিন ইংরিজীজানা পাকা সাহেব শ্বশুর। খাতিরের কোন ত্রুটি রাখলেন না জামাই।

সেক্রেটারিয়েটের বন্ধুবান্ধব আসে বাড়িতে। মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় আলাপ করিয়ে দেন—ইনি আমার শ্বশুর, রায়সাহেব জে· ডি· ব্যানার্জি—

চুরুটটা মুখে লাগিয়েই রায়সাহেব জে· ডি· ব্যানার্জি মাথা নাড়েন। ভোরবেলা শার্টের গলায় টাই থাকে না, কেমন যেন খালি-গা মনে হয় তাঁর। বলেন—মেজর উইন্‌স্‌ফোর্থ যেবার বেঙ্গল গবর্নরের মিলিটারী সেক্রেটারী, সেইবার আমি রায়সাহেব হলুম—কিন্তু এখন রায়সাহেবিটাও ছ্যা ছ্যা হয়ে পড়েছে—রামা-শ্যামা, ডিক্‌-হ্যারি সবাই পাচ্ছে—কোনও ইজ্জত রইল না আর আমাদের—

তার পরেই প্রশ্নকর্তা যদি প্রশ্ন করেন তো ভালোই, না হলে নিজের রায়সাহেব হওয়ার ইতিহাসটা নিজেকেই বলতে হয়—

—'হোয়াইটম্যানে' আমার লীডার পড়েই তো প্রথম মেজর উইন্‌স্‌ফোর্থ চম্‌কে যায়, খাস বিলিতী বাচ্ছা কিনা, গুণের কদর করতে জানে—তার পর যখন শুনলে লিখেছে একজন বাঙালী, আরো অবাক্‌, একদিন নেমন্তন্ন করলে ডিনারে। বললে—বাঙালীর মধ্যেও যে জিনিয়াস্‌ জন্মায় এটা তোমাকে দেখবার আগে কল্পনাও করতে পারিনি মিস্টার ব্যানার্জি—ওয়েল্‌, তখন আমি শুধু

মিস্টার-ই ছিলাম কিনা—

তার পরেও যদি প্রশ্নকর্তা আগ্রহ না দেখান, তখন নিজেকেই বলতে হয়—

—আশ্চর্য হয়ে গেলেন মেজর যখন শুনলেন আমি একটা রায়সাহেবিও পাইনি। বললেন—ওয়েল্, এটা আমারই কর্তব্য, দেখি আমি কী করতে পারি—

প্রশ্নকর্তা যদি প্রশ্ন করেন—তার পর…?

রায়সাহেব জে· ডি, ব্যানার্জি সে প্রশ্নের উত্তর দেবেন না। চুরুটটাকে দাঁতে চেপে সেইখানে বসেই বহুদিন আগে শেখা মেজর উইন্স্ফোর্থের সুরের অনুকরণ করে চীৎকার করবেন—মহারাজ—চা—

আগে হাতে করে চায়ের কাপ দেওয়া হতো। রায়সাহেব আসার পর ট্রের বন্দোবস্ত হয়েছে। বিকেলবেলা একটা পর্ব আছে রায়সাহেবের। সামান্য পর্ব নয়। ঝাড়া ঘণ্টাখানেক লাগে। তখন বেরোয় আলমারী থেকে নিভাঁজ সুট্গুলো। একটা একটা করে মিলি কিংবা জ্যোটি, লোটি, রুবি যে-কেউ নামিয়ে দেয়। যেটা কাল পরেছেন আজ সেটা পরতে নেই। সবগুলো বিছানার ওপর পর-পর বিছিয়ে দিতে হবে। রায়সাহেব জে· ডি· ব্যানার্জি একটা সেট্ বেছে নেবেন তারি মধ্যে থেকে। কোনো দিন ওয়ালনাটের স্টিক, কোনো দিন অ্যাশ-কাঠের। স্যুটের সঙ্গে যেন ম্যাচ করে। মাথায় লাইট নেভি-ব্লু ফেল্ট-হ্যাট্। আর ঝকঝকে চকচকে দাঁতে কামড়ানো চুরুট। পায়ে পেটেন্ট লেদার শু। হাতের পাঁচটা আঙুলের মতন ওই চুরুটটা ছিল তাঁর শরীরের সঙ্গে একাত্ম। বাথরুমে যাবার সময়ও মুখে থাকতো চুরুট। মিলির মনে পড়ে না বাবাকে কখনও চুরুট ছাড়া দেখেছে। কোথাকার কোন্ লর্ড স্যালস্বারি নাকি মারা যাবার পর হিসেব করে দেখা হয়েছিল, জীবনে যত চুরুট তিনি খেয়েছেন তা জোড়া দিলে ছ মাইল লম্বা হয়। তা ছাড়া চুরুট খেলে আত্মবিশ্বাস বাড়ে! সেই লর্ড স্যালস্বারি বলেছিলেন—ইতিহাসে কোনও চুরুটখোরের আত্মহত্যার রেকর্ড নেই—

রায়সাহেব জে· ডি· ব্যানার্জি বলতেন—চুরুট খেতে শেখান আমাকে মিঃ অকিনলেক—এদিকে তো পণ্ডিত লোক, ইংরিজীর মাস্টার—ইংরিজী ভাষাটা গুলে খেয়েছিলেন—ওদিকে চুরুট খান আমার মতো—তাঁর কাছেই তো এই ইংরিজী বিদ্যেটা আর চুরুট খাওয়ার হাতেখড়ি আমার—

স্যুট পরে ছড়িটি ফেলতে ফেলতে যারা পাটনার রাস্তায় রায়সাহেব জে· ডি· ব্যানার্জিকে হাঁটতে দেখেছে তারা জানে সেই মন্থর অথচ দ্রুত চালের মুভমেন্ট। প্রতি পদে সেই ইলাস্টিক স্টেপ্। দেখেই মনে হবে যেন বিরাট গাড়ি, বিরাট বাড়ি সবই আছে—সমাজে সংসারে যেন সুউচ্চ প্রতিষ্ঠায় অধিষ্ঠিত। শুধু স্বাস্থ্যের খাতিরে একটু পদাচারণা করতে বেরিয়েছেন।

একমাস পরেই হতাশার সুর বেজে উঠলো।

—না রে মিলি, যা দেখলুম তোরা পাটনায় কী সুখেই আছিস—এতদিনের

মধ্যে একটা ভদ্দরলোক নজরে পড়লো না—

পেস্ট্রির ডিশ্‌টা বাবার দিকে এগিয়ে দিয়ে চা ঢালতে ঢালতে মিলি বলেলে —কেন বাবা—ওই তো ইয়েরা রয়েছেন, হরসিংপুরের জমিদার জনকবাবুরা রয়েছেন, সব ভাই ক'টা বি-এ পাস, তার পর মুন্সেফ রঘুবীর প্রসাদ বিলেত-ফেরত—তার পর নিউ-পাটনায় ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের এজেন্ট বাবুল মিত্তির এম-এ, চার্টার্ড একাউন্‌টেন্ট, রণধীর চৌহান···

—আরে ছি ছি—ওদের তুই বলিস ভদ্দরলোক ?

চায়ের কাপটা ঠোঁটে তুলতে গিয়ে একটা 'শ্রাগ্‌ করলেন রায়সাহেব জে· ডি· ব্যানার্জি'।

—কেউ ইংরিজীর 'ই' জানে না, 'হোয়াইটম্যান' পড়ে না—আবার পলিটিক্স নিয়ে তর্ক করতে আসে, ইংরিজী জানা লোক গোটা ভারতবর্ষেই তো আছে মাত্র আড়াইটে, একটা তোদের গান্ধী, একটা টেগোর আর আধখানা···

আধখানা যে কে তা আর বলা হলো না ! হঠাৎ যেন স্বগতোক্তির সুরেই রায়সাহেব বললেন—ইংরিজীটা কি অত সহজ রে···তা যদি হতো···এই দ্যাখ্‌না আজকের হোয়াইটম্যানেই তো চারটে ইংরিজীর ভুল ধরেছি···

ইংরিজী ভাষাটাই জানতেন রায়সাহেব জে· ডি ব্যানার্জি। তিনি নিজেই একদিন বলেছেন—কেমন করে শিখলেন বিদ্যেটা। ওটা বড় অদ্ভুত ভাষা নাকি। ভাবতে হয়, পড়তে হয়, লিখতে হয়, স্বপ্ন দেখতে হয়—অনেকের আবার তাতেও হয় না। ওটা অনেকটা কবি হওয়ার মতো। সবাই কি চেষ্টা করলেই কবি হতে পারে ? তেমনি সবাই চেষ্টা করলেও ইংরিজী শিখতে পারে না। ওটা একটা ভগবান-দত্ত ক্ষমতা। না হলে তো রামা-শ্যামা টম-ডিক্‌-হ্যারি সবাই শিখে ফেলে বসে থাকতো। ইংরিজীটা কি অত সহজ রে !

কথাগুলো অনেকটা ধমকের মতো। না জেনে মিলি তার বাবাকে অন্য সকলের সঙ্গে সমান পর্যায়ে নামিয়ে ফেলেছে। কিন্তু বড় শিশুর মতো সরল মন রায়সাহেব জে· ডি· ব্যানার্জির। কিছু মনে রাখেন না। বোধ হয় প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ পরের দিন মিলি নিজে বাজারে গিয়ে বাবার পছন্দ-করা চুরুট আর এক বাক্স আনিয়ে দিলে।

কিন্তু হোয়াইটম্যানের কুড়ি বছরের চাকরিটা যাওয়ার পেছনে একটা ইতিহাস আছে।

যাঁর ধ্যান জ্ঞান স্বপ্নই হলো ইংরিজী, ইংরিজীর ভুল তিনি সইবেন কেমন করে ! ভুল দেখলে সইতে পারতেন না, তা সে স্বয়ং এডিটরেরই হোক, আর নিজেরই হোক। একবার নিজেরই একটা ভুল ধরা পড়লো। উঃ, সে কী আত্মগ্লানি ! ছাপার অক্ষরেও বেরিয়ে গেল সেটা। সাধারণ পাঠকরা কেউই ধরতে পারলে না বটে, এডিটরও পারেনি। কিন্তু যে-টা ভুল সেটা তো ভুল-ই।

কেউ ধরতে পারুক আর না-পারুক, নিজেকে তিনি ক্ষমা করবেন কী করে? নিজের কাছে কী কৈফিয়ত দেবেন তিনি?

গল্প হচ্ছিল ডিনার খেতে খেতে।

জ্যোটি, লোটি, রুবি আর মিলি। আর ওদিকে মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়। পাটনা সেক্রেটারিয়েটের সুপারিনটেন্ডেন্ট। মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় বললেন—তার পর?

মিলিও চচ্চড়ির ডাঁটা চিবানো থামিয়ে বললে—তার পর কী করলে বাবা?

সুপের চামচেটা মুখ থেকে নামিয়ে ন্যাপকিন দিয়ে দুটো ঠোঁট মুছে নিলেন। তার পর আধখাওয়া চুরুটটা মুখে দিয়ে আবার ধোঁয়া ছাড়লেন লম্বা করে। বললেন—ঠিক করলাম আত্মহত্যা করবো, আত্মহত্যাই আমার একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত! বোঝো, আমরা সে-যুগে কতখানি জীবন দিয়ে ভালোবাসতুম ইংরিজী ভাষাকে—যাকগে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করা হলো না—

চমকে উঠেছে মিলি। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় নিজের মনেই নিঃশব্দে খেতে লাগলেন।

ছোট মেয়ে রুবি আর চাপতে পারলে না কৌতূহল। বললে—কেন বাবা? ধরা পড়ে গেলে বুঝি?

চুরুটটা টানতে-টানতে থেমে ধোঁয়া ছেড়ে বললেন—এই চুরুট-ই আমায় বাঁচিয়ে দিলে শেষ পর্যন্ত, লর্ড স্যলসবারির কথাটা মনে পড়লো—কোনও চুরুটখোর আত্মহত্যা করেছে ইতিহাসে এমন ঘটনা তো পাওয়া যায় না—

রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি এক স্লাইস রুটি ছুরি দিয়ে কাটতে লাগলেন।

—তার পর এল ডানকান সাহেব। স্কচের বাচ্ছা। জাঁদরেল লোক। কিন্তু ইংরিজি ভুল। ধরলাম একদিন। অতি সাধারণ ভুল। সাহেবের হাতে অমন ভুল বড় একটা দেখা যায় না। তর্ক হলো। এডিটর বলে ঠিক—অ্যাসিসট্যান্ট বলে ভুল।···

রায়সাহেব রুটি কামড়ালেন। তার পর বাঁ হাতের কাঁটা দিয়ে মাংস তুলে মুখে পুরলেন—

—দিলাম চাকরি ছেড়ে—

মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় তখনও রায়সাহেব হননি। বললেন—এই সামান্য কারণে চাকরি ছেড়ে দিলেন আপনি!

—একে তুমি সামান্য বলছ, মৃত্যুঞ্জয়?

যেটা সত্যি কথা সেটা ডানকান সাহেব জানুক। আর কারুর জানবার দরকার নেই। সেই সামান্য কারণে রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি সাত শো টাকার চাকরি ছেড়ে, কলকাতা ছেড়ে, জ্যোটি, লোটি আর রুবিকে নিয়ে এখানে চলে এলেন। মিলির বাড়িতে। নাই বা থাকলো টাকা, সাত শো টাকা মাইনের চাকরি। মিলি

আছে, মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়—পাটনা সেক্রেটারিয়েটের সুপারিনটেন্ডেন্ট আছে। জ্যোটি, লোটি, রুবির বিয়ে মিলি-ই দেবে। তাঁর ডিনার, কেক, পেস্ট্রি, চুরুট, চা, স্যুটের খরচ মিলি-ই দেবে।

এ সবই চৌদ্দ বছর আগেকার ঘটনা।

সেই সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে বিছানায় আধশোয়া অবস্থায় বাসী মুখে বেড্-টি খাওয়া। তার পর ড্রেসিং গাউনটা গায়ে চড়িয়ে চুরুট ধরানো। 'হোয়াট্-নট' থেকে হোয়াইটম্যান নিয়ে পড়া। পায়জামা-পরা পা দুটো হোয়াট্‌নট-এর গায়ে লাগিয়ে দেওয়া আর কাগজ পড়া। পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে পড়া। হাতের ফাউনটেন পেন দিয়ে মার্জিনে দাগ দেওয়া। কোথাও ছাপার ভুল থাকলে তা দাগিয়ে দেওয়া। এই কাজেই লাগে দু'ঘণ্টা। এ-সময়ে রায়সাহেবকে পৃথিবী ভুলে যেতে হয়। এই দু'ঘণ্টা তিনি অখণ্ড মনোযোগ দিয়ে ছোট ছোট অক্ষরের সমুদ্রে ডুবে যান।

তার পর পড়া, ভাবা, দাগ দেওয়া যখন শেষ হয় তখন লেটারপ্যাড নিয়ে লেখবার টেবিলে গিয়ে বসেন। চিঠি লিখতে বসেন। লম্বা শুদ্ধ ইংরিজী চিঠি। হোয়াইটম্যানের সম্পাদকের নামে। কুড়ি বছর হোয়াইটম্যানের চাকরি করে এসেছেন, লেখার প্রুফ দেখেছেন। এ-কাজে তিনি অভ্যস্ত। সিদ্ধহস্ত বলা চলে। সেই অভিজ্ঞ কলম নিয়ে লিখে চলেন। চিঠির আকারে জানিয়ে দেন সম্পাদককে কোথায় সেদিনকার কাগজের সম্পাদকীয়তে ছাপার ভুল, নয়তো ইংরিজীর ত্রুটি। বিস্তারিত সমস্ত আলোচনা। মতবাদ নিয়ে, কাগজের পৃষ্ঠা-সংখ্যা নিয়ে, বিজ্ঞাপন নিয়ে, কাগজের প্রচার নিয়ে। কাগজের একজন শুভাকাঙ্ক্ষীর মতো ডাক-খরচা দিয়ে দিয়ে চৌদ্দ বছর ধরে দিনের পর দিন এমনি সমালোচনা মৌখিক নয়, লিখিত। এ যেমন বিস্ময়কর তেমনি কৌতুকজনক।

তার পর সেই চিঠি ডাকে দিয়ে আসা। যে-সে গেলে চলবে না। মহারাজকে নিজের রান্না ফেলে চিঠি ফেলে আসতে হবে। একমাত্র বিশ্বাসী লোক সে-ই। চীৎকার করে ডাকবেন—মহারাজ—

রায়সাহেবের মেজাজী গলার আওয়াজে সমস্ত বাড়ির ঘরগুলো গমগম করে ওঠে। মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় তখন অফিসে যাবেন। ঠাকুর চাকর সবাই ব্যস্ত। মিলিও ব্যস্ত স্বামীর তদারকে। হাতের কাছে গুছিয়ে দিতে হবে জামা, কাপড়, গেঞ্জি, রুমাল, চাবি—সমস্ত। সেই ব্যস্ত আবহাওয়ায় মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় ডাকলেন—মহারাজ—

মিলি বললে—মহারাজ নেই—

—কোথায় যায় অফিসে যাবার সময় ?

মিলি বলে—বাবা পাঠিয়েছেন ডাকের চিঠি ফেলতে—

রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি নিজে পাঠিয়েছেন। সুতরাং মহারাজের কোনও

দোষ নেই। কিন্তু এখন তিনি অফিসে যাচ্ছেন, তিনি এ-বাড়ির মনিব, তিনি অফিসে চলে যাবার পরই চিঠি ফেলতে পাঠালে হতো। কিছু বললেন না মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়, কিন্তু যেন কেমন বিরক্ত হলেন, অন্তত স্বামীর মুখ দেখে মিলির তাই মনে হলো।

আর এক দিনের ঘটনা। রায় সাহেব জে· ডি· ব্যানার্জি ড্রেসিং গাউন পরে বারান্দায় পায়চারি করছিলেন চুরুট মুখে। যেমন সচরাচর করে থাকেন।

একটা চাকর এধার থেকে ওধার যাচ্ছিল ঘর ঝাঁট দিতে। ডাকলেন তাকে।

—এই, শোন্—

চাকরটা সামনে এল বেকুবের মতো।

বললেন—গায়ে জামা দিস না কেন ?

মিলিকে ডেকে আনলেন। বললেন—তোদের এ কী সিস্টেম ? চাকর-বাকর উর্দি না পরুক, খালি গায়ে থাকে কেন ? একটা গেঞ্জি জোটে না—

সেই সময়ে একদিন পয়লা জানুয়ারি তারিখে খবর বেরুল মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় রায়সাহেব হয়েছেন। শ্বশুর রায়সাহেবই ছিলেন, এবার জামাইও রায়সাহেব হলেন। বাড়ির গেট্-এ আর একটা ট্যাবলেট ঝোলাবার কথা। কিন্তু কেন জানি না মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় রাজী হলেন না।

সেদিন সকালেও রায়সাহেব জে· ডি· ব্যানার্জি কাগজের উপাধির তালিকাটা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পড়লেন। দেখলেন কার কার প্রমোশন হলো। নতুন কে কে জাতে উঠলো। খাবার টেবিলে বসে বললেন—এ কী রকম হলো মৃত্যুঞ্জয়··· আমার সময় মনে আছে, টেলিগ্রাম এসেছিল দেড় শো, আর চিঠি বোধ হয় শ তিনেক···কয়েকটা কাগজে ফোটোও বেরিয়েছিল—চাকরিটা রেগে ছেড়ে না দিলে রায়বাহাদুরও হয়ে যেতাম···কিন্তু তোমার বেলায় এ কী রকম হলো মৃত্যুঞ্জয়··· আজকালের লোক গুণের কদর করতে কি ভুলে যাচ্ছে···

মিলিকে বললেন—তোকে বলেছিলুম মিলি তোদের এখানে একটা ভদ্দরলোক নেই···দেখলি তো, মৃত্যুঞ্জয়কে একটা পার্টি পর্যন্ত কেউ দিলে না···আমার মনে আছে মেজর উইন্স্ফোর্থ···

এ সবই চৌদ্দ বছর আগেকার ঘটনা।

তারপর চৌদ্দ বছরের প্রাত্যহিকতায় দৃশ্যপটের কতই না পরিবর্তন হয়ে গেল। মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় বরাবর কম কথার মানুষ ছিলেন, কথা কওয়া আরো কমিয়ে দিয়েছেন।

শ্বশুর জামাইবাড়িতে বেড়াতে এসেই থাকে, কিন্তু এমন বরাবরের মতো বে-আক্কেলে হয়ে যে থেকে যাবেন এ-কথা কে জানতো!

একে একে জ্যোটি, লোটি এবং শেষ পর্যন্ত রুবির বিয়েটাও দিলেন জামাই। প্রত্যেক বিয়েতেই মোটা রকমের খরচ করতে হলো। নইলে পাটনার সমাজে মান থাকে না। সকলেরি বিয়ে দিলেন জাঁকজমক করে। আর তা ছাড়া টাকা খরচের প্রশ্নটাই তো বড় নয়, মেহনত কী কম!

রায়সাহেব মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের কিছু দেনা করতে হলো। মিলির গায়ের গয়না কিছু ভাঙতে হলো। টাউনের বাইরে কিছু খোলা জমি কেনা ছিল মিলির নামে, সেটা সস্তা দরে ছেড়ে দিতে হলো। উপরি উপরি তিনটি মেয়ের বিয়ে দেওয়া সামান্য কথা নয়। তবু রায়সাহেব মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় অসাধ্যই সাধন করলেন। একটিমাত্র ছেলে ছোটবেলা থেকে দেরাদুনে থেকে পড়তো। সিনিয়র কেম্ব্রিজ পাস করার পর কলেজে পড়ছে সেখানে, সুতরাং খরচ পাঠানোও বেড়েছে।

এত কাণ্ড ঘটছে, এত দৃশ্যপট বদলাচ্ছে, কিন্তু রায়সাহেব জে· ডি ব্যানার্জি তাঁর সেই উঁচু চুড়ো থেকে একচুল নড়েননি। সংসারে দৈনন্দিন সচ্ছলতা-অসচ্ছলতার কথা যেন তাঁর জানবার কথা নয়। তিনি যে একজন ব্যয়বহুল গলগ্রহ সে-কথা ভাববার বা বোঝবার তাঁর অবসর নেই। জামাইকে মেয়ে দিয়েছেন বলে শ্বশুরকে ভরণ-পোষণ করাও যেন জামাইয়ের অন্যতম কর্তব্য। আর তা ছাড়া তিনি তো এ-সংসারের একজন গর্বের ও গৌরবের পাত্র। রায়সাহেব জে· ডি· ব্যানার্জি তিনি, চালচলনে বলনে নামধাম-পরিচয়ে যে-কোনও জামাই-ই গৌরবান্বিত বোধ করবে। নিয়ে আসুক না মৃত্যুঞ্জয় দশটা নাইট, বিশটা রায়বাহাদুরকে এ-বাড়িতে, দেখাই যাক না তারা মোহিত বিগলিত হয় কিনা রায়সাহেব জে· ডি· ব্যানার্জির আদব-কায়দায়, কেতা-দুরস্ত ব্যবহারে, ঈর্ষান্বিত হয় কিনা মৃত্যুঞ্জয়ের শ্বশুর-সৌভাগ্যে! বিলেতে তিনি যাননি সত্যি, কিন্তু অন্তত দু শো লোক তো তাঁর কাছে বিলেত যাবার আগে আদব-কায়দা শিখে নিতে এসেছে। কাঁটা-চামচ থেকে শুরু করে ডিনার, ড্রয়িংরুম, বাথ, বো, স্যুট্—হাই সোসাইটির সমস্ত রকম খুঁটিনাটি।

তা সেদিন চা মুখে দিয়েই কাপ নামিয়ে নিলেন রায়সাহেব।

—মিলি, ছি ছি, তোদের টেস্ট দিন-কে-দিন কী যে হচ্ছে—

মিলি কিছু উত্তর করলে না। মিলি ভালো করেই জানে এ-চা বাবা মুখে তুলবেন না, তবু চুপ করে রইল সে। একটু কম দাম। একটু ফ্লেভার কম। কিন্তু সব দিক ভেবেই তো চলা উচিত। উনি বলেছেন—এত দামী চা কি না-হলেই চলে না? তোমার বাবাকে তো পয়সা আয় করতে হয় না, যাকে করতে হয় সে বোঝে।

কথাগুলো তো একেবারে মিথ্যেও নয়। মিলি দেখলে বাবা চা ছুঁলেন না।

বললেন—এ নিশ্চয়ই মহারাজের ভুল হয়েছে রে, কিংবা ওকে ঠকিয়ে দিয়েছে—তুই একটা স্লিপ লিখে পাঠা এখুনি—পাঠা তুই···প্রমাণ হয়ে যাক—পয়সা দিয়ে কেন খারাপ জিনিস খাবো—বল্ ?

বাবাকে চিনতো মিলি।

শেষ পর্যন্ত লিখতে হলো স্লিপ। স্লিপ লিখে মহারাজের হাতে দিতে যাচ্ছিল—

রায়সাহেব জে· ডি· ব্যানার্জি বললেন—আর ওই সঙ্গে আমার সেই চুরুটের কথাটা লিখে দে না, এ মাসে হঠাৎ ওই খারাপ চুরুটটা যে কেন আনালি—জানিস তো আমি চল্লিশ বছর ধরে ওই এক ব্র্যান্ড খেয়ে আসছি···

শেষ পর্যন্ত মহারাজকে দিয়ে ভালো চা আর চুরুটের ফরমাস দিতেই হলো। কিন্তু বার বার কাল রাত্রের কথা মনে পড়তে লাগলো মিলির। স্বামী শেষ পর্যন্ত অধৈর্য হয়ে বলেছিলেন—তোমার বাবা বিড়ি খেতে পারেন না—যাঁর একপয়সার মুরোদ নেই—তাঁর আবার অত শখ কেন শুনি···?

রাত্রে শোবার ঘরের মধ্যে মিলিকে অনেক সহ্য করতে হয় বাবার জন্যে। আজকাল রায়সাহেব মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের কী যে হয়েছে—বাড়িতে তিনি থাকেন কম। অফিসের আগে আর অফিসের পরে যতক্ষণ তাঁর বাড়িতে থাকবার কথা, সে-সময়টা কাটে তাঁর বাগানে। রাত্রে হারিকেন আর টর্চ নিয়ে চলে তাঁর গাছের তদবির তদারক। কোনও বন্ধু এলে দেখা করেন বাগানে। মিলি সারাদিন সংসারের খুঁটিনাটি নিয়ে ব্যস্ত থাকে। আর ওদিকে রায়সাহেব জে· ডি· ব্যানার্জি ? যখন রায়সাহেব মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় অফিসে বেরিয়ে যান, তখন নেমে আসেন তিনি ওপর থেকে।

চীৎকার শোনা যায় দূর থেকে—মহারাজ—

অর্থাৎ আর একবার তাঁর চা চাই।

সেই তখন থেকে যতক্ষণ না রায়সাহেব মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় অফিস থেকে আসেন, ততক্ষন ঘণ্টায় ঘণ্টায় তাঁর চা চাই। আর সেই দামী চা। সংসার ভেসে যাক, কারু পেট ভরুক আর না-ভরুক, রায়সাহেব জে· ডি· ব্যানার্জির চুরুট, চা চাই। তা ছাড়া সকালবেলা চাই তাঁর নিজস্ব একখানা 'হোয়াইটম্যান', লেখবার প্যাড, কলম, কালি আর স্ট্যাম্প। চাই নিজস্ব ব্র্যান্ড টুথপেস্ট, টুথব্রাশ, স্নো, পাউডার আর মাসকাবারী হাতখরচ কুড়িটি টাকা।

প্রতি মাসের পয়লা তারিখে মিলি দু'খানা দশ টাকার নোট বাবার হাতে গিয়ে দিয়ে আসে।

মিলির সেদিন নজরে পড়ে। বিকেল থেকে বাবার সেদিন শুরু হয় উদ্যোগ-আয়োজন। রায়সাহেব জে· ডি· ব্যানার্জি আবার যেন তাঁর পুরনো ফেলে-আসা দিনগুলো ফিরে পান। আলমারি থেকে বেরোয় সেইসব চৌদ্দ-বছরের পুরনো

স্যুট্। কোনোটা আর শরীরের সঙ্গে এখন ফিট্ করে না। জুতোর গোড়ালি থেকে প্যান্টটা দু'ইঞ্চি ওপরে উঠে পড়েছে। জায়গায় জায়গায় পোকায় এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে দিয়েছে। অ্যাশ-কাঠের সৌখিন ছড়িটা বেরোয়। বেরোয় ফেল্ট-হ্যাট্। মাথায় ঈষৎ বেঁকিয়ে বসিয়ে দেন। হাফ্‌সোল দিয়ে দিয়ে পেটেন্ট লেদারের শু-জোড়ার সে-গৌরব আজ অস্তমিত। তবু মাস্টার-টেলারের তৈরি সেই পোশাকে হঠাৎ রায়সাহেবের দেহটা কেমন ঋজু হয়ে ওঠে। যেমন হতো চৌদ্দ বছর আগে সাহেবী হোটেলে ডিনার খেতে যাবার সময়। চুরুটটা দাঁতে কামড়ে যখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তায় পড়েন তখন আর ধরতে পারার কথা নয়। খাঁটি বনেদী চাল। হোন নিঃস্ব, জামাইয়ের গলগ্রহ—একদিন আধদিন নয়, চৌদ্দ বছর ধরে—তবু চালচলন দেখে বোঝা যায় ইজ্জতদার মানুষ, খানদানী আদব-কায়দার মানুষ। সম্ভ্রমে মাথা নীচু হয়ে আসতে বাধ্য।

তার পর যেমন ভঙ্গীতে সে-যুগে হোটেলে গিয়ে ঢুকতেন, তেমনি ভাবে গিয়ে ঢোকেন পাটনার বড় একটা হোটেলে। কলকাতার হোটেলের কাছে এ হয়তো কিছু নয়। কিন্তু রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি ভুলে যেতে চেষ্টা করেন যে, এটা পাটনার হোটেল। তাঁর মানসচক্ষে ভেসে ওঠে পাম্ গ্রোভ্—জাজ্ ওয়াল্‌জ্ আর স্যুট-পরা স্ত্রী-পুরুষের ভিড়।

একটা চেয়ারে মধ্যেখানে বসেন—সকলের দৃষ্টির সামনে। তার পর যারা সেই অবস্থায় সেখানে ডিনার খেতে দেখেছে তাঁকে, তারা জানে পাকা বনেদিয়ানা কাকে বলে। তাঁর সেই ন্যাপকিন নেওয়া থেকে শুরু করে নিখুঁত সব মুভমেন্ট লক্ষ্য করার মতো। অন্তত পাটনার ওই হোটেলে এর আগে আর কাউকে অমন ভাবে দেখা যায়নি ডিনার খেতে।

কিন্তু মাত্র তো কুড়িটি টাকা। প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহটাই শুধু চলে—আর বাকী সমস্তটা মাস আবার বসে থাকতে হয় পরের মাসের পয়লা তারিখটির দিকে চেয়ে। কারণ খাওয়াই কি শুধু? বকশিশ দিতেও যে মোটা টাকা বেরিয়ে যায়, আর ওটা না দিলে তো খাতিরও থাকে না।

একবার মেয়েকে বলেছিলেন—মিলি, আমার স্যুটগুলো সব তো গেছে, আর অন্তত হাফ ডজন না করালে তো আর চলছে না—তোর কী ভুলো মন, তিনমাস থেকে তো কেবল করাবি বলছিস—

রায়সাহেব মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের সেটা ইন্সিওরেন্স-এর প্রিমিয়াম দেবার মাস। সে মাসে হয় না। সুতরাং মিলি চুপ করে থাকে। পরের মাসে ছেলের পরীক্ষার ফিস্ দিতে হলো অনেক টাকা। তার পরের মাসে মিলির বিয়ের মাস, জামাই একটা নেকলেস কিনে দিলে স্ত্রীকে, তার পরের মাসেও একটা-না-একটা কী খরচ হয়ে গেল। সুতরাং রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জির সামান্য হাফ-ডজন স্যুট্ তা-ও হয়ে উঠলো না বহুদিন।

ড্রেসিং গাউনটা ছিঁড়ে যেতে বসেছে। ওই একখানাই এখন সম্বল। কোন্-দিন পিঠের দিকটায় টান পড়লেই ফ্যাস্ করে ছিঁড়ে যাবে। তবু সকালবেলা ওইটে পরেই হোয়াট্নট-এর ওপর থেকে হোয়াইটম্যান-খানা নিয়ে চায়ে চুমুক দিতে দিতে কাগজ পড়তে থাকেন। সেটা ছোট-চা।

তার পর বড়-চা হবে আটটা থেকে ন'টার মধ্যে। আগে কিছু পেস্ট্রি বা বিস্কুট বা টোস্ট থাকতো সংগে। আজকাল আবার পরোটায় নেমেছে। তবু সেই পরোটাই ছুরি কাঁটা দিয়ে চিবোতে চিবোতে চা খাওয়া।

আজকাল রায়সাহেব মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় এই বড়-চা'তে থাকেন না। তিনি তখন থাকেন বাগানে। রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি একাই গল্প করে যান তখন।

—জানিস মিলি, এবারকার শীতে লন্ডনের মে-ফেয়ার-এ চৌদ্দ ইঞ্চি বরফ পড়েছিল···

মিলি একমাত্র নীরব শ্রোতা। শুধু বললে—তাই নাকি বাবা ?

রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি বললেন—এতেই তুই অবাক্ হচ্ছিস, কিন্তু যেবার বার্লিনে কলের জল জমে বরফ হয়ে গিয়েছিল, নাইনটিন টোয়েনটিতে—তিনশো তেতাল্লিশ জন লোকের নাক যে একেবারে খসে গিয়েছিল—

চুরুটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি লন্ডন, বার্লিন আর নিউইয়র্কের গল্প করে চলেন। তার পর একসময় দ্যাখেন মিলি কখন অজান্তে উঠে চলে গেছে, তখন আস্তে আস্তে ওপরে উঠে যান। ওপরে উঠে গিয়ে লেখবার টেবিলে চিঠি নিয়ে বসেন। চিঠির তাড়া। ম্যানচেস্টার থেকে মিস্টার ক্রফোর্ড চিঠির জবাব দিয়েছেন। ফ্লীট স্ট্রীট থেকে জবাব এসেছে কোনো এক কাগজের মালিক লর্ড ফেয়ারওয়েদারের। চিঠির জবাব পড়া এবং জবাবের জবাব লেখার মধ্যে হঠাৎ দেশলাইয়ের কাঠি ফুরিয়ে গেল।

চীৎকার করে ডাকেন—মহারাজ—

মহারাজ এল না। সাড়াও দিল না। কী হলো সব! কিছু বুঝতে পারলেন না রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি। অথচ চুরুট নিভে গেছে।

আবার ডাকেন—মহারাজ—

এবার মহারাজ এল। রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি বললেন—একটা দেশলাই আনো তো মহারাজ—দেশলাই একটা—

কিন্তু সোজা হুকুম তামিল না করে মহারাজ বললে—জামাইবাবু এখন অফিসে যাচ্ছেন। তিনি অফিসে বেরিয়ে গেলে দেশলাই কিনে আনবো—

সাহেবী মেজাজ হঠাৎ যেন গরম হয়ে উঠতে যাচ্ছিল। কিন্তু চুরুটখোরেরা সহজে রাগে না বলেই তিনি কিছু না বলে চুপ করে রইলেন।

কিন্তু খাবার টেবিলে রিপোর্ট না করে পারলেন না। বললেন—আদর দিয়ে

দিয়ে তুই চাকরদের একেবারে মাথায় তুলে ছেড়েছিস মিলি, কী বুদ্ধি দ্যাখ্—আমার চুরুটটা তখন নিভে গেছে, আমার দেশলাইয়ের চেয়ে জামাইবাবুর অফিসে যাওয়াটাই বড় হলো—

এখন, ঠিক এই সময়ে, এক পয়লা জানুয়ারির সকালবেলায় কাগজ পড়তে পড়তে রায়সাহেব জে· ডি· ব্যানার্জি থমকে গেলেন। রায়সাহেব মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় প্রমোশন পেয়ে রায়বাহাদুর হয়েছেন।

সেই অবস্থাতেই নেমে এলেন। সেই ড্রেসিং গাউন, বাঁ হাতে চায়ের কাপ, আঙুলের ফাঁকে চুরুট।

—মিলি, মিলি—

মিলি রান্নাঘরের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। রায়সাহেব জে· ডি· ব্যানার্জি বললেন—মৃত্যুঞ্জয় কোথায় রে—

মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় বাগানে ছিলেন। যথারীতি চা খেয়েই বাগানে গিয়েছেন।

রায়সাহেব জে· ডি· ব্যানার্জি হাত বাড়িয়ে দিলেন—কন্‌গ্র্যাচুলেশন্‌স্‌—

ভিড় হয়ে গেল সকাল থেকেই। লোকের আসা-যাওয়া। স্যার জীবনপ্রসাদ এলেন বুইক হাঁকিয়ে। চার্টার্ড একাউন্‌টেন্ট রণধীর চৌহান সাহেব। হরসিংপুরের জমিদার জনকবাবুরা। বিলেত-ফেরত মুন্সেফ রঘুবীর প্রসাদ। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের ম্যানেজার বাবুল মিত্তির এম· এ·।

দুপুর বারোটা নাগাদ দু'-তিনখানা টেলিগ্রামও এসে গেল।

তার পর বিকেলবেলা আর এক দফা। চা, হাসি, কথা, নমস্তের ধাক্কা একদিনেই শেষ হলো না। দু'-তিনদিন ধরেই চললো। ডাকে চিঠি আসতে লাগলো। জ্যোটি, লোটি, রুবিরা আর তাদের বরেরা লিখেছে। দেরাদুন থেকে ছেলে লিখেছে। চেতলা থেকে মাসিমারা। দিল্লী থেকে লিখেছে পরেশবাবুর স্ত্রী। ভাগলপুর থেকে মামাবাবু লিখেছেন। বেরিলি থেকে জ্যাঠতুতো ভাই লিখেছে। অনেক অনেক চিঠি। সকলকে উত্তর দিতে দিতে মিলি বিব্রত হয়ে পড়লো।

প্রথমে রায়সাহেব জে· ডি· ব্যানার্জি সত্যিই খবরটা দেখে প্রীতই হয়েছিলেন। কিন্তু এই বাড়াবাড়ি তাঁর ভালো লাগলো না। ডানকান সাহেব তো কথাই দিয়েছিলেন। ওখানে চাকরিতে থাকলে এতদিনে রায়বাহাদুরিটা পেতে অন্তত দেরি হতো না। তা এত বড় রায়বাহাদুরের তালিকা তো আর কখনও বেরোয়নি। এমন বছর-বছর গাদা গাদা রায়বাহাদুর যদি বেরোতে থাকে তাহলে কাকে ছেড়ে কাকে দেখবেন!

কিন্তু এতেও বোধ হয় বিচলিত হবার মতো কিছু ছিল না। সবই চাপা

পড়ে যেত একদিন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেক্রেটারিয়েটের অফিসাররা একটা বিরাট পার্টি দেবার বন্দোবস্ত করে বসলো রায়বাহাদুর মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়কে। হাসি পেল রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জির। এমন হাস্যকর ব্যাপার শুধু পাটনা বলেই সম্ভব বুঝি।

তা হোক, পৃথিবী কারও হাসি-ঠাট্টা, সুখ-দুঃখের ভালো লাগা না-লাগার তোয়াক্কা করে না।

দিনক্ষণ স্থির হয়ে গেছে। আগামী রবিবার। হাতে আর মাত্র চারদিন। ছাপানো কার্ড বিলি হলো সকলের নামে। পাটনার রথী-মহারথীরা কেউ বাদ পড়লেন না। রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জির নামেও আলাদা চিঠি এল একটা।

রবিবার পার্টি। আর, শনিবার দুপুর পর্যন্তও কেউ জানতো না।

শনিবার সন্ধ্যাবেলা বললেন মিলিকে। বললেন—কাল তো আমি থাকতে পারছি না, মিলি—আমাকে যে কলকাতায় যেতে হচ্ছে—

—কেন বাবা, হঠাৎ ?··· মিলির চমকে ওঠবারই তো কথা।

রায়বাহাদুর মৃত্যুঞ্জয়ও কম চমকে উঠলেন না। বললেন—কেন ?

রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি বললেন—তোমার পার্টিতে থাকতে পারবো না, মৃত্যুঞ্জয়, কিছু মনে কোরো না—ডানকান সাহেব জরুরী চিঠি লিখেছে, গিয়ে দেখা কররার জন্যে—এতদিন পরে বোধ হয় ভুল ওরা বুঝতে পেরেছে···

—তোমাকে কি আবার ওরা চাকরি দেবে নাকি, বাবা ?··· মিলি প্রশ্ন করলে।

—কে জানে !

—কবে যাবে ?

—কালই সকালে, জরুরী চিঠি লিখেছে, দেরি করা উচিত নয়।

—তা তো বটেই— রায়বাহাদুর মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় বললেন।

গুছিয়ে দিলে মিলি। রাত পোহালেই সকাল। সময় বড় কম। রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি চলে যাবেন পাটনা ছেড়ে। চাকরি পেলে আর ফিরবেন না। আর একটা দিন পরে গেলেই তো ভালো হতো। কিন্তু উপায় নেই। নইলে জামাইয়ের সম্মানে যে পার্টি দেওয়া হচ্ছে, তাতেই কিনা তিনি থাকতে পারবেন না !

যত কিছু জিনিসপত্র নিজের বলতে ছিল রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জির, সব গুছিয়ে বাঁধাছাঁদা হলো। মিলি স্লিপ পাঠিয়ে দু' কেস্ চুরুটও আনালো।

সকালবেলা উঠেই মিলি এসেছে বাবার ঘরে। হঠাৎ রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি যেন কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। চোদ্দ বছর আগে যেদিন তিনি এ-বাড়িতে এসেছিলেন, সেদিন যেন এমনি করে মিলি কাছে এসেছিল। এমনি করে তাঁর তদারক করতো। মিলি এরই মধ্যে এক ডজন রেডি-মেড শার্ট

আনিয়েছে। আনিয়েছে এক ডজন টাই। রুমাল ছ'টা। এক টিন বিস্কুট, রাস্তার খাবার।

আজই সন্ধ্যেবেলা রায়বাহাদুর মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের পার্টি। শহরের সমস্ত গণ্যমান্য লোকের নেমন্তন্ন। কথাটা মনে পড়তেই রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি লম্বা চুরুটের ধোঁয়া ছাড়লেন।

মিলি শেষসময়ে বললে—বাবা, হপ্তায় হপ্তায় একটা করে চিঠি বরাবর দিয়ে যেয়ো—তুমি চলে গেলে বাড়িও একেবারে ফাঁকা হয়ে গেল—

রায়সাহেব অন্যমনস্ক হয়ে বললেন—দ্যাখ্ মিলি, জানিস রায়বাহাদুর আমিও হতুম···সব বন্দোবস্ত ঠিক—এমন সময় ডান্‌কান সাহেব এসে গোলমাল করে দিলে—

কী কথার উত্তরে কী কথা শুনে মিলি যেন অবাক্ হয়ে গেল। বললে—তা হোক্‌গে বাবা, সেই ডান্‌কান সাহেবই তো ডেকেছে—সেই ডান্‌কান সাহেবই তো আবার তোমায় চাকরি দিচ্ছে—লোকটা ভালোই বলতে হবে—

একটা খামের মধ্যে কিছু টাকা দিয়ে বাবার জামার বুকপকেটে রেখে দিয়ে বললে—এই পকেটে দু শো টাকা রেখে দিলাম বাবা, মনে থাকে যেন—

আজ আর রায়বাহাদুর মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের নয়, আজ যেন রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জির হুকুম তামিল করতে ছুটেছে চাকর-বাকরেরা!

ট্রেন ছাড়লো। মিলির চোখ-দু'টো করুণ হয়ে উঠেছিল। রায়বাহাদুর মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় হাত উঁচু করলেন। হাতের চুরুটটা দাঁতে চেপে রায়-সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জিও হাত উঁচু করে আঙুল নাড়তে লাগলেন। ইঞ্জিনের ধোঁয়ার সঙ্গে তাঁরও একটা স্বস্তির সুদীর্ঘশ্বাস পড়লো। পাটনায় থাকলে রায়বাহাদুর মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের পার্টিতে তাঁকে যেতেই তো হতো!

সাতদিন পরে মিলি তখন চায়ের আয়োজন করছে।

বাইরে থেকে হঠাৎ চীৎকার এল—মহারাজ—

মিলি বেরিয়ে এসে দেখলে—ট্যাক্সি থেকে নামছেন বাবা।

মিলিকে দেখে বললেন—এই ট্যাক্সি-ভাড়াটা দিয়ে দে তো মিলি—

ঘরে ঢুকে বললেন—রাজী হলাম না, বুঝলি রে······ডান্‌কান সাহেব বললে—সাত শো টাকা দেব, করো তুমি চাকরি আবার। আমি বললাম—চাকরী আমি করবো না সাহেব। তখন বললে—হাজার টাকা দিচ্ছি—। তখন আমিও বললাম—দু হাজার টাকা দিলেও করবো না—

মিলি বললে—তার পর?

—তার পর আর কি—চলে এলাম, চাকরি করবো কোন্ দুঃখে বল্—তোরা

থাকতে বুড়ো বাপ চাকরি করবে—এটা কি ভালো দেখায়—লোকেই বা কী বলবে ?

অফিস থেকে এসে রায়বাহাদুর মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ও শুনলেন। শ্বশুরের হাজার টাকা মাইনের চাকরি না-নেওয়ার কাহিনী।

রায়সাহেব জে· ডি· ব্যানার্জি প্রশ্ন করলেন—ভালো করি নি—তুমি কী বলো মৃত্যুঞ্জয় ?

রায়বাহাদুর মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ও মিলির মতো কোনো মতামত দিলেন না। চুপ করে রইলেন।

রায়সাহেব নিজের মনেই বলতে লাগলেন—হাজার হোক, বেটারা তো আমাদের মতো নয়—গুণের কদর বোঝে—খাঁটি স্কচের বাচ্ছা—বললে—রায়-সাহেব তোমাকে আমি রায়বাহাদুর করিয়ে দেবো, তুমি এসো আমার এখানে—তোমার মতন লোক রায়বাহাদুর হয়নি ! এটা খুব লজ্জার কথা—কিন্তু…

কিন্তু হঠাৎ কথা বলতে বলতে রায়সাহেব জে· ডি· ব্যানার্জির নজরে পড়লো কেউ শুনছে না। না মৃত্যুঞ্জয়, না মিলি। তারা কখন টেবিল থেকে উঠে গেছে তিনি টের পাননি। তিনি একলা।

তার পর একলা সিঁড়ি দিয়ে ওপরে নিজের ঘরে উঠতে উঠতে হঠাৎ তাঁর মনে হলো এ-বাড়ির সিঁড়িগুলো আজ যেন বড় উঁচু ঠেকছে।

বংশধর

আপনারা যদি কখনো মেচাদা লোকালে চড়েন তো একটা জিনিস সম্বন্ধে আপনাদের আগে সাবধান করে দেওয়া দরকার।

ধরুন, সকাল সাতটা পঁচিশে ট্রেনটা ছাড়ে হাওড়া স্টেশনের ছ'নম্বর প্লাটফরম থেকে। অন্য দিনের চেয়ে একটু বেশি সকালেই আপনাকে সেদিন ঘুম থেকে উঠতে হবে। আপনি থাকেন টালিগঞ্জে। সেখান থেকে বাসে হোক, ট্রামে হোক—অনেকখানি পথ—অন্তত পুরো এক ঘণ্টার রাস্তা। ঘুম থেকে উঠে দাড়ি কামিয়ে, কাপড়জামা বদ্‌লে হাতে হয়তো সময় থাকবে না বেশি।

ভেবে নিলেন, হাওড়া স্টেশনে গিয়ে কিছু খেয়ে নেবেন। কিন্তু ট্রাম যখন পৌঁছুল স্টেশনের সামনে, তখন মাথার ওপর ঘড়িটার দিকে চেয়ে আপনার খাবার ইচ্ছে মাথায় উঠেছে। ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে ট্রেন তো ধরলেন। জায়গাও হয়তো পেলেন থার্ডক্লাস গাড়ির এক কোণে। তখন? তখন ট্রেনের দোলানি আর ভিড়ের গরমে আপনার হয়তো চায়ের তেষ্টা পাবে। তা চা আপনি পাবেন। ভাঁড়ে করে পবিত্র চা এক আনা দিয়ে কিনতে পারেন। উলুবেড়িয়া, কোলাঘাট এলে ঠাণ্ডা ডাব পাবেন। আন্দুলে গরম পান্তুয়া পাবেন। সাঁকরেলে 'গরম গরম' সিঙাড়া। মৌরগ্রামে তেলেভাজা। ও-সব জিনিস আপনি কিনতে পারেন, কিন্তু একটি জিনিস পেলেও কিনবেন না। কিনে আমি ঠকেছি।

সেইটি বলি।

মেচাদা লোকালে আমি দু'বার চড়েছি।

প্রথমবার তেমন বিশেষ কিছুই ঘটেনি।

গাড়িতে খুব ভিড় ছিল। একটা খবরের কাগজ নিয়ে পড়ছিলাম। চার-দিকের ভিড়ে সামনের বেঞ্চিতে পা তুলে আরাম করবার পর্যন্ত জায়গা নেই।

ট্রেন সাঁত্রাগাছি ছাড়তেই ক্যানভাসারের দল একের পর এক বক্তৃতা দিতে লাগলো।

অদ্ভুত সব জিনিসের বেসাতি। বারো আনার হাফপ্যান্ট থেকে সুরু করে সংসারের দরকারী-অদরকারী নানান জিনিসের বিজ্ঞাপন আর প্রচার। প্রচারের জন্যে অতি অল্পমূল্যে সে-সব জিনিসের বিতরণ। সাধু-প্রদত্ত হাঁপানির ওষুধ, মানুষের কল্যাণের জন্যে এ-ওষুধ বিনামূল্যে বিতরণ করা হচ্ছে, কিন্তু তামার মাদুলির দাম বাবদ মাত্র সওয়া পাঁচ আনা নগদ-মূল্য দিতে হয়। বাজারে যে হাফ-প্যান্ট পৌনে দু'টাকার কমে পাওয়া যায় না, 'কালীমাতা টেলারিং কোম্পানি' নাম-মাত্র বারো আনায় দেশের বস্ত্র-সমস্যার সমাধান করতে ক্যানভাসার পাঠিয়েছেন

মেচাদা লোকালের যাত্রীদের কাছে। তারপর আছে দাস কোম্পানির দাদের মলম। নাম বটে দাদের মলম, কিন্তু চর্মরোগের যম। একবার লাগালেই নির্মূল। কাপড়ে এ মলমের দাগ লাগে না। পারা-বর্জিত মলম, যাঁরা একবার ব্যবহার করেছেন, তাঁরা আত্মীয়-স্বজনের উপকারের জন্যে আর এক শিশি কিনতে পারেন। আরো আছে হাসির হর্‌রা—মহাত্মা গোপাল ভাঁড়ের কৌতুক-কাহিনী। নিরানন্দ মনে হাসির বন্যা ছোটাতে, শোক, দুঃখ, কান্না ভোলাতে ভবসংসারে একমাত্র কাণ্ডারী। বাপ, মা, মেয়ে, ছেলে—একসংগে পড়বার মতো পুস্তক। দাম মাত্র তিন আনা। দেখতে চটি বই, কিন্তু আরব্য-উপন্যাসের চেয়ে উপাদেয় এই গোপাল ভাঁড়ের কৌতুক-কাহিনী। তারপর আছে অন্ধ ভিখারীর মাটির হাঁড়ি বাজিয়ে করুণ গান—'অন্ধ হয়ে ভাই কত কষ্ট পাই…'। তারপর আছে তিলোত্তমা কেমিক্যালের 'বংগলক্ষ্মী সিঁদুর'। আজ থেকে দাম কমলো এ-সিঁদুরের। কাল দাম বাড়তেও পারে। কিনে ঘরে রেখে দিন। হিন্দুর ঘরে এ জিনিস অপরিহার্য। পাঁচ প্যাকেট একসংগে কিনলে তিন আনা পয়সা কমিশন দেওয়া হয়। এমন সুযোগ হারাবেন না। আরো আছে নিমের টুথ-পাউডার। এ টুথ-পাউডারের দাম মাত্র দু'পয়সা। কিন্তু যাঁরা দাঁতের ব্যাধির জন্যে ডেন্টিস্ট্‌কে হাজার হাজার টাকা দিয়েও উপকার পাননি, তাঁরা এই দু'পয়সার নিম টুথ-পাউডার কিনে পরীক্ষা করতে পারেন। বিশ্বাস করে কিনে নিয়ে যান। দুটো পয়সা কতদিন কতভাবেই বাজে-খরচ হয়ে যায়! তারপর আছে…

কিন্তু আরও যা যা আছে, তত জিনিসের নাম মনে রাখা কি সম্ভব!

এ-সব ছাড়াও প্লাটফরমের ওপর ঠেলাগাড়িতে বালুসাই মিহিদানা আছে, ভাঁড়ে বা কাচের গ্লাসে পবিত্র চিনির চা আছে, কচি ডাব আছে, তেলেভাজা আছে, বাঙলা বা মিঠে পান আছে, সিগারেট আছে—বিড়ি আছে, এক কথায় কী নেই?

ধীরে ধীরে মেচাদা লোকাল এগিয়ে চলেছে। ডাইনে বাঁয়ে ছোট ছোট স্টেশন। মৌরিগ্রাম, আন্দুল, সাঁকরেল, আবাদা, নলপুর, বাউড়িয়া…এক এক স্টেশনে ট্রেন থামলেই ক্যানভাসাররা এক গাড়ি থেকে নেমে আর-এক গাড়িতে ওঠে। তারপর পরের স্টেশনে আবার আর-এক গাড়ি।

কিন্তু এবার ফুলেশ্বর আসতেই অতি বৃদ্ধ একজন লোক এল। মাথায় একটু টাক। পাকা চুল সামান্য। গায়ে বোতামহীন খাকী শার্ট। চোখে মোটা কাচের চশমা। হাতে একটা ছেঁড়া স্যুটকেস।

—জি-জি রায়ের অবাক-জলপান নেবেন কেউ?—জি-জি রায়ের অবাক-জলপান?

এত আস্তে কথা বলে, যেন শোনাই যায় না কানে। গম্ভীর মানুষ।

এতগুলো ক্যানভাসারের সঙ্গে যেন কোনো মিল নেই। বক্তৃতার কলা-কৌশল এখনও আয়ত্ত হয়নি। আর তা ছাড়া, চলতি গাড়িতে ওঠা-নামা করবার বয়েসও নয় ঠিক।

আমার পাশের বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি মুখ তুললেন এবার। তারপর একবার অবাক-জলপানের মুখখানার দিকে চেয়ে কী ভাবলেন কে জানে! বললেন: দেখি একটা—

নগদ দু'পয়সা দিয়ে কিনলেন অবাক-জলপান। তারপর প্যাকেটটা খুলে ফেললেন। ওপরে খবরের কাগজ, তলায় শালপাতার তৈরি বড় পানের খিলির মতো প্যাকেট। ভেতরে কয়েকটি চিনেবাদাম, ডালভাজা, কাঠিভাজা—মশলা দিয়ে মাখা। তারপর প্যাকেটটা মুড়ে পকেটে রেখে দিলেন। আমি চেয়ে দেখছিলাম। তিনি আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে চেয়ে যেন স্বগতোক্তিই করলেন—বাড়ির ছেলেদের জন্যে নিলাম মশাই—

ততক্ষণে উলুবেড়িয়া এসে গিয়েছিল। আধ মিনিট থামবে এখানে।

অবাক-জলপান নামতে নামতে গাড়ি ছেড়ে দিলে। আর একটু অসাবধান হলেই বুঝি পড়ে যেত। অবাক-জলপানের দিকে চেয়ে হঠাৎ পেছন দিকটা দেখে যেন চমকে উঠলাম। মুখখানা যেন চেনা-চেনা। ভালো করে দেখবার জন্যে জানলায় মুখ বাড়িয়েছি। চেয়ে দেখি, পেছনের আর একখানা গাড়িতে তখন উঠে পড়েছে সে।

আবার নিজের সীটে এসে বসলাম। কেমন যেন সন্দেহ হলো, রায়মশাই না!

কিন্তু আমাদের গাড়িতেও তখন আর-এক কাণ্ড—

—বীরবলের অদ্ভুত মলম—বীরবলের অদ্ভুত মলম—কাটা-ঘা, পোড়া-ঘা, নালি-ঘা, প্যাঁচড়া, দাদ, চুলকানি, খোস, হাজা, সর্দি-কাসি, ঘুঙরি-কাসি, হাঁপ-কাসি, মাথা-ধরা, পেট-ফাঁপা, আমাশা, বদহজম—যাবতীয় রোগে অব্যর্থ···

এর বছর পাঁচেক পরে আর একবার মেচেদা লোকালে চড়েছি। সেইবারেই কাণ্ডটা ঘটলো।

গোপাল ভাঁড়ের কৌতুক-কাহিনী, পবিত্র চিনির চা, হাফ-প্যান্ট—সমস্ত অত্যাচার এড়িয়ে কোনোরকমে মেচাদা লোকাল থেকে নামতে পেরেছিলাম। কাজ সেরে ফিরবো সন্ধ্যের গাড়িতে। কিন্তু স্টেশন যখন এক মাইল দূরে, তখন ডিস্ট্যান্ট-সিগন্যালের কাছ দিয়ে ডাউন ট্রেনটা বেরিয়ে গেল। বেশ সন্ধ্যে হয়ে গেছে। অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে চারদিকে। একা-একা স্টেশনের প্লাটফরমের ওপর পায়চারি করছি। কাছাকাছি বোধ হয় আর গাড়ি নেই কোনো। জনহীন প্লাটফরম। দূরান্তবর্তী কয়েকটা সিগন্যাল-পোস্টের মাথায় কয়েকটি লালের বিন্দু অদৃশ্য প্রহরীর মতো স্থির নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে। সামনে পেছনে অনন্ত

অন্ধকারের রহস্য। অল্প-অল্প কুয়াশার ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন। চুপ করে দাঁড়িয়ে কান পাতলে যেন এই নিস্তব্ধতারও এক অপরূপ শব্দ শোনা যাবে।

হঠাৎ কানে এল—জি-জি-রায়ের অবাক-জলপান নেবেন কেউ? অবাক-জলপান…জি-জি-রায়ের…

প্রথমে মনে হলো, ও-শব্দ বুঝি আমার অন্তরাত্মার অব্যক্ত গুঞ্জন। তার পরে প্রখর দৃষ্টি দিয়ে একবার চারিদিক দেখবার চেষ্টা করলাম। উল্টো দিকের প্লাটফরমে কোনো জনমানবের সাড়াশব্দ নেই, এই নির্জন প্লাটফরমে কে এমন ঘুরে ঘুরে কাদের কাছে অবাক-জলপান বেচবে! নিজের দৃষ্টি দিয়ে অনুসরণ করলাম তাকে। ছায়ামূর্তি ওভারব্রিজ পেরিয়ে এপাশের প্লাটফরমে আসছে। তখনও অনর্গল বলে চলেছে: জি-জি-রায়ের অবাক জলপান নেবেন কেউ? অবাক জলপান?…নেবেন কেউ?…অবাক-জলপান?…

জপমন্ত্র-উচ্চারণের মতো অবাক-জলপান হাঁকতে হাঁকতে এদিকেই আসছে। তারপর সে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলো। নেমে নির্জন প্লাটফরমের ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সে যেন এদিকেই আসছে। আমি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি। যেন অশরীরী একটা মূর্তি অনন্তকালের ক্যানভাসারের রূপ নিয়ে অনন্তকালের যাত্রীদের কাছে তার অসামান্য বেসাতি বেচতে চলেছে। কেমন যেন ভয় করতে লাগলো।

কিন্তু এবার একটা লাইট-পোস্টের তলায় এসে আমাকে দেখতে পেয়েই অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে চুপ করে চলতে লাগলো লোকটা।

আলোর সামনে ভালো করে দেখলাম তাকে আবার। সেই সেবারের দেখা মূর্তি। বৃদ্ধ মানুষ। মোটা চশমা। মাথার চুলও পেকে গেছে। একটু টাকও আছে বুঝি। মুখে যেন নিঃশব্দে কী বিড়বিড় করে বলছে। এবার চিনতে পারলাম স্পষ্ট। সেই রায়মশাই। পুরন্দর খাঁর বংশধর। কোনও ভুল নেই!

কিন্তু আমাকে যেন চিনতে পারলেন না!

সামনে এগিয়ে বললাম: অবাক-জলপান আছে?

একটি মুহূর্ত। কিন্তু সেই একমুহূর্তের মধ্যে যেন পৃথিবী-পরিক্রমা করে এলাম।

মনে আছে, প্রথম যেদিন চাকরিতে ঢুকলাম, চারদিকে চেয়ে মনে হয়েছিল, যেন এক বিচিত্র জগৎ। সুধীরবাবু আমার হাতে একঠোঙা খাবার দিয়ে বলেছিলেন—নিন, ধরুন…

জিজ্ঞেস করেছিলাম—কিসের খাবার?

সুধীরবাবু বলেছিলেন—পুরন্দর খাঁর বংশধর ম্যাট্রিক পাস করেছে।

তখনও কিছু বুঝিনি। পাশের হরিশবাবু বললেন—নতুন ঢুকেছেন আপনি,.

অনেক কিছু দেখতে পাবেন এখানে, বিখ্যাত-বিখ্যাত সব লোক আছে আমাদের অফিসে। ওই দেখুন, ওই-যে ছেঁড়া শার্ট গায়ে দিয়ে গেলাসে চা খাচ্ছেন, উনি হচ্ছেন বিখ্যাত ডাক্তার, বাড়িতে ডাকলে চার টাকা ভিজিট নেন। আর এই-যে দেখছেন চাঁদনির স্যুট-পরা লোকটি, ও হচ্ছে এক বিলেত-ফেরতের ভাই, আর রেকর্ড-সেক্‌শানে গেলে আপনাকে পুরন্দর খাঁর বংশধরকে দেখিয়ে দেব।

রায়মশাইকে সেদিন প্রথম দেখলাম।

···রেকর্ড-সেক্‌শানে একটা চিঠির খোঁজে গিয়েছিলাম। মোটা চশমা-পরা। হাঁটুর ওপর কাপড় তুলেছেন। জামার সব-ক'টা বোতাম খোলা। ভেতরে বুকের ছাতির ওপর কাঁচা-পাকা চুল দেখা যাচ্ছে। কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই মুখটা তুললেন। বললেন—তোমাকে আগে দেখিনি তো! নতুন ঢুকেছ? কার লোক? দাস সাহেবের?

বললাম—না।

—তবে বিনয়বাবুর?

এবারও বললাম—না।

—তবে কি ম্যাক্‌লীন সাহেবের?

এ অফিসে কারো-না-কারোর লোক না হলে ঢোকা অসম্ভব জানতাম। তবু যখন শুনলেন, আমি কারোর লোকই নই, তখন বললেন—উন্নতি করা শক্ত হবে ভাই, ওই জার্নাল-সেক্‌শানেই পচতে হবে সারা জীবন, এই আমার ব্যাপারই দ্যাখো না··

বলতে গিয়ে একটু থেমে জিজ্ঞেস করলেন—তোমার নামটা···?

নাম শুনে বললেন—মিত্তির? নয়নজোড়ের মিত্তিরদের কেউ হও নাকি?

বললাম—না···

এবারও ছাড়লেন না। বললেন—তবে রাজা কৈলাস মিত্তিরের ফ্যামিলির কেউ?

আমার উত্তর শুনে একটু কৃপাপরবশ হয়েই যেন বললেন—সে কি, রাজা কৈলাস মিত্তিরের নাম শোননি? সে কি হে! খবরের কাগজ পড়ো না নাকি? সেকালে মা'র শ্রাদ্ধে বারো লক্ষ টাকা খরচ করে সমস্ত কলকাতাকে চমকে দিয়েছিলেন, সোনার হুঁকোয় রুপোর কলকে চড়িয়ে তামাক খেতেন। নামই শোননি তাঁর? ওঁর দৌহিত্রের সঙ্গেই আমার পিসিমার দেওরের বে···

পাশ দিয়ে ভূধরবাবু যাচ্ছিলেন। আমাকে ঠেলে দিয়ে বললেন—কার সঙ্গে কথা বলছেন? পুরন্দর খাঁর নাম শুনেছেন?

বললাম—তা শুনেছি বৈকি···

রায়মশাই বাধা দিলেন—ওদের কথা তুমি ছেড়ে দাও ভাই—পুরন্দর খাঁর বংশধর হলে কি আর এই তেষট্টি-টাকা বারো-আনার চাকরিতে পচে মরি!

পরে অবশ্য বুঝেছিলাম যে, 'তেষট্টি টাকা বারো আনা'র কথাটা নেহাতই বিনয়ের ব্যাপার। আরো বুঝলাম, পুরন্দর খাঁর বংশধরের কাহিনীটা কিন্তু সবাই জানে। তেষট্টি টাকা বারো আনা—যা হাতে নেন, সেটা নিতান্তই দায়ে পড়ে। সওয়া ছ'লক্ষ টাকার সম্পত্তির মালিক গঙ্গাগোবিন্দ রায় আজ জ্ঞাতি-সরিকদের ষড়যন্ত্রে বিপাকে পড়ে রেলে চাকরি করতে এসেছেন। আর এই যে ছেঁড়া পাঞ্জাবি, খাটো ধুতি, চার-পাঁচ দিন ক্রমান্বয়ে দাড়ি কামান না, আর ভবানীপুর থেকে এতদূর হেঁটে অফিসে যাতায়াত করেন, কিংবা দুপুরবেলা আধ গেলাস চা খেয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করেন—এ সবই নাকি উদ্দেশ্যমূলক।

জার্নাল-সেকশানের সাব-হেড্ পঞ্চাননবাবুর বেয়াই জামাইকে শীতের তত্ত্ব করেছিলেন। তার থেকে চারটি ফজলি আম এনে সেদিন অফিসের তিরিশটি লোককে খাওয়ালেন। ভাগে দুটো করে টুকরো পড়লো সকলের।

রেকর্ড-সেকশানে টিফিনের সময় গিয়ে রায়মশাইকে বললাম—আপনি আম খেলেন না যে রায়মশাই? বলাবলি করছিল ওরা…

রায়মশাই হাতের চিঠিপত্রের ওপর একটা পাথর চাপা দিয়ে রেখে গলা নীচু করে বললেন—তোমাকে আমার বলতে দোষ নেই ভাই, তুমি যেন আবার ওদের বোলো না…

সামান্য ব্যাপারে এত গোপনীয়তা কেন, বুঝলাম না। বললাম—না, বলবো না, বলুন…

—তবে শোনো, ও-রকম একটুকরো আম আমাদের খাওয়ার অভ্যেস নেই ভাই, তোমাকে সত্যিকথাই বলি। এমন দিন গেছে, যেদিন একসঙ্গে অমন চল্লিশটা আম আমি নিজে সাবড়েছি, আর সে-আম আর এ-আম? এক-একটা গাছ-পাকা আম বেছে বেছে জাল-আঁকশি দিয়ে পাড়া। আমার দেশে যদি কখনও যাও দেখাবো, আর গাছ কি একটা! আমার ভাগে শুধু আমগাছই একশো তিনটে, সব কলমের। সাতটা লিচু গাছ, কাঁঠাল গাছ পঁচাশিটে—আর সে-কাঁঠাল কী! গাছে ফল ফললে তলার মাটিতে গর্ত করতে হয়, নইলে মাটিতে ঠেকে যায়। আমার জীবনে কখনও আমের টুকরো খাইনি ভাই…

বললাম—সে-সব এখন কে খাচ্ছে?

রায়মশাই আবার কাজে মন দিলেন। বললেন—সে অনেক কথা, সব বলতে গেলে আঠারোপর্ব মহাভারত হয়ে যাবে, কেউ বিশ্বাসও করবে না। আমি নিজে কাউকে বলেও বেড়াই না যে, আমি পুরন্দর খাঁর বংশধর। আমাকে দেখে তা কে বিশ্বাস করবে বলো না? ও না-বলাই ভালো। যারা নির্বোধ, তারাই বলে বেড়ায় সবাইকে। আমার সে-স্বভাব নয় ভাই; যারা জানে আমাদের বংশের ইতিহাস, যারা রেখেছে আমাদের খবর, তারা এখনও খাতির করে।…সে-সব গল্প কাউকে করি-ও না, সে অভ্যেসও আমার নেই। বাবা-মশাইয়ের পালকিটা এখনও চণ্ডী-

মণ্ডপের ধারে ভেঙেচুরে পড়ে আছে, আজ্‌জিন বেহারায় বইতো সেটা, তারই একখানা পাল্লা ভেঙে নিয়ে সরিকেরা ছেলে-ঘুমপাড়ানোর দোলনা করলে, আর রাজা-বাহাদুরের পেতলের কামানটা এখনও টিউবওয়েলের পাশে কাত হয়ে পড়ে রয়েছে, এখন গেলে দেখবে তার ওপর বউ-ঝিরা সাবান কাচছে বসে-বসে···

আমি চলে আসছিলাম। ডাকলেন আবার—আর একটা কথা শুনে যাও ভাই···

ফিরে এসে বললাম—কী ?

—তোমার কোনো ভালো উকিল-টুকিলের সঙ্গে জানাশোনা আছে ভায়া ?

আমার নিজের দাদাই আলিপুরের উকিল শুনে বললেন—কোন্ কোর্টের উকিল—দেওয়ানী না ফৌজদারী ?

বললাম—দেওয়ানী।

রায়মশাই হঠাৎ যেন উল্লসিত হয়ে উঠলেন। হাতের কাজ সরিয়ে রেখে বললেন—তোমাকে একটা উপকার করতে হবে ভাই, আমার···

তার পর হাত দুটো ধরে আবার বললেন—আমি শুধু আমার কাগজ-পত্তর-গুলো একবার দেখাতে চাই তাঁকে, আমি ব্যারিস্টার কে. বোসকে আমার দলিল-দস্তাবেজ দেখিয়েছিলাম একবার, তিনি দেখলেন সব, পাট্টা-কবুলিয়ত, খাজনার দাখলে-পত্তর, লর্ড ক্লাইভের আমলের সনদ—সব নকল করিয়েছি কিনা ? তিনি বললেন, কাগজ-পত্তর পরিষ্কার আছে, কোথাও দাগ নেই—আদালতে একবার পেশ করতে পারলে ডিক্রী নিশ্চয় হবে, এই তোমায় বলে রাখলুম। কিন্তু···

—কিন্তু কী ?—জিজ্ঞেস করলাম।

—কিন্তু খরচা। খরচা কে দ্যায় ? এ তো আর ফৌজদারী মামলা নয় ?—এ যে দু'-তিন বছরের ধাক্কা। দু'-তিন বছর ধরে আদালত-ঘর, আর উকিল-মুহুরীর খরচা। চাট্টিখানি কথা তো নয়, সওয়া ছ'লক্ষ টাকার সম্পত্তি ! বাঘও যত বড়, ফাঁদও তত বড় হওয়া চাই তো ! আর এ হলো গিয়ে বাঘের বাবা, যার নাম আদালত—অত টাকা কোথায় ? এখন এই মাসে মাসে দু'-চার টাকা করে জমাচ্ছি, কিন্তু তেমন যদি একজন উকিল পাই···

ফিরে এসে নিজের চেয়ারে বসতেই সুবীরবাবু বললেন—তোমাকে ওর বাড়ি যেতে বলেছে নাকি ? খবরদার খবরদার, যেও না কখনও বলছি।

বললাম—কেন ?

—জ্বালিয়ে খাবে। সেই ট্রাঙ্ক-ভর্তি দলিল দেখাবে, খাওয়াবে, তারপর যত রাতই হোক, সব পড়িয়ে শোনাবে। দলিলের হাতের লেখা পড়তে হবে, নক্সা দেখতে হবে, বংশ-তালিকা দেখতে হবে—তবে ছাড়বে। আমাকে গরম লুচি আর আলুভাজা খাইয়েছিল।

জিজ্ঞেস করলাম—আপনাকেও দেখিয়েছে নাকি ?

—শুধু কি আমাকে ? জিজ্ঞেস করে দেখো. অফিসের কেউ আর বাদ পড়েনি। ওই জীবনবাবু, হরিশবাবু, সনাতনবাবু—এমন কি দ্বিজপদ চাপরাসীকে পর্যন্ত বাড়িতে নিয়ে গিয়ে পড়িয়ে শুনিয়েছে, ও তো পড়তে পারে না…

অফিস থেকে বেরুবার পর দেখতে পাই, সবাই বাস্-এর জন্যে যখন অপেক্ষা করছি, রায়মশাই তখন হাঁটা সুরু করেছেন। কোনো দিকে ভ্রুক্ষেপ নেই, লাঠিটা নিয়ে সোজা বাড়ি যাবেন। বাড়ি ভবানীপুরে। সারাটা রাস্তা হেঁটে আসা-যাওয়া।

সুধীরবাবু বললেন—এই কষ্ট বুড়ো কেন করে জানো ? সব ওর ভাইয়ের জন্যে। এই না-খেয়ে না-প'রে ভাইকে মানুষ করে তুলছে, আর সে-ও তেমনি অমানুষ হয়ে উঠছে। দু'-দু'বার ফেল করে সেবার ম্যাট্রিকটা থার্ড ডিভিসনে পাস করেছে, এবার আই-এ পাস করবে ক'বারে দেখা যাক। কিন্তু রায়মশাই বলে রেখেছেন, বসন্ত আই-এ পাস করলে তোমাদের মাংস খাওয়াবো…

রায়মশাইও বলতেন—কাউকে বোলো না ভায়া, তোমাকেই গোপনে বলছি, বসন্তকে, ইচ্ছে আছে, বি-এ পাস করিয়ে ওকালতি পড়াবো। বুঝলে না, বাড়ির উকিল—নিজে দেখে শুনে মামলা করবে। সওয়া ছ'লক্ষ টাকার সম্পত্তি, তিন বছর লাগে, চার বছর লাগে, যতদিন ইচ্ছে—মামলা করুক, আমি তো এদিকে চাকরি করতে রইলুম। তারপর একবার মামলার ডিক্রী হয়ে গেলে আমায় আর পায় কে ! বসন্তকেও আর ওকালতি করে খেতে হবে না, যা আছে তাই ভাঙিয়ে খেলেই সাতপুরুষ পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে খেতে পারবে। আমিও তখন তেষট্টি টাকা বারো আনার চাকরির মাথায় লাথি মেরে…

রায়মশাই কখনও বেশি কথা বলতেন না। কিন্তু একটু অন্তরঙ্গ হলেই মনের আর বাধা-বন্ধ থাকতো না।

একদিন বললেন—কাউকে বোলোনা ভাই, এই যে লাঠিটা দেখছো, এটা রাজা রুদ্ররামের নিজের হাতের লাঠি, শৌখিন লোক ছিলেন কিনা ! মাথাটা সোনা-বাঁধানো ছিল আগে, চার পুরুষের লাঠি, কত স্মৃতি জড়িয়ে আছে এর সঙ্গে ! এই লাঠি ওঠানামাতে একদিন বর্ধমান জেলার ভাগ্যনির্ণয় হয়েছে—আর এখন রেলের কেরানীর হাতে মানাবে কেন, ভায়া ? তাই দশভরি সোনা খুলে রেখেছি, বসন্তর বিয়েতে আমাকেও তো কিছু খরচ করতে হবে ? ভেবেছি, পয়সা হলে একটা মুকুট গড়িয়ে রাখবো। বুঝলে না, রাজবংশের পুত্রবধূকে গিনি দিয়ে তো আর আশীর্বাদ করা যায় না ?

তা রায়মশাই সত্যিই অফিসের সবাইকে মাংস খাওয়ালেন একদিন। অফিসের তিরিশজন লোক চেটেপুটে মাংস খেলে। একবারের চেষ্টায় আই-এ পাস করেছে বসন্তবল্লভ রায়।

রায়মশাই বলেন—কুমার আমরা নামের আগে লিখতে পারি, আইনে বাধে

না। কিন্তু লিখিনে। তেষট্টি টাকা বারো আনার কেরানী, তার আবার···যদি তেমন সুদিন কখনও আসে ভায়া···

বসন্ত ম্যাট্রিক পাস করেছে, আই-এ পাস করেছে, বি-এ পড়বার জন্যে ভর্তি করে দেওয়া হলো, বসন্তের কবে শরীর খারাপ হলো, বসন্ত কী খেতে ভালোবাসে, বসন্ত কখন ঘুম থেকে ওঠে, কীরকম দেখতে তাকে,—সব সংবাদ আমাকে বলেন রায়মশাই।

একদিন এসে বললেন—কাউকে বোলো না ভাই, আজ বসন্ত খুব রেগে গেছলো···

বললাম—কেন?

—এমনি! আমাদের রায়বংশের ওটা একটা বিশেষত্বই বলতে পারো। রাজা রুদ্ররাম রাত্রে একদিন ব্যাঙের ডাকে ঘুমের ব্যাঘাত হয়েছিল বলে পুকুর-ই বুজিয়ে ফেলেছিলেন রেগে গিয়ে। রাজা দিগম্বরপ্রসাদ একবার রাগের চোটে চল্লিশখানা গাঁ পুড়িয়ে দিয়েছিলেন, আর রাজা নীলাম্বরপ্রসাদ একবার···

একদিন এসে বললেন—কাল বসন্ত সারা রাত ঘুমোয়নি, জানো ভাই?

বললাম—কেন?

রায়মশাই বললেন—তাস খেলেছে বন্ধুবান্ধব নিয়ে।

বললাম—সে কি! পরীক্ষার সামনে এইরকম ভাবে সময় নষ্ট করা···আপনি কিছু বললেন না!

—প্রথমে ভেবেছিলাম বলি, কিন্তু চুপ করে গেলাম, খেয়ালী বংশ তো।··· তেষট্টি টাকা বারো আনার কেরানী না-হয় হয়েছি, কিন্তু রাজরক্ত যাবে কোথায়? নিজেকেও তো চিনি! রাজা সর্বেশ্বর খামখেয়ালি করে সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছিলেন, ইতিহাসের বইতেই তা দেখতে পাবে, তারপর আমার ঠাকুরবাবা রাজা কৈলাসচন্দ্র তাঁর একমাত্র মেয়ে পটেশ্বরীকে অর্থাৎ আমার পিসিমাকে বিয়ে দিয়েছিলেন ঘুঁটেকুড়ুনীর ছেলের সঙ্গে···সে-বেচারি রাজকন্যেও পেলে, অর্ধেক রাজত্বও পেলে।

বললাম—সে কি! বংশ, কুলমর্যাদা···

—তা না হলে আর খামখেয়ালি কাকে বলে? তা তাদের সঙ্গেই তো এই মামলা। বাবা মারা গেলেন, আমরা তখন নাবালক দু'ভাই, আমার অভিভাবক হয়ে বসলেন পিসেমশাই মাথার ওপর—তারপর সব বেনামী করে-করে···তুমি তো একদিন গেলে না বাড়িতে, সম্রাট আওরঙ্গজেবের সীলমোহর দেওয়া সনদ পর্যন্ত দেখিয়ে দেব, সব বাক্সে ভরে রেখেছি। বসন্ত একবার ওকালতিটা পাস করে নিক, তখন···কিন্তু কাউকে যেন এ-সব বোলো না, ভাই···

ভূধরবাবু একদিন বললেন—আপনার সঙ্গে তো খুব ভাব দেখছি রায়মশায়ের, রাজা রুদ্ররামের রাগের গল্প শোনেননি?

বললাম—শুনেছি।

—সোনা-বাঁধানো লাঠির গল্প শোনেননি ?

—শুনেছি।

—আওরঙ্গজেবের সীলমোহর-করা সনদের গল্প ?

বললাম—তাও শুনেছি।

—একবার হাতীর পিঠে চড়ে ইছামতী পেরোতে গিয়ে কুমীর-শিকারের গল্প বলেননি ? আর, রাজা নীলাম্বরপ্রসাদের সোনার ছিপে মাছ-ধরা…

বললাম—না, এ-সব শুনিনি তো…

—শুনবেন, আরো কিছুদিন যাক। সবাই শুনেছে আর আপনি শুনবেন না, তা কি হতে পারে? সকলকেই বলবেন,—কাউকে বোলো না, কিন্তু বলবেন সবাইকেই…

তা সত্যিই, ভূধরবাবু মিথ্যে কথা বলেননি। সে-গল্পও শুনলাম একদিন রায়মশায়ের বাড়ি গিয়ে। রায়মশাই তাঁর বাড়ি যেতে বহুদিন থেকে পীড়াপীড়ি করছিলেন। সেদিন গেলাম।

কিন্তু গিয়ে মনে হলো, না গেলেই যেন ভালো করতাম।

নামে ভবানীপুর। কিন্তু এ-গলির বাড়িগুলোয় ভবানীপুরত্ব নেই যেন কোথাও।

রায়মশাই একটা গামছা পরে বোধহয় নর্দমা পরিষ্কার করছিলেন। সেই অবস্থাতেই আমাকে টেনে একবারে ঘরের ভেতর নিয়ে গেলেন।

বললেন—আসছি কাপড়টা প'রে, বোসো ভাই—

কিন্তু ততক্ষণে আমি নির্বাক হয়ে ঘরের মেঝেতে দেখছি আর এক দৃশ্য। একথালা ভাত-তরকারি সারা ঘরময় ছড়ানো। কে যেন একটু আগে সবেমাত্র এখানে ভাত খেতে বসেছিল। তারপর কী কারণে যেন ভাত না খেয়েই থালায় লাথি মেরে উঠে চলে গেছে।

বড় লজ্জায় পড়লুম। মনে হলো, রায়মশায়ের লজ্জা প্রকাশিত হয়ে গিয়ে আমাকেই যেন পরোক্ষভাবে লজ্জিত করছে।

কাপড় প'রে ফিরে এসেই রায়মশাই বললেন—বড় আনন্দ হলো, তুমি এসেছ। কিন্তু…

তারপর আমার কুণ্ঠিত ভঙ্গী দেখে আর আমার চোখের দৃষ্টি অনুসরণ করে বললেন—আরে, তুমি কিছু ভেবো না, এ ছোট-বাহাদুরের কাণ্ড। তুমি আরাম করে খাটের ওপর পা তুলে বোসো দিকিনি ভাই আগে।

আমি তবু জিজ্ঞেস করলাম—ছোট-বাহাদুর কে ?

—ওই বসন্ত, আমার ছোট ভাই, ভাত দিতে একটু দেরি হয়েছিল কিনা, কোথায় মাছ ধরতে যাবে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে, ট্রেনের টাইম…তা যাকগে, ও-সব

নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। এখন কোন্‌টা আগে দেখবে বলো, দলিলপত্তর, না সনদের নকল ?

আমি তখন ঘরের চারিদিকের দারিদ্র্যের এই নগ্নরূপ দেখে কুণ্ঠিত হয়েছিলাম। তাই রায়মশায়ের কথার কোনও জবাব দিতে পারলাম না।

রায়মশাই হঠাৎ কৌতূহলী হয়ে উঠলেন। বললেন—কী ভাবছ বলো তো ভাই ?

আমি হঠাৎ অপ্রস্তুত ভাব সামলে নিয়ে বললাম—না, কিছু না, বলুন আপনি···

রায়মশায়ের দ্বিধা কাটলো না। বললেন—না, নিশ্চয় কিছু ভাবছো, আমার এই ময়লা কাপড় দেখে কিছু ভাবছো, না ?

বললাম—না না—আপনি বলুন, কিছুই ভাবছিনে আমি···

—'না' বললে শুনবো কেন ভাই ? নিশ্চয় ভাবছো। উডবার্ন সাহেব নিজেই আমাকে দেখে অবাক্ হয়ে গিয়েছিল, তা তুমি তো তুমি···

—কোন্ উডবার্ন সাহেব ?

—উডবার্ন সাহেব, আলিপুরের দেওয়ানী আদালতের জজ। আদালতের ব্যাপার জানো তো ?—কেউ-ই মানতে চায় না কাউকে, তা সে রাজাই হও, আর উজীরই হও। উডবার্ন সাহেবের কাছেই আমার দরখাস্ত গিয়েছিল কিনা। হেঁটে হেঁটে পায়ের গোড়ালি ক্ষইয়ে ফেলেছি তখন। আর দানছত্তর করছি টাকার। পঁচাশি টাকা জমা দিয়েছি, সনদের নকলটা করিয়ে নেব মোক্তারকে দিয়ে। তা উডবার্ন সাহেব আমার দিকে চেয়ে অবাক্ হয়ে গেছে। বললে, তুমিই রুদ্ররামের নাতি ? যার মৃত্যুতে কেল্লায় তিনবার তোপ পড়েছিল ?

আমি করজোড়ে বললাম—হ্যাঁ হুজুর···

তারপর সাহেবও জিজ্ঞেস করেছিল—কিন্তু তোমার এ দশা কেন ? করো কি তুমি ?

মনে আছে, সেদিন সেই বহুকাল আগে রায়মশাই, পুরন্দর খাঁর বংশধর গঙ্গাগোবিন্দ রায়, বি-এন-আর অফিসের তেষট্টি টাকা বারো আনার চাকরি-করা রেকর্ড-সেক্‌শানের কেরানী, নগদ একটাকা তিন আনার খাবার কিনে এনে খাইয়েছিলেন আমাকে। আমি রসগোল্লা, পান্তুয়া, দরবেশ, ছানার গজা—প্রত্যেকটির দাম কষে-কষে হিসেব করে খতিয়ে দেখেছিলাম, একটাকা তিন আনার কম নয় তার দাম। হয়তো তাঁর দু'দিনের বাজার-খরচ, যিনি নিজে বাস্-ট্রামের ভাড়ার পয়সা বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে ছোট-বাহাদুরকে উকিল করে তুলছেন, দেওয়ানী মামলার খরচ সংগ্রহ করছেন। খেতে গিয়ে আমার গলা দিয়ে যেন কিছু নামছিল না। মনে হচ্ছিল, যেন অন্যায় করছি ! চুরি করছি !

সেদিন ঘরের কোণে একটা লোহার সিন্দুক খুলে কত কাগজপত্র, কত পুঁথির

পাতা, কত ঘটককারিকা-কুলকারিকা যে দেখিয়েছিলেন, তার আর ইয়ত্তা নেই। মনে আছে, তাঁরও খেতে দেরি হয়েছিল সেদিন, আমারও হয়েছিল। বোধ হয় ঘড়িতে যখন তিনটে বেজেছিল, তখন উঠতে পারি।

এর পর বেরুলো বাদশা আওরঙ্গজেবের সনদ।···

আমি একবার বললাম—আমি আজ উঠি রায়মশাই···

—না না, আর একটু, আর একটু, সব তোমায় দেখানো হলো না।

এক-একটি জিনিস কত যত্নে কত আগ্রহে লোহার সিন্দুকে রেখেছেন, দেখলে করুণা হয়। প্রত্যেকটি দলিলের কাগজ অতি সাবধানে হাত দিয়ে স্পর্শ করতেন। যেন কত মহামূল্য সামগ্রী!

পরের রবিবার রায়মশাইকে নিয়ে আসতে হলো দাদার কাছে। কথাবার্তার সময় আমি উপস্থিত ছিলাম না। প্রায় পঁচিশ সের ওজনের কাগজপত্র-ভর্তি একটা পুঁটুলি নিয়ে এলেন আমাদের বাড়ি। ভালো অয়েলক্লথ দিয়ে বাঁধা। পোঁটলার ভারে একেবারে কুঁজো হয়ে পড়েছেন রায়মশাই। খানিকক্ষণ জিরিয়ে নিয়ে তবে যেন আবার চাঙ্গা হলেন। বললেন—এগুলো দেখতে ছেঁড়া কাগজ, কিন্তু ভায়া, এরই দাম সওয়া ছ'লক্ষ টাকা!···

পরদিন অফিসে দেখা হতেই আমাকে ডেকে একটু আড়ালে নিয়ে গেলেন। বললেন—কাউকে বোলোনা ভাই, সব ঠিক হয়ে গেল···

আমিও বিস্মিত হয়ে গেলাম। যাক, এতদিনে বুঝি সত্যিই সব ঠিক হয়ে গেল। কিন্তু এত সহজে কেমন করে হলো?

রায়মশাই বললেন—আরে তোমরা যে নয়নজোড়ের মিত্তির, তা তো বলোনি?

—কী জানি! কোথায় নয়নজোড়! সে-নামও কখনও শুনিনি।

—আরে অতবড় বংশের ছেলে তোমরা! তুমি কেন এলে ভাই এই রেলের চাকরিতে! তোমার দাদাকেও তাই বললুম, ভারি পণ্ডিত ব্যক্তি, আইন একেবারে গুলে খেয়েছেন, নইলে কি আর শুধু শুধু পাঁচশো-এক টাকা ফী হয়? উকিল বটে, তা উনিও ওই কথাই বললেন, ব্যারিস্টার কে. বোস যা বলেছিল···

—কী হলো শেষ পর্যন্ত?

—উনিও বললেন, কাগজ-পত্তর, দলিল দস্তাবেজ পরিষ্কার—কোথাও দাগ নেই এক-ছিটে, মামলা আমার পক্ষে, রাজা রুদ্ররামের নিজের হস্তাক্ষর রয়েছে—আমার পৌত্রদ্বয় শ্রীমান গঙ্গাগোবিন্দ রায় ও শ্রীমান বসন্তবল্লভ রায় যতদিন নাবালক থাকিবেক, ততদিন অভিভাবকরূপে রাজ্যের পরিদর্শন কার্য নির্বাহ করিতে শ্রীযুক্ত··· ; তা ঠিক হলো—মামলার ফল বেরিয়ে গেলে আধাআধি বখরা হবে দুজনের—তোমার দাদার অর্ধেক আর আমার অর্ধেক, অর্থাৎ আমাদের দু'ভাইয়ের ভাগে পড়লো তিন লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকার মতন আর কি, কিন্তু

একটা কথা···

বললাম—কী কথা ?

—উনি বললেন, মামলা আমি জিতিয়ে দেবই। হাইকোর্ট থেকেও জিতিয়ে আনব, কিন্তু তিন-চার বচ্ছর ধরে মামলা চলবে, সেজন্য ও-চাকরি আপনাকে ছেড়ে দিতে হবে রায়মশাই, নইলে পেরে উঠবেন না। এ তো আর ফৌজদারী নয়, দেওয়ানী মামলা ! বাঘ নয়, একেবারে বাঘের বাবা···

বললাম—তা হলে কী করবেন, ঠিক করলেন ? চাকরি ছেড়ে দেবেন ?

রায়মশাই বললেন—এই মুহূর্তে, এই মুহূর্তে চাকরির মাথায় লাথি মেরে বেরিয়ে যেতে পারলে বাঁচি। আজকে হাতের কাজগুলো সেরে নিই, কালই দরখাস্ত করে দিচ্ছি, প্রভিডেন্ট ফান্ডে হাজার চারেক টাকা জমেছে, তিন-চারটে বছর ওই টাকাতে সংসার-খরচটা চালিয়ে দেব। তারপর তো···কিন্তু কাউকে যেন এখন বোলোনা ভাই, তোমাকে বলেই বলছি···

কিন্তু কেমন করে জানি না, সেইদিনই সমস্ত সেক্‌শানের লোকের কানে গেল খবরটা !

সুধীরবাবু এসে বললেন—খবরটা সত্যি নাকি রায়মশাই ?

ভূধরবাবুও জিজ্ঞেস করলেন—তা হলে সত্যিই চাকরির মায়া কাটালেন রায়মশাই ?

সনাতনবাবু, অবিনাশবাবু, বিলেত-ফেরতের ভাই, ডাক্তারবাবু—সবাই কৌতূহলী। সবাই রায়মশায়ের কথাতে না হোক, আমার সমর্থন পেয়ে যেন বিমর্ষ হয়ে গেল। ব্যাপারটা এমনি হলো, যেন আমাদের জানাশোনা একজন হঠাৎ লটারিতে তিন লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা পেয়ে গেছে। রায়মশাই রাতারাতি সকলকে অতিক্রম করে সকলের ঊর্ধ্বে উঠে গেছেন। সবাই ঈর্ষার চোখে—শ্রদ্ধার চোখে দেখতে লাগলো আজ রায়মশাইকে।

পরের দিন কিন্তু দরখাস্ত করা হলো না।

জিজ্ঞেস করলাম—আজকেই দরখাস্তটা করছেন তাহলে ?

রায়মশাই বললেন—না, আজ আর হলো কই ? ছোট-বাহাদুরকে একবার জিজ্ঞেস না করে কী করে করি ? তারও তো মত নেওয়া চাই,—সে-ও তো বিষয়ের অর্ধেক হিস্যের মালিক ?

এর কিছুদিন পরেই চাকরিতে বদলি হয়ে বিলাসপুরে চলে গেলাম আমি।

রায়মশাই বললেন—তোমার কাছে যে কী-রকম কৃতজ্ঞ হয়ে রইলুম, বলতে পারবো না ভাই। এ সব তোমার জন্যেই হলো, নইলে কোনোদিন যে আবার বিষয় ফিরে পাবো, এ তো কল্পনা করতে পারিনি। তা খবর তুমি পাবে—সব তোমার দাদার কাছ থেকে। আমিও চিঠি লিখবো, মনে কোরো না, বড়লোক হয়ে গিয়ে ভুলে যাবো আফিসের বন্ধুদের। রাজাই হই, আর যা-ই হই,

একসঙ্গে এত বছর কাটালুম…

তারপর কয়েক বছর বাদে অফিসের কাজে একবার হেড-অফিসে এসেছি। এসে দেখেছি, রায়মশাই সেই রেকর্ড-সেক্‌শানে, সেই চেয়ারে সেইভাবেই কাজ করছেন। বললাম—কী হলো আপনার ? চাকরি এখনও ছাড়েননি ?

রায়মশাই বললেন—ছেড়েই দিয়েছি একরকম বলতে পারো, বসন্তও মত দিয়েছে, দরখাস্তটাও লিখে টাইপ করে রেখে দিয়েছি, পেশ করার যা দেরি—আর তোমার বৌদিও বললেন…

—বৌদি আবার কী বললেন ?

—তিনি বিচক্ষণ লোক, বিচক্ষণ লোকের মতোই পরামর্শ দিয়েছেন, আমিও ভেবে দেখলাম, বসন্ত ওকালতিটা পাস করে নিক আমি চাকরিতে থাকতে থাকতে। কী বলো, ভালো বুদ্ধি নয় ? আরো একজন অ্যাডভোকেটকে দলিল-দস্তাবেজ দেখিয়েছি—তিনিও এক কথাই বললেন, কাগজপত্তর পরিষ্কার—দাগ নেই…

এর আরো কয়েক বছর পরে এসেছি হেড-অফিসে। এসে দেখেছি, রায়মশাই সেই রেকর্ড-সেক্‌শানে, সেই চেয়ারে সেইভাবেই কাজ করছেন। আরো বুড়ো হয়ে গেছেন। ভূধরবাবু প্রমোশন পেয়েছেন। অবিনাশবাবু বদলি হয়ে গেছেন। সুধীরবাবু রিটায়ার করেছেন। অফিসের অনেক কিছুরই পরিবর্তন হয়ে গেছে। কিন্তু রায়মশাই…

এবারও জিজ্ঞেস করলাম—কী হলো, চাকরি ছাড়েননি ?

রায়মশাই বললেন—এই যে, এইবার সব ঠিক করে ফেলেছি, বসন্তর বিয়েটা দিয়ে দিয়েছি, ভারি সুলক্ষণা মেয়ে, মুলোজোড়ের বিখ্যাত দত্তবংশের নাম শুনেছ তো ? সেই বংশের মেয়ে এনেছি ঘরে। এইবার এক চান্সে আইনটাও পাস করে ফেলেছে বসন্ত—এই দরখাস্তটা এনেছি আজ, বিকেলবেলা দাস-সাহেবকে নিজের হাতে দিয়ে আসবো,—আজ দিনটাও ভালো, পাঁজি দেখে নিয়েছি। এইবার চাকরির মাথায় লাথি মেরে…

ভূধরবাবু আমাকে বললেন—আরে আপনিও যেমন, একবার এ-খাঁচায় ঢুকলে আর কারো বেরুবার সাধ্যি আছে ? তা তিনি রাজাই হোন, আর নফরই হোন…

এর বছর তিনেক পরে এসে শুনলাম, একদিন আগেও নয়, একদিন পরেও নয়, ঠিক পঞ্চান্ন বছর পুরিয়ে রায়মশাই রিটায়ার করে গেছেন। একবছরের এক্সটেন্‌-শনের দরখাস্তও করেছিলেন, মঞ্জুর হয়নি। তাও প্রায় সাত মাস হয়ে গেল আজ। চেয়ে দেখলাম, সেই জায়গায় আর একটি ছোকরা বসে কাজ করছে। পুরনো লোকের মধ্যে এখন কেবল ভূধরবাবু আছেন। বললেন—রাজা গঙ্গাগোবিন্দ -রায়ের খবর শুনেছেন ?

ব্যাকুলভাবে বললাম—না তো ! কী খবর ?

—তিনি রিটায়ার করে গেছেন, শুনেছেন ? এক্সটেন্‌শন চেয়েছিলেন কিন্তু মঞ্জুর হয়নি। শুনেছেন ?

—তা শুনেছি, এখানে এসে শুনলাম।

—আর কিছু শুনেছেন ?

বললাম—না।

—তবে কিছুই শোনেননি। ছোট-রাজাবাহাদুর বসন্তবল্লভ রায় বিখ্যাত মুলোজোড়ের দত্তবংশের বউ নিয়ে আলাদা হয়ে গেছেন, শুনেছেন ?

—সে কি !

—আজ্ঞে হাঁ, ভবানীপুরে সে বাড়িভাড়া নিয়েছে, ওকালতি করে আলিপুর কোর্টে, রায়মশায়ের প্রভিডেন্ট ফান্ডের সাড়ে ছ'হাজার টাকা পর্যন্ত মেরে দিয়ে, দাদা-বৌদিকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। সেদিন সুধীরবাবুর সঙ্গে রাস্তায় দেখা হলো। তিনি বললেন, রায়মশায়ের নাকি ভারি দুরবস্থা ! তাঁরা ছেলেপুলে নিয়ে হাওড়া জেলার কোন্ একটা গ্রামে আছেন—খেতে না-পাবার মতন একেবারে নিঃসম্বল অবস্থা। একটা পয়সা নেই, সাবালক ছেলে নেই, দুটো আইবুড়ো মেয়ে ঘাড়ের ওপর···

দীর্ঘকালের এত সব ঘটনার পর আজ মেচাদা লোকাল থেকে নেমে নির্জন প্লাটফরমে হঠাৎ রায়মশায়ের সঙ্গে প্রথম মুখোমুখি হলাম। কিন্তু আমার কথা যেন তাঁর কানে গেল না। আমি আবার বললাম—অবাক-জলপান আছে ?

রায়মশাই এবার যেন শুনতে পেলেন। বললেন—আছে।

বলে ছেঁড়া স্যুটকেসটা খুলে একটা প্যাকেট আমাকে দিলেন। আমিও দুটো পয়সা দিলাম তাঁর হাতে।

আমি হঠাৎ বলে ফেললাম—আমাকে চিনতে পারেন, রায়মশাই ?

রায়মশায়ের চোখ-দুটো নির্বিকার নিষ্পলক। আমিও ভালো করে দেখতে লাগলাম তাঁকে। নিস্তব্ধ প্লাটফরমের পরিপ্রেক্ষিতে কেমন যেন অপ্রকৃতিস্থ মনে হলো তাঁকে। মুখে বিড়বিড় করে কী যেন বলে চলেছেন। চোখের দৃষ্টিও উদ্‌ভ্রান্ত, লক্ষ্যহীন !

হঠাৎ রায়মশাই অন্যদিকে চোখ রেখেই বলে উঠলেন—ভালো উকিল-টুকিল জানা-শোনা আছে আপনার ? ভালো উকিল ?

বলেই উত্তরের অপেক্ষা না করে উল্টো দিকে চলে যাচ্ছিলেন, এমন সময় এক কাণ্ড ঘটলো।

হারিকেন লন্ঠন আর লাঠি নিয়ে জনকতক লোক এসে হাজির হলো।

একজন বললে—এই যে, মামাবাবু এখানেই···

আর একজন বললে—বার বার করে বলেছি তোমাদের, পায়ে লোহার চেন

দিয়ে বেঁধে রাখবে, তা তো শুনবে না…

কলকাতার ট্রেনে উঠে পকেট থেকে অবাক-জলপানের প্যাকেটটা বার করলাম। এতক্ষণে মনে পড়লো ওটার কথা। ওপরে খবরের কাগজের মোড়ক। তলায় শালপাতা নেই। কিন্তু সমস্তটা খুলে হতবাক্ হয়ে গেছি। চিনেবাদাম, ডালভাজা, কাঠি-ভাজা—কিছুই নেই। শুধু খানিকটা ধুলো-বালি আর কাঁকর…

অবাক্ জলপানই বটে !

সেগুলোর দিকে চেয়ে মনে হলো, ওগুলো ধুলো-বালি আর কাঁকর নয় শুধু ও যেন রায়মশায়েরই জীবনের অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যৎ !

রামায়ণের যুগে ধরণী একবার দ্বিধা হয়েছিল। সে-রামও নেই, সে-অযোধ্যাও নেই। কিন্তু কলিযুগে যদি দ্বিধা হতো ধরণী, তো আর কারো সুবিধে হোক আর না-হোক—ভারি সুবিধে হতো রমাপতির।

সত্যি, অমন অহেতুক লজ্জাও বুঝি কোনও পুরুষ মানুষের হয় না।

মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে সবাই গল্প করছি—

হঠাৎ চীৎকার করে উঠলো ননীলাল। বললে—ঐ আসছে রে—

কিন্তু ওই পর্যন্ত! আমরা সবাই চেয়ে দেখলাম—রমাপতি আমাদের দেখেই আবার নিজের বাড়ির মধ্যে গিয়ে ঢুকলো। সবাই বুঝলাম—রমাপতির যত জরুরী কাজই থাক, এখনকার মতো এ-রাস্তা মাড়ানো ওর বন্ধ। বাড়িতে ফিরে গিয়ে হয়তো চুপ করে বসে থাকবে খানিকক্ষণ। তারপর হয়তো চাকরকে পাঠাবে দেখতে। চাকর যদি ফিরে গিয়ে বলে যে রাস্তা পরিষ্কার, তখন আবার বেরুতে পারবে।

বললাম—চল আমরা সরে যাই, ওর অসুবিধে করে লাভ কি?

ননীলাল বললে—কেন সরতে যাবো? এ-রাস্তা কি ওর? লেখাপড়া শিখে এমন মেয়েছেলের বেহদ্দ—আমরা কি ওকে খেয়ে ফেলবো?

এমনই রমাপতি। রাস্তা দিয়ে চলতে গেলে পাছে কেউ জিজ্ঞেস করে বসে—কেমন আছ? তখন-যে কথা বলতে হবে। মুখ তুলতে হবে। চোখে চোখ রাখতে হবে!

সমবয়সী বউদিরা হাসে। বলে—ছোট ঠাকুরপো বিয়ে হলে কী করবে···

মেজবউদি বলে—আমাদের সামনেই মুখ তুলে কথা বলতে পারে না, তো বউ-এর সঙ্গে কী করে রাত কাটাবে, ভাই—

বাড়িতে অনেকগুলো বউদি। কেউ কেউ কমবয়সী আবার। তারা নিজের নিজের স্বামীর কথাটা কল্পনা করে নেয়। যত কল্পনা করে তত হাসে। অন্য সব ভাইরা সহজ স্বাভাবিক মানুষ। ব্যতিক্রম শুধু রমাপতি।

শুনতে পাই বাড়িতেও রমাপতি নিজের নির্দিষ্ট ঘরটার মধ্যে আবদ্ধ থাকে। ঘরের মধ্যে বসে কী করে কারো জানবার কথা নয়। খাবার ডাক পড়লে একবার খেয়ে আসে। তরকারিতে নুন না-হলেও বলবে না মুখে। জলের গ্লাস দিতে ভুল হলেও চেয়ে নেবে না। পৃথিবীকে এড়িয়ে চলতে পারলেই যেন ভালো।

এক এক দিন হঠাৎ বাড়ি আসার পথে দূর থেকে দেখতে পাই হয়তো রমাপতি হেঁটে আসছে। সোজা ট্রাম-রাস্তার দিকেই আসছে। তার পর আমাকে দেখতে পেয়েই পাশের গলির ভেতর ঢুকে পড়লো। পাঁচ মিনিটের রাস্তাটা ত্যাগ করে

পনেরো মিনিটের গলিপথ দিয়েই উঠবে ট্রাম-রাস্তায়।

কিন্তু তবু অতর্কিতেও তো দেখা হওয়া সম্ভব!

গলির বাঁকেই যদি দেখা হয়ে যায়! কোনও চেনা লোকের সঙ্গে! হয়তো মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়ে পড়লেন পাড়ার প্রবীণতম লোক। জিজ্ঞেস করে বসলেন—এই-যে রমাপতি, তোমার বাবা বাড়ি আছেন নাকি?

নির্দোষ নির্বিরোধ প্রশ্ন। আততায়ী নয় যে ভয়ে আঁতকে উঠতে হবে। পাওনাদার নয় যে মিথ্যে বলার প্রয়োজন হবে। একটা 'হাঁ' বা 'না'—তাও বলতে রমাপতির মাথা নীচু হয়ে আসে, কান লাল হয়ে ওঠে; কপালে ঘাম ঝরে। সে এক মর্মান্তিক যন্ত্রণা যেন। তার পর সেখান থেকে এমন ভাবে সরে পড়ে, যেন মহা বিপদের হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়ে গেছে।

ছোটবেলায় রমাপতি একবার কেঁদে ফেলেছিল।

তা ননীলালেরই দোষ সেটা।

একা-একা রমাপতি চলেছিল কালীঘাট স্টেশনের দিকে। ও-দিকটা এমনিতেই নিরিবিলি। বিকেলবেলা ট্রেন থাকে না। চারিদিকে যতদূর চাও কেবল ধূ-ধূ ফাঁকা। বড় প্রিয় স্থান ছিল ওটা রমাপতির। আমরা জানতাম না তা।

দল বেঁধে আমরাও ওদিকে গেছি। ধূমপানের হাতেখড়ির পক্ষে জায়গাটা আদর্শস্থানীয়। হঠাৎ নজরে পড়েছে সকলের আগে বিশ্বনাথের। বললে—আরে, রমাপতি না—?

সকলে সত্যিই অবাক হয়ে দেখলাম—দূরে রেল-লাইনের পাশের রাস্তা ধরে একা-একা চলেছে রমাপতি। আমাদের দিকে পেছন ফেরা। দেখতে পায়নি আমাদের।

দুষ্টবুদ্ধি মাথায় চাপলো ননীলালের। বললে—দাঁড়া, এক কাজ করি—ওর কাছা খুলে দিয়ে আসি—

যে-কথা সেই কাজ। তখন কম বয়েস সকলের। একটা নিষিদ্ধ কাজ করতে পারার উল্লাসে সবাই উন্মত্ত। ননীলালের উপস্থিতি টের পায়নি রমাপতি। ননীলালের রসিকতার সিদ্ধিতে সবাই মাঠ কাঁপিয়ে হো-হো করে হেসে উঠেছি।

কিন্তু রমাপতির কাছে গিয়ে মুখখানার দিকে চেয়ে ভারি মায়া হলো। রমাপতি হাউ হাউ করে কাঁদছে।

সে-গল্প বিয়ের পর প্রমীলার কাছেও করেছি।

প্রমীলা বলে—আহা বেচারা, তোমরাই ওকে ওমনি করে তুলেছ—

সেদিন প্রমীলা বললে—ওই বুঝি তোমাদের রমাপতি—এসো এসো—দ্যাখো—দেখে যাও—

বললাম—ওকে তুমি চিনলে কী করে?

প্রমীলা বললে—ও না ছুয়ে যায় না, আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি—একবার মুখ তুলে পর্যন্ত চাইলে না ওপরদিকে, ও-বয়সে এমন দেখা যায় না তো—

বারান্দার কাছে গিয়ে দেখি সত্যি ঠিকই চিনেছে। রমাপতিই বটে।

বললাম—সরে এসো, নইলে মূর্ছা যাবে এখনি—

তা অন্যায়ের কিছু বলিনি আমি।

ক্লাস সেভেন-এ গুড-কনডাক্টের প্রাইজ পেয়েছিল রমাপতি। মোটা মোটা তিনখানা ইংরিজী ছবির বই। সেই প্রথম আমাদের স্কুলে ও-প্রাইজের প্রচলন হলো। স্কুলের হল্-এ লোকারণ্য। আমরা স্কুলের ছাত্রেরা সেজেগুজে গিয়ে একেবারে সামনের বেঞ্চিতে বসেছি। আমরা খারাপ ছেলের দল সবাই। কেউ প্রাইজ পাবো না। কমিশনার ম্যাকেয়ার সাহেব নিজের হাতে সবাইকে প্রাইজ দিচ্ছেন। এক এক জন করে বুক ফুলিয়ে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে আর প্রাইজ নিয়ে প্রণাম করে নিজের জায়গায় এসে বসছে।

তার পর ম্যাকেয়ার সাহেব ডাকলেন—মাস্টার রমাপটি সিন্‌হা…

কেউ হাজির হলো না।

সাহেব আবার ডাকলেন—মাস্টার রমাপটি সিন্‌হা—

সেক্রেটারি পরিতোষবাবু এদিক ওদিক চাইতে লাগলেন। হেডমাস্টার কৈলাস-বাবুও একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন আমাদের দিকে, তার পর নীচু গলায় কী বললেন সাহেবকে গিয়ে। তারপর থেকে গুড-কনডাক্টের প্রাইজটা বরাবর রমাপতিই পেয়ে এসেছে। কিন্তু কখনও সভায় এসে উপস্থিত হয়নি। সে-সময়টা কালীঘাট স্টেশনের নিরিবিলি রেল-লাইনটার পাশের রাস্তা ধরে একা-একা ঘুরে বেড়িয়েছে সে।

এর পর আমরা একে একে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে কাজে ঢুকেছি। একা রমাপতি আই-এ পাস করেছে, বি-এ পাস করেছে। আমাদের সঙ্গে ক্বচিৎ কদাচিৎ দেখা হয়। দেখা যদিই-বা হয় তো সে একতরফা!

দেখা না হলেও কিন্তু রমাপতির খবর নানা সূত্রে পেয়ে থাকি। চুল ছাঁটতে ছাঁটতে কানাই নাপিত বলেছিল—ছোটবাবু, দাড়িটা এবার কামাতে শুরু করুন—আর ভালো দেখায় না—

আমরা তখন সবাই ক্ষুর ধরেছি। কিন্তু রমাপতি তখনও একমুখ দাড়ি-গোঁফ নিয়ে দিব্যি মুখ ঢেকে বেড়ায়।

কানাই এ-বাড়ির পুরনো নাপিত। পৈতৃক নাপিত বলা যায়। রমাপতিকে জন্মাতে দেখেছে।

বললে—নতুন ক্ষুরটা আপনাকে দিয়েই বউনি করি আজ—কী বলেন ছোটবাবু?

রমাপতি মুখ নীচু করে খানিকক্ষণ ভেবে বলেছিল—না না, ছিঃ—লোকে কী বলবে—

কানাই নাপিত বলেছিল—লোকের আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নেইতো—আপনার দাড়ি নিয়ে যেন মাথা ঘামাচ্ছে সব—

—না, থাক্‌রে, সামনে গরমের ছুটি আসছে সেই সময় কলেজ বন্ধ থাকবে—তখন দিস বরং কামিয়ে—

হঠাৎ যেদিন প্রথম দাড়ি-গোঁফ-কামানো চেহারা দেখলাম—সেদিন ঠিক চিনতে পারিনি। ছাতার আড়ালে মুখ ঢেকে চলেছে রমাপতি। আমাকে দেখে হঠাৎ গতিবেগ বাড়িয়ে দিলে। নতুন জুতো পরতে লজ্জা! নতুন জামা পরতে লজ্জা! ওর মনে হয় সবাই ওকে দেখছে যেন।

উমাপতিদার বিয়েতে বউভাতের নিমন্ত্রণে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম—সেজদা, রমাপতিকে দেখছিনা যে—সে কোথায়—

সেজদা বললে—সে তো সকালবেলা খেয়ে-দেয়ে বেরিয়েছে বাড়ি থেকে, সব লোকজন বিদেয় হলে রাত্তিরের দিকে বাড়ি ঢুকবে—

এ পাড়ায় মেয়েরা পরস্পরের বাড়ি বেড়াতে যাওয়ার অভ্যাসটা রেখেছে। যেদিন দুপুরবেলা কেউ এল বাড়িতে, রমাপতি বাইরের সিঁড়ি দিয়ে টিপি-টিপি পায় বেরিয়ে পড়লো রাস্তায়। রাস্তায় বেরিয়ে কোনও রকমে ট্রামে-বাসে উঠে পড়তে পারলেই আর ভয় নেই। সব অচেনা লোক। অচেনা লোকের কাছে বিশেষ লজ্জা নেই তার!

বড় যদুপতির শ্বশুর এ-বাড়িতে কাজে-কর্মে ছাড়া বড় একটা আসেন না। মেজ উমাপতির শ্বশুরমশাই মারা গেছেন বিয়ের আগে। সেজভাই উমাপতির শ্বশুর নতুন—মেয়ে এখানে থাকলে রবিবার রবিবার দেখতে আসেন। তিনি আবার একটু কথা বলেন বেশি।

বাড়ির সকলকে ডাকা চাই। সকলের সংগে কথা কওয়া চাই। সকলের খোঁজ-খবর নেওয়া চাই। মেয়েকে বলেন—হ্যাঁরে, তোর ছোট দেওরকে তো কখনও দেখতে পাই না—এতদিন ধরে আসছি—

মেয়ে বলে—ছোট ঠাকুরপোর কথা বোলো না বাবা, তুমি রবিবারে আসবে শুনে সকালবেলাই সেই যে বেরিয়ে গেছে বাইরে—আর আসবে সেই দুপুরবেলা বারোটার সময়, তা-ও বাড়ির বাইরে থেকে যদি বুঝতে পারে তুমি চলে গেছ—তবে ঢুকবে, নইলে একঘণ্টা পরে আবার আসবে—

উমাপতিদার শ্বশুর হাসেন। বলেন—কেন রে, আমি কী করলাম তার!

মেয়ে বলে—তুমি তো তুমি, বাড়ির লোকের সঙ্গেই কখনও কথা বলতে শুনিনি—ছোট ঠাকুরপো বাড়িতে থাকলেই টের পাওয়া যায় না ঘরে আছে কি নেই—

উমাপতির শ্বশুর কী ভাবেন কে জানে! কিন্তু এ বাড়ির লোকের কাছে এ ব্যাপার গা-সওয়া।

মা বলেন—তোমরা কিছু ভেবো না বউমা, রমা আমার ওই রকম—আমার সঙ্গেই লজ্জায় ব'লে কথা বলে না—

কথাটা অবিশ্বাস্য হলেও একেবারে মিথ্যে নয়।

স্বর্ণময়ীর সেবার ভীষণ অসুখ হয়েছিল। ছেলেরা রাতের পর রাত জেগে মায়ের সেবা করতে লাগলো। বউদেরও বিশ্রাম নেই। ডাক্তারের পর ডাক্তার আসে। ইনজেকশন, ওষুধ, বরফ—অনেক কিছু!

একটু সেরে উঠে স্বর্ণময়ী চারদিকে চেয়ে দেখলেন। বললেন—রমা কোথায়?

রমাপতি তখন ঘরে বসে বই পড়ছিল দরজা ভেজিয়ে দিয়ে।

বড়দা একেবারে ঘরে ঢুকে বললেন—মা'র এতবড় একটা অসুখ গেল, আর তুমি একবার দেখতেও গেলে না—

দাদার কথায় রমাপতি অবশ্য গেল দেখতে মাকে। রোগীর ঘরে তখন বাড়ির লোক, আত্মীয়-স্বজনে পরিপূর্ণ। রমাপতি কিন্তু কিছুই করলো না। কিছু কথাও বেরুল না তার মুখ দিয়ে। চুপচাপ গিয়ে খানিকক্ষণ সকলের পেছনে দাঁড়ালো সসংকোচে। তার পর কেউ দেখে ফেলবার আগেই পালিয়ে এসেছে আবার নিজের ঘরে।

স্বর্ণময়ীর সে-কথা এখনও মনে আছে। বলেন—তোমরা ভাবো ওর বুঝি মায়া-দয়া কিছু নেই—আছে, বৌমা, সেদিন নিজের চোখে দেখলাম যে—দোতলার বারান্দায় মেজবউমার ছেলে ঘুমোচ্ছিল, কেউ কোথাও নেই, রমু আমার দেখি ছেলের গাল টিপে দিচ্ছে—মুখময় চুমু খাচ্ছে, সে যে কী আদর কী বলবো তোমাদের, রমু যে আমার ছেলেপিলেদের অমন আদর করতে পারে আমি তো দেখে অবাক,...তার পর হঠাৎ আমায় দেখে ফেলতেই আস্তে আস্তে নিজের ঘরে চলে গেল—

প্রতিবেশীরা বেড়াতে এসে বলে—তোমার ছোট ছেলের বিয়ে দেবে না, দিদি—?

স্বর্ণময়ী বলেন—রমুর বিয়ের কথা ভাবলেই হাসি পায় মা,—ও আবার সংসার করবে, ছেলেপিলে হবে! যার কাছা খুলে যায় দিনে দশবার, তরকারিতে নুন না হলে বলবে না মুখ ফুটে, এক গেলাস জল পর্যন্ত চেয়ে খাবে না, একবারের বদলে দু'বার ভাত চেয়ে নেবে না...

তা এই হলো রমাপতি। রমাপতি সিংহ। একে নিয়েই আমাদের গল্প।

আমার এক আত্মীয় একদিন টেলিফোনে ডেকে পাঠালেন বাড়িতে।

বললেন—তোমাদের পাড়ায় রমাপতি সিংহ বলে কোনো ছেলেকে চেন?

বললাম—চিনি, কিন্তু কেন ?

তিনি বললেন—ছেলেটি কেমন ? আমার রেবার সঙ্গে মানাবে ?

রেবাকে চিনতাম। আই-এ'তে দশটাকার স্কলারশিপ পেয়েছিল। থার্ড ইয়ারে পড়ছে। বেশ স্মার্ট মেয়ে। বাবার কাছে মোটর-চালানো শিখে নিয়েছে। অটোগ্রাফের খাতায় জওহরলাল নেহরু থেকে শুরু করে কোনও লোকের সই আর বাদ নেই। নিজে ক্যামেরায় ছবি তোলে। ভায়োলিন বাজিয়ে মেডেল পেয়েছে কলেজের মিউজিক কম্পিটিশনে। মোট কথা, যাকে বলে কালচার্ড।

আমি সেদিন সম্মতি দিলে বোধ হয় বিয়েটা হয়েই যেত। পাত্র হিসেবে রমাপতি খারাপই বা কী! নিজে শিক্ষিত। কলকাতায় নিজেদের তিনখানা বাড়ি। সংসারে ঝামেলা নেই কিছু। বোনদেরও সকলের বিয়ে হয়ে গেছে। চার ভাই-ই বেশ উপার্জনক্ষম। ভাইদের মধ্যে মিলও খুব।

রেবার মা বলেছিলেন—কিন্তু কেন যে তুমি আপত্তি করছো বাবা, বুঝতে পারছি না—

আমি বলেছিলাম—রেবাকেই জিজ্ঞেস করে দেখুন মাসিমা, এ-সব শুনেও যদি মত দেয় তো···

কিন্তু রেবাই নাকি শেষ পর্যন্ত মত দেয়নি।

আজ ভাবছি সেদিন সম্মতি দিলেই হয়তো ভালো করতাম। শেষ পর্যন্ত রেবার বিয়ে হয়েছিল এক বিলেত-ফেরত অফিসারের সঙ্গে, তার পর সে ভদ্রলোক শেষকালে···কিন্তু সে-কথা এ-গল্পে অবান্তর।

এর পর ননীলাল এসে খবর দিয়েছিল—ওরে, রমাপতির বিয়ে হচ্ছে যে—

আমরা সবাই অবাক হয়ে প্রশ্ন করেছিলাম—সেকি! কোথায় ?

ননীলাল বললে—খবর পেলাম, এবার আর কলকাতায় সম্বন্ধ নয়—জব্বলপুরে—

জব্বলপুরে কার মেয়ে, মেয়ে কী করে—সব খবর ননীলালই বার করলে।

শেষে একদিন বললে—ভাই, চোখের ওপর নারীহত্যা দেখতে পারবো না—আমি ভাঙচি দেবো—

সত্যিসত্যি-ই ননীলাল ঠিকানা যোগাড় করে বেনামী চিঠি দিলে একটা : আপনারা যাকে পছন্দ করেছেন তার সম্বন্ধে কলকাতায় এসে পাড়ার লোকের কাছে ভালো করে সংবাদ নেবেন। নিজেদের মেয়েকে এমন করে গলায় ফাঁস লাগিয়ে দেবেন না—ইত্যাদি অনেক কটু কথা।

বিয়ে ভেঙে গেল।

শুধু সেইবারই প্রথম নয়। যতবারই ননীলাল বা আমরা কেউ সংবাদ পেয়েছি, চিঠি লিখে বিয়ে ভেঙে দিয়েছি। আমাদের সত্যিই মনে হয়েছে রমাপতির সঙ্গে বিয়ে হলে সে-মেয়ের জীবনে বিড়ম্বনার আর অবধি থাকবে না।

কিন্তু হঠাৎ একদিন বিনা-ঘোষণায় রমাপতির বিয়ে হয়ে গেল।

কেউ কোনও সংবাদ পায়নি। মাত্র একদিন আগে আমার কানে এল খবরটা।

প্রমীলাও বহরমপুরের মেয়ে। বললাম—বহরমপুরের কমল মজুমদারকে চেন নাকি ? খুব বড় উকিল ? তাঁর মেয়ে প্রীতি মজুমদার ?

প্রমীলা চমকে উঠলো।

—প্রীতি ? আমরা তাকে ডাকতাম বেবি বলে।—বহরমপুরের বেবি মজুমদারকে কে না চেনে—একটা চোদ্দ বছরের ছেলে থেকে শুরু করে ষাট বছরের বুড়ো সবাই চিনবে তাকে, বেবি টেনিসে তিনবার চ্যাম্পিয়ান, ওকে চিনবো না—

কিন্তু তখন আর উপায় নেই। চিঠি লিখে জানালেও একদিন পরে খবর পাবে। ননীলাল শুনে কেমন বিমর্ষ হয়ে গেল।

তবু যেন কেমন সন্দেহ হলো। তারা শেষকালে আর পাত্র পেলে না খুঁজে ! শেষে এই আকাট ছেলেটার হাতে পড়বে ! আর কোনও প্রীতি মজুমদার আছে নাকি বহরমপুরে ?

প্রমীলা বললে—মজুমদার অবিশ্যি আরো আছে ওখানে—কিন্তু খবর নাও দিকিনি ওর নাম বেবি কিনা—

তখন আর খবর নেবারই বা সময় কোথায়।

প্রমীলাও যেন বিমর্ষ হয়ে গেল। বললে—বেবির সঙ্গে বিয়ে হবে শেষকালে তোমাদের রমাপতির—সে-যে ভারী খুঁতখুঁতে মেয়ে—গোঁফওয়ালা ছেলেদের মোটে দেখতে পারতো না, ওর প্রাইভেট টিউটার ছিল বদ্যিনাথবাবু, তাকেই ছাড়িয়ে দিলে। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম—তোর মাস্টারকে ছাড়ালি কেন ? ও বলেছিল—বড্ড বড় বড় গোঁফ বদ্যিনাথবাবুর, ওই গোঁফ দেখলে আমার ভয় পায়।—তা তুমিও তাকে দেখেছ তো—

বললাম—কোথায় ?

—কেন, সেই-যে বাসরঘরে ?

বাসরঘরে কত মেয়েই এসেছিল, সকলকে মনে থাকার কথা নয় আজ। তবু মনে করতে চেষ্টা করলাম।

প্রমীলা আবার মনে করিয়ে দিতে চেষ্টা করলে—মনে পড়ছে না তোমার ? সেই-যে কালো জমির ওপর জরির-কাজ-করা শিফন শাড়ি পরে এসেছিল, লংস্লিভের সাদা লিনেনের ব্লাউজ পরা, খুব কথা বলছিল ঠেস দিয়ে-দিয়ে—মনে নেই ?

তবুও মনে পড়লো না !

প্রমীলা আবার বলতে লাগলো—বিয়ের পরদিন মা জিজ্ঞেস করেছিল—কেমন জামাই দেখলে, বেবি ! বেবি বলেছিল ভালো। কিন্তু আমাকে বলেছিল

—তোর বর ভালোই হয়েছে মীল, কিন্তু আর একটু লম্বা হলে ভালো হতো—

যে-মেয়ে এত খুঁতখুঁতে, তার সঙ্গে রমাপতির কিছুতেই বিয়ে হতে পারে না !

প্রমীলাও সন্দেহ প্রকাশ করলো। না না, সে-মেয়ে হতেই পারে না—অন্য কোনো প্রীতি মজুমদার হবে, দেখো—

কখন বিয়ে করতে গেল রমাপতি—কেউ জানতে পারলো না। ভোরের ট্রেন। রাত থাকতে থাকতে উঠে একজন পুরুত আর দু'চারজন আত্মীয়স্বজনকে নিয়ে দলবল বেরিয়ে গেছে। বউ যখন এলো তখনও বেশ রাত হয়েছে। অনেকেই তখন খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়বার ব্যবস্থা করছে। শাঁখের আওয়াজ পেয়ে প্রমীলা উঠে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালো একবার। আমিও উঠে গেলাম।

বাড়ির লোকজনের ভিড়ের ভেতর ঘোমটা-টানা বউটিকে দেখতে পেলাম না ভালো করে। আর রমাপতিও যেন টোপরের আড়ালে নিজেকে গোপন করে ফেলতে চেষ্টা করছে। মনে হলো—লজ্জায় চোখদুটো সে বুজিয়ে ফেলেছে। কোনও রকমে এতদূর এসেছে সে বরবেশে, কিন্তু পাড়ার চেনা লোকের ভিড়ের মধ্যে সে যেন-মর্মান্তিক যন্ত্রণা অনুভব করছে।

আমাদের বাড়ি থেকে একা আমারই নিমন্ত্রণ ছিল।

অনেক রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর বাড়ি ফিরতেই প্রমীলা ধরলে—কেমন বউ দেখলে—আমাদের বৌদি নাকি ?

বললাম—কী জানি, চিনতে পারলাম না—কিন্তু যার বিয়ে তারই দেখা পেলাম না—

—সে কি ?

—সে যে কোথায় লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াচ্ছে—অনেক চেষ্টা করলাম দেখতে, কিছুতেই দেখা পেলাম না।

পরদিন সেই কথাই আলোচনা হলো।

ননীলালকে জিজ্ঞেস করলাম—বউ দেখলি রমাপতির ?

ননীলাল যেন কেমন গম্ভীর-গম্ভীর। বললে—বউটার কপালে দুঃখ্যু আছে ভাই—বেচারী ওর হাতে পড়ে মারা যাবে দেখিস—

জিজ্ঞেস করলাম—রমাপতিকে দেখলি কাল ?

কেউ দেখতে পায়নি। সমস্ত লোকজন আত্মীয়-স্বজনের দৃষ্টি থেকে সরে গিয়ে কোথায় যে লুকিয়ে রইল রমাপতি, সেই-ই এক সমস্যা। বিশ্বনাথ বললে—সে-ও দ্যাখেনি।

কিন্তু কনক বললে—আমি দেখেছি।

—কোথায় ?

—দেখলাম, মিণ্টির ভাঁড়ারে গেঞ্জি গায়ে ওর পিসির কাছে তক্তপোশের ওপর বসে রয়েছে—জানলার ফাঁক দিয়ে দেখতে পেলাম, আমাকে দেখেই মুখ ফিরিয়ে নিলে—

কানাই নাপিতকে চেপে ধরলাম। সে বরের সঙ্গে গিয়েছিল।।

সে তো হেসে বাঁচে না। বলে—ছোটবাবুর কাণ্ড দেখে সবাই অবাক সেখানে—

—সে কী রে—

—আজ্ঞে, সবাই বলে বর বোবা নাকি? কনের বাড়ির মেয়েছেলেরা খুব নাকাল করেছেন ছোটবাবুকে সারা রাত, মাঝরাতে বাসরঘর থেকে বেরিয়ে এসে ছোটবাবু আমার কাছে এসে হাজির। আমি ছাতের এক কোণে ঘুমোচ্ছিলাম, ছোটবাবু চৌপর রাত সেই ছাতে বসে কাটাবে আমার কাছে—কিন্তু মেয়েছেলেরা শুনবেন কেন? তাঁরা আমোদ-আহ্লাদ করতে এয়েছেন···

কিন্তু পরদিন প্রমীলার কাছে যা শুনলাম তাতে আমার বাক্‌রোধ হয়ে এল। প্রমীলা ভোরবেলা উঠেই ওদের বাড়ি গিয়েছিল। আর ফিরে এল বেলা দশটার সময়।

বললাম—এত দেরি হলো? দেখা হয়েছে?

প্রমীলা বললে—গেছি বউ দেখতে, আর না-দেখে ফিরে আসবো? গিয়ে বললাম—মাসিমা, তোমার বউ দেখতে এলাম—কাল শরীর খারাপ ছিল, আসতে পারিনি—

মাসিমা বললে—ছেলে-বউ তো এখনও ঘুমোচ্ছে—তা বোস মা একটু—

তা দরজা খুললো বেলা ন'টার সময়। তোমার বন্ধু তো আমাকে দেখেই পালিয়ে গেল কোথায়। বেবি কিন্তু ঠিক চিনতে পেরেছে। আমাকে দেখেই বললে—মিলি, তুই—!

তার পরে শোবার ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালো আমায়। দেখলাম—সমস্ত বিছানাটা একেবারে ওলোটপালোট। নতুন খাট-বিছানা; নয়নসুখের চাদর, বালিশের ওয়াড়। পাশাপাশি দুটো বালিশ একেবারে সিঁদুরে মাখামাখি। বেবির মুখে-গালেও সিঁদুরের দাগ।···বিছানায় শুকনো ফুল ছড়ানো—

আমি হাসছিলাম দেখে বেবি জিজ্ঞেস করলে—হাসছিস যে?

বললাম—সারা রাত ঘুমোসনি মনে হচ্ছে—

বেবি বললে—ঘুমোতে দিলে তো—বলে মুখ টিপে-টিপে হাসতে লাগলো।

আমিও স্তম্ভিত। বললাম—বললে ওই কথা?

—তার পর শোনোই তো—

প্রমীলা আবার বলতে লাগলো—তার পর আমি জিজ্ঞেস করলাম—তোর বর

কেমন হলো ? তা শুনে কী উত্তর দিলে জানো ?

বললাম—কী ?

প্রমীলা বললে—প্রথমে বৌদি কিছু বললে না, মুখ টিপে হাসতে লাগলো, তার পর আমার কানের কাছে মুখ এনে হাসতে হাসতে বললে—বড় নির্লজ্জ, ভাই…

জেনানা সংবাদ

বিলাসপুরের ডি-এল-এস অফিসের ক্লার্ক কৃষ্ণমূর্তি মারা গেল। মারা গেল যত হঠাৎ, তত হঠাৎ কিন্তু মৃত্যুর প্রসঙ্গ চাপা পড়লো না। কৃষ্ণমূর্তি যতখানি ছিল বাঙালী বিদ্বেষী ঠিক ততখানি ছিল মাদ্রাজী-বিদ্বেষী। অর্থাৎ কৃষ্ণমূর্তির বউ ছিল বাঙালী মেয়ে।

কথা উঠলো—দায়িত্বটা নেবে কে। এমন ক্ষেত্রে না 'বেংগলী এসোসিয়েশন' না 'সাউথ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন' কারোরই মাথাব্যথা হবার কথা নয়। কারণ কৃষ্ণমূর্তি না-বাঙালী না-মাদ্রাজী। তার আট-দশটা নাবালক ছেলেমেয়ে আর বিধবা বাঙালী বউ-এর ভারটা নেবে তা হলে কে? প্রভিডেন্ট ফান্ডের কয়েকশো টাকা ছাড়া বেচারার নির্ভর করবার আর কিছু নেই। বিগতপ্রাণ কৃষ্ণমূর্তি আর তার বিগতশ্রী পরিবারের প্রসংগটা ঘটনাক্রমে রটনায় পর্যবসিত হলো।

রেলওয়ে ইনস্টিটিউটের করিডরে বসে অফিসারদের মধ্যে তাই নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল।

আজাইব সিং বললেন—বাঙালী মেয়েরা কিন্তু স্ত্রী হিসেবে আইডিয়াল—

টি-আই বুড়ো এন্টনি বললে—আমি তা হলে সত্যি কথাই বলি—তেমন বাঙালী মেয়ে যদি পেতাম তা হলে আমাকে আর আজীবন ব্যাচিলর থাকতে হতো না—

মুদেলিয়ার স্টেশনমাস্টার। বললেন—কিন্তু যাই বলো—বাঙালী মেয়েরা বড় ঘর-কুনো, ওই স্বামীটি আর নিজের সংসারটিই কেবল চেনে তারা—

সোনপার সাহেব সিন্ধী। প্রথমপক্ষের স্ত্রী ছিল বাঙালী। গান জানতো। শান্তিনিকেতনে পড়া। বললেন—আপনার কথায় আমার আপত্তি আছে মুদেলিয়ার গারু, ক্যালিফোর্নিয়ার কোনও তজ পাড়াগাঁয়েও যদি কোনো ভারতীয় মহিলাকে দেখতে পান, জানবেন সে বাঙালী মেয়ে—

মুদেলিয়ার দমবার পাত্র নন। দুপাশে মাথা হেলাতে লাগলেন। বললেন—তা হলে বলুন-না কেন মাহেঞ্জোদারোতে যে নাচওয়ালীর কংকাল পাওয়া গেছে, সে-ও বাঙালী মেয়ের কংকাল—

পাশের হল্-এ বিলিয়ার্ডখেলার গোলমাল শোনা যায়। আর করিডর-এর খোলা জানলা দিয়ে বাইরে নজরে পড়ে ইনস্টিটিউটের বিরাট লন। অন্ধকার হয়ে এসেছে অনেকক্ষণ। তীব্র আলো জ্বালিয়ে লন-এর ওপর দু'দলের ব্যাডমিন্টন খেলা চলছে। আর দিল্লী স্টেশনের উর্দু-ঠুংরি গান চলেছে রেডিওতে। এতক্ষণে বোধ হয় ওয়ান-ডাউন এল, আজ বুঝি বম্বে-মেল লেট্। পিচের রাস্তার ওপর দিয়ে টিমটিমে ল্যাম্প জেবলে সার-সার টাংগাগুলো শনিচরী বাজারের দিকে

ছুটে চলেছে।…

সোনপার সাহেব বললেন—আপনি কিছু বলছেন না, মেটা সাহেব—

গুরুবচন মেটা এতক্ষণ চুপ করে বসেছিলেন। এখানকার পি-ডব্লিউ-আই, রেললাইনের তদারক করা কাজ তাঁর। আজীবন ব্যাচিলর। শেয়ালকোটের কোন্ গ্রাম থেকে কবে সি-পি'তে এসে বসবাস করতে শুরু করেছেন কেউ জানে না। তবু রসিকপুরুষ হিসেবে বন্ধুমহলে তাঁর সুখ্যাতি আছে।

স্টেশনমাস্টার মুদোলিয়ার বললেন—আপনি কিছু মতামত দিন মেটা সাহেব—

জুন মাসের মাঝামাঝি। এবার এখনও 'মনসুন' আরম্ভ হলো না! গুরুবচন মেটা আকাশের দিকে চেয়ে সকলের গল্প শুনছিলেন।

বললেন—আমি ব্যাচিলর মানুষ, তরুণী মেয়েদের সম্বন্ধে আমার কোনো অভিজ্ঞতা থাকা অপরাধ—তা ছাড়া বেংগলে কখনও যাইনি—কলকাতা সম্বন্ধে আমার ধারণা কিছুই নেই—বাঙালী মেয়ে বলতে দেখেছি শুধু সরোজিনী নাইডুকে—জব্বলপুরে যেবার কংগ্রেসের মিটিং-এ এসেছিলেন—

টি-আই বুড়ো এন্টনি বললে—সরোজিনী নাইডু? হার এক্সেলেন্সী…

গুরুবচন মেটা বললেন—তবে অনেক বছর আগে একজন বাঙালী মেয়ের সংগে আমার একবার ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল—জব্বলপুরে—

সবাই বললেন—বলুন, বলুন—

গুরুবচন মেটা বলতে শুরু করলেন—আপনারা যদি মনে করে থাকেন যে, সমস্ত বাঙালী মেয়ের সম্বন্ধে আমার একটা অভিজ্ঞতা আছে, তো ভুল করবেন। মেয়েদের সম্বন্ধেই আমার অভিজ্ঞতা কম, তার ওপর বাঙালী মেয়েদের সম্বন্ধে আরও কম। কারণ প্রথমত আমি বাঙালী নই, বাংলাদেশে কখনও যাইনি—তার পর আমার অভিজ্ঞতা শুধু একটিমাত্র বাঙালী মেয়েতেই সীমাবদ্ধ—

টি-আই বুড়ো এন্টনি বললে—তা হোক—বলুন মিঃ মেটা—ভেরি ইন্টারেস্টিং—

মেটা বললেন—আমার মতে আপনাদের কথা যদি সত্যি হয় যে, সব প্রদেশবাসীরাই বাঙালী মেয়েদের বউ করে পেতে চায়, তো তার প্রধান কারণ হলো বাঙালী মেয়েদের রান্না। অমন সুস্বাদু রান্না করতে আর কোনও জাতের মেয়েরা পারে না—

—সো ভেরি ইন্টারেস্টিং—তার পর? বুড়ো এন্টনি বললে।

—তবে একটা কনডিশন, গল্পটা আমি যেখানে শেষ করবো, তার পরে আমাকে আর কেউ কোনো প্রশ্ন করতে পারবেন না—আপনারা জানেন বোধ হয় যে, গল্প যেখানে শেষ হয় 'জীবন সেখানে শেষ হয় না। জীবন বিস্তীর্ণ, ব্যাপক—কিন্তু গল্প জীবনকে ভিত্তি করে গড়ে উঠলেও এক জায়গায় তার

ক্লাইম্যাক্স আছে—সেখানে এসে গল্পে দাঁড়ি টানতে হয়—তাতে আপনারা রাজী ?—গুরুবচন মেটা সকলের দিকে সপ্রশ্ন চোখে চাইলেন।

সোনপার সাহেব সকলের দিকে চেয়ে নিয়ে বললেন—রাজী আমরা—আপনি বলুন—

রেডিওতে বুঝি এবার ইংরিজী প্রোগ্রাম শুরু হয়েছে। রেকর্ডে জ্যাজ অর্কেস্ট্রা। সামনের লন-এ ব্যাডমিন্টন খেলা বন্ধ হলো। কাট্‌নি ব্রাঞ্চের শেষ গাড়িটা অনেকক্ষণ ছেড়ে গেছে। এতক্ষণে সেখানা বোধ হয় পেন্ড্রা রোডের পথে অমরকণ্টকের রেঞ্জ-এর গা দিয়ে টানেল পার হচ্ছে। পুবদিকে প্লাটফরমের ওপর গোস্‌ রুটি আর চায় গরমের হল্লা নেই। প্লাটফরমের তালগাছপ্রমাণ লাইট-পোস্টটার আগাপাস্তলা শুধু পোকায় পোকা।···

গুরুবচন মেটা বলতে আরম্ভ করলেন—আজ থেকে পঁচিশ বছর আগের ঘটনা—আমি তখন থাকি আমাদের জব্বলপুরের বাড়িতে। আমার বড় বোনের তখন বিয়ে হয়ে গেছে, সে সবে লায়ালপুরে চলে গেছে—আমি থাকি সারা বাড়িটাতে একলা—মাঝে মাঝে বাবার দালালী ব্যবসাটা নিয়ে বাইরে ঘুরতে হয়—কখনও নাইনপুর, গন্ডিয়া, ছিন্দোয়াড়া, আর বালাঘাট—ন্যারো গেজের সমস্ত সেক্‌শনগুলো···আবার কখনও ভুসাওয়াল, ইগ্‌গতপুর, বীণা, এলাহাবাদ-কট্‌নি সাতদিন আটদিন পরে হয়তো একদিন বাড়ি এলাম আবার একদিন ব্যাগ আর ব্যাগেজ নিয়ে বেরিয়ে পড়ি টুপ করে—

কাজের মধ্যে কাজ ওই দালালী ব্যবসা, আর ফুর্তি বলুন আর যাই বলুন একমাত্র রিক্রিয়েশন শিকার করা ··

তা বাবারও ছিল শিকারের শখ, আমারও তাই। বাবার দুটো ডবল-ব্যারেল বন্দুক পেয়েছিলাম আমি, একটা বারো বোরের আর একটা যোলো বোরের···আর নিজে কিনেছিলাম একটা রাইফেল—ফোর-ফিফ্‌টি—

যখনি ট্যুর-এ যেতাম—ওটা থাকতো সঙ্গে। কখনও কখনও তেমন জায়গায় গিয়ে পড়লে হাতিয়ার-অভাবে যেন বেকুব না হই। একবার অনুপপুর থেকে নেমে মাইল তিনেক দূরে এক নদীর ধারে মাচা বাঁধা হলো বাঘ মারবার জন্যে—উত্তর আর পশ্চিম দিক থেকে নর্মদা আর শোণ সেখানে এসে মিশেছে—জায়গাটা বাঘ-শিকারের পক্ষে আইডিয়াল···বিকেলবেলা উঠলাম গিয়ে মাচার ওপর আমি, পেন্ড্রা-রোডের ঠাকুরসাহেবের ছেলে নর্মদাপ্রসাদ—সে-ও ভালো শিকারী—আর আমাদের 'কিল্‌'টা রাখা হলো ঠিক···

কিন্তু যাক্‌গে, আমার গল্পে ও-সব অবান্তর প্রসঙ্গ। আমার এ-গল্প তো শিকার-কাহিনী নয়, এ-গল্প মেয়েমানুষ নিয়ে—সুতরাং সেই প্রসঙ্গেই ফিরে আসি—

আপনারা হাওবাগ স্টেশন দেখেছেন ? স্টেশনে নেমে সোজা পুবদিকে

যে-রাস্তাটা চলে গেছে—ডাইনে বাঁয়ে ছোট-বড় অনেক রাস্তাই গেছে—কিন্তু যে-রাস্তাটা বি-এন-আরের মস্ত প্রকাণ্ড মাঠটা ঘুরে বেঁকে সোজা গেছে দক্ষিণ-মুখো, আমি সেই রাস্তাটার কথা বলছি···এখন অবশ্য অনেক বাড়ি হয়েছে ওখানে, রেফিউজিরা ভিড় করেছে, আশেপাশের জলাজমিগুলোও ভরাট হয়ে গেছে, কিন্তু ও-তল্লাট অমন ছিল না—ওই রাস্তায় ঢোকার মুখে ডানদিকে ছিল শুধু 'সানি-ভিলা', কতকগুলো অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান থাকতো ওই বাড়িটাতে, আর তারপর ঝোপ-জঙ্গল, কয়েকটা কবর আর সামনে বি-এন-আরের জমিতে বিরাট বিরাট আমগাছ—আর তারই বাঁকে পশ্চিম-মুখো 'শিয়ালকোট লজ'—আমার বাড়ি। সামনে ধরুন বাগান এককালে ছিল, কিন্তু তখন তত কিছু বাহার ছিল না, শুধু গোটাকতক আগাছা ছড়িয়ে আছে এদিক-ওদিক। তবু দোতলার বারান্দায় দাঁড়ালে সামনের রাস্তা আর আশেপাশের সব-কিছুই দেখা যায়।

একদিন আমার একতলাটায় একটা ভাড়াটে এল।

এ-পাড়ার দিকে ভাড়াটে বড় একটা আসে না। কারণ এখান থেকে ফ্যাক্টরি অনেক দূরে। তার পর জি-আই-পি স্টেশন থেকে এখানে আসতে গেলে রিক্সা করতে হবে। বাজার-হাট সব দূরে। বিশেষ করে ফ্যামিলি নিয়ে বাস করতে গেলে তখনকার দিনে আরো অসুবিধে।

কিন্তু তবু একটা ফ্যামিলি এল। বাঙালী ফ্যামিলি।

কুড়ি টাকা ভাড়া। একমাসের ভাড়া অ্যাডভান্স-ও দিয়ে দিলে। রসিদটার নীচে সই দিয়েছে মিসেস স্বামীনাথন নিজে। বাড়িভাড়া হয়েছে স্ত্রীর নামে—

আজাইব সিং বললেন—স্বামীনাথন! বাঙালী 'সারনেম' তো অমন শুনিনি কখনও, ব্রাদার—

সোনপার সাহেব বললেন—হয়—হয়—মেটা ইজ রাইট—আমার ফার্স্ট ওয়াইফ্-এর কাছে শুনেছি—বাঙালী জাতটা যেমন পিকিউলিয়র, ওদের সারনেম-গুলোও তেমনি পিকিউলিয়র—আমি জানি আমার ওয়াইফ-এর একজন কাজিন ছিল, তার সারনেম 'গোস্'—

মুদেলিয়ার স্টেশনমাস্টার বললেন—তা কেন—স্বামীনাথন কখনও কোনও বাঙালীর সারনেম তো হতে পারে না—ওটা আমাদেরই একচেটে—

সোনপার বাধা দিতে যাচ্ছিলেন। টি-আই বুড়ো এস্টান বললে—ওটা একটা মাইনর পয়েন্ট—আপনার সেই বেঙ্গলী গার্লের গল্পটা বলুন, মিস্টার মেটা—

গুরুবচন মেটা বললেন—সেই বেঙ্গলী গার্লের গল্পই তো বলছি, স্বামীনাথন হলো তার হাসব্যান্ড-এর সারনেম—মিসেস স্বামীনাথন একজন বাঙালী মেয়ে, বিয়ে করেছিল হ্যারি স্বামীনাথনকে—ম্যাড্রাসী ইণ্ডিয়ান ক্রিশ্চিয়ান—

টি-আই বুড়ো এস্টান বললে—সো ভেরি ইন্টারেস্টিং······আমাদের ডি-এল-

এস অফিসের ক্লার্ক কৃষ্ণমূর্তির মতো—তারপর—তার পর ?

গুরুবচন মেটা বললেন—কিন্তু তার আসল নাম হলো—

বলতে গিয়ে গুরুবচন মেটা নিজেই হঠাৎ থেমে গেলেন। বললেন—আসল নামটা আপনাদের আগে বলে দিয়ে আর একটু হলে ভুল করছিলাম। কারণ আসল নামটা কি আমারই জানবার কথা ? একদিন কি দুদিন মাত্র দেখেছি ওদের —তা-ও দু'এক সেকেন্ডের জন্যে—সুতরাং নাম জানা দূরে থাক, চেহারাটাও ভালো করে দেখা হয়নি। আর আমি বাড়িতেই বা থাকি কতক্ষণ—মাসের মধ্যে যে দশ-বারো দিন বাড়ি থাকি তা-ও ওই শিকার নিয়ে কাটে—তবে এক এক দিন শুনতাম বটে—যেদিন সন্ধ্যাবেলা বাড়ি থাকতাম—বাঙালী স্ত্রী ক্রিশ্চিয়ান-ম্যাড্রাসী স্বামীকে গান শেখাচ্ছে—বাংলা গান—গানটার একটা লাইন আমার এখনও মনে আছে—পরে শুনেছিলাম পোয়েট টেগোরের লেখা গান—হে নাটারাজ —হে নাটারাজ···

সোনপার সাহেব বললেন—এ গানটা আমার ফার্স্ট ওয়াইফ গাইতো—বেঙ্গলীদের টিউন ভেরি পিকিউলিয়র—

—তার পর শুনুন— গুরুবচন মেটা আবার বলতে শুরু করলেন।

—একদিন সাইকেল নিয়ে 'চৌকে' গেছি কী কিনতে, দেখা হলো সুবেদার কেদার সিং-এর সঙ্গে। কেদার আমায় জিজ্ঞেস করলে—তোমার বাড়িতে একতলায় নতুন এক ভাড়াটে এসেছে দেখলাম—নতুন জেনানা—

আমি বললাম—হ্যাঁ—এক ম্যাড্রাসী ফ্যামিলি—

—ম্যাড্রাসী নয়—আমি চিনি ওকে—চাইবাসায় থাকতো ওর বাবা, ফরেস্ট অফিসার, ওর নাম মিস সুজাতা দাশ, ওর বাবা ছিলেন মিস্টার দাশ, রেইস্ আদমি—খানদানী বংশের লোক—কিন্তু সঙ্গের ও-লোফারটা কে ?

আমি বললাম—ও ওর হাসব্যান্ড—হ্যারি স্বামীনাথন—

সুবেদার কেদার সিং বললে—শেষকালে কিনা ওর সঙ্গে বিয়ে হলো !

ওর সঙ্গে বিয়ে হওয়াটা যেন সুবেদার সাহেবের মনঃপূত নয়। সুবেদার সাহেবের কাছেই শুনলাম—মেয়েটি নাকি ভারী খুবসুরৎ ছিল আগে। ভারি বলিয়ে কইয়ে, নাচিয়ে গাইয়ে। চাইবাসার সব লোকই নাকি ভালোবাসত সুজাতাকে। বড়লোক বাপ। ঘোড়া ছিল, মোটর ছিল, আবার মাঝে মাঝে সাইকেলও চড়তো ও। কখনও পরতো শাড়ি, কখনও সেরোয়ানি, কখনও শালোয়ার, কখনও পরতো চোদ্দহাত মাদ্রাজী শাড়ি কাছা-কোঁচা দিয়ে, আবার কখনও পরতো স্রেফ ব্রিচেস আর নেকটাই-এর সঙ্গে ট্রাউজার শার্ট।

আমারও দেখে মনে হলো ভারী মজবুত গড়নের মেয়ে। ভইষের দুধ, ঘি আর মাঠা না খেলে অমন চেহারা হয় না। তার ওপর আছে তাকত্ আর মেহন্নত। মোটর চালানো, ঘোড়ায় চড়া আর সাইকেল পেটা—

সেদিন প্রথম আলাপ হলো।

সন্ধ্যে তখনও হয়নি। হরিশঙ্কর রোডে গিয়েছিলাম বিল্ কালেক্শনে, মহাসামুন্দের পি-ডব্লিউ-আই শুক্লাজী ছাড়লো না। একটা বুল্-ডিয়ার মেরে নিজের ট্রলি করে রায়পুর পৌঁছে দিয়ে গেল। তার পর সেটা নিয়ে গন্ডিয়া জাংশানে ন্যারো-গেজ ট্রেন ধরে সন্ধ্যের কিছু আগে আমার 'শিয়ালকোট-লজে' এসে পৌঁছুলাম। এবার বাড়িতে প্রায় দিন কুড়ি গরহাজির ছিলাম—

আমার চাকর আমার আগে-আগে বুল্-ডিয়ারটা নিয়ে ঘরে গেছে। আমি ধীরে সুস্থে আস্তে-আস্তে আসছি। ক'দিনের ঘোরাঘুরিতে বেশ পরেশান হয়েছিলাম—দীনদয়ালকে বলে দিয়েছিলাম—মাঠা যেন তৈরি রাখে—গিয়েই এক গ্লাস খেয়ে নেবো—

কিন্তু গেট্ দিয়ে ঢুকতেই দেখি মিসেস স্বামীনাথন বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। আমি কাছাকাছি আসতেই দু'হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে সেলাম করলে।

বললে—জয় রামজী কি—

তারপর সামনে এসে দাঁড়াতেই বললে—আপনি শিকারপ্রিয় লোক আমি জানতাম না—

আগাগোড়া ক্রেপ্-সিল্কের বুটিদার শাড়ি-ব্লাউজ মিসেস স্বামীনাথনের পরনে। জরিদার একজোড়া পা-ঢাকা চটি—দু'দিকের ব্লাউজের নীচে থেকে সমস্ত হাতদুটো মাস্ল্-ওয়ালা—মোদ্দা কথা আমাদের গুজরানওয়ালা লাহোরের মেয়েদের পর্যন্ত হারিয়ে দিতে পারে পাঞ্জায়—এমনি তাকত-ওয়ালা জেনানা—দেখে তাজ্জব হয়ে গেলাম।

তারপরেই আমার হাত থেকে বন্দুকটা নিয়ে রীতিমতো বাগিয়ে ধরলে—

বললে—ষোলো বোরের বন্দুক ব্যাভার করেন আপনি ?

বললাম—তিনরকমই আছে, যখন যেটা সুবিধে সেইটে নিই—

মিসেস স্বামীনাথন বললে—আমার আর আপনার দেখছি একই—হল্যান্ড অ্যান্ড হল্যান্ড—আপনি কী কার্ট্রিজ কেনেন ?

—তার কিছু ঠিক নেই, আজকের বুল্-ডিয়ারটা মেরেছি বাক্শটে—যখন যেটা সুবিধে হয়, কখনও এল-জি, কখনও এস-জি—

—অ্যাল্ফা ম্যাক্স— ?

—তারও কোনো ঠিক নেই—তবে অ্যাল্ফা ম্যাক্স-ই আমি পছন্দ করি—

মিসেস স্বামীনাথন বন্দুকটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছে, ট্রিগার টিপছে, কাঁধের ওপর রেখে 'এইম্' করছে—হঠাৎ লক্ষ্য করলাম বাঁ হাতের কড়ে-আঙুলটা যেন জখম হয়ে আছে। আঙুলটা কাটা।

দীনদয়ালকে দিয়ে দোস্ত-দোস্তালি সকলের কাছে কিছু কিছু মাংস পাঠিয়ে দিলাম। সুবেদার কেদার সিং-এর কাছে, এতোয়ারিতে মুন্সিজীর কাছে, আরো

অনেকের কাছে,—আর পাঠালাম একতলায় মিসেস স্বামীনাথনের কাছে।

সেইদিন থেকে ঘনিষ্ঠতা শুরু হলো। সকালবেলায় সাইকেল চড়ে মিসেস স্বামীনাথন যখন বাজার করে ফেরে তখন বেশ দেখায়। পিঠে বেণী ঝুলিয়ে দিয়েছে, সিল্কের ঢিলে পায়জামা, গায়ে একটা জুট-সিল্কের ঢিলে পাঞ্জাবি আর সামনের বেতের বাস্কেটের মধ্যে আলু, ভিণ্ডি, পরবোল আর ভাজি—এই সব—

হঠাৎ সেদিন আমাকে নেমন্তন্ন করে বসলো মিসেস স্বামীনাথন—

গোয়াড়িঘাট থেকে গ্রীন পিজিয়ন্ মেরে এনেছে দু'তিন ডজন। নতুন বটফল পাকতে শুরু করেছে—বর্ষা শুরু হয়ে গেছে কিনা।

বললে—আজ সকাল-সকাল হ্যারি টাউনে বেরিয়ে গেছে—হাতে কাজ ছিল না, বেরিয়েছিলুম আমার বন্দুকটা নিয়ে, মতলব ছিল 'ডাক্' মারবার, কিন্তু··· আজ সন্ধ্যে সাতটায় আসছেন তো, হ্যারিকে বলেছি সে-ও আসবে তার আগেই—

সেদিনকার নেমন্তন্নটা বিশেষ করে মনে আছে, এই পঁচিশ বছর পরেও, কারণ অমন মাংসের রোস্ট্ জীবনে আর খেলুম না—আর খাবোও না। শুনেছিলাম মিসেস স্বামীনাথন নিজে রান্না করেছিল—

সন্ধ্যে সাতটার সময় নেমন্তন্ন। কিন্তু সেদিন মনে হয়েছিল পৃথিবীতে সাতটা বুঝি আর বাজে না! কারণ তখন দীনদয়ালের রান্না খেয়ে খেয়ে আমার অরুচি হয়ে গিয়েছে। আর তা ছাড়া গ্রীন পিজিয়নটা বরাবরই আমার প্রিয় খাদ্য। তার কাছে কোথায় লাগে মাটন, কোথায় লাগে ফাউল। যা হোক, ঘড়ির কাঁটায় সাতটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে আমি একতলায় গিয়ে হাজির হয়েছি। মিসেস স্বামীনাথন সেদিন পুরোপুরি বাঙালী সাজে সেজেছিল। একটা পীককের গায়ের রঙের মতো ব্রাইট জর্জেট-শাড়ি ফিগারটাকে লেপ্টে জড়ানো, আর চিতাবাঘের মতো ডোরা-ডোরা ছিটের ব্লাউজ কাঁধ পর্যন্ত, তার নীচেয় বাচ্চা হরিণের মতো নরম মোলায়েম দুটো হাত। বন্দুক হাতে যে-মিসেস স্বামীনাথনকে দেখেছি গুজরান-ওয়ালার মেয়েদের মতো কর্কশ-কঠিন, কী জানি কেমন করে কেউটে-সাপের ফণার মতো হাতের মাস্‌ল্‌গুলোকে সেদিন সে লুকিয়ে ফেলেছে।

আমি যেতেই পরদা সরিয়ে এসে অভ্যর্থনা করলে। বললে—আসুন মেটাজী—

বললাম—মিস্টার স্বামীনাথন কোথায়?

—হ্যারি এখনই এসে পড়বে, বোধ হয় কোনো কাজে আটকে পড়েছে, সেলস্ম্যানের কাজ বড় বিশ্রী কাজ মেটাজী, প্রত্যেককে প্লীজ করতে করতে অস্থির—

টেবিলের সামনে মুখোমুখি বসলাম দুজনে।

বললাম—ওঁর ব্যবসা তো অনেক ভালো, আর আমাদের দেখুন তো, মাসের

মধ্যে পনেরো দিন বাইরে বাইরে ঘুরতে হয়—শরীরের আর কিছু থাকে না—

মিসেস স্বামীনাথন বললে—তা হোক, কিন্তু হ্যারি যে বাইরেই যেতে চায় না, বিয়ের আগে ওর ভালো একটা চাকরি ছিল, ছ'শো টাকা মাইনে পেতো—সে-চাকরি ছেড়ে দিয়ে এখন এই মোটরের সেলস্‌ম্যানশিপ ধরেছে। এখন কত বলি একটু বাইরে ঘোরাঘুরি করো—তা যাবে না—আমাকে ছেড়ে বাইরে গিয়ে একটা রাত কাটাতে পারেনা ও—এমন ঘরকুনো—

হেসে বললাম—সে তো যে-কোন স্ত্রীর পক্ষেই ঈর্ষার বিষয়, মিসেস স্বামীনাথন,—কিন্তু ছ'শো টাকার চাকরিটা ছাড়লেন কেন—আজকালকার বিজ্‌নেসের বাজার যে-রকম—

—না ছেড়ে যে উপায় ছিল না মেটাজী, তখন এমন ব্যাপার হয়ে পড়েছিল, চাকরি তো চাকরি, হ্যারির জীবন নিয়ে টানাটানি, আমার রীতিমতো ভয় হয়ে গিয়েছিল—

—কেন ?

—হয়তো আত্মহত্যা করে বসতো। বলা তো যায় না—

—কেন, আত্মহত্যা করবার কী হয়েছিল ?

মিসেস স্বামীনাথন বললে—হ্যারির পাগলামির কথা তো সব জানেন না—পুরুষমানুষ যে অমন সেন্টিমেন্টাল হতে পারে তা হ্যারির সঙ্গে মেশবার আগে পর্যন্ত আমি জানতাম না—জানেন, তিনবার ও সুইসাইড করতে গিয়েছিল—

—কেন ! আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম আমি।

—আমার সঙ্গে বিয়ে হবে না বলে— হাসতে হাসতে মিসেস স্বামীনাথন বললে।

তার পর বললে—আমরা হলাম গোঁড়া হিন্দু বাঙালী—বাবা সাহেবী খানা খেলেও হিন্দুয়ানি আমাদের বংশের রক্তের মধ্যে শেকড় বসিয়েছে, আর তা ছাড়া তখন আমার হাতে চা খেতে বি-সি-এস থেকে শুরু করে আই-সি-এস পর্যন্ত পাঁচ ছ'জন ক্যান্ডিডেট তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ মাইল দূর থেকে মোটর ড্রাইভ করে রোজ সন্ধ্যেয় আমাদের বাড়ি আসছে···আর হ্যারি ভারি তো ছ'শো টাকা মাইনের মার্কেনটাইল ফার্মের একাউনটেন্ট—আমাকে কিনা বিয়ে করবার সাধ তার—সেন্টিমেন্টাল না তো কী বলব ওকে বলুন—

বেশ আগ্রহ হচ্ছিল গল্প শুনতে। মিসেস স্বামীনাথনের গল্প বলবার সময়ে ঠোঁটের যে অপূর্ব ভঙ্গী হচ্ছিল তাতে সেন্টিমেন্টাল হ্যারি কেন, যে-কোনো পুরুষের আত্মহত্যার ইচ্ছে হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়।

বললাম—তার পর—

খিলখিল করে হেসে উঠলো বাঙালী মেয়ে মিসেস স্বামীনাথন। বললে—তার পর তো দেখছেনই এখন মিসেস স্বামীনাথন হয়েছি—কিন্তু হ্যারি ওমনি

ছাড়েনি আমাকে—অমন নাছোড়বান্দা পুরুষমানুষও আমি দুটো দেখিনি, মেটাজী—এই দেখুন না— বলে হাতের কাটা আঙুলটা দেখালে উঁচু করে—

বললে—সারা শরীরে আমার খুঁত নেই কোথাও—অন্তত আমার অ্যাডমায়ারাররা তাই বলতো—কিন্তু সারা জীবনের এই খুঁতটি আমার করে দিয়েছে হ্যারি—

গল্প আরো জমে উঠেছে। বললাম—কেন ?

হঠাৎ হাতঘড়িটার দিকে চাইলে মিসেস স্বামীনাথন।

বললে—রাত ন'টা বাজতে চললো এখনও তো হ্যারি আসছে না—

বললাম—আমার কোনো অসুবিধে হচ্ছে না, মিসেস স্বামীনাথন—

—তা হোক কতক্ষণ আর অপেক্ষা করা যায়, আসুন আমরা আরম্ভ করে দিই—হ্যারি নিশ্চয়ই কোনো কাজে আটকে গেছে—

তার পর শুরু হলো ডিনার। অপূর্ব রান্না, অপূর্ব তার টেস্ট। জীবনে সেই ডিনারের কথা আর কোনোদিন ভুলবো না। খেতে খেতে আমাদের গল্প চলতে লাগলো। বললাম—তার পর, বলুন—

মিসেস স্বামীনাথন বললে—সেইদিনের ঘটনাটা বলি—মজুমদার আসবার কথা আছে, আসবার কথা আছে দীপেন কুমার আর অলবের—কিন্তু বলা নেই কওয়া নেই হ্যারি দুপুরবেলা বাড়িতে এসে হাজির ওর মোটর-বাইক নিয়ে—অফিস থেকে পালিয়ে এসেছে হ্যারি—

যেতে হবে শিকারে। ঠিক ছিল ফিরে আসবো সন্ধ্যের আগে। কিন্তু হলো না। নোয়ামুণ্ডির জঙ্গলে গোটাকতক তিতির মেরে ফিরে আসছি—হ্যারি বললে বড়াবিল সাইডিং-এর ধারে একটু বিশ্রাম নিতে ; বিশ্রাম আর নেব কী বলুন, নোয়ামুণ্ডি থেকে চাইবাসায় আসতে ইঞ্জিন চালাতেও হবে না—এমন ঢালু রাস্তা, শুধু চেপে বসলেই হলো এমন গড়ানে, তবু হ্যারি নাছোড়বান্দা, বললে —একটু বিশ্রাম করতেই হবে—সেইখানে বসেই হ্যারি কাণ্ডটা বাধালে—

বললাম—কোন্ কাণ্ড ?

মিসেস স্বামীনাথন আমার প্লেটের দিকে তাকিয়ে বললে—আপনি আর একটু দো-পেঁয়াজি নিন মেটাজী—আপনার হয়তো লজ্জা হচ্ছে—

খানিক পরে মিসেস স্বামীনাথন আবার বলতে শুরু করলে—সেইখানে বসে আমরা চা-পান শেষ করলাম, তার পর বোধ হয় একটু ক্লান্তি এল হ্যারির শরীরে —ও শুয়ে পড়লো আমার কোলে মাথা রেখে। তাতেও দোষ ছিল না, কারণ কোলটা আমার হলেও, কেউ-না-কেউ শোবার জন্যই তো হয়েছে ওটা—সুতরাং আমি আপত্তি করিনি—কিন্তু বিপদ ঘটলো তার পর। হ্যারি বললে, আমি যদি হ্যারিকে বিয়ে না করি তো ও আত্মহত্যা করবে। তা কী করে হয় বলুন, আমরা হলুম হিন্দু বাঙালী আর ও হলো মাদ্রাজী ক্রিশ্চিয়ান। আর তা ছাড়া

মজুমদারকে প্রায় একরকম কথা দেওয়াই হয়ে গেছে—কিন্তু হ্যারী বললে আমার কোলে শুয়েই সে আত্মহত্যা করবে, আমাকে না পেলে ওর নাকি মরা-ই ভালো। তা ভালো তো ভালোই, কি বলুন, কিন্তু আমার সামনে আর আমার কোলে শুয়েই বা আত্মহত্যা করা কেন—আড়ালে করলেই তো চুকে যায় ঝঞ্ঝাট··· আপনাকে আর স্লাইস রুটি দেব, মেটাজী—

খানিক থেমে মিসেস স্বামীনাথন আবার আরম্ভ করলে—আমি বিরক্ত হয়ে কোল থেকে হ্যারির মাথাটা দিলাম সরিয়ে। ও-ও আপত্তি করলে না, কিন্তু উঠে দাঁড়িয়ে আমার বারো-বোরের বন্দুকটায় একমুহূর্তে একটা এল-জি পুরে নিয়ে নিজের বুকে লক্ষ্য করে ট্রিগার টিপলে—আর সঙ্গে সঙ্গে—আপনি আর-একটু কারী নিন, মেটাজী—কিছুই খেলেন না দেখছি···

বললাম—ও কথা থাক, আপনি বলুন তার পর কী হলো—

মিসেস স্বামীনাথন বললে—দশটা বাজতে চললো, এখনও দেখছি হ্যারি আসছে না—নিশ্চয়ই কোনো কাজে আটকে পড়েছে—কী বলেন—

বললাম—তার পর বলুন—

—তার পর আর কী—এই তো আমার মাঝখানের আঙুলটা দেখছেন, আধখানা উড়ে গেছে, এ ওই হ্যারিকে কেবল বাঁচাবার জন্যে—আমিও তাড়াতাড়ি বন্দুকটা ধরে বাধা দিতে গেছি, কিন্তু দেরি হয়ে গেল একটু—হ্যারি বাঁচলো এইটুকুর জন্যে, কিন্তু আমার আঙুলটা···বাইরে যেন সাইকেল-রিক্সার ঘণ্টা বাজলো, না মেটাজী?

মিসেস স্বামীনাথন টেবিল ছেড়ে উঠলো। বললে—এক্সকিউজ মি—এতক্ষণে বোধ হয় হ্যারি এল—

সত্যিই হ্যারি সাইকেল-রিক্সায় এল। কিন্তু সেই সময়, ঠিক আমাদের গল্পের চৌমাথায় পৌঁছুবার আগেই হ্যারি না-এলেই যেন ভালো করতো। পরে অনেকবার ভেবেছি সেদিন আমার সামনে অমন অবস্থায় মিসেস স্বামীনাথনের স্বামী কেন এল। কেন এল-না আরো অনেক পরে, যখন খাওয়াদাওয়া সেরে আমি আমার ঘরে চলে আসতুম। তা হলে মিসেস স্বামীনাথনও অমনভাবে ধরা পড়তো না।

সেই রাত্রে মিসেস স্বামীনাথনের যে-ব্যবহার দেখেছিলাম তা জীবনে ভুলবো না। আর সে ব্যবহার কিনা করলো আমারই উপস্থিতিতে।

রিক্সার ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে মিসেস স্বামীনাথন মাতাল হ্যারিকে পেছন থেকে ধরে নিয়ে এল ঘরের মধ্যে। হ্যারি তখন বেশ টলছে। দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই ভালো করে।

আমাকে চিনতে পেরে হ্যারি বললে—হ্যাল্লো বয়—

তার পর কী একটা বেয়াদবি করতেই মিসেস স্বামীনাথন এক কাণ্ড করে

বসলো। দেখলাম মিসেস স্বামীনাথনের শরীরে আবার সেই কর্কশ-কাঠিন্য ফুটে উঠেছে। চীৎকার করে উঠল—স্কাউণ্ড্রেল…

তার পর হ্যারির চুলের মুঠি ধরে সে কী ঝাঁকুনি! অচৈতন্য হ্যারির চেতনা ফিরিয়ে আনবার অনেক চেষ্টা হলো। শেষে আমার দিকে একবার কাতর চাউনি দিয়ে হ্যারিকে বেডরুমে নিয়ে যাবার চেষ্টা করলে—

পাশের ঘরে যেতে যেতে হ্যারি আমার দিকে ফিরে বললে—চিয়ারিউ, বয়—চিয়ারিউ—

তখনও বাকি ছিল পুডিং আর কফি। আমার ডিনার শেষ হলো না। মিসেস স্বামীনাথনকে সেই অপ্রস্তুত অবস্থা থেকে বাঁচাবার জন্যে আমি নিঃশব্দে ওপরে আমার ঘরে চলে এলাম। মনে হলো—মিসেস স্বামীনাথনের অপমান যে-ই করুক—তা দাঁড়িয়ে দেখাও যেন অপরাধ।

টি-আই বুড়ো অ্যান্টনি বললে—সো ভেরি ইন্টারেস্টিং—তার পর, মিস্টার মেটা—

মুদেলিয়ার বললেন—ড্রানকার্ড'স আর অলওয়েজ স্কাউণ্ড্রেলস্—ঠিকই হয়েছে—

সোনপার সাহেব বললেন—বাজে কথা, আমি তো বরাবরই ড্রিঙ্ক করি, তবে মডারেট ডোজে—কিন্তু আমার ফার্স্ট ওয়াইফ কখনো আপত্তি করেননি—বরং—

মুদেলিয়ার বললেন—তা তো করবেই না, আমি শুনেছি বেঙ্গলী গার্লরা কোলকাতার হোটেলে পাবলিক্লি স্মোক আর ড্রিঙ্ক করে—

সোনপার সাহেব বললেন—আই টেক সীরিয়াস অবজেক্শন টু ইট—

টি-আই অ্যান্টনি বললে—চুপ করুন আপনারা—তার পর বলুন মিঃ মেটা—

গুরুবচন মেটা আবার বলতে শুরু করেলেন। বিলাসপুর রেলওয়ে কলোনি তখন নিস্তব্ধ। রাস্তার আলোগুলো চুপচাপ প্রহরীর মতো ঠায় দাঁড়িয়ে। শুধু বিলাসপুর ইয়ার্ডে শান্টিং-এর শব্দ মাঝে মাঝে আকাশকে চমকে দেয়। আর, এই ইন্স্টিটিউটের ভেতরে বিলিয়ার্ড খেলা তখন বন্ধ হয়ে গেছে। শুধু দিল্লীর রেডিওতে তখন দরবারী কানাড়ায় খেয়াল ধরেছে কোনো ওস্তাদজী।

মেটাজী বললেন—তার কিছুদিন পরে হঠাৎ একদিন দেখা হয়ে গেল মিস্টার স্বামীনাথনের সঙ্গে বাড়ির বাইরে। আমি ট্রেন থেকে নেমে 'কিংসওয়ে'তে খেতে গেছি—রাত্রের খাওয়াটা ওখানেই সেরে নেওয়ার মতলব—কারণ ট্রেন লেট্ ছিল, আর এত দেরিতে আবার দীনদয়াল কেন কষ্ট করবে এই ভেবে। হঠাৎ দেখি, হ্যারি স্বামীনাথন দূরে একটা টেবিলে বসে আছে। সঙ্গে আর একটি মেয়ে—

বাঙালী নয়, অ্যাংলো ইন্ডিয়ান—

আমাকে দেখতে পেয়েই হ্যারি নিজের বোতল আর গ্লাসটা হাতে নিয়ে উঠে এল। এসে আমার সামনের চেয়ারেই মুখোমুখি বসল। বললে—গুড্ ইভনিং, বয়—

দেখলাম, নেশা বেশ হয়েছে। এবং ক্রমে আরও হবার আশা আছে—

আমার খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল। বললাম—আমি উঠি—

—সে কি, একটু খাবেন না—

আমার আপত্তিতে হ্যারি আর বেশি পীড়াপীড়ি করল না। বললে—ভালো কথা, একটা কথা আপনাকে প্রায়ই জিজ্ঞেস করবো ভাবি—

—কী কথা—

—এই-যে রাত্রে বাড়িতে ফিরে সুজাতার সঙ্গে আমি প্রায়ই ঝগড়া করি, আপনি টের পান ? কী যে ওর স্বভাব মশাই। সকলে সব জিনিসে রস পায় না, তা না পাক, ধরুন আমার মদ খেতে ভালো লাগে, সুজাতার ভালো লাগে না। তোমার ভালো লাগেনা তুমি খেওনা, কিন্তু আমি যদি খাই তুমি বাধা দেবার কে—ঠিক কিনা বলুন—এখন এই নিয়ে রাত্রে মশাই রোজ আমাদের ঝগড়া হয়—

বললাম—এবার তা হলে উঠি—

—কিন্তু আপনি উত্তর দিলেন না তো ?

—কীসের উত্তর ?

—ওই আপনি টের পান কিনা—

—কেন বলুন তো, আমি পেলেই বা…

—সেই কথাটা সুজাতাকে একবার বোঝান দিকি, আমিও যত বলি মেটাজী টের পেলেই বা, সুজাতা বলে—তুমি শেমলেস্ হতে পারো কিন্তু আমার লজ্জা করে। অর্থাৎ আমি যে মদ খাই এটা যেন দোষের নয়, দোষটা হলো আপনার টের পাওয়াতে—

বললাম—মিসেস স্বামীনাথন যখন চান না—তখন আপনি ওটা খান কেন ?

আপনি বুদ্ধিমান হয়ে এই কথা বলছেন— হ্যারি বোতল হাতে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। তার পর বললে—আপনি আমাদের হিস্ট্রি কিছু জানেন না, আমি ছ'শো টাকার চাকরি ছেড়েছি সুজাতার জন্যে, জানেন—নইলে আজ আমি মোটরগাড়ির পেটি সেল্স্ম্যান—তিনবার আমি সুইসাইড করতে গেছি—তিনবার সুজাতা আমাকে বাঁচিয়েছে—সুজাতা কি আমায় কম ভালোবাসে ভেবেছেন ! ওর সব ভালো, অমন সতী স্ত্রী পাওয়া কি কম সৌভাগ্যের কথা ? একরাত্তির আমি পাশে না শুলে ওর ঘুম আসে না—আমি যেমন ওর জন্যে আমার চাকরি, আমার সব ত্যাগ করেছি, ও-ও আমার জন্যে ওর বাবার প্রচুর সম্পত্তি স্যাক্রিফাইস্ করেছে—শেষে মজুমদারকে এড়াবার জন্যে আমার সঙ্গে পালিয়ে এসেছে—অমন

একনিষ্ঠ ভালোবাসার তুলনা হয় না, মেটাজী—কিন্তু ওর ওই এক দোষ—আমার মদ খাওয়া মোটে পছন্দ করে না—কিন্তু ন্যান্সীকে দেখুন—ওই যে বসে আছে—

দূরের টেব্‌লে বসা অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান মেয়েটিকে দেখালে হ্যারি।

বললে—ওই ন্যান্সীকে দেখুন—ওকে আমি যত খাওয়াবো তত খাবে—একবারও 'না' বলবে না—ও এক পিপে মদ খাওয়ালে খেতে পারে—সুজাতাকে কত বলেছি খেতে—কিছুতেই খাবে না, মাতাল দেখলে একশো হাত দূরে পালিয়ে যাবে—ওদের আর সব ভালো মশাই, বাঙালী মেয়েরা ওই এক ব্যাপারে ভারি কন্‌জারভেটিব—

সেদিন অনেক কষ্টে মাতালের হাত থেকে ছাড়িয়ে বাড়ি আসতে পেরেছিলাম। দেখেছিলাম, আমি চলে আসতেই হ্যারি আবার ন্যান্সীর টেব্‌লে গিয়ে বসলো।

কিন্তু বাড়ি এসে একটু সকাল-সকাল শোবার ব্যবস্থা করছি। রাত তখন প্রায় এগারোটা হবে। হাওবাগের এ-দিকটা সন্ধ্যে থেকেই অবশ্য নিরিবিলি হয়ে যায়। তারপরে ক্লান্তও ছিলাম খুব। দীনদয়াল এসে খবর দিলে—একতলার মেমসাহেব সেলাম দিয়েছে—

অত রাত্রেই গেলোম নীচেয়। মিসেস স্বামীনাথন একলা আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল। বললে—এবার আপনি অনেকদিন বাইরে ছিলেন মেটাজী—

বললাম—আমার ব্যব্‌সায় শুধু ওই ঘোরাই সার—লাভ বিশেষ কিছু নেই—কিন্তু মিস্টার স্বামীনাথন কোথায় ?

মিসেস স্বামীনাথনকে বেশ চিন্তিত দেখলাম। বললে—সেই জন্যেই তো আপনাকে ডেকেছি, মেটাজী—

বললাম—হয়তো কোনো কাজে আটকে গেছেন—

—না, কিন্তু ক'দিন থেকেই বেশি রাত্রে ফিরছে হ্যারি—দিন দিন ওর যেন অত্যাচারটা বাড়ছে—দেখুন না, এগারোটা বাজলো, এখনও এল না—আপনার সাইকেলটা একবার দিতে পারেন মেটাজী—আমারটা পাঙচার হয়ে পড়ে আছে কাল থেকে—

—কিন্তু এত রাত্রে সাইকেল কী করবেন— জিজ্ঞেস করলাম আমি।

—আমি হ্যারিকে খুঁজতে যাবো—

—এতবড় শহরে কোথায় খুঁজবেন তাকে ?

—জব্বলপুরে যত মদের দোকান আছে, সব জায়গায় খুঁজবো—আজ একটা গাড়ি বিক্রি করবার কথা ছিল ওর—পাঁচ হাজার টাকার 'কার'—আজ কয়েক শো টাকা ওর হাতে আসবার কথা, সেই সকালবেলা বেরিয়েছে, নাওয়া নেই খাওয়া নেই, তার পর এই এত রাত হলো···আপনি সাইকেলটা আনিয়ে দিন আমি ততক্ষণে কাপড়টা বদ্‌লে নিই—

বলে মিসেস স্বামীনাথন ভেতরে চলে গেল সেই মুহূর্তে। আমি দীনদয়াল-কে ডেকে সাইকেলটায় বাতি জ্বালিয়ে দিলাম। খানিক পরেই মিসেস স্বামীনাথন বেরিয়ে এল অপূর্ব পোশাক প'রে। সেই রাত সাড়ে এগারোটায় মিসেস স্বামী-নাথনের যে অপরূপ রূপ দেখেছিলাম তা জীবনে ভুলবো না। শালোয়ার আর সেরোয়ানি পরা পাঞ্জাবী মেয়ে হাজার হাজার দেখেছি। কিন্তু বাঙালী মেয়ে মিসেস স্বামীনাথনের সেই পোশাকে আমার ব্যাচিলর মনে সেই রাত্রে যে-মোহ বিস্তার করেছিল তা অসহ্য। অত রাত্রে ওই জ্বালা-ধরা পোশাক প'রে মাতাল স্বামীকে মদের দোকানে দোকানে ঘুরে খুঁজে বেড়ানো বড় রোমান্টিক মনে হয়েছিল আমার সেই তরুণ বয়েসে।

মিসেস স্বামীনাথন সাইকেলটা আমার হাত থেকে নিয়ে বললে—জেন্টস্ সাইকেল বলেই এই পোশাকটা পরলাম—এতে অন্য কোনো উদ্দেশ্য কিন্তু নেই আমার, মেটাজী—

আমি একবার বললাম—এত রাত্রে আর নাই-বা বেরুলেন, মিসেস স্বামীনাথন—

—ভয় ? ভয়ের কথা বলছেন ?

মিসেস স্বামীনাথন হেসে উঠলো। বললে—এর চেয়েও অ্যাড্‌ভেঞ্চারাস কত কাজ আমায় জীবনে করতে হয়েছে···আর তা ছাড়া আপনি মেয়েমানুষ হলে বুঝতেন, মেটাজী—হাসব্যান্ড যদি মনের মতো না হয়, তার চেয়ে বড় অশান্তি মেয়েদের জীবনে আর কিছু নেই—

তার পর সাইকেলের প্যাডেলে একটা পা রেখে বললে—এ ছাড়াও আপনার তিন মাসের বাড়িভাড়া বাকি পড়ে আছে, টাকার অভাবেই দিতে পারা যায়নি—কথা ছিল এই টাকাটা পেয়ে ওটা মিটিয়ে দেব—কিন্তু আজ যদি সবটাই উড়িয়ে দেয়, কী সর্বনাশ হবে বলুন তো মেটাজী—হয়তো আমি গিয়ে পড়লে কিছু টাকা অন্তত বাঁচলেও বাঁচতে পারে—

সাইকেলে উঠতে যাচ্ছিল মিসেস স্বামীনাথন।

আমি বললাম—কিন্তু এমনও তো হতে পারে, হ্যারি হয়তো মদের দোকানে নেই—অন্য কোথাও···

'কিংসওয়ে' হোটেলে হ্যারি স্বামীনাথনকে যে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান মেয়ে ন্যান্‌সীর সঙ্গে মদ খেতে দেখছি সে-কথাটা বলতে গিয়েও বলতে পারলাম না আমি।

কিন্তু প্রখর-বুদ্ধি মিসেস স্বামীনাথন আমার কথার তাৎপর্য ধরে ফেলেছে এক নিমেষে। কথাটা শুনে যেন হঠাৎ তার মুখ দিয়ে কোনো উত্তর বেরুল না। যেন নিজেকে তার পরাজিত মনে হলো, কিন্তু তা মুহূর্তের জন্য। বললে—আপনি যা ভাবছেন তা হতে পারে না, মেটাজী—হতে পারে না, কখনও হতে

পারে না—ওই হ্যারি তিনবার সুইসাইড করতে গিয়েছিল আমার জন্যে, ও জানে আমি ওর জন্যে কী-ই না স্যাক্রিফাইস্ করেছি…হ্যারি অমন আনফেথফুল হতে পারবে না—এখনও যে রাত্রে আমি পাশে না শুলে ওর ঘুম আসে না… কিন্তু…

কথাটা বলে কিন্তু তখনও খানিক চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল মিসেস স্বামীনাথন। মনে হলো যেন হঠাৎ এক বিদ্যুৎ-ঘোষিত মৌসুমী ঝড় তার মনের আকাশে বইতে সুরু করেছে, তার পর কেউটে-সাপের মতো ফণাটা হঠাৎ বিস্তার করে বললে—আপনি ঠিক বলেছেন…সত্যিই তো কিছুই অসম্ভব নয়… সাইকেলটা একবার ধরুন তো মেটাজী—

মিসেস স্বামীনাথন হঠাৎ নিজের ঘর থেকে বারো-বোরের বন্দুকটা বার করে নিয়ে এল। আমি তখন বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেছি। বন্দুকটা কাঁধে ঝুলিয়ে দিয়েছে মিসেস স্বামীনাথন শরীরের বাঁ দিকে।

সেই অবস্থায় সাইকেলটা আমার হাত থেকে নিয়ে বললে—আমাকে একটা এল-জি ধার দিতে পারেন, মেটাজী—

—কেন, এল-জি কী করবেন ?

—আগে দিন, তার পরে বলবো—একটু শীগ্‌গির করুন মেটাজী—

দীনদয়ালকে বলে আমার বাক্স থেকে একটা এল-জি কার্ট্রিজ আনিয়ে দিলাম মিসেস স্বামীনাথনের হাতে।

—এবার বলুন এল-জি কী করবেন ?— আবার জিজ্ঞেস করলাম আমি।

মিসেস স্বামীনাথন বললে—হ্যারির জন্যে আমারও সারাদিন কিছু খাওয়া হয়নি, কিন্তু গড্ ফরবিড্ আপনার কথা যদি সত্যিই হয়, মেটাজী, তখন আমি কী করবো ! হ্যারিকে গুলী করা ছাড়া আমার কী উপায় আছে বলুন—ওর মদ খাওয়া আমি তবু টলারেট করেছি, কিন্তু মেয়েমানুষ জড়িত থাকলে আমি ওকে ক্ষমা করবো কী করে, মেটাজী—ওকে আমি খুন করবো এই আপনাকে বলে রাখছি—ওর সঙ্গে যদি মেয়েমানুষ থাকে তো ওকে আমি খুন করবো—হাতিয়ার সঙ্গে রাখলুম—যাতে দেরি না হয়—

তার পর একটা কথাও না বলে সাইকেলে উঠে মিসেস স্বামীনাথন অন্ধকারে অন্তর্হিত হলো।

বুড়ো টি-আই এস্টনি বললে—স্প্লেনডিড্, মিস্টার মেটা, স্প্লেনডিড্—তার পর—

মুদেলিয়ার স্টেশনমাস্টার বললেন—আমার ছোট ছেলের পড়ার বইতে পড়ছিলাম 'ট্রুথ ইজ স্ট্রেঞ্জর দ্যান ফিকশন'—কথাটা নেহাত মিথ্যে নয় তা হলে—

সোনপার সাহেব বললেন—জীবন সম্বন্ধে আর কতটুকু অভিজ্ঞতা আপনার

মুদেলিয়ার গারু, চোদ্দ বছর বয়েসে রেলে ঢুকেছেন, খেয়েছেন চারুপানি আর ঘষতে ঘষতে আজ বিলাসপুরের স্টেশনমাস্টার—ভাবছেন চরম স্যালভেশন পেয়ে গেছেন—কিন্তু জীবনের জানলেন কী—একটু মদও খেলেন না—একদিন অফিস কামাইও করলেন না, কখনও বে-নিয়মও করলেন না জীবনে—

গুরুবচন মেটা বললেন—অন্য কথা থাক, গল্পটা শেষ করে নিই—রাত অনেক হয়ে গেল···

ইন্‌স্টিটিউটের সমস্ত ঘর অন্ধকার। পেন্ড্রা রোডের দিক থেকে একটা মাল-গাড়ি ক্লান্ত গতিতে আসছে। দূরে লোকো-শেডের দেওয়ালে ইঞ্জিন-গর্জনের প্রতিধ্বনি বারবার রেল-কলোনির নিস্তব্ধতা ভেঙে দেয়। প্লাটফরমের চায়ের দোকানটি পর্যন্ত এখন বন্ধ হয়ে গেছে। জুন মাসের মাঝামাঝি হয়ে গেল কিন্তু মনসুন এখনও শুরু হলো না।···

—তার পর সেই রাত্রে ওপরে নিজের ঘরে শুয়ে-শুয়ে অনেকবার ভেবেছি। ভেবেছি—'কিংসংয়ে' হয়তো এতক্ষণ বন্ধ হয়ে গেছে। হ্যারি সেখানে নেই। হয়তো ন্যান্‌সীর সঙ্গে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছে। কিন্তু বাঙালী মেয়ে মিসেস স্বামীনাথনের একী ভয়াবহ কান্ড। সারাদিন হ্যারির নাওয়া-খাওয়া নেই তাই মিসেস স্বামীনাথনও উপোস করেছে সারাদিন। তার পরে এই ক্লান্ত উত্তেজিত অবস্থায় এত রাত্রে বারো-বোরের বন্দুক আর ধার-করা এল-জি কার্ট্রিজ নিয়ে পরের সাইকেল চড়ে স্বামীর খোঁজে মদের দোকানে দেখতে যাওয়া—এ-নিয়ে যদি কেউ গল্প লেখে তো মনে হবে গাঁজাখুরি, কিন্তু নিজের চোখেই তো দেখলাম। আমার মনে হলো—আর কোনো দেশের মেয়েরা এমন করে এমন অবস্থায় বেরুতে পারতো না, এক বাঙালী মেয়েরা ছাড়া। আর আমার নিজের জাত শিয়ালকোট-গুজরানওয়ালার মেয়েদের কথা জানি—তারা ওই দূর থেকেই যা—

সে যা হোক—সে-রাত্রে অনেকক্ষণ বিছানায় শুয়ে শুয়েই জেগে থাকবার চেষ্টা করেছিলাম—ওদের ফেরার খবর পাব বলে। হ্যারি রাত্রে ফিরবেই এমন ধারণা আমার ছিলই। অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান মেয়ে ন্যান্‌সী সঙ্গে থাকলেই শুধু বিপদ ঘটবে তাও জানতাম। আর এ-ও জানতাম হ্যারিকে খুন করতে পেছপাও হবার মতো মেয়ে মিসেস স্বামীনাথন নয়। কারণ হ্যারিকে মিসেস স্বামীনাথন যেমন গভীর করে ভালোবাসে তেমন করে ক'জন মেয়েমানুষ তাদের স্বামীকে ভালোবাসতে পারে ?

কিন্তু কোথা দিয়ে কখন সে-রাত্রে চোখে ঘুম নেমে এল টের পাইনি। পরের দিনও আবার সকাল হবার আগেই জব্বলপুর ছেড়ে ভোরের ট্রেন ধরে ভুসাওয়াল যেতে হলো।

কয়েকদিন পরে যখন ফিরে এলাম 'শিয়ালকোট নজ'-এ, তখন সে-প্রসঙ্গ বাসী হয়ে গেছে। সুজাতা স্বামীনাথনকে দেখি সাইকেল চড়ে বেতের বাস্কেটে করে

বাজার করে আসে। তারপর হ্যারি স্যুট্ টাই প'রে সাইকেল-রিক্সায় চড়ে কোথায় বেরিয়ে যায়। আবার ফেরে অনেক রাত্রে, একটা টিমটিম আলো জ্বালিয়ে সাইকেল-রিক্সায় চড়ে।

সেদিন সেই রাত্রে তবে কি হ্যারিকে 'কিংসওয়ে'তেই পাওয়া গিয়েছিল? ন্যান্সী কি ছিল না সঙ্গে? আমার ব্যাচিলর মনে এসব প্রশ্ন মাঝে মাঝে আলোড়ন করতো।

সেদিন সুজাতা স্বামীনাথন সোজা চলে এল ওপরে আমার এলাকায়।

বললে—একটা কথা আপনাকে বলতে এসেছিলাম—মেটাজী—

বললাম—বসুন, আমারও অনেক কথা আছে আপনার সঙ্গে—আপনার কথাটাই আগে বলুন—

সুজাতা বললে—তাই বলি। আপনার সেই এল-জি কার্ট্রিজটা আমার কাছেই রয়েছে—কাজে লাগেনি—ওটা এখনও কিছুদিন থাক আমার কাছে—দরকার না হলে ফিরিয়ে দেব আপনাকে—আপত্তি নেই তো—

বললাম—এবার আমার কথাটা বলি—সেদিন রাত্রে আপনাকে বন্দুক-হাতে একলা ছেড়ে দিয়েছিলাম—পরে মনে হলো সঙ্গে গেলে হতো—ঝোঁকের মাথায় কী হয়তো করে বসবেন—দায়িত্ববোধ সম্বন্ধে আমার এখনও ভালো জ্ঞান হলো না, মিসেস স্বামীনাথন—

সুজাতা বললে—দেখুন, হ্যারিকে যদি আমি কোনওদিন খুন করি তো সে একা আমার দায়িত্বে—এ ব্যাপার সম্পূর্ণ আমার আর হ্যারির, এতে কোনও থার্ড পারসন নেই—

বললাম—আপনি কি সত্যই ও-বিষয়ে সিরীয়স—

—নিশ্চয়ই। আপনি জানেন না মেটাজী, আমি অন্য বাঙালী মেয়ের মতো মানুষ হইনি—আমার শিক্ষা-দীক্ষা সব আলাদা—সেদিন রাত্রে হ্যারির খোঁজে বেরিয়েছিলাম আপনার সাইকেল আর এল-জি নিয়ে, ভাববেন না ঠাট্টা করতে বা ভয় দেখাতে—আমি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি হ্যারি কখনও বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে না—ওই মদের ওপরেই যা দুর্বলতা আছে ওর—আর কোনোকিছুতে নেই, মেটাজী—হ্যারি মিছে কথা বলবার লোক নয়—কিন্তু যদি···

বললাম—সেদিন শেষ পর্যন্ত কোথায় দেখা পেলেন ওর—

সুজাতা স্বামীনাথন বললে—ও বাড়ির দিকেই আসছিল—সারাদিন সেই মোটর বিক্রি নিয়ে এমন পরিশ্রম গিয়েছিল যে, বাড়িতে এসে খাবার সময় পর্যন্ত পায়নি—তবে স্বীকার করলে ও যে মদ খেয়েছিল—এই নিন চার মাসের বাকী ভাড়া—একটা রসিদ সময়মতো পাঠিয়ে দেবেন—

কী জানি কেন তখনও সেই অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান মেয়ে ন্যান্সীর কথাটা মুখ ফুটে বলতে পারলাম না।

কিন্তু যাবার সময় সুজাতা বললে—কিন্তু এ-ও বলে রাখছি মেটাজী, যদি কোনোদিন আমি চাক্ষুষ প্রমাণ পাই, সেদিন আমি হ্যারিকে……আমার ওই বারো-বোরের বন্দুকে এল-জি লোড্ করে রেখেছি—ওকে আমি খুন করবোই—আপনিই সেদিন আমার প্রথম চোখ খুলিয়ে দিয়েছেন—

বললাম—না না, মাফ করবেন সুজাতা-বাঈ, আমি কিছুই জানি না, আমি কিছুই দেখিনি—

সুজাতা স্বামীনাথন বললে—না, শুধু আপনি নন, আরো অনেকের কাছে আমি শুনেছি যে, হ্যারিকে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান মেয়েদের সঙ্গে নানা জায়গায় দেখা যায়, কিন্তু আমি নিজে যদি কোনওদিন চোখে দেখতে পাই তো খুন করবো ওকে। আমি আমার বাবা মা ভাই বোন আর বাবার প্রচুর সম্পত্তি পায়ে ঠেলে শুধু ওর টানে চলে এসেছি। শেষকালে সেই হ্যারি যদি আন্‌ফেথফুল হয় তা হলে…সে আপনি ব্যাচিলর মানুষ ঠিক বুঝবেন না ··

গুরুবচন মেটা আবার আরম্ভ করলেন—ঈশ্বরের কী ইচ্ছে ছিল কে জানে। ঠিক তার পরদিনই সেই কাণ্ডটা ঘটলো। সেদিনও জুন মাস, মনসুন আরম্ভ হয়নি। চুপচাপ ওপরের পশ্চিমমুখো বারান্দায় বসে আছি। কোনো কাজ নেই হাতে। সামনে বাগান পেরিয়ে বি-এন-আরের আমবাগানের দিকে চেয়ে ছিলাম। আস্তে আস্তে সন্ধ্যে হয়ে এল। দীনদয়াল একগ্লাস ঠাণ্ডা মাঠা দিয়ে গেছে। তাও খাওয়া শেষ করে খালি গেলাসটা পাশের চেয়ারের ওপর রেখে দিলাম। স্যান-ভিলার দিকে হাওবাগ স্টেশনে বুঝি কোনো মালগাড়ি এল। ওদিকের আকাশটা ইঞ্জিনের ধোঁয়ায় কালো হয়ে আসছে। আমার সামনে বাগানের দিকে চেয়ে দেখলাম, সুজাতা স্বামীনাথন সাইকেল চড়ে চৌক থেকে ফিরলো মার্কেটিং করে। ওপরদিকে চাইতেই দুজনে উইশ্ করলাম। তার পর আধঘণ্টাও কাটেনি, দেখি একটা সাইকেল-রিক্স আসছে আমারই 'শেয়ালকোট লজ' লক্ষ্য করে। দূরে থাকতে দেখতে পাওয়া যায়নি। গেট-এর মধ্যে সাইকেল-রিক্সটা ঢুকতেই নজরে পড়লো হ্যারি একলা নয়। প্রচুর মদ খাওয়ার জন্যে নিজে একেবারে অর্ধ-বেহুঁশ, আর সঙ্গে সেই ন্যান্‌সী—অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান মেয়ে। সে-ও প্রকৃতিস্থ বলে মনে হলো না।…

নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস হলো না। এখানে ন্যান্‌সীকে নিয়ে এল কেন? তবে হয়তো ওর খেয়াল নেই। দুজনে 'কিংসওয়ে' থেকে বেরিয়ে কোথায় যেতে কোথায় চলে এসেছে। কিংবা হয়তো পুরনো রিক্সওয়ালা। রোজকার অভ্যাসমতো বাড়িতে নিয়ে চলে এসেছে। ওরা দুজনে জানে না, কোথায় কোন্ বাড়িতে এসে ওদের নামিয়েছে রিক্সওয়ালা—

উত্তেজনার সমস্ত নার্ভ আমার শিথিল হয়ে এল। এখনি যে বিপদ ঘটবে, তা ওরা কেউ জানে না। অথচ কালকেও আমার কাছে সুজাতা স্বামীনাথন যে

প্রতিজ্ঞা করে গেছে—ও মেয়ে তো সে-কথা ভোলবার নয়!

মাথা থেকে পা পর্যন্ত আমার থরথর করে কাঁপতে লাগলো। মনে হলো, এখনি একতলায় একটা প্রচণ্ড শব্দ হবে আর তার পর দুটো না হোক, একটা লাইফ সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে যাবে। ঠিক 'এইম্‌' করে মারতে পারলে একটা টাইগা-রের লাইফ-এর পক্ষেও একটা এল-জি যথেষ্ট।

কথাটা মনে পড়তেই আরো আতঙ্ক হলো আমার। ওটা তো আমার এল-জি। যদি প্রমাণ হয়, আমিই সুজাতাকে ও এল-জি'টা দিয়েছি, তা হলে মার্ডার চার্জে তো আমিও পড়বো। হ্যারির বডি থেকে যদি এল-জি'টা বেরোয়। তার পর সুজাতা স্বামীনাথনের সঙ্গে ব্যাচিলর বাড়িওয়ালা গুরুবচন মেটার একটি কল্পিত সম্পর্ক খাড়া করে দিয়ে হ্যারি স্বামীনাথনকে খুনের অপরাধের···

আর ভাবতে পারলাম না।

কান পেতে রইলাম উদ্‌গ্রীব হয়ে। নীচেয় ওদের তুমুল ঝগড়া চলেছে। মাঝে মাঝে সুজাতার গলা। তারপর হ্যারির। হ্যারি মদ খেলেও মনে হলো যেন সেন্স ঠিক আছে তার। এইবার বুঝি সুজাতা স্বামীনাথনের বারো-বোরের বন্দুকটা প্রচণ্ড শব্দে ফেটে উঠবে···

গুরুবচন মেটা থামলেন।

আজাইব সিং বললেন—থামলেন কেন, মেটাজী—

বুড়ো টি-আই এস্টনি বললে—শেষ হয়ে গেল নাকি—

সোনপার সাহেব বললেন—বন্দুকের শব্দটা শেষ পর্যন্ত হলো কিনা বলুন মেটাজী, আর দেরি করবেন না—

মুদেলিয়ার বললেন—সুজাতা কি দুইজনকেই মারলো, না, একজনকে মারলো—

সোনপার সাহেব বললেন—আপনার যেমন চারুপানি-খাওয়া বুদ্ধি, মুদেলি-য়ার গারু! এল-জি তো একটা শুনে আসছেন। দুজনকে মারবে কী করে—

মুদেলিয়ার বললেন—তবে কি নিজেই আত্মহত্যা করলো নাকি সুজাতা? বড় সমস্যায় ফেলেছেন—উঃ—

গুরুবচন মেটা মিটিমিটি হাসতে লাগলেন। বললেন—আপনারা এ-কাহিনীর যত কিছু পরিণতি ভাবতে পারেন ভাবুন, কিন্তু আমার ধার-কাছ দিয়েও ঘেঁষতে পারবেন না, এই আমি বলে দিলাম।

টি-আই বুড়ো এস্টনি সামনে মুখ এগিয়ে নিয়ে এসে বললে—আর বাজে কথা বলবেন না স্যার, শেষটা বলে দিন দয়া করে—

গুরুবচন মেটা বললেন—আপনাদের আমি গোড়াতেই বলেছি যে, গল্পটা যেখানে আমি শেষ করবো তার পরে আমাকে আর কেউ কোনও প্রশ্ন করতে

পারবেন না। আপনারা জানেন বোধ হয় যে, গল্প যেখানে শেষ হয়, জীবন সেখানে শেষ হয় না। জীবন বিস্তীর্ণ ব্যাপক, কিন্তু গল্প জীবনকে ভিত্তি করে গড়ে উঠলেও এক জায়গায় তার ক্লাইম্যাক্স আছে। সেখানে এসে গল্পে দাঁড়ি টানতে হয়। আমার সেই শর্ততে আপনারা রাজী হয়েছিলেন, মনে আছে বোধ হয়···যা হোক এখনই শেষ অধ্যায়টা বলি···

একটু থেমে মেটাজী বলতে লাগলেন—সেই রকম উদ্‌গ্রীব হয়ে বারান্দায় ছটফট করছি, কী হবে, কী হবে! ভাগ্যিস দীনদয়াল বাড়ি ছিল না, চৌকে গিয়েছিল ভঁইষের খড় কিনতে, নইলে সে-অবস্থায় আমাকে দেখলে হয়তো পাগল ভাবতো। তার আসতে প্রায় একঘণ্টা দেরি। হঠাৎ মনে হলো নীচেকার গোলমাল যেন থেমে এল।—পাশের সিঁড়িতে কার পায়ের শব্দ শুনতে পেয়ে মুখ ফিরিয়ে যা দেখলাম, তাতে অবাক হয়ে গেছি! আর কেউ নয়। মিসেস স্বামীনাথন দৌড়ুতে দৌড়ুতে ওপরে উঠছে। মুখখানা লজ্জায় ঘৃণায়, পরাজয়ের কলঙ্কে অপমানে একেবারে থ্যরোলি অন্যরকম দেখাচ্ছে, চোখ ফেটে জল বেরুবে এখনি—

সুজাতা স্বামীনাথন আমাকে কথা বলবার অবসর দিলেনা পর্যন্ত। ছুটে এসে আমার হাত ধরে এক হ্যাঁচকা টান দিয়ে বললে—দেখেছেন তো হ্যারির কাণ্ড—

তার পর আমাকে টানতে টানতে বললে—কাম্ অন্ মেটাজী, কাম্ অন—

আমি হতবাক্ হয়ে সুজাতা স্বামীনাথন-এর পেছনে চলতে লাগলাম···

তার পর আমার শোবার ঘরে আমাকে ঢুকিয়ে দিয়ে বললে—মেটাজী, আই মাস্ট বি আন্‌ফেথফুল, আই মাস্ট বি আন্‌ফেথফুল, আমি···আমি এর প্রতিশোধ নেব··· বলে একমুহূর্তে ঘরের একমাত্র দরজাটা বন্ধ করে সজোরে খিল লাগিয়ে দিলে।

পুতুল দিদি

এতদিন পরে যে আবার পুতুল দিদির কথা মনে পড়লো, এ পুতুল দিদির মেয়ের বিয়ে বলে নয়। কিংবা তার মেয়ের বিয়েতে এত পুলিশ পাহারার বন্দোবস্ত হয়েছে বলেও নয়। মনে পড়ার আরও একটি কারণ আছে।

কারণটা পরে বলবো।

পুতুল দিদিকে জানি খুব ছোটবেলা থেকে। ছোটবেলায় পুতুল দিদির ওপর ভার পড়তো আমার তদারকের।

বাবার চাকরিতে খুব ঘন ঘন বদলি হতো তখন। আজ মীরাট, কাল দিল্লী, পরশু জব্বলপুর, আবার তার পরদিনই হয়তো কলকাতা। বদলি হবার মুখে বাবা আমাদের সবাইকে মামার বাড়িতে রেখে একলা চলে যেতেন। তারপর বাড়ি বা কোয়ার্টার ঠিক করে আবার আমাদের নিয়ে যেতেন সেখানে।

তা এইসূত্রে বড় ঘন ঘন মামার বাড়ি যাওয়ার সুযোগ ঘটতো আমাদের।

মামার বাড়িতে গেলেই আমার ভার পড়তো পুতুল দিদির ওপর। তা শোয়ানো, খাওয়ানো, জামা পরিয়ে বেড়াতে পাঠানো—সমস্ত করতো পুতুল দিদি। আমার অন্য ভাইবোনদের নিয়ে ব্যস্ত থাকতো মা। তাই যে-ক'দিন মামার বাড়ি থাকতাম, সে-ক'টা দিনই পুতুল দিদির হেপাজতে থাকতে হতো।

মনে আছে দালানে সবাই সার সার শুয়ে আছি। মাঝরাত্রে আমার ঘুম ভেঙেছে। ভয়ে আমার বুক শুকিয়ে গেছে। ডাকলাম—পুতুলদি…

ডাকতে গিয়েও যেন গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোচ্ছে না। যদি ধমক দেয়! যদি মারে! পুতুল দিদি মারতো খুব। মেরে আমার গালে পিঠে বুকে একেবারে পাঁচ আঙুলের দাগ বসিয়ে দিত।

বলতো—পিসিমা, তোমার বড় ছেলেটাকে একেবারে বাঁদর করে তুলেছ—

মনে আছে, যখন আমার খুব অল্প বয়েস, পুতুল দিদিকে যেন ফ্রক্ পরতে দেখেছি। স্মৃতির সিন্দুক খুললে এখনও অস্পষ্ট আবছা-আবছা সে-চেহারাটা মনে পড়ে। খুব মোটা-মোটা গোলগাল থলথলে চেহারা ছিল তখন। আর ধবধব করছে গায়ের রং। আমাকে কোলে করে নিয়ে বারান্দায় এ-পাশ থেকে ও-পাশ ঘুরতো। তারপর সেই পুতুল দিদি শাড়ি পরতে শুরু করলে। তখন গায়ের থলথলে ভাবটা কমে গেছে। রংটা আরো উজ্জ্বল হয়েছে। গায়ে আরো জোর হয়েছে। পুতুল দিদি একটা চড় মারলে সমস্ত মাথাটা আমার ঝিমঝিম করতো।

কিন্তু যত বিপদ হতো রাত্রে। পুতুল দিদি আমার পাশেই শুতো।

ঘুমোতে ঘুমোতে কখন আমার গায়ে পা তুলে দিয়েছে খেয়াল নেই। কিন্তু তবু নড়তে পাবো না।

পুতুল দিদি মাকে বলতো—পিসিমা, জানো, যত দুষ্টুমি ওর রাত্রে—

সত্যি, রাত্রেই আমার কেমন একলা কলতলায় যেতে ভয় করতো। সমস্ত বাড়িটা তখন নিষুতি। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। আশেপাশে ভাইবোনদের নিশ্বেস ফেলবার শব্দ আসছে। আবার একবার আস্তে আস্তে ডাকতাম—পুতুলদি…

শেষ পর্যন্ত যখন কলতলায় নিয়ে যেত আমাকে, তখন রাগের চোটে আমার ওপর দুমদুম করে কিল বসিয়ে দিত।

বলতো—রাত্তিরে যে একটু ঘুমবো তারও উপায় নেই তোর জ্বালায়—

এমনি প্রতিদিন।

আবার বলতো—আজ যদি রাত্তিরে আবার উঠিস তো, কাল তোকে কিছু খেতে দেব না, উপোস করিয়ে রাখবো—দেখিস ঠিক—

কিন্তু তার পরেই বিকেলবেলা যখন জামা-কাপড় পরিয়ে পার্কে বেড়াতে পাঠাতো ঝি-এর সঙ্গে, তখন সে এক অন্য চেহারা। পাউডার স্নো মাখিয়ে, কপালে একটা খয়েরের টিপ পরিয়ে দিয়ে আমার কড়ে-আঙুলের ডগাটা আলতো করে কামড়ে দিয়ে ছেড়ে দিত।

বলতো—সন্ধ্যেবেলা পড়তে বসতে হবে কিন্তু। মনে থাকে যেন—

কিন্তু আমাকে ভালো-ও বাসতো খুব পুতুল দিদি। কেউ আমাকে বকলে কি মারলে পুতুল দিদি এগিয়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

বলবে—পল্টুর ওপরে তোদের এত গায়ের জ্বালা কেন রে—ও তোদের কী করেছে রে শুনি—

এমনি করে মীরাট থেকে জব্বলপুর, জব্বলপুর থেকে কাট্‌নি, কাট্‌নি থেকে কোথায় কোথায় বাবার সঙ্গে আমরাও বদ্‌লি হয়ে চলতে লাগলুম। আর মাঝে মাঝে এক এক বার প্রায় পাঁচ-ছ'মাসের মতো মামার বাড়ি গিয়ে থাকি।

তখন পুতুলদি আরো বড় হয়েছে। ভালো ভালো শাড়ি পরে। গায়ে সাবান মাখে, এসেন্স মাখে। পুতুল দিদি যখন আদর ক'রে কাছে টেনে নেয়, আমি বুক ভরে এসেন্সের গন্ধ শুঁকি। পুতুল দিদির কাছে-কাছে থাকতে ভালো লাগে। পুতুল দিদির পুতুলের বাক্সতে হাত দিতে দেয় তখন। বেড়াতে যাবার আগে সাজিয়ে গুছিয়ে দিয়ে এক এক দিন একটা আধলা দেয়। বলে, কাউকে বলিসনি পল্টু—তোকে আমি এমনি দিলুম—

আমি আবার সেই আধলা দিয়ে হয়তো চিনেবাদাম কিনে এনে লুকিয়ে লুকিয়ে দিতুম পুতুলদিকে।

পুতুলদি বলতো—আজ লালার দোকানের কচুরি আনতে পারবি, পল্টু—

বলতুম—কেন পারবো না—

—কাউকে বলবিনা বল্—

বলতুম—না, সত্যি বলছি কাউকে বলবোনা পুতুলদি—

—মাইরি বল্, মা কালীর দিব্যি বল্—

তাই বলতাম। শেষে সেই গরম গরম তেলেভাজা হিঙের কচুরি নিয়ে এসে ছাদের ওপরে চিলেকুঠুরির কোণে বসে দুজনে খাওয়া।

এমনি করে কতবার কতরকম নিষিদ্ধ খাওয়া খেয়েছি দুজনে। কেবল আমি আর পুতুল দিদি। পুতুলদি আমার চেয়ে পাঁচ-ছ' বছরের বড়। তবু আমাদের বন্ধুত্বে বাধেনি কোথাও।

একবার মামার বাড়িতে গিয়ে দেখলুম পুতুলদি আরো বড় হয়েছে। ইস্কুলে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। আমাকে পেয়ে পুতুলদি যেন একটা কাজ পেলে হাতে। পুতুল-খেলা তখন ছেড়ে দিয়েছে। বই পড়ে খালি। লুকিয়ে লুকিয়ে বই পড়ে। আমি গিয়ে বই নিয়ে আসি পাশের বাড়ি থেকে চেয়ে-চেয়ে। পুতুলদির পড়া হয়ে গেলে আবার ফিরিয়ে দিয়ে আসি। বেশির ভাগ সময় পুতুলদি ছাদের ওপরে বসে বসে পড়তো।

পুতুলদি একমনে পড়তো আর আমি বসে পাহারা দিতাম।

পুতুলদি বলতো—ওখানে সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে থাক্, কেউ এলেই আমাকে বলে দিবি—

সিঁড়িতে কারও পায়ের শব্দ হলেই আমি ইংগিত করতাম পুতুলদিকে, আর পুতুলদি বইটা লুকিয়ে ফেলতো কাপড়ের মধ্যে। তখন একেবারে ভালোমানুষ যেন। পুতুলদি এক এক সময় গান গাইতো গুনগুন করে। আর আমি হাঁ করে শুনতাম। গানের খাতায় কত যে গান লেখা ছিল পুতুল দিদির! পুতুলদির বিছানার তলায় সে-সব লুকোনো থাকতো। এক আমি ছাড়া আর কেউ জানতো না সে-কথা।

আমাকে কেবল সাবধান করে দিত পুতুল দিদি—খবরদার, আমি যে গান গাই, বই পড়ি—কাউকে বলবিনে—বললে তোর হাড় মাস আর আস্ত রাখবো না কিন্তু—

তা পুতুল দিদির পক্ষে সবই সম্ভব। প্রত্যেক কথাতেই মারতো আমাকে। বেড়াতে গিয়ে হয়ত প্যান্ট-এ ময়লা লেগেছে, দেখামাত্র মার! পুতুল দিদি নিজে গান গাইতো বটে, কিন্তু আমি গাইলে আর রক্ষে নেই।

বলতো—খুব যে ওস্তাদ হয়ে গেছিস পল্টু—এই বয়েসেই গান ধরেছিস—

কিংবা হয়ত বলতো—বখাটে ছেলেদের সঙ্গে মেশা হয়, না? তোমার আড্ডা মারা আমি বন্ধ করছি—

কখনও হয়ত গাল টিপে দিয়ে বলতো—লুকিয়ে লুকিয়ে আমার বই পড়ছিলি—এই বয়েসেই নবেল পড়া দেখাচ্ছি তোমার—

কিন্তু সেবার এক কাণ্ড হলো।

হঠাৎ মামাবাবু আপিস থেকে বাড়ি এল একদিন দুপুরবেলা। আমি তখন ঘুমোচ্ছি। মামীমা জেগে ছিল বোধহয়। একটা আচমকা শব্দে আমার ঘুম ভেঙে গেল। উঠে দেখি একতলায় মামাবাবু পুতুলদিকে খুব মারছে। সে কী মার! দেখে আমার কান্না পেতে লাগলো। পুতুলদি চুপ করে মার সহ্য করছে। আর মামাবাবু বেত দিয়ে পিঠের ওপর সপাং সপাং করে মারছে। মারতে মারতে পিঠ দিয়ে রক্ত পড়তে লাগলো।

সবাই এসে কাছে ভিড় করে দাঁড়ালো। কিন্তু কেউ কিছু বলছে না। মামাবাবুর সামনে কারও কথা বলার সাহস নেই। মামীমাও হাত গুটিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মা-ও হতভম্ব হয়ে গেছে। আমরা ভাইবোনরা সব ভয়ে নির্বাক হয়ে দেখছি।

মামাবাবু বললে—আজ আমি ওকে আস্ত রাখবোনা আর—ও মেয়ে মরে যাওয়াই ভালো—

মামীমা কাঁদছিল। বললে—ও মেয়ে আমার একদিন মুখ পোড়াবে ঠিক, দেখে নিও তোমরা—

মা বললে—চেঁচিও না বউ, লোক জানাজানি হলে আমাদেরই মুখ পুড়বে—ওর আর কী—

মামীমার কান্না তখনও থামেনি। বলতে লাগলো—এইটুকু মেয়ের পেটে পেটে এত বুদ্ধি মা, আমি কতবার বলেছি বিয়ে দিয়ে দাও ও-মেয়ের—তখন কেউ কথা শুনলে না আমার,—এখন হলো তো—

মা বললে—দিনকাল খারাপ পড়েছে বউ, এ হাওয়ার দোষ, আমার পল্টু হয়েছে ওই বয়েসে—বিয়ে দিলে ও-মেয়ে তিন ছেলের মা হতো এতদিনে—

তা পুতুলদির বয়েস তখন তেরো, আর আমার বয়েস সবে আট।

সেই তেরো বছর বয়েসের পুতুল দিদি সেদিন কী অপরাধ করেছিল বুঝিনি, কিন্তু যে-শাস্তিটা পেয়েছিল তা এখনও মনে আছে। মনে আছে, সেদিন কয়লা রাখবার একটা ঘরে সারাদিন বন্দী হয়ে থাকতে হয়েছিল পুতুল দিদিকে; খেতে দেওয়া হয়নি, ঘুমোতে পায়নি। এক গ্লাস জল পর্যন্ত দেওয়া হয়নি সেদিন পুতুল দিদিকে। আমার বারবার মনে হচ্ছিল পুতুল দিদির কথা। কান্না পেয়েছিল পুতুল দিদির অবস্থা ভেবে। কিন্তু ভয়ে কয়লার ঘরটার কাছে যেতে পারিনি একবারও। যদি কেউ দেখতে পায়!

পরের দিন পুতুল দিদিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম—ওরা তোমাকে অত মারলে কেন পুতুল দিদি? কী দোষ করেছিলে তুমি?

পুতুল দিদি ভীষণ রেগে গিয়েছিল,—বললে—তোর অত খবরে দরকার কী রে—বড় জ্যাঠা হয়েছিস তো তুই—লেখাপড়া নেই, খালি—

তারপরে পুতুল দিদির বিয়েতে আবার একবার এলাম মামার বাড়িতে। পুতুল দিদি তখন অনেক বড় হয়েছে। তখন বোধহয় বছর ষোলো বয়েস। ভারিক্কী হয়েছে চেহারা। বেনারসী আর চন্দনের টিপ পরে সে রীতিমতো অন্য চেহারা। বিয়ের দিন সন্ধ্যেবেলা চারদিকে আলো জ্বলছে। বাজনা বাজছে। লোকজন আত্মীয়-স্বজন। লুচিভাজার গন্ধ।

আমি পুতুল দিদিকে একলা পেয়ে এক ফাঁকে জিজ্ঞেস করলাম—তোমার ভয় করছেনা পুতুলদি ?

পুতুলদি ঠোঁট বেঁকিয়ে বললে—ভয় করতে আমার বয়ে গেছে—

বললাম—তুমি তো শ্বশুরবাড়ি চলে যাবে এবার—

পুতুল দিদি বললে—যাচ্ছি বৈকি—যাবোই তো—তোর কী রে—

কী জানি আমার যেন কেমন কষ্ট হচ্ছিল। সমস্ত বাড়ির কলকোলাহল আনন্দ-উৎসবের মধ্যে আমার মন যেন উদাস হয়ে যাচ্ছিল পুতুল দিদির কথা ভেবে। মামার বাড়িতে একটা মাত্র লোভ, একটা মাত্র আকর্ষণ ছিল—সে পুতুল দিদি। পুতুল দিদির হাতে মার খেতেও যেন কত আনন্দ! পুতুল দিদির গালাগালিও যেন কত মিষ্টি! মামার বাড়িতে এলে এবার থেকে কে সাজিয়ে-গুজিয়ে দেবে। কে পাহারা দেবে আমায়। আমি নভেল পড়ছি কিনা কে তীক্ষ্ন-দৃষ্টি রাখবে ? আমার ভালো-মন্দের জন্যে কে অত মাথা ঘামাবে ?

পুতুল দিদি তখন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে নিজের চেহারা দেখছিল। একবার এদিক একবার ওদিক। নতুন গয়না প'রে কেমন দেখাচ্ছে, তাই।

পুতুল দিদি বললে—দেখিস তো—কেউ যেন আসে না এদিকে—

বিয়েবাড়িতে রাজ্যের লোক। দরজা-জানলা বন্ধ করে দিলাম। কেউ আর দেখতে পাবে না! পুতুল দিদি আপন-মনে সাজগোজ করতে লাগলো চুপ করে। আমি যে একটা মানুষ তা যেন গ্রাহ্যই নেই। শাড়িটাকে ঘুরিয়ে বেঁকিয়ে নানা ভাবে নানান কায়দায় প'রেও সোয়াস্তি নেই। কিছুতেই যেন পছন্দ আর হয়না নিজেকে। নিজের রূপ নিয়ে নিজেই বিভোর। একবার ঘোমটা দিলে। একবার ঘোমটা সরিয়ে দিলে। একবার ঠোঁটে রং দিলে। আবার ঘষে রং মুছে ফেললে। কিছুতেই আর পছন্দ হচ্চে না।

শেষকালে আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলে—কেমন দেখাচ্ছে রে আমাকে—

পুতুল দিদির দিকে চেয়ে কিছু বলতে পারলাম না কিন্তু। আমার মনে হলো যেন অপূর্ব। উর্বশী, মেনকা, রম্ভা, জগদ্ধাত্রী, দুর্গা—সব নামগুলো একসঙ্গে মনে এল।

পুতুল দিদি বুঝতে পারলে। বললে—আমার দিকে অমন করে চাইছিস কেন রে—আমি না তোর দিদি হই—খবরদার, কিল মেরে পিঠ ভেঙে দেব—

ব'লে কথা নেই বার্তা নেই আমার পিঠে এক কিল বসিয়ে দিলে দুম করে।

বললে—এইসব শিক্ষা হচ্ছে, না ?···

বললাম—আমি কী করেছি—

—আবার কথা ? আমি বুঝিনা কিছু !—মেয়েমানুষের দিকে অমন করে তাকাতে আছে ?

পিঠের ব্যথায় আমার চোখ দিয়ে তখন জল গড়াচ্ছিল।

পুতুলদি বললে—আবার ছিঁচকাঁদুনি আছে ঠিক—বিদেশে থেকে থেকে এই-সব যত বদ শিক্ষা হচ্ছে—

আমার বড় অভিমান হয়েছিল সেদিন মনে আছে। খিল খুলে বাইরে চলে আসছিলাম।

পুতুল দিদি বললে—কোথায় যাচ্ছিস শুনি—

—বাইরে—

পুতুল দিদি হঠাৎ হাতটা ধরে এক টান দিলে। বললে—এইটুকু বয়েস থেকেই এত শয়তানি—যেতে হবে না বাইরে—একটা কাজ কর্—দাঁড়া এখানে—

তখন বেশ সন্ধ্যে হয়ে আসছে। এখনি বর আসবে। ঘরের বাইরে লোক-জনের গলা শোনা যায়। সবাই কাছে ব্যস্ত। এখনি বরযাত্রীরা এসে পড়বে। জামা-কাপড় প'রে সবাই তৈরি হয়ে নিয়েছি। পুতুল দিদি হঠাৎ একটা কাগজ নিয়ে চিঠি লিখতে বসল। একমনে কী-সব লিখলে খানিকক্ষণ। তারপর চিঠিটা খামে পুরে জিব দিয়ে খামের মুখটা ভিজিয়ে সেঁটে দিলে। বললে—এই চিঠিটা দিয়ে আয় তো—

আমি চিঠিটা নিয়ে চলে যাচ্ছিলাম।

পুতুল দিদি থামিয়ে দিলে। বললে—কাকে দিবি—

বললাম—তুমি যাকে বলবে—

—তবে শোন্, বড় রাস্তার মোড়ে যেখানে একটা জিউলিগাছ আছে, তার গায়ে একটা এতবড় ফোকর দেখবি, সেই ফোকরের মধ্যে তুই রেখে দিয়ে আসবি —পারবি তো ? কেউ যেন না দ্যাখে—

বললাম—কেউ দেখতে পাবে না—

—যদি কেউ দেখতে পায়—তা হলে ?

—তা হলে তুমি আমায় দশঘা কিল মেরো—

তখন আমার সমস্ত শরীর আনন্দে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে। পুতুল দিদির একটা জরুরী গোপন কাজ করতে পেরেছি। পুতুল দিদি আমায় বিশ্বাস করেছে। আমার আনন্দ আর ধরে না।

কিন্তু পুতুল দিদি এক কাণ্ড করে বসলো সেই মুহূর্তে। সেই আতর স্নো পাউডার, সেই নতুন সোনার-গয়না, সেই বেনারসী, জরি জড়োয়া নিয়ে হঠাৎ আমার মুখটা ধরে গালে একটা চুমু খেলে। আদরে পুতুল দিদির মুখের চেহারা

এক-মুহূর্তে অন্যরকম হয়ে গেল। বললে—লক্ষ্মী ভাইটি আমার—কেউ যেন না দ্যাখে, বুঝলি তো—

বললাম—কেউ দেখবে না, পুতুলদি—তুমি দেখে নিও—

—যদি ভালো মতন চুপি-চুপি দিয়ে আসতে পারিস চিঠিটা—তো আবার তোকে একটা চুমু দেব—

সেদিন চিঠিটা যথাস্থানে নিঃশব্দে গোপনেই রেখে এসেছিলাম। একবার কৌতূহল পর্যন্ত হয়নি কার নামে লেখা সে-চিঠি, কে সে-চিঠিটা নিলো বা কী-রকম তার চেহারা। তার সঙ্গে পুতুল দিদির কিসের সম্পর্ক। ন্যায় অন্যায় কোনও বিচারের চিন্তা মনে ঘেঁষেনি। যেন কর্তব্যটা সম্পাদন করতে পারলেই আমার পাওনা উপহারটা মিলবে—এইটেই ছিল আমার লক্ষ্য।

কিন্তু পুতুল দিদির কাছ থেকে সে-চুমু আমার আর পাওয়া হয়নি সেদিন। শুধু সেদিনই নয়—সে-পাওনা আমার বরাবরই বাকেয়া রয়ে গেছে। তার পর যখন দেখা হয়েছে···

কিন্তু সে-দেখা না হলেই বুঝি ভালো হতো।

পুতুল দিদি তো শ্বশুরবাড়ি চলে গেল। আর তার পরদিন আমরাও চলে গেলাম মীরাটে। বাবা তখন জব্বলপুর থেকে মীরাটে বদলি হয়েছিলেন। পরের বছরে গরমের ছুটিতে আর আসা হয়নি মামার বাড়িতে। দেয়ালির ছুটিতেও যাওয়া হলো না।

মনে আছে একদিন পোস্টকার্ড এল একটা।

মা চিঠি পেয়েই পড়তে লাগলো। আপিস থেকে বাবা এলে, বাবাকেও দেখালে।

চিঠি পড়ে বাবারও মুখের ভাব কেমন গম্ভীর হয়ে গেল। জামা-কাপড় ছাড়তে ভুলে গেলেন অনেকক্ষণ।

রান্না-বান্না পড়ে রইল মা'র। মা বললে—পোড়ারমুখী আমাদের বংশের নাম ডোবালে গো—এখনও যে দাদার দু'মেয়ের বিয়ে দিতে বাকি—

বাবা বললেন—আজকাল ছেলেমেয়েদের একসঙ্গে মেলামেশা তো এইজন্যেই পছন্দ করিনে—

মা বললে—অমন সব্বনেশে রূপ দেখেই বুঝেছিলাম কপালে ওর দুঃখ্যু আছে অনেক—রূপসী মেয়েরা কখনও সুখী হয় জীবনে—

রান্নাঘরে গিয়ে চুপি চুপি জিজ্ঞেস করলাম—কী হয়েছে, মা?

—কিসের কী রে?

—কার কথা বলছিলে তখন বাবাকে?

মা হঠাৎ রেগে গেল। বললে—তোমার সব কথায় কান দেওয়া কেন শুনি? নিজের লেখা-পড়া নেই?

কিন্তু কেন জানিনা মনে বড় ভয় হলো। মনে হলো নিশ্চয়ই পুতুল দিদির কিছু হয়েছে। রূপসী বলতে তো পুতুল দিদিকেই বোঝায়। অমন রূপসী আর মামার বাড়িতে কে আছে!

মা'র নামে আবার চিঠি এল। মা সে-চিঠিটাও আড়ালে নিয়ে অনেকক্ষণ পড়লে। তারপর বাবা আপিস থেকে আসতেই বাবাকে পড়ালে। আমি আশেপাশে ঘুর-ঘুর করছি। কী কথা বলে শুনবো।

মা বললে—তুই এখেনে কেন রে, যা পড়্‌গে যা—

আমাকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়ে তবে যেন শান্তি। কিন্তু মনে মনে ভারি কষ্ট হতে লাগলো। সে কষ্ট কার জন্যে কিংবা কেন তা জানি না। কিন্তু মনে হলো যেন পুতুল দিদিকে নিয়েই বাবা-মা'তে আলোচনা চলছে। পুতুল দিদি যেন চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। পুতুল দিদিই যেন মামার বাড়ির বংশে কালি দিয়েছে।

তারপর বহুদিন আর মামার বাড়ি যাওয়া হয় না। বাবা বদ্‌লি হন আর আমরা সঙ্গে-সঙ্গে যাই। মা বলেন—না, ছেলেমেয়েরা তো ওইসব শুনবে, তখন কী ভাববে বলো তো—

তারপর পাঁচবছর পরে একটা মারাত্মক অসুখের পর বাবা যেবার ছুটি নিলেন, সেবার আবার মামার বাড়ি গেলাম।

মামাবাবু তখন আরো বুড়ো হয়ে গেছেন। মামীমাও অথর্ব। মামার বাড়িতে গিয়ে আর সে-আদর সে-যত্ন পেলাম না। মামার বাড়ির সে-আবহাওয়া বদ্‌লে গেছে। মামাতো ভাইবোনরাও বড় হয়ে গেছে সব। মামাবাবুর সমাজে বেশ প্রতিষ্ঠা ছিল। আগে কত লোকজন আসতো। বৈঠকখানা ঘরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কতক্ষণ ধরে আসর বসতো। কেউ আর আসেনা দেখলাম। মামাবাবু একলা নিজের ঘরে বসে কেবল তামাক খান। পুরনো চাকর রামধনি নিজেই সব করে। বাজার করা থেকে তামাক সাজা পর্যন্ত সমস্ত।

বাড়িতে ঢুকেই ফটিককে জিজ্ঞেস করলাম—পুতুল দিদি কোথায় রে?

ফটিক যেন ভয় পেয়ে চারদিকে একবার চেয়ে নিয়ে থেমে গেল। কেউ কিছু বলে না।

বিকেলে বেড়াতে যাবার সময় মা বললে—পন্টু যেন তরুয়ার দিকে না যায়, দেখিস রামধনি—

মামার বাড়টা ছিল শনিচরি বাজারে যাবার রাস্তার ওপরেই। আর সোজা রাস্তা ধরে পুব দিকে গেলেই তরুয়া। তরুয়াতে আগে কতবার গেছি। ওখানে আড়পা নদীর ধারে রেলের পাম্পিং স্টেশনে গিয়ে খেলা করেছি। ওপারে পেয়ারা-বাগানে গিয়ে মালীর সঙ্গে ভাব জমিয়ে পেয়ারা খেয়েছি। আর, এবার তরুয়াতে যেতে কেন এত আপত্তি কে জানে।

রামধনি বুড়ো মানুষ। কিন্তু সে-ও কিছু বললে না।

বললে—ও-সব কথা বলতে নেই—

কিন্তু শেষে বললে অন্তু।

বললে—কাউকে বলবেনা বলো—মা-কালীর দিব্যি বলো—নইলে মা কিন্তু মাথা ফাটিয়ে দেবে একেবারে—

বললাম—বলবো না, বল্‌ তুই—

—মা মঙ্গলচণ্ডীর দিব্যি করে বলো—

—মা মঙ্গলচণ্ডীর দিব্যি।

অন্তু বললে—পুতুলদি না—শ্বশুরবাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে—

—পালিয়ে এসেছে! কোথায় আছে?

—ওই-যে বড়রাস্তার মোড়ে থাকতো অম্বিকা-দা, সেই আমাদের ল্যাবেনচুষ কিনে দিত? তাতে আর পুতুলদিতে তরুয়ার একটা বাড়িতে আছে—

—তরুয়ার কোন্‌ বাড়িতে?

—অ্যাডাম্‌স ব্লকে। পুতুলদির একটা মেয়ে হয়েছে, ভাই—

—আর জামাইবাবু?

জামাইবাবুর খবর অন্তু রাখে না।

অন্তু বললে—একদিন লুকিয়ে লুকিয়ে গিয়েছিলুম পুতুলদিকে দেখতে—কী নোংরা ঘর, ভাই—ময়লা কাপড় প'রে তখন রান্না করছিল, আমাকে মুড়ি খেতে দিলে—আমার খুব কষ্ট হলো দেখে—

—তারপর?

—তারপর পুতুলদি জিজ্ঞেস করলে বাবা কেমন আছে, মা কেমন আছে—সবাই কেমন আছে জিজ্ঞেস করলে—

জিজ্ঞেস করলাম—আমার কথা জিজ্ঞেস করেনি পুতুলদি?

—না ভাই, তোমার কথা জিজ্ঞেস করেনি।

বললাম—আজ যাবি আমার সঙ্গে, অন্তু? আমায় বাড়িটা একবার দেখিয়ে দিবি।

অন্তু বললে—না। বাবা মা বকবে। সেদিন আমাকে বাবা যা মেরেছিল—

মনে আছে কতদিন কতবার মনটা তরুয়ার দিকে যাবার জন্যে ছটফট করেছে। ইস্টিশনে যাবার রাস্তার বাঁ দিকে পড়ে তরুয়া। তরুয়ার ফাঁকা মাঠ পেরিয়ে গেলেই বড় বড় দুটো আমগাছের তলায় অ্যাডাম্‌স ব্লক। সেইদিকে চেয়ে-চেয়ে দেখতাম। কোথাও কোনো বাড়ির জানলার ফাঁক দিয়ে যদি পুতুল দিদিকে দেখা যায়। অ্যাডাম্‌স সাহেবের বাড়িটা ছিল দোতলা। আর তার ডান দিকের সার-বাঁধা ছ'টা বাড়ি ছিল একতলা। সেগুলোতে থাকতো ভাড়াটেরা। অ্যাডাম্‌স সাহেবকে চিনতাম। বুড়ো গার্ডসাহেব। চাকরি থেকে রিটায়ার করে বাড়ি করেছিল

ওখানে। বিয়ে-থা করেনি। সাইকেল করে টিকিয়ে টিকিয়ে সকাল-সন্ধ্যেয় গিয়ে রানিং-রুমে গার্ডদের সঙ্গে আড্ডা দিত। কিন্তু মা'র ভয়ে কোনওদিন ওদিকে যেতে পারিনি। কেবল মনে হতো পুতুলদির কাছে আমার একটা পাওনা বাকি আছে। সেদিন সেই জিউলিগাছের কোটরের মধ্যে সেই চিঠিটা তো আমি রেখেই এসেছিলাম ঠিক। তারপর বিয়েবাড়ির 'হই চই'-এর মধ্যে বোধ হয় পুতুলদি সে-কথা ভুলে গেছে।

কিন্তু আবার মনে হতো অম্বিকাদাকে কী করে পছন্দ হলো পুতুল দিদির। পুতুল দিদির বরকে তো ভালোই দেখতে। মামাবাবু কত খোঁজ করে, কত খরচ করে ভাগলপুরে বিয়ে দিলেন।

সেদিন বুক ঠুকে সকালবেলাই চলে গেলাম তরুয়ার দিকে। কোন্ বাড়িতে পুতুল দিদি থাকে জানি না। তবু চলছি। মনে হলো যা-হয় হোক—মেরে মাথা ফাটিয়ে দিলেও পুতুল দিদির সঙ্গে দেখা করা চাই আমার।

সামনে আলকাতরা মাখানো জাফরি-দেওয়া ঘর। ভেতরের কিছুই স্পষ্ট দেখা যায় না। মনে হলো যদি পুতুল দিদি আমাকে দেখতে পায় নিশ্চয় ডাকবে। বার-বার রাস্তা দিয়ে ঘোরাফেরা করলাম—কেউ ডাকলে না। রাস্তায় ছোট ছোট মাদ্রাজীদের ছেলেরা খেলা করছিল—তাদেরও জিজ্ঞেস করি-করি করে জিজ্ঞেস করা হলো না।

পরের দিন আবার একবার বিকেলের দিকে যাব ভাবলাম। কিন্তু বাবার টেলিগ্রাম এসে হাজির হলো সেদিন। সকালবেলার নাগপুর প্যাসেঞ্জারেই রওনা হয়ে গেলাম বাবার কাছে।

যে-ক'দিন ছিলাম মামার বাড়িতে, দেখেছিলাম মামাবাবুর কাছে এক সাধু আসতো রোজ। মামাবাবু খুব ভক্তি করে অভ্যর্থনা করতেন। মামাবাবুকে আগে কখনও সাধুসন্ন্যাসী নিয়ে মাথা ঘামাতে দেখিনি। কেমন যেন আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম।

রামধনি বলেছিল—মস্তবড় তান্ত্রিক সাধু উনি—জিনিস হারালে জিনিস পাইয়ে দেন—দুষমন থাকলে, দুষমন নষ্ট করেন—

ফটিক বললে—ও লোকটা শ্মশানে গিয়ে পুজো করে পুতুলদির জন্যে—

বললাম—কেন?

ফটিক বললে—ও বলেছে, পুজো করলে আবার জামাইবাবুর বাড়িতে পুতুলদি ফিরে যাবে—

কিন্তু ফিরে সেবার যায়নি। যখন ফিরেছিল তখন পুতুল দিদির মেয়ে আরো বড় হয়েছে। মামাবাবু সে-ঘটনা দেখে যেতে পারেননি। মেয়ের শোকেই প্রায় শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছিলেন। একদিন তিনি মারাও গিয়েছিলেন। আমরা তখন কানপুরে।

শুনলাম—পুতুল দিদি নাকি বরের কাছে ফিরে গেছে—

আমি তখন চাকরিতে ঢুকেছি সবে। ফটিকও চাকরি করছে রেলে।

ফটিক লিখেছিল—জামাইবাবুর দ্বিতীয়পক্ষের বউ মারা যাবার পর একবার এসেছিল মামার বাড়িতে—এসে কান্নাকাটি করতে পুতুল দিদি রাজী হয়েছে শ্বশুরবাড়ি যেতে। মেয়েকে নিয়েই পুতুল দিদি শ্বশুরবাড়ি চলে গেছে।

আমি লিখেছিলাম—আর তোর অম্বিকা-দা ?

ফটিক লিখেছিল—অম্বিকা-দা সেই তরুয়ার বাড়িতেই আছে একলা—কার সঙ্গে মেশে, কী করে তাও জানি না।

তখন বড় হয়েছি আমরা। সব জিনিস বুঝতে শিখেছি। অতীতের ঘটনার নতুন অর্থ করেছি। তবু আমার কাছে অবাক লেগেছে কেমন করে এ সম্ভব হলো। ভেবেছি—কত বড় দরাজ বুক হলে পরের সন্তান-সুদ্ধ স্ত্রীকে আবার গ্রহণ করতে পারে লোকে। কত বড় ক্ষমাপরায়ণ মন হলে এ সম্ভব হয় তা-ও বুঝেছি। বুঝেছি সংসারে আইন দিয়ে আর যত কিছুই বাঁধা যাক, মন বস্তুটি বড় শক্ত জিনিস, সে কারও শাসন মানে না, কোনও আইন মানে না সে, কোনও বাঁধা-ধরা পথে সে চলতে চায় না। শুধু একটা জিনিস বুঝিনি—সেই পুতুল দিদিই কেন আবার তার স্বামীর ঘরে ফিরে যেতে রাজী হলো। বুঝিনি বটে, কিন্তু বুঝতে চেষ্টাও যে করেছি তা-ও নয়। ভেবেছি স্বামী-স্ত্রীর মনের অন্তস্তলে কোথায় কোন্ দুর্ভেদ্য রহস্য লুকিয়ে আছে তা বোঝবার চেষ্টা করাও যেন বৃথা। পুতুল দিদির স্বামিত্যাগও যেমন দুর্বোধ্য, স্বামীকে তার পুনর্‌গ্রহণও তেমনি। সে সম্বন্ধে বাইরের লোকের মতামত শুধু নিরর্থকই নয়, মিথ্যেও বটে। তাতে সুবিচারের নামে অবিচারই তো ঘটতে দেখি সংসারের সর্বত্র। সুতরাং সে-চেষ্টাও আর করিনি।

মামাবাবুর মৃত্যুর পর থেকে মামার বাড়ি যাওয়া আমাদেরও কমে গেল বটে, কিন্তু সম্পর্ক ঠিক-ই ছিল। বিয়ে শ্রাদ্ধ অন্নপ্রাশন উপলক্ষ্যে মাঝে মাঝে দেখা বা চিঠি লেখা হতো। আমাদের বয়েস বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে জীবনও জটিল হয়ে উঠলো।

ফটিকের ঘাড়েই তখন সংসারের ভার পড়েছে। তিন বোনের বিয়ে, দুই ভাইকে কলেজে পড়িয়ে মানুষ করানো থেকে বাড়িটা দোতলা তোলা। তা ছাড়া লোক-লৌকিকতা খাওয়া-পরা, এই সামান্য রেলের চাকরি থেকে করা সামান্য কথা নয়।

সেবার অন্তুর বিয়েতে গিয়েই দেখলাম—এলাহী কাণ্ড করে বসেছে ফটিক। রোশনচৌকি, ব্যাণ্ড, খাস-গেলাসের আলো, বাজি ফাটানো আর বিলাসপুরে ঝেঁটিয়ে সমস্ত বাঙালীদের সপরিবারে খাওয়ানো কি কম খরচের ব্যাপার! দেখে

মনে হলো—ফটিক কি চাকরিতে মোটা ঘুষ পায় নাকি ?

বলেছিলাম—ধার-দেনা হলো বোধহয় তোর অনেক—

ফটিক বললে—আমি ধার করবার পাত্তোরই বটে—আমার তো ওই চাকরি, জানিস তো তুই—দশ আনা রোজ—ওদিকে মিন্টুর বরকে বিলেত পাঠানো হয়েছে জানিস তো—আর এবারে বাড়িটাও তেতলা তোলা হবে—ঘরে আর কুলোচ্ছিল না—

বললাম—তা তো বটে—

ফটিক বললে—এবার পুজোতে আত্মীয়-স্বজনকে কাপড় দেওয়া হলো। সবাই খুশি, দিতে পারলে সবাই ভালো—কী বল্—

বললাম—কিন্তু এমন করে টাকা ওড়ানোর দরকার কী—

ফটিক বললে—এ-সব কি আমার ইচ্ছে—বললে যে পুতুলদি শোনে না—

—পুতুলদি ?

—হ্যাঁ, পুতুলদি-ই তো অন্তু-নন্তুর বিয়ে-টিয়ে দিলে, যাবতীয় খরচ করছে সে, পুতুলদি ছিল বলে আবার বিলাসপুরে বাঙালী সমাজে মাথা তুলে দাঁড়াতে পেরেছি, ভাই—পুতুলদির জন্যেই একবার মাথা হেঁট হয়েছিল আমাদের, আবার ওই পুতুলদি-ই আমাদের মাথা উঁচু করিয়ে দিয়েছে, এবার এখানকার দুর্গো-পুজোয় আটশো টাকা চাঁদা পাঠিয়ে দিয়েছিল, খুব খুশি সবাই—আবার বলেছে এখানকার 'লেপার হোম'-এর জন্যেও কয়েক হাজার টাকা দেবে—টাকার তো অভাব নেই জামাইবাবুর—

—অত টাকা কী করে হলো ?

—ব্যবসায়ে জানিস তো উঠ্‌তি পড়্‌তি আছে। এখন উঠ্‌তির সময় চলছে—দু'হাতে টাকা উপায় করছে জামাইবাবু—

জিজ্ঞেস করলাম—পুতুলদির ছেলেমেয়ে কী ?

—ওই সেই মেয়ে একটা—লক্ষ্মী। আর তো হলো না—

এ-সব ঘটনা অনেক দিনের। পুতুল দিদির জীবনটা পূর্বাপর আলোচনা করে যেমন কোনো তাৎপর্য খুঁজে পাইনি, তাৎপর্য খোঁজবার চেষ্টাও করিনি কোনো-দিন। এখন বুঝেছি ফরমুলা দিয়ে বাঁধা যায় গল্প-উপন্যাসকে—মানুষের জীবন ফরমুলার ধার ধারে না। নইলে সেই পুতুল দিদি স্বামীর মৃত্যুর পর ব্যবসা তুলে দিয়ে আবার কেন বিলাসপুরে আসে ! কোতোয়ালির সামনে আবার বিরাট প্রাসাদ তুলেছে পুতুল দিদি। স্বর্গত বাবার নামে বাড়ির নাম দিয়েছে 'জানকী ভবন'। যে-মামাবাবু পুতুল দিদির ব্যাপারে লজ্জায় অপমানে দেহত্যাগ করলেন, সেই মামাবাবু—জানকীনাথ বসু-ই অমর হয়ে রইলেন বিলাসপুরে। এখন জানকীবাবুর নামডাক খুব। বাবার নামে হাসপাতাল করে দিয়েছে পুতুল দিদি। ট্রেজারির পাশে কাছারির মুখোমুখি মস্ত দু'শো বিঘে জমির ওপর

'জানকীনাথ মেমোরিয়াল হাসপাতাল'। জানকীবাবুর নাম করলে এখন হাজার মাইল দূরের লোক পর্যন্ত চিনতে পারে। হাত জোড় ক'রে মাথায় ঠেকিয়ে প্রণাম করে—ধন্য মেয়ে জন্মেছিল বটে।

আর তা ছাড়া গুণও কী কম!

মারহাট্টিদের গণেশপুজো, মাদ্রাজীদের পঙ্গল, বাঙালীদের দুর্গাপুজো, ছত্রিশগড়িয়াদের ছট্ পরব,—এক একটা উৎসবে হাজার হাজার লোক কাপড় পায় একখানা করে। আর সিধে।

অথচ খুব বেশিদিনের কথাও তো নয়। কিন্তু মানুষ চিনি, মানুষের সব জানি বলে বড়াই-এরও তো অন্ত নেই আমাদের। কী করে কী হলো—এসব ভাবতে গেলে কেমন যেন উপন্যাস পড়ছি বলে মনে হবে।

সেই কথাই ভাবছিলাম লক্ষ্মীর বিয়েতে এসে। পুতুল দিদির একমাত্র মেয়ে লক্ষ্মীর বিয়ে আজ। ঘটার শেষ নেই। জাঁকজমকের অন্ত নেই।

পুতুল দিদিকে দেখলাম অনেকদিন পরে। একটা তসরের থান প'রে বসে আছে। চারিদিকে সাত্ত্বিক সতীলক্ষ্মী বিধবা-সধবা আত্মীয়-স্বজন তোষামোদ করছে তাকে ঘিরে। পাশে লক্ষ্মী বসে আছে।

আন্নাদিদি বলছে—তুই কিছু মুখে দে, পুতুল—আমরা তো আছি—দেখছি সব—

কাল একাদশী করেছে পুতুল দিদি। নির্জলা একাদশী করে আজ এতটা বেলা মুখে কিছু দেয়নি বলে আত্মীয়াদের মাথাব্যথার অন্ত নেই। কিন্তু একটা জিনিস দেখে অবাক লাগলো। সকাল থেকে পুলিশ-কনস্টেবলে ছেয়ে গেছে বাড়ির চারিদিক।

ফটিককে জিজ্ঞেস করলাম—এত পুলিশ-পাহারা কেন রে?

ফটিক বললে—ও একটা ব্যাপার আছে- পরে বলবো—

বাড়ি আবার সরগরম হয়ে উঠেছে। অন্তু এসেছে, নন্তু এসেছে। জামাই-রাও এসে বাড়ি আলো করেছে। ভাই ভাজ ভাইপো, বোন বোনঝি বোনঝি-জামাই—সব।

পুতুল দিদি বললে—ছেলেদের নিয়ে এলিনা কেন শুনি—? কতদিন তাদের দেখিনি—বউকেও নিয়ে এলি নে—বড় হয়ে সব পর হয়ে গেলি নাকি তোরা?

রাত্রের দিকে পুলিশ-পাহারা আরও বাড়লো।

ফটিককে জিজ্ঞেস করলাম—এত পুলিশ-পাহারার বন্দোবস্ত কেন?

ফটিক ব্যস্ত ছিল। তবু গলা নীচু করে বললে—পুতুলদি কোতোয়ালির বড় দারোগাকে বলে নিজে এ-ব্যবস্থা করেছে—

—কেন?

—ওই লক্ষ্মীর জন্যে। ভাগলপুরে যতদিন ছিল, ওখানকার পাড়ার ছেলেরা

ভালো নয়, লক্ষ্মীও ঠিক নিজের ভালো-মন্দ বুঝতে পারেনা তো, সে-বয়েসও হয়নি, একবার এক ছেলের সংগে বেরিয়ে গিয়েছিল, তারপরে অনেক কষ্টে আবার ফিরিয়ে আনা হয়েছে—

কেমন যেন অবাক হয়ে গেলাম।

ফটিক বললে—তা এইবার বিয়ের সম্বন্ধ হবার পর চোখে-চোখে রাখতে হচ্ছে। ওকে উড়ো চিঠিও দিয়েছে একটা, তাই পুতুলদি নিজের কাছে বসিয়ে রেখেছে সমস্ত দিন—

কিন্তু মনে হলো—বরও তো আশ্চর্য ছেলে !

ফটিক বললে—তাকেও সব বলা হয়েছে, সব শুনেই সে বিয়ে করতে রাজী হয়েছে—

—খুব ভালো—বলতে হবে তাকে—

ফটিক বললে—টাকায় সব হয় ভাই, শাশুড়ীর একমাত্র মেয়ে জানে তো—টাকার লোভটাও আছে বৈকি।

তা যা হোক, কখন বিয়ের ধুমধামের মধ্যে সমস্ত দিন কাটলো। বর এল। শাঁখ বাজলো। হুলুধ্বনি উঠলো। হাজার-হাজার লোক পাত পেড়ে লুচি তরকারি খেয়ে কখন বিদায় নিলে, কিছুই বোঝা গেল না। নিশ্চিন্তে নির্বিঘ্নে কাটলো সন্ধ্যেটা। কোনও বিঘ্ন ঘটতে পারেনা জানতাম। বিঘ্ন হলোও না।

আমি এক ফাঁকে সরে পড়লাম।

ফটিক ধরলে—এখুনি যাবে কেন, গাড়ি তো তোমার কাল ভোরবেলা—

বললাম—সেই ভোর চারটেয় ট্রেন, তারপর আবার শীতকাল—অত সকালে স্টেশনে যাওয়া—স্টেশন কি এখানে নাকি—

—তোমাকে আমি গাড়ি করে পেঁছে দেব, কোনো ভাবনা নেই—

তবু আমি থাকতে রাজী হইনি। খাওয়া-দাওয়া চুকলেই বেরিয়ে পড়লাম। রাত্রে গিয়ে ওয়েটিং-রুমে আরাম করে শুয়ে থাকবো। তারপর ট্রেন আসবার ঘণ্টা শুনলেই উঠে পড়া যাবে। শীতকালের রাত। রাত চারটে মানে শেষ রাত্তির। আর বিলাসপুরের আপার-ক্লাস ওয়েটিং-রুমটা ভারি নিরিবিলি। দোতলার ওপর। বেশী লোকজন থাকে না। ভোরের ট্রেনে যেতে গেলে বরাবর এমনি রাত্রে গিয়ে শুয়ে থেকেছি সেখানে। এ আজ নতুন নয়। কিংবা প্রথমও নয়।

একটা টাঙ্গা নিয়ে উঠে পড়লাম স্টেশনের দিকে।

তা এই ওয়েটিং-রুমের মধ্যেই সে-রাত্রে যা ঘটলো তার পরে দেখলাম সত্যি আমার এতদিনের চেনা পুতুল দিদি রীতিমতো একটা গল্পে দাঁড়িয়ে গেছে বেশ।

সেই ঘটনাটি-ই বলি এখানে।

টাঙ্গার ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে কুলীর মাথায় মালপত্তর চাপিয়ে দোতলায় ওয়েটিং-রুমে তো গিয়ে হাজির। লোকজন বিশেষ তখন কেউ নেই। কেবলমাত্র একজন ভদ্রলোক ভালো খাটটা জুড়ে বসে আছেন।

কুলীকে বলে দিলাম গাড়ি আসবার লাইন-ক্লিয়ারের ঘণ্টা হলেই যেন এসে ঘুম ভাঙিয়ে দেয় আমার। তারপর শোবার বন্দোবস্ত করতে লাগলাম।

শোবার আগে ভদ্রলোকের দিকে একবার চেয়ে দেখলাম।

বললাম—আলো নিভিয়ে দিলে কি আপনার খুব অসুবিধে হবে—

ভদ্রলোক যেন একটু অন্যমনস্ক ছিলেন। বললেন—কেন ?

—না, আমার আবার আলো জ্বললে ঘুম আসেনা কিনা—

ভদ্রলোক বললেন—আমি এখুনি চলে যাবো, এই সাড়ে এগারোটার গাড়িতে—আপনি বরং এই খাটটায় এসে শোন্—এইটেই মজবুত, শুয়ে আরাম পাবেন—আমি সারাদিন ছিলাম এখানে—

ব'লে ভদ্রলোক সত্যিই জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে কুলী ডেকে বেরিয়ে গেলেন।

আমি নিশ্চিন্ত হয়ে ভেতরের আলো নিভিয়ে দিয়ে ওঁর খাটটি দখল করে শুয়ে পড়লাম। শুধু বাইরের সিঁড়িতে একটা আলো জ্বলতে লাগলো। ভারি শীত পড়েছিল। আগাগোড়া কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমের মধ্যে তলিয়ে গেলাম কখন টের পাইনি।

আর তারপর মনে হলো বোধহয় মিনিটখানেকও হয়নি। গাঢ় ঘুমের মধ্যে দু'ঘণ্টাকেও যেন এক মিনিট সময় বলে ভুল হয়েছে তো কতবার।

অন্ধকারের মধ্যেই হঠাৎ যেন কে ডাকতে লাগলো—দাদাবাবু গো—ও দাদাবাবু—

প্রথমটায় অস্পষ্ট। তারপর যেন মনে হলো রামধনির গলা। মামাবাবুর বুড়ো চাকর রামধনির গলার মতন। কিন্তু এত রাত্রে আমাকে কেন ডাকে! বললাম—হুঁ—

রামধনি বললে—দিদিমণি বড় রাগ করছিল আপনার ওপর, গেলেন না একবার, তাই খাবার পাঠিয়ে দিলেন—আর এই চিঠিটা—

কেমন যেন অবাক লাগতে লাগলো।

রামধনি বললে—আমার আবার অনেক কাজ পড়ে রয়েছে দাদাবাবু, যাই আজ্ঞে আমি—খাবার রইল, খাবেন কিন্তু—নইলে, দিদিমণি পই পই করে বলে দিয়েছে···

সত্যিসত্যিই আরো দু'একবার ডেকে রামধনি চলে গেল। অনেক রাত হয়ে গেছে। সে-ও ক'দিন ধরে নাগাড়ে খাটছে। তাকে আবার অনেকদূর সিটিতে ফিরে যেতে হবে এই শীতের রাতে।

তাড়াতাড়ি উঠে বসলাম। আলো জ্বাললাম। একটা টিফিন-কৌটোতে থরে

থরে লুচি পোলাও মাংস মাছ মিষ্টি যত্ন করে সাজানো। আর একটা ভাঁজ-করা চিঠি। চিঠিটা খুলতেই নীচে নজর পড়লো পুতুল দিদির নামসই।

পুতুল দিদি লিখছে : চিরটা কাল তোমার এমনি অভিমান করেই কাটলো, তাতে লাভটা কী হলো বলতে পাবো? কাল সকালে খাবারগুলো বাসী হয়ে যাবে তাই রাত্রেই রামধনিকে দিয়ে পাঠালাম। তোমার জন্যে কি মানুষকে লজ্জা-শরম সব কিছু জলাঞ্জলি দিতে বলো! এত খরচ করে ও-শাড়ি দেবার কী দরকার ছিল? তোমারও যেমন মেয়ে, আমারও তো তেমনি। আমি তো দিয়েইছি। আমার দিলেই তোমারও দেওয়া হলো। আজ রাত্রের ট্রেনেই চলে যেও না; অনেকদিন পবে এলে, দেখা করে যেও। আমাব হাতে টাকা নিতেও তো তোমার বাধে, পব পর ক'বারই মনি-অর্ডার ফেরত এল। ব্যাপার কী! বুড়ো বয়সে কি আবার রাগ অভিমান ভাঙাতে হবে নাকি! দেখবার লোক তোমার কেউ নেই, এটা মনে রেখে শরীরটার দিকে নজর রেখো,...

আত্মহত্যা

চল্লিশ-জোড়া চোখ একদৃষ্টে প্রমীলার দিকে চেয়ে আছে। প্রমীলা বই থেকে চোখ সরিয়ে নিজের চেহারার দিকে চোখ বুলিয়ে নিলে।

হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে গেল সে। একদিন ওদের মতো বয়েস ছিল প্রমীলার। ওদেরই মতো শাড়িটাকে আঁটসাঁট করে প'রে দশটা বাজতে-না-বাজতে এসে বসতো ফার্স্ট বেঞ্চে। তারপর কী মনোযোগ দিয়েই না পড়ানো শুনেছে টিচারদের! একে একে ইংরিজী, হিস্ট্রী আর অংকের ক্লাসের পর আধঘণ্টা টিফিনের ঘণ্টা—তারপর আবার একে একে সমস্ত ক্লাসের শেষে হাঁটতে হাঁটতে বাড়ি যাওয়া।

—বাসন্তী—

বাসন্তী ঘোষাল পেছনের বেঞ্চে বসে পাশের মেয়েটির সঙ্গে ফিসফিস করে গল্প করছে আর হাসছে। অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ্য করে আসছিল প্রমীলা।

—বাসন্তী—

প্রমীলা আবার তাকালে। সব মেয়েরা পেছন ফিরে দেখলে। প্রমীলা যখন ওদের মতো ছাত্রী ছিল, তখন এমন করে কোনওদিন টিচারদের পড়ানোর সময় গল্প করেনি।

করুকগে গল্প। লেখাপড়া করেই বা তার কী হয়েছে! হয়ত বাসন্তী ঘোষাল আর পড়বেই না কাল থেকে। হয়ত বিয়ে হয়ে যাবে আজকালের মধ্যে। মস্তবড় ঘরেই হয়ত পড়বে। বলতে গিয়েও কিছু বলা হলোনা বাসন্তীকে।

বোর্ডিং-এর দালানে বসে প্রমীলা তরকারি কুটছিল।

গৌরী এল। বললে—প্রমীলাদি একটা সুখবর আছে—ওর বাবা রাজী হয়ে গেছে—

প্রমীলা মুখ তুললে। বললে—তা হলে মিষ্টি-মুখটা কবে হচ্ছে বল্—

—সত্যি প্রমীলাদি, আমি ভাবতেও পারিনি—আজ সকালবেলা ইস্কুলে গেছি তখনও জানি না, দুপুরবেলা চিঠি এসেছে—এতদিন পরে ওর বাবা মত দিলে—

—মিষ্টি-মুখটা কবে হচ্ছে শুনি—

—বা রে, ও আসুক, ওকেই ধোরো-না তোমরা—শনিবার তো আসছে—

ক'মাস মাত্র গৌরী এসেছিল এ-ইস্কুলে। বড় দুঃখও নেই কোনো, বড় আশাও ছিলনা কখনও হয়ত। শৈলেশকে ভালোবাসা ছাড়া জীবনে আর কোনও উদ্দেশ্য ওর নেই। শেষ পর্যন্ত শৈলেশের বাবা মত দিয়েছে—এ-যে কত

বড় সুখবর, এ শুধু গৌরীই বোঝে।

গৌরীর মতো ক'রে ক'জন সুখী হতে পারে!

আভা তখনও ফেরেনি। ইস্কুলের পর দুটো টুইশ্যানি করতে হয় ওকে। শীলা এতক্ষণ বোধ হয় আহ্নিক করছে ওর ঘরে। রেবা হয়ত চিঠি লিখতে বসেছে। সপ্তাহে অন্তত দুটো করে চিঠি আসে রেবার নামে। এত চিঠিও ওরা দুজনে দুজনকে লিখতে পারে!

—বামুন-দি—.

প্রমীলা আলাদা করে একটা বাটিতে কপির টুকরোগুলো তুলে রাখলে।

—এই রইল শীলার নিরিমিষ তরকারি—আর এই মাছের কালিয়ার আলু কুটে দিলাম—আভার জন্যে ঝাল দিয়ে এগুলো রেঁধো—ও আবার ঝাল না-হলে খেতে পারে না, জানো তো—

প্রতিদিনের খাবার দিকটা প্রমীলাকেই দেখতে হয়। ওদের সকলের বয়েস কম। বাপ-মা, ভাইবোনদের ছেড়ে এতদূর বিদেশে চাকরি করতে এসেছে। জীবনে প্রমীলা কারও স্নেহ-ভালবাসা পেলেনা বলে ওদের সে-স্নেহ থেকে কেন বঞ্চিত করবে।

—শীলা, আজ নিরিমিষ কপির তরকারিটা কেমন হয়েছে রে—আমি নিজে রেঁধেছি—

—আভা, রোজ রোজ তোমার খাবার নষ্ট হয়—বড়লোক ছাত্রীর বাড়িতে রোজ রোজ খেয়ে এলে এদিকে যে নষ্ট হয়—আগে বলে যেতে পারো না—

—গৌরী, তুই এমন রোগা হয়ে যাচ্ছিস, তোর শৈলেশ ভাববে প্রমীলাদি বুঝি ভালো করে খেতে দেয় না—ও তো জানে না, শৈলেশের কথা ভেবে ভেবে রোগা হচ্ছিস—

গরমের দিনে রবিবারের দুপুরে আভা দৌড়ে এসেছে এ-ঘরে।

—প্রমীলাদি, আইসক্রীম-ওয়ালা যাচ্ছে—আইসক্রীম খাওয়াবে?

বামুনদিদি খবর পাঠালে মালীকে। মালী নিয়ে এল আইসক্রীম।

—একি, তুমি খাবেনা প্রমীলাদি?

আভা, রেবা, গৌরী দুটো দুটো করে নিয়েছে। প্রমীলা ছ'টা আইসক্রীমের দাম বার করে দিলে ব্যাগ থেকে।

—তুমি খেলেনা প্রমীলাদি, তবে আমরাও খাবো না—

আভা রেবা গৌরী রাগ করলে। প্রমীলাদি-ই যদি না-খাবে, তবে কিসের এই আনন্দ। তুমি আমি সকলে মিলে খেলেই তো মজা। এ যেন খেতে চেয়েছি বলে খাওয়ানো।

—আর যদি কখনও খাই তো কী বলেছি— গৌরী মুখ বেঁকিয়ে বসলো।

—আরে না না—রাগ করিসনি তোরা—আজ শীলার একাদশী কিনা—

সবাই বুঝলো। তা তো বটেই। শীলার আজ নির্জলা একাদশী, ও জলটা পর্যন্ত ছোঁয় না। এতোটুকু মেয়ে বিধবা হয়েছে বলে একী নিষ্ঠুর কৃচ্ছ্রসাধনা! স্বামীর স্মৃতিকে হয়ত এমনি করেই চিরস্থায়ী করে রাখতে চায়। তা সে যা-হয় হোক—প্রমীলা শীলার এই একাদশীর দিনে কেমন করে এই বিলাসিতা করতে পারে। শীলার মা এখানে নেই—তিনি থাকলে তিনিই কি মেয়ের নির্জলা উপোসের দিনে আইসক্রীমের নিষ্প্রয়োজন বিলাসিতার প্রশ্রয় দিতেন? প্রমীলার বয়স যাই হোক—পদমর্যাদায় প্রমীলাই বা সকলের মা'র চেয়ে কম কিসে।

বোর্ডিং-এর সমস্ত টিচারদের সুখ-সুবিধে স্বাচ্ছন্দ্য সব দেখতে হবে প্রমীলাকে। শুধু যে বয়েসে বড় তা বলে নয়। বহুদিনের গুরুদায়িত্বের অভ্যাসে এটা তখন কর্তব্যে পরিণত হয়েছে। ওদিকে সেক্রেটারি রায়সাহেব যদুনাথ চৌধুরী আছেন। ইস্কুল সম্বন্ধে যা-কিছু তাঁর করণীয় সব করতে হবে প্রমীলাকেই।

—এই টেক্সট্-বইগুলো পড়ে দেখো প্রমীলা, চলবে কিনা—পাবলিশার বড্ড ধরেছে আমাকে—

—ইস্কুলের নতুন খানপঞ্চাশেক বেঞ্চ দরকার, দেখো তো প্রমীলা এই কোটেশনগুলো—

—ইস্কুল ফাণ্ডের সেই যে ছ'হাজার টাকা পড়েছিল বাজে একটা ব্যাঙ্কে, ভাবছি ওটা তুলে নেব, চারদিকে যেমন ফেল হচ্ছে ব্যাংক—কোন্‌টায় রাখি বলো তো—

রায়সাহেব বৃদ্ধ হয়েছেন। একদিন কী খেয়ালে একটা ছোট চালাঘরে মেয়েদের ইস্কুল করেছিলেন। পাঠশালার মতো দুজন পণ্ডিতমশাই নিয়ে। বাঙলাদেশের বাইরে বাঙলা শেখাবার আগ্রহটা ছিল মনে মনে। রামমোহন, ভুদেব মুখুজ্যের ভক্ত ছিলেন; বড় কিছু না হোক, ছোটখাটো একটা কীর্তি রেখে যাবেন এমন বাসনাও ছিল বোধ হয়। তাঁর সে স্বপ্ন সফল হয়েছে। বিশেষ করে আমার ছিড়িকে ছাত্রীসংখ্যা বেড়ে যায় আশাতীত। তারপর অনেকে রিটায়ার করে এখানেই বাস করছেন। এখানকার পোস্ট-অফিস, রেলস্টেশন, বাজার-হাটের মতো ইস্কুলটা এখন অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

রায়সাহেব বলেন—এই যে, এইটিই আমার হেড-মিস্ট্রেস।—প্রমীলা, এঁকে প্রণাম করো, ইনি হলেন পুরনো বন্ধু আমার, রিটায়ার্ড সাবজজ···ইত্যাদি, ইত্যাদি।

গোলগাল, মোটাসোটা বড় শরীরটা নিয়ে ছোট একটু প্রণাম করে প্রমীলা—

কোথাও সভা-সমিতি বা সম্মিলনীর আয়োজন হলে রায়সাহেব উদ্যোক্তাদের বলেন—কমিটির মধ্যে ওঁকেও নিও, আমার হেডমিস্ট্রেসকে···প্রমীলা, প্রমীলা দেবী,—একজন মহিলা সভ্যা থাকা ভালো···কী বলো—

অনেক দূর দূর থেকে মেয়েদের গার্জেনরা আসেন। বিরাট সেক্রেটারিয়েট

টেবিলের সামনে বসে বলেন—আপনার নাম শুনেই আসা—শুনেছি এখানে শিক্ষাটা ভালো হয়—আমার মেয়েটি আবার একটু দুষ্টু কিনা—

ওই সুনামটা বজায় রাখতে প্রমীলাকে দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা চারদিকে নজর রাখতে হয়। মেয়েদের খাবার জলের জায়গাটা ঢাকা রইল কিনা ; মেয়েদের স্বাস্থ্য ঠিক থাকছে কিনা—পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার দিকেও দেখতে হয়। ইস্কুলের মধ্যে মেয়েদের পান খাওয়া নিষেধ। চীৎকার, গোলমাল, জানলা দিয়ে বাইরে চেয়ে দেখা—সমস্তই বারণ।

আভার সেদিন সন্ধ্যেবেলা পড়াবার কাজ নেই। এসে বললে—প্রমীলাদি, গৌরী আমাদের সিনেমা দেখাচ্ছে—

—ও, বিয়ের আনন্দে বুঝি ?

—না, আমরাই তো ধরেছি সবাই, রেবাটা আজ চেপে ধরেছে, হাতে পয়সা নেই বলতে পারবে না—আজই মাইনে পেয়েছে—চলো, বা রে—শেষকালে দেখছি তোমার জন্যেই দেরি হয়ে যাবে—

রেবাও এসে গেল। নিখিলের পুজোয়-দেওয়া শাড়িটা পরেছে আজ। আজ যেন রেবা আর ইস্কুল-মিস্ট্রেস নয়। প্রমীলা চেয়ে দেখলে। বেশ মানিয়েছে রেবাকে। কতদিন ধরে মাস্টারি করছে রেবা। আর, কতদিন ধরে অপেক্ষা করে আছে নিখিলের জন্যে। নিখিলের একটা ভালো চাকরি হলেই, ও ছেড়ে দেবে এ-চাকরি। তারপর দুজনে মিলে এক জায়গায় নীড় বাঁধবে। ছোট সংসারে নিবিড় পরিবেশে দুজনে করবে স্বর্গ-রচনা।

রেবা বললে—অনেকদিন পরে এ-ছবিটা এল প্রমীলাদি, নিখিল লিখেছে এ-বছরে অ্যাকাডেমী প্রাইজ পেয়েছে ছবিটা, ওরও খুব ভালো লেগেছে,—তৈরি হয়ে নাও প্রমীলাদি—গৌরী বাথরুমে ঢুকেছে—এল বলে—

প্রমীলা মৃদু হেসে বললে—কিন্তু, আমি তো যেতে পারবোনা রে তোদের সঙ্গে—

—কেন ? বা রে, তা হলে আমরাও···আমি বলছি প্রমীলাদি, ছবিটা তোমার ভালো লাগবেই—নিখিল লিখেছে যে···কে কে আছে জানো ছবিতে—

প্রমীলা হাসলো। বললে—বলুকগে তোর নিখিল—বরং তুলসীদাস কি মীরাবাঈ এলে দেখা যাবে—তা হলে শীলাও যাবে আমাদের সঙ্গে···আমরা সবাই যাব আর ও-ই একলা বোর্ডিং-এ থাকবে—সে কেমন করে হয়—

শেষ পর্যন্ত হৈ হৈ করতে করতে ওরা চলে গেল।

অনেক রাত্রে প্রমীলা শীলার ঘরে গিয়ে হাজির।

—এই দ্যাখো ক্লাস টেন-এর মেয়েরা এমন বানান ভুল লিখেছে, আমি এদের কেমন করে পাস করাই বলো তো, প্রমীলাদি—বিশ্বাস না হয় তো নিজের চোখেই দ্যাখো—

শীলার ধবধবে সাদা থানের মতো বিছানার চোখ-ধাঁধানো সাদা চাদরের ওপর প্রমীলা বসলো। শীলার কাছে শীলার বিছানার ওপর বসতেও যেন কেমন সংকোচ হলো প্রমীলার। শীলাকে দেখলেই যেন কেমন চোখে ধাঁধা লেগে যায়। শীলার অকাল-বৈধব্য তাকে যেন এই ইস্কুল-মিস্ট্রেসদের বোর্ডিং-এর আবহাওয়ার মধ্যে এক অপরূপ স্বাতন্ত্র্য এনে দিয়েছে। দল বেঁধে আইসক্রীম খাওয়ার দলে সে নেই, সিনেমায় যাওয়ার পার্টিতে সে নেই। কিন্তু তবু প্রমীলাকে কেবল এই দুটো দলের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধান করে চলতে হয়। সংসারে বুঝি এই স্কুল ছাড়া শীলার আর কোথাও কিছু আকর্ষণ নেই। এই এক জায়গায় দু-জনের যেন অপূর্ব মিল! যখন গরমের দীর্ঘ ছুটিতে সবাই যে-যার বাড়িতে চলে যায়, শীলা পড়ে থাকে এই বোর্ডিং-এ। আর থাকে প্রমীলা। একজন কুমারী আর একজন বিধবা। ইস্কুলের উন্নতির চিন্তায়, মেয়েদের মানুষ করবার মহৎ প্রেরণায় ওরা জীবন-যৌবন জলাঞ্জলি দিচ্ছে—ওদের দেখে এমনি ধারণা পোষণ করাও বুঝি অন্যায় নয়।

শীলা বললে—এবার সামার-ভেকেশনের সময় আমি কোচিং-ক্লাস করবো প্রমীলাদি—এরকম হলে আমাদের স্কুলের যে বদনাম হবে—

সেদিন আভা বললে—জানো প্রমীলাদি—আমার টুইশ্যানি কমলো একটা—

—কেন—

—বাসন্তী ঘোষালের বিয়ে। বিয়ের পর কে আর পড়ে বলো—তা মেয়েটার ভাগ্যি ভালো, স্বামী বুঝি কোন্ মেজর একজন—দেখতেও চমৎকার—কলকাতায় নিজেদের বাড়ি—

আভার তিরিশ টাকার টুইশ্যানি যাওয়ার চেয়ে বাসন্তী ঘোষালের বিয়ের সংবাদটাই বড় মনে হলো প্রমীলার কাছে! দেখতে বাসন্তীকে কি খুবই ভালো? লেখাপড়ার ধার দিয়েও যেতনা কখনও। এম-এ পরীক্ষার পর বি-টি দেবার সময় প্রমীলারও মনে এ-কথা উদয় হয়েছিল একবার। সংগে যারা পড়তো একে একে সবাই যখন সরে পড়লো, নিজেকে তখন বিজয়িনীই মনে হয়েছিল। তারপর মোটা চশমার সংগে সংগে শরীরটাও মোটা হয়ে এল। পদোন্নতি হলো। প্রতিষ্ঠা হলো। সময় গড়িয়ে চললো কুটিল গতিতে। নিজেকে কৃপা করবার অবসর আর মিললো না।

রায়সাহেব ডেকে পাঠালেন সেদিন। বললেন—তুমি মা, রেবা ভাদুড়ীকেও একমাসের ছুটির রেকমেন্ড করেছ—ইস্কুল চলবে কেমন করে—এমনিতেই কম স্টাফ নিয়ে কাজ চালাতে হচ্ছে—

প্রমীলা ফাইলটা হাতে নিয়ে পাখার তলায় বসেও ঘামতে লাগলো।

—এই সেদিন গৌরী চ্যাটার্জি বিয়ের জন্য ছুটি নিয়ে গেল, তাও তিন মাস

হয়ে গেছে—এখনও তো এল না—আর আসবেও না বোধ হয়—

শৈলেশের বড়লোক বাবার মত হওয়াতে গৌরীর বিয়ে হয়ে গেছে। সে কেন আর এই সাতশো মাইল দূরে চাকরি করতে আসবে? প্রমীলা তাকে বাধা দেবার কে! তারপর এই রেবা। নিখিল যে একটা চাকরি জুটিয়েছে।

সেক্রেটারি জিজ্ঞেস করলেন—এই তো সামার ভেকেশন গেল সেদিন—বাড়ি থেকে এল সবাই—এরি মধ্যে আবার ছুটির দরকার হলো কিসে—এরও কি বিয়ে নাকি, মা—

—হ্যাঁ— একটু হেসে মাথা নীচু করলে প্রমীলা।

—সে তো ভালো কথাই, মা—ভালো ই কথা—কিন্তু···সামনে টেস্ট পরীক্ষা —ক্লাস-প্রমোশনের সময়—

কিন্তু সেক্রেটারির যুক্তিটায় যেন জোর কম বলে মনে হলো। কিংবা বিবাহিত রায়সাহেব- বুঝি অবিবাহিত হেড-মিস্ট্রেসের সামনে তা নিয়ে আলোচনা করা যুক্তিসঙ্গত মনে করলেন না।

বাইরে নিখিল দাঁড়িয়ে আছে। হেড-মিস্ট্রেসের অফিসে চেয়ারে বসবার অবসর টুকুও যেন নেই তার। রেবাকে দেখবার আগ্রহে বুঝি এতই অধীর সে।

রেবা পায়ে হাত দিয়েই প্রণাম করলে। বললে—বিয়েতে যেতে চেষ্টা কোরো প্রমীলাদি—

মালকোঁচা করে ধুতিটা পরা। গায়ে একটা নীল শার্ট। চুল ওলটানো। পায়ে কাবলী জুতো। রেবার বিছানার বান্ডিল আর স্যুটকেসটার পাশে দাঁড়িয়ে রেবার জন্যেই অপেক্ষা করছে। তারপর একটা সাইকেল-রিক্সা ডেকে দুজনে গিয়ে ট্রেনে উঠবে। শৈবলশও একদিন ওমনি করে এসেছিল গৌরীকে নিতে। গৌরীর বিয়ের নিমন্ত্রণের চিঠিও এসেছিল। তারপর আভাও হয়ত একদিন চলে যাবে। অবস্থা খারাপ বলেই এতদিন চাকরি করতে হচ্ছে। কিন্তু তার পর? তারপর শীলা! শীলা আর সে।

কিন্তু এত কথা ভাববার সময় নেই প্রমীলার।

অনেক রাত হয়ে গেছে। বোর্ডিং-এর বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল সে। পশ্চিমের রাত। শুকনো আবহাওয়া। হাওয়া নেই কোথাও। আকাশের দিকে চেয়ে দেখলে। মাটি আর আকাশ যেন এদেশে এসে বন্ধ্যা হয়ে গেছে। অন্তত প্রমীলার কাছে তাই মনে হয়। শীলার মতো সর্বাঙ্গে বৈধব্যের সাজ এখানকার মাটিতে আর আকাশের গায়ে।

ছোট বাড়িতে এত ছাত্রী ধরতো না। তাই সেক্রেটারির বাড়ির পাশে ইস্কুলের নতুন দোতলা বাড়ি তৈরি হয়েছে। ছাত্রী আরো বেড়েছে—প্রমীলার বয়েসের সঙ্গে সঙ্গে দায়িত্ব আরো বেড়েছে। প্রমীলা শরীরের চাপে না-হোক দায়িত্বের চাপে

আরো ভারি হয়েছে ইদানীং। আশেপাশের আরো অনেক শহরে নাম ছড়িয়ে পড়েছে বিলাসপুরের ইস্কুলের আর তার হেড-মিস্ট্রেস প্রমীলা সরকারের।

দূর থেকে হেড-মিস্ট্রেসকে আসতে দেখলে রাস্তার একপাশে সরে দাঁড়ায় ছাত্রীরা। বড় কড়া লোক এই প্রমীলা সরকার।

গার্জেনরা বলে—এই-ই তো ভালো—একটু শাসনের মধ্যে না থাকলে কী ছেলেই বলো আর মেয়েই বলো—সংশিক্ষা পায়—

কিন্তু এত অমায়িক ব্যবহারও আবার আর কারও কাছে পায় না ছাত্রীরা।

বাবা মারা গেছে, ছ'মাসের মাইনে দিতে পারেনি—এমন ছাত্রীকে ফ্রী-শিপ করিয়ে দিতে আর কে পারতো। রায়সাহেব এখন বৃদ্ধ হয়েছেন আরো, নিজের ব্যবসার কাজে আরো সময় পান না—স্বাস্থ্যেও তেমন কুলোয় না। প্রমীলাকেই একলা সেক্রেটারির কাজ, স্কুল-কমিটির সমস্ত কাজ দেখতে হয়। নতুন বিল্ডিং হবে তার কনট্রাক্ট দেওয়া, ইউনিভার্সিটির সঙ্গে ম্যাট্রিকে মেয়েদের পরীক্ষার সেন্টার নিয়ে চিঠিপত্র লেখা, চাকরির অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা—সমস্তই করতে হয় প্রমীলাকে। সেক্রেটারি শুধু তলায় নামসই করে দিয়েই খালাস।

শীলা এল। বললে - প্রমীলাদি, আমার একমাসের ছুটি রেকমেন্ড করতে হবে—

ছুটি !—প্রমীলা অবাক্ হয়ে গেল। গৌরী গেছে, রেবা গেছে। আভাও একদিন বাবার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে চলে গিয়েছিল, আর আসেনি। ভাই নেই, সব ক'টাই বোন। ছ'টি-সাতটি ছোট ছোট বোনের তদবির তদারক, এক কথায়, বোনদের মানুষ করতে একমাত্র আভাই ছিল সকলের মাথার ওপর। এখানে যতগুলো টাকা মাস্টারি আর টুইশ্যানি করে উপায় করতো সব পাঠিয়ে দিত সংসারে। তারও একদিন চিঠি এসেছে। বিয়ে হয়ে গেছে তার। তা হলে শীলারও কি গোপন টান আছে কোথাও ?

শীলার মুখের দিকে ভালো করে চেয়ে দেখলে প্রমীলা। সারা দেহে তার বৈধব্যের প্রশান্তির প্রলেপ। ওকি তবে ছদ্মবেশ! ওর ভেতরেও কি আগুন ছিল!

—প্রাইভেটে এম-এ'টা দেবো—তারপর যদি পারি তো বি-টি'টাও—

শীলাও শেষপর্যন্ত একদিন চলে গেল বিলাসপুরের বোর্ডিং ছেড়ে। অন্য কিছু না হোক, শিক্ষয়িত্রী হিসেবে উন্নতি করবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা তারও আছে। যে একদিন পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিলাসপুরের এই স্কুলে এসে আশ্রয় নিয়েছিল, সামার-ভেকেশনে বোর্ডিং ছেড়ে একরাত্রির জন্যেও যার যাবার কোনও ঠাঁই ছিল না—সে-ই আবার ফিরে গেল যেন তার ফেলে-আসা সংসারে। শীলার ট্রেনটা যখন ছেড়ে গেল, তার পরেও অনেকক্ষণ প্রমীলা সরকার, বিলাসপুরের 'বাণী বিদ্যায়তন'-এর হেড-মিস্ট্রেস, প্লাটফরমের ওপর চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল—

নতুন নতুন মিস্ট্রেস, নতুন ছাত্রী, শহরে অনেক নতুন লোক এসেছে। প্রমীলা বুঝি আজকাল আরো মোটা আর ভারি হয়েছে। আরো মোটা চশমা উঠেছে চোখে। কাজ আরো বেড়েছে—সুনাম বেড়েছে ততোধিক।

সকালবেলা নিয়ম করে সেক্রেটারির বাড়ি একবার ফাইল নিয়ে যেতে হয়। সেখানে প্রায় একঘণ্টা কাটে স্কুলের দৈনন্দিন কাজের রিপোর্ট নিয়ে আলোচনায়। তারপর তাড়াতাড়ি ফিরে এসে এগারোটার মধ্যে স্কুল।

ইতিহাসের ক্লাসে দাঁড়িয়ে প্রমীলা ছাত্রীদের দিকে চেয়ে বলতে থাকে—

"…তোমরা যখন বড় হয়ে গ্রীসের ইতিহাস পড়বে—দেখবে, ট্রয় নামে এক নগরী ছিল—সেই ট্রয় নগরীতে এক বিরাট যুদ্ধ হয়…সেই যুদ্ধের সূত্রপাত সামান্য একটি নারীকে উপলক্ষ্য করে—তার নাম হেলেন…অপরূপ-রূপসী সেই হেলেনের ভুবনবিজয়ী রূপ-ই হলো গ্রীক ইতিহাসের এক রক্তাক্ত অধ্যায়—ঐতিহাসিকেরা বলেন—হেলেনের রূপের আগুনেই ট্রয় নগরী নাকি পুড়ে ছারখার হযে গিয়েছিল …ঠিক তারই পুনরাবৃত্তি হয়েছিল আর একবার আমাদের এই ভারতবর্ষে…পাঠান যুগে…যখন…"

সেক্রেটারি সেদিন বললেন—এবার থেকে আমাকে ছুটি দাও, মা। আমি বৃদ্ধ হয়েছি—আমার ছেলে আসছে বদলি হয়ে, এবার থেকে সে-ই সব দেখা শোনা করবে তোমার কাজ…

রায়সাহেবের একমাত্র ছেলে বহুকাল পরে বদলি হয়ে এখানে আসছে। সরকারী চাকরিতে নতুন কী একটা প্রমোশন পেয়েছে। এতদিন বাইরে বাইবে কাটিয়েছে প্রদ্যোৎ, এবার অনেক তদবির করে বাড়িতে আনিয়েছেন তাকে নিজের জেলায়।

রায়সাহেব কাজ বুঝিয়ে দিয়ে গ্রামের জমিদারিতে গিয়ে বিশ্রাম নিয়েছেন। প্রদ্যোৎ চৌধুরী মানুষটি ভালো। বললেন—বসুন, আমি তো কিছুই বুঝিনা ও-সব—যেমন আপনি করছেন—তেমনই করবেন, আমি শুধু…

স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীও এসেছে। সেদিন হঠাৎ ঘরে ঢুকতেই প্রমীলা চমকে উঠেছে। প্রীতি সেন। পাঁচশো মাইল দূরের বহুদিন আগের বন্ধু, ক্লাস-মেট।

—একি, প্রমীলা তুই—ঝলমল করে উঠলো প্রীতি সেন।

—চেন নাকি এঁকে—প্রদ্যোৎ চৌধুরী স্ত্রীর দিকে মুখ ঘুরিয়ে হাসলেন।

—বা রে, প্রমীলা আমাদের ক্লাসের ইটার্নাল ফার্স্ট মেয়ে—

তারপর কাছে এসে একেবারে প্রমীলার হাত দুটো ধরেছে। সেই প্রীতি সেন। লেখাপড়ায় বরাবর ছিল কাঁচা। ক্লাসে আসতো দেরিতে। একবার পরীক্ষায় নকল করার অপরাধে নাকাল হয়েছিল খুব। তবে একটা গুণও ছিল ওর। মিশুক ছিল ভারি। বাবার পয়সাও ছিল বোধহয় বেশ। ক্লাসময় মেয়েদের রেস্টুরেন্টে খাওয়াতো খুব।

—থাক তোমাদের কাজের কথা, তুই আয় তো প্রমীলা···আয়ে, তুই আমাদের স্কুলের হেড-মিস্ট্রেস, তাকি জানি ছাই—

টানতে টানতে একেবারে নিজের খাস-কামরায় নিয়ে এসেছে প্রীতি। সেক্রেটারির বাড়ির ভেতরে কখনও আসেনি প্রমীলা।

—আয় বোস্ এখানে, এই কোচটায়, ফার্নিচার-টার্নিচার কিছুই এখনও প্যাক্ খোলা হয়নি ভাই—দ্যাখ্ না—ড্রেসিং ব্যুরোটা এখনও এসে পৌঁছুলো না, পিয়ানোটার কী দশা হয়েছে কে জানে—এমন অসুবিধে হচ্ছে—

তারপর সামনে আঙুল দিয়ে দেয়ালের একটা ছবির দিকে দেখালে—ওই তো আমার বড়-মেয়ে বেবি—দেরাদুনে পড়ে—ওইটুকু তো মেয়ে—তুই ওর ইংরেজী গান শুনলে হাসতে-হাসতে তোর পেটে খিল ধরে যাবে—উনি বলেন—

উনি কি বলেন, তা আর বলা হলো না, প্রীতি মিহি গলায় ডাকলে—দায়ি—ও দায়ি—

ঝি আসতেই প্রীতি বললে—আমাদের দু'কাপ চা খাওয়াতে পারিস, দায়ি—আর দ্যাখ্, কালকে বেকারী থেকে কী কী এসেছিল নিয়ে আয় তো আমার কাছে···

অনেক কথা। অনেক হাসি। প্রীতি কথার বন্যায় একেবারে ভাসিয়ে দিলে। প্রীতিকে দেখে মনে হয়, বয়েস যেন প্রীতির অনেক কমে গেছে। এত সুন্দরী তো ও ছিল না আগে! টেবিলের ওপর প্রদ্যোৎ চৌধুরী আর প্রীতির কাঁধে কাঁধ লাগানো একখানা জোড়া ফটোগ্রাফ। কোথায় কোন্ ঘটনাচক্রে এদের দুজনের বিয়ে হলো কে জানে!

—হ্যাঁরে, কত পাস তুই এখানে?

চা এসে গেছলো। চায়ে চুমুক দিয়ে প্রীতি বলে উঠলো। বললে—দাঁড়া আমার অ্যালবামটা তোকে দেখাই···এবার মুসৌরি গিয়েছিলাম সামারে—সেখানে গিয়ে কী কাণ্ড হলো শোন্—

প্রীতি একমিনিট চুপ করে থাকতে জানে না।

প্রমীলা বললে—এবার উঠছি, প্রীতি—

—সে কি রে, না না, আজ ইস্কুল কামাই করে দে—তোর কথা কিছু শোনাই হলো না···

—তা ওই মাইনেতে তোর চলে—?

প্রীতি সহানুভূতিতে একসময়ে শান্ত হয়ে এলো। বললে—তোর জন্যে ভাই আমার দুঃখ্যু হচ্ছে···অত খেটে রাত জেগে লেখাপড়া করলি—বিয়ে-থা'ও হলো না—আর এখন তো যা মোটা হয়েছিস!—ভালো কথা—তোর সেই উত্তম রায় এখনও আমাকে চিঠি লেখে জানিস—আমিও ছেড়ে কথা বলি না জানিস তো—আমি তোকে বলেছিলাম···

প্রমীলা বললে—আচ্ছা, আজ তাহলে উঠি রে…

প্রীতি নিজের কথার জের টেনে বললে—আমিও উত্তমকে বলেছিলাম যে তুমি একটা স্কাউন্ড্রেল—প্রমীলার সঙ্গে তুমি বিশ্বাসঘাতকতা করেছ—

সিঁড়িতে তাড়াতাড়ি নামতে নামতে বললে—ভালো করিনি, কী বলিস তুই—তোর জন্যে সত্যি-ই আমার দুঃখ্যু হয় ভাই—সত্যিই তো আজ তোর এই অবস্থার জন্যে উত্তম ছাড়া আর কে দায়ী বল্—ওর জন্যেই তো তুই…

দরজার কাছে এসে প্রমীলা বললে— আচ্ছা, আসি ভাই—

রাস্তায় নেমে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো সে। কিন্তু তবু প্রমীলার মনে হলো সে যেন আজ বিলাসপুরের সকলের কাছে বড় কৃপার পাত্রী হয়ে উঠেছে। শ্রদ্ধার আসন থেকে নামিয়ে সবাই আজ থেকে তাকে অনুকম্পা করছে। একটি সামান্য কারণে তার সমস্ত শিক্ষা শ্রম নিষ্ঠা ধূলিসাৎ হয়ে গেল এক-নিমেষে। সে যেন আশ্রিত। নেহাত পৃথিবীর কোনও কোণে তার মাথা গোঁজবার জায়গা নেই বলেই এখানে সে মেয়েদের মানুষ করবার অছিলায় স্বেচ্ছানির্বাসন বরণ করেছে। আজ প্রমীলার কাছে এই কথাটাই প্রকট হয়ে উঠলো যে, তার এই হেড-মিস্ট্রেস পদের কোনও গৌরবই নেই, বরং লজ্জা অপমান আর বিড়ম্বনাই কেবল সার হলো তার।

বোর্ডিং-এ এসে মাথাটা খুব ভারি মনে হলো।

—বামুন-দি—

একটা ছোট স্লিপে এক লাইন লিখে দিয়ে বললে—এইটে মালীকে গিয়ে দাও তো, বামুন-দি—বলো ছোট দিদিমণির হাতে গিয়ে যেন দেয়—আর যেন বলে যে আমার শরীর খারাপ, আমি আজ স্কুলে যেতে পারবো না—

সেদিন মাথাটা আর কিছুতেই ছাড়লো না।

সেক্রেটারি সেদিন বোর্ডিং-এ এলেন! বললেন—ডাক্তারকে পাঠিয়ে দেব'খন—এখন তাড়াতাড়ি ইস্কুলে যাবার দরকার নেই, আপনি বরং বিশ্রাম নিন দিনকয়েক—

দিনকয়েক বিশ্রামই নিতে হলো। কিন্তু এ বড় বিড়ম্বনা। বরং সারাদিন কাজের তাগিদে ব্যস্ত থাকা, সে এর চেয়ে অনেক ভালো। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া যায়। নিজেকে ভুলে যেতে পারা যায়। সমস্ত অতীতটা এমন মুখর হয়ে তাকে পীড়া দিতে পারে না।

শেষে একদিন গা-হাত-পা ঝেড়ে উঠলো। এমন করে আর ক'দিন ধ'রে পড়ে থাকা যায় বিছানায়। হঠাৎ বামুন-দি ঘরে এসে একটা চিঠি দিয়ে গেল। নতুন সেক্রেটারির বাড়ি থেকে এসেছে। প্রদ্যোৎ চৌধুরীর মনোগ্রাম-করা খাম।

কিন্তু সেক্রেটারি নয়। লিখেছে প্রীতি :

"…শুনলাম তুই একটু ভালো আছিস……আজকে একবার বেড়াতে

বেড়াতে আয়-না আমাদের বাড়িতে···উত্তম রায়ের একটা চিঠি এসেছে···তাকে লিখেছিলাম যে, তুই এখানে আছিস···সে কী লিখেছে জানিস···যা হোক, তুই এলেই তোকে দেখাব'খন চিঠিটা···আজকে যখনি সময় পাবি একবার আসিস···বুঝলি—"

অপমানে ধিক্‌কারে প্রমীলার কালো মুখ বেগুনি হয়ে উঠলো।

একটা কাগজ-কলম নিয়ে বিকেলবেলাই লিখতে বসলো। লম্বা একটা দরখাস্ত।

সন্ধ্যের পর সেক্রেটারি এলেন।

বেড়াবার ছড়িটা নিয়ে নীচের বসবার ঘরে বসে আছেন। প্রমীলা খবর পেয়ে নীচে নেমে এসে নমস্কার করলে—

সেক্রেটারি বললেন—লম্বা ছুটির দরখাস্ত করেছেন, কিন্তু ইস্কুলের কাজে বড় গোলমাল দেখা দিয়েছে—সেকেন্ড টিচার সব পেরে উঠছেন না···অবশ্য বিশ্রাম আপনার চাই স্বীকার করি···

প্রমীলা বললে—আমার ছুটিটার জরুরী দরকার ছিল—আমি কলকাতায় যাবো—

সেক্রেটারি বললেন—সেইটেই তো মুশকিল হয়েছে, আপনি ছুটিতে থাকলেও দরকারের সময় আপনার কাছে সাহায্য পাওয়া যেতো···কিন্তু কলকাতায় চলে গেলে—

প্রমীলা চুপ করে রইল।

সেক্রেটারি বললেন—অবশ্য দরখাস্তে কিছু কারণ দেননি—বোঝা যায় বিশ্রামই দরকার আপনার—কিন্তু তবু কমিটির কাছে একটা যা-হোক কিছু কারণ···

প্রমীলা মুখ তুললে। তারপর মুখ নীচু করে বললে—আমার বিয়ে—

প্রদ্যোৎ চৌধুরী ধুতি-পাঞ্জাবি পরে ছড়ি নিয়ে হয়ত সান্ধ্যভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। কিন্তু ঠিক এমন ঘটনার মুখোমুখি হবেন ভাবতে পারেননি। তাহলে হয়ত প্রস্তুত হয়ে বেরুতেন। কিন্তু প্রমীলার মনে হলো যেন প্রদ্যোৎ চৌধুরী নয়, প্রীতি চৌধুরীকেই সে তার কথা শোনাচ্ছে।

সেক্রেটারি বললেন—কিন্তু···আমি শুনেছিলাম—

প্রমীলা শেষ করতে দিলে না। সেক্রেটারি কী বলবেন, তা যেন সে আগে থেকেই জানতো। বললে—আপনি ভুল শুনেছিলেন—

প্রমীলার এই হঠাৎ বাঙময় আত্মঘোষণা প্রদ্যোৎ চৌধুরীর কাছে যেমন আকস্মিক, তেমনই অস্বাভাবিক। তাই মুখ দিয়ে তাঁর কোনও কথাই বেরুল না।

প্রমীলাই আবার বললে—গত দশবছরে একদিনও কামাই করিনি বা ছুটি নিইনি—ইস্কুলটা গড়ে তোলবার দিকেই মন ছিল, নিজের কথা আর ভাববার

সময়ই পাইনি, কিন্তু এবার আর এড়াতে পারছি না—তা ছাড়া··· উত্তেজনার চোটে আরও অনেক কথা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু নিজেকে সামলে নিলে।

নাটকীয় ভঙ্গীতে বলা কথাগুলো হুবহু আজই প্রীতি নিশ্চয় শুনবে। প্রদ্যোৎ চৌধুরী দরখাস্ত মঞ্জুর করে দিয়ে উঠলেন।

প্রদ্যোৎ চৌধুরীর গাড়িটা শব্দ করে চলে যাবার পরও প্রমীলা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলো। তারপর সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে থমকে দাঁড়াল। তাকে এখান থেকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে কেউ আসবে না সত্যি। তাকে একলা গিয়েই ট্রেনে উঠতে হবে। তার পর ? তারপর হাওড়া স্টেশনে নেমে ভাবা যাবে কোথায় উঠবে সে।

হাওড়া স্টেশনের প্লাটফরমে যখন প্রমীলা প্রথম এসে নেমেছিল সেদিনও সে জানতো না যে, শেষপর্যন্ত এখানে এসেই আশ্রয় মিলবে তার।

বউবাজারে একটা গলির মধ্যে নোনাধরা ইঁটের পুরনো বাড়িটাতে এতদিন কাটলো কেমন করে, এ কথা প্রমীলা নিজেই ভাবতে পারে না।

ইন্দু-মাসিমা অনেক দেরি করে বাড়ি আসেন। সারাদিন ইস্কুলে পড়ানোর পর চলে যান ছাত্রীদের বাড়ি। একটা, দুটো, তিনটে জায়গায় টুইশ্যানি সেরে ফিরতে একটু দেরি হয়। বিধবা মানুষ। রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার বালাই নেই।

ইন্দু-মাসিমা বলেন—হ্যাঁরে প্রমীলা—কী ঠিক করলি—

জমানো কিছু টাকা সঙ্গে এনেছিল প্রমীলা। বিলাসপুরে বিশেষ খরচ ছিল না—কিছু টাকা জমেছিল। তাও এমন কিছুই নয়। বসে খেলে কুবেরের ভাঁড়ারও শেষ হতে কতক্ষণ লাগে !

প্রমীলা বলে—ভাবছি আর ফিরে যাবো না, মাসিমা—এখানেই একটা চাকরি-টাকরি কিছু যোগাড় করে দিন।

ইন্দু মাসিমা এসেছিলেন হাওড়া স্টেশনে কোন্ ছাত্রীদের ট্রেনে তুলে দিতে। সেইখানেই দেখা। সাত-আট দিন থাকবে, সেইরকম ঠিক ছিল—তার বদলে সাত মাস হয়ে গেল।

রান্নাবান্না করে ইন্দু-মাসিমা দশটার মধ্যেই বেরিয়ে যান। তাবপর প্রমীলাও বেরিয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে অনেকগুলো জায়গায় দেখা করাও হয়ে গেছে। দরখাস্তও পাঠিয়েছে অনেক জায়গায়।

প্রীতি চিঠি লিখেছে—তোর বিয়ের খবর শুনে খুব সন্তুষ্ট হলাম—আগে জানালে যেতাম—কবে আসছিস—দুজনে আসিস—আলাপ করবো—

সেক্রেটারিও একটা চিঠি লিখেছেন—হেড-মিস্ট্রেসের পদটা এখনও খালি রাখাই হয়েছে—প্রমীলার কাছ থেকে সঠিক জবাব পেলে অন্য ব্যবস্থা করবেন—

প্রমীলা অনেক গর্ব করে চলে এসেছিল বিলাসপুর থেকে—আবার সে কেমন

করে সেখানেই ফিরে যাবে !

গৌরী চিঠি দিয়েছে : "প্রমীলাদি, বিয়েতে তো তুমি এলে না···দীপুর অন্নপ্রাশনে নিশ্চয় আসতে চেষ্টা করবে—যদি একান্তই না আসতে পারো—তোমার আশীর্বাদ পাঠিয়ে দিও—"

রেবারা বদলি হয়ে গেছে জব্বলপুরে। নতুন জায়গার বিবরণ জানিয়ে চিঠি দিয়েছে রেবা। নিখিলের নাকি আর একটা প্রমোশন হয়েছে চাকরিতে।

শুভাও ভালো আছে। বিজয়ার নমস্কার জানিয়ে লেখা চিঠিটা এতদিন পরে হাতে এল। সব চিঠিগুলোই বিলাসপুরের পোস্ট-অফিসে ঘুরে এখানে এসেছে।

আস্তে আস্তে সব টাকাগুলো প্রায় ফুরিয়ে এল। অথচ কোনো কিছুর ব্যবস্থা হলো না।

ইন্দু-মাসিমা সেদিন আরো ভাবিয়ে দিলেন—

—ওরে প্রমীলা, খুব মুশকিল হয়েছে রে—আমার চাকরি বোধহয় গেল—

—কী রকম— প্রমীলা ভাবনায় পড়ে গেল।

—এবার রিটায়ার করতে বলছে আমাকে—বলছে, অনেক বয়েস হলো, এবার বিশ্রাম নিন—দ্যাখ্ তো মা, আমার না-আছে সংসার, না-আছে কেউ—সারাজীবন ওই ইস্কুল নিয়েই রইলুম—শেষে কিনা···

তা ইন্দু-মাসিমার তেমন ভাবনা নেই। চাকরি গেলেও ছাত্রীরা ইন্দু-মাসিমাকে সবাই ভালোবাসে। পুরনো ছাত্রীদের কত বড় বড় ঘরে বিয়ে হয়েছে—যার কাছে গিয়ে দাঁড়াবেন, সে-ই মাথায় তুলে রাখবে—

কিন্তু প্রমীলার নিজের ভাবনাটাই বাড়লো সেইদিন থেকে।

একদিন ইন্দু-মাসিমা বললেন—হ্যাঁরে, এমনি করে কাটিয়ে দিলি—বিয়ে-থা'ও করলিনি—

মাসিমা নিজের মায়ের মতন। তাঁর কাছে লজ্জা নেই। ঠাণ্ডা মেজের ওপর শুয়ে-শুয়ে গল্প করছিল প্রমীলা। হারিকেনটা নেভানো। অন্ধকার ঘর। প্রমীলা বললে—করলুম না নয়, মাসিমা—হলো না—

সেদিন আর-এক কাণ্ড ঘটে গেল। এমন করে দেখা হবে ভাবা যায়নি।

—প্রমীলা-দি—

হ্যারিসন রোড আর কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে···

সে-ই আর পাশে আর-একটি স্যুট-পরা লোক। শীলার পরনে শাড়ি, সিঁথিতে সিঁদুর।

—তোমার সঙ্গে এমন করে দেখা হবে ভাবিনি, প্রমীলাদি—কবে এলে বিলাসপুর থেকে ?

যেন শীলার সঙ্গে এমনভাবে দেখা হবে তা প্রমীলাই ভাবতে পেরেছিল !

—জানো প্রমীলাদি, লেক কলেজে প্রফেসারি করছি আজকাল—

তারপর যাবার সময় বললে—এঁর সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিই, প্রমীলাদি—

রাত্রে বাড়ি এসে প্রমীলা বললে—ইন্দু-মাসিমা কাল সকালবেলা ট্রেন—

—সেকি ! কোথায় চললি তুই ?— ইন্দু মাসিমা অবাক হয়ে গেলেন।

– রাজপুতানা—

এত জায়গা থাকতে রাজপুতানার নাম মুখ দিয়ে কেন বেরুল, কে জানে। ইতিহাসের পাতায় তো আরও অনেক দেশের নাম আছে। কিন্তু শীলার সিঁথির ওপর সিঁদুরের শিখাটা তখনও যেন দাউ-দাউ করে জ্বলছে। প্রমীলার মনে পড়লো রাজপুতানার মেয়েরাই তো জহর-ব্রত করতো—ইতিহাসে লেখা আছে।

সেক্রেটারি প্রদ্যোৎ যথারীতি সকালবেলা নিজের অফিস-ঘরে বসে ছিলেন। হঠাৎ সামনে যেন ভূত দেখলেন। কিংবা দেখলেও বুঝি লোক এত চমকায় না।

—একি !— এর বেশি কিছু মুখ দিয়ে বেরুল না তাঁর।

—বসুন—

প্রমীলা বসলো। বললে—আপনি লিখেছিলেন—তাই আবার আমি এলাম—

ভালোই করেছেন—কিন্তু… বেশী কিছু বলতে পারলেন না প্রদ্যোৎ চৌধুরী—

খবর পেয়ে ঝলমল করে দৌড়ে এল প্রীতি। ঘরে ঢুকে সে-ও পাথরের মতো নিশ্চল হয়ে গেছে। প্রমীলার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে কী যে সে বলবে বুঝতে পারলে না। তারপর সামনে এগিয়ে এসে প্রমীলার হাত-দুটো ধরলে।

প্রীতির চোখ দিয়ে জল পড়ছে। বললে—কী করে হলো, ভাই—

প্রীতি প্রমীলাকে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালো। বললে—কী করে হলো, ভাই—

—হঠাৎ হলো—কিছু টের পাইনি— প্রমীলা মাথা উঁচু করে বললে।

প্রমীলা আবার বলতে লাগলো—অমন স্বাস্থ্য—অমন লম্বা-চওড়া চেহারা—কিছুতেই ভাবতে পারিনি—দশবছরে একদিনের জন্যে একটু মাথাধরারও খবর পাইনি—সেই লোক কিনা…

বলতে বলতে প্রমীলা মাথা নীচু করলে।

প্রীতি জিজ্ঞেস করলে—ডাক্তারেরা কী বললে ?

—ডাক্তারেরা আর কী বলবে—কোনও ডাক্তার আর বাকি ছিলনা ডাকতে—সাতদিন সর্বস্ব খুইয়ে ফতুর হয়ে গেলাম—

বোর্ডিং-এ এসে প্রমীলা আবার তার পুরনো ঘরটায় গিয়ে ঢুকলো।

সাদা থান, সাদা শেমিজ, পায়ে সাদা কেড্‌স্‌। পুরনো ছাত্রীরা সবাই এসে

পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে। ভালোই আছে। এবার আর কেউ তো কৃপা করবে না, অনুকম্পা করবে না—সমস্ত সমস্যা থেকে রেহাই পাওয়া গেল। ক্লাসে দাঁড়িয়ে প্রমীলা পড়ায় :

"…তোমরা যখন বড় হয়ে গ্রীসের ইতিহাস পড়বে, দেখবে ট্রয় নামে এক নগরী ছিল—সেই ট্রয় নগরীতে একবার এক বিরাট যুদ্ধ হয়—সেই যুদ্ধের সূত্রপাত সামান্য একটি নারীকে উপলক্ষ্য করে…তার নাম হেলেন…অপরূপ-রূপসী হেলেনের ভুবন-বিজয়ী রূপ-ই হলো গ্রীক ইতিহাসের এক রক্তাক্ত অধ্যায়… ঐতিহাসিকেরা বলেন, হেলেনের রূপের আগুনেই নাকি ট্রয় নগরী পুড়ে ছারখার হয়ে গিয়েছিল…ঠিক তেমনি ঘটনা ঘটেছিল আমাদের দেশে –এই ভারতবর্ষে… আলাউদ্দিন খিলজী পদ্মিনীর রূপে উন্মাদ হয়ে চিতোর রাজ্য আক্রমণ করলে… কিন্তু পদ্মিনী…ঐতিহাসিকেরা বলেন…পদ্মিনীর সেদিনকার আত্মত্যাগের ফলে দেশকে শত্রুর অত্যাচার থেকে তিনি বাঁচাতে পারেননি, কিন্তু তিনি তাঁর আত্মসম্মান রক্ষা করেছিলেন—পদ্মিনী সেদিন জহর-ব্রত করেছিলেন।—জহর-ব্রত কাকে বলে জানো…তুমি জানো…অনুপমা তুমি জানো…উৎপলা তুমি—ইলা তুমি…তুমি…তুমি…তুমি…তুমি…তুমি……"

উত্তেজনায় প্রমীলার কণ্ঠস্বর ক্রমে পরদায় পরদায় উঁচু থেকে আরো উঁচুতে উঠতে লাগলো।

বললাম—না ভাই, ভুল শুনেছ, আমি জীবনে কখনও থিয়েটার করিনি—

সবাইকেই হতাশ করতে হলো। বিলাসপুরের রেল-কলোনির ছেলেরা বড় আশা করে আমার কাছে এসেছিল। তিন দিন ধরে থিয়েটার, নাচ, গান। চাঁদাও উঠেছে বহু টাকা। কোলিয়ারির মালিকরাই দিয়েছে সাতশো। কলকাতা থেকে ড্রেসার পেন্টার আসছে।

আবার বললাম—না ভাই, ভুল শুনেছ তোমরা, আমি জীবনে কখনও অভিনয় করিনি—

কিন্তু ছেলেরা চলে যাবার পর হঠাৎ যেন নিজের অজ্ঞাতে চমকে উঠলাম। তবে কি ছেলেরা অন্তর্যামী! কী করে জানলে ওরা? আমি তো মিথ্যে কথাই বললাম। জানলার বাইরে দেখলাম বুধবারী-বাজারের দিকে ছেলেরা চলে যাচ্ছে। টাউনের রাস্তায় ইলেকট্রিক বাতিগুলো হঠাৎ জ্বলে উঠলো। ডাউন বম্বে-মেল আসবার সময় হয়েছে বুঝি। টাঙ্গাগুলো সওয়ারী নিয়ে ছুটে চলেছে স্টেশনের দিকে। নিজের প্রায়-অন্ধকার ঘরটার মধ্যে বসে কেমন যেন বিভ্রান্ত হয়ে গেলাম। ওদের কাছে আমি মিথ্যে কথাই তো বলেছি। সত্যিই তো অভিনয় করেছি আমি। ছোট এক-অঙ্কে-সমাপ্ত একখানা নাটক। স্টেজ নেই, দৃশ্যপট নেই, ড্রেসার পেন্টার রিহার্শাল কিছুই নেই। তবু তো সেদিন অভিনয় করতে আমার বাধেনি!

ছেলেদের ডাকা হলো না। সেইখানে বসেই যেন মল্লিকমশাইকে স্পষ্ট দেখতে পেলাম চোখের সামনে। মল্লিকমশাই বললেন—কেমন জামাই দেখলে, মুকুন্দ?

বললাম—খাসা, চমৎকার—

মল্লিকমশাই আবার বললেন—আমি জানতুম জয়ন্ত রাজী হবেই, এদিকে চারশো টাকা মাইনে পায়, আর ওইতো বয়েস, এর পর পরীক্ষাটা দিলেই একেবারে অফিসার হয়ে যাবে···কিন্তু তুমি খেয়েছো তো? পেট ভরেছে?

এবারও বললাম—হ্যাঁ—

—মাংসটা কেমন হয়েছিল?

এবারও বললাম—ভালো।···কিন্তু এবার আমি আসি মল্লিকমশাই, এর পর গেলে আর ট্রেন পাবো না হয়ত—

কোনও রকমে মল্লিকমশাই-এর হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে বাইরে আসতেই আদিনাথ ধরেছিল।

বললে—আপনি খেয়ে যাবেন না?

মনে আছে আদিনাথের হাত-দুটো ধরে বলেছিলাম, কিছু মনে কোরো না

তুমি—কিন্তু খেতে আমাকে বোলো না, ভাই—

—অন্তত গরীবের বাড়িতে ডাল-ভাত-চচ্চড়ি—যা জোটে ?

কিন্তু কুড়ি বছর আগের এ-ঘটনা এমন করে মাঝখান থেকে বললেই কি সব বোঝানো যায় ? এখানে এই পাঁচশো মাইল দূরে বিলাসপুর রেল-কলোনির বি-টাইপ কোয়ার্টারে বসেও ঘনায়মান অন্ধকার অতিক্রম করে যেন শাঁখের আওয়াজ শুনতে পেলাম। কুড়িবছর আগের আওয়াজ এখানে পৌঁছুতে কি এত সময় লাগে ? তারপর তো কত দেশ, কত নদী, কত পাহাড় নিঃশব্দে পেরিয়ে এসেছি — কিন্তু সে-দিনের সে-ঘটনা এমন করে ভুলতেই বা পেরেছিলাম কী করে !

তবে গোড়া থেকেই বলি—

হঠাৎ ভৈরবগঞ্জে এসে ট্রেনটা থেমে গেল। শুনলাম—ট্রেন আর যাবে না। এখানেই রইল। কালও যেতে পারে, পরশুও যেতে পারে—কিংবা তার পরদিনও যেতে পারে। ইছামতীর জল বেড়ে রেলের লাইন ডুবে গেছে। জল না নামলে কিছু বলা যায় না।

যে-যার মালপত্তর নিয়ে নেমে পড়ল।

ভৈরবগঞ্জ ছোট স্টেশন। না আছে ওয়েটিং-রুম, না আছে ভালো রকমের প্লাটফরম। না আছে একটা কুলী। টিমটিম করছে একফালি একটা স্টেশন-ঘর। কাঁকর-বিছানো প্লাটফরমের ওপর রাত কাটানো যায় না।

স্টেশনমাস্টার টেলিফোন নিয়েই ব্যস্ত। কথা বলবার সময় নেই তাঁর।

হাত নেড়ে বললেন—এখন মরবার সময় নেই স্যার, তিনখানা আপ, দুখানা ডাউন-গাড়ি সেক্শানে আট্কে গেছে—

তারপর পাশের টিফিন-ক্যারিয়ারটা দেখিয়ে বললেন—ওই স্বচক্ষে দেখুন বাড়ি থেকে হালুয়া করে পাঠিয়েছে—মুখে দিতে পারিনি—

বলে আবার 'হ্যালো হ্যালো' করতে লাগলেন।

চোখে অন্ধকার দেখলাম। বিকেল হয়েছে। এ জায়গায় রাত কাটাবার কথাটা মনে আসতেই ভয় পেয়ে গেলাম। শনিবারের দুপুরবেলা শেয়ালদ' থেকে উঠেছি, আবার সোমবারে ফিরে গিয়ে অফিস করতে হবে।

প্লাটফরমের ওপর দাঁড়িয়ে এই কথাই ভাবছি। হঠাৎ স্টেশনের একপ্রান্তে পাথরের ওপর বড় বড় অক্ষরে 'ভৈরবগঞ্জ' লেখাটা চোখে পড়তেই মনে পড়ে গেল।

ভৈরবগঞ্জ !

এই ভৈরবগঞ্জেই তো মল্লিকমশাই-এর বাড়ি। কতদিন যেতে বলেছেন। কিন্ত কখনও আসা হয়ে ওঠেনি। গ্রামের নামটাও মনে আছে 'ছুটিপুর'। এই ছুটিপুর থেকেই ডেলিপ্যাসেঞ্জারি করতেন মল্লিকমশাই।

বলতেন—একবার তো সময়ই হলো না তোমার মুকুন্দ, কিন্তু মিনুর বিয়ের সময় কোনও ওজর-আপত্তি শুনবো না।

বলেছিলাম—নিশ্চয়ই যাবো মল্লিকমশাই, দেখে নেবেন, মিনুর বিয়ের সময় নিশ্চয়ই যাবো।

তারপর মল্লিকমশাই হতাশাভরে আবার কাজে মন দিতেন—হ্যাঁ, তুমি আর গিয়েছ!

সত্যিই, কত অকাজে কত দিকেই গিয়েছি, কিন্তু মল্লিকমশাই-এর ছুটি-পুরে যাবার আর সুযোগ হয়ে ওঠেনি আমার। হঠাৎ ভৈরবগঞ্জ স্টেশনের প্লাট-ফরমে দাঁড়িয়ে আবার মনে পড়ে গেল মল্লিকমশাই-এর কথা বহুদিন পর।

স্টেশনের পেছনেই একটা পান-বিড়ির দোকানে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

সে বললে—ছুটিপুর? তা পোয়া-তিনেক রাস্তা হবে এখেন থেকে আজ্ঞে—সামনে খাঁটুরোর বিল পেরিয়ে সোজা পেঁপুলবেড়ের আল-পথ ধরে চলে যান,—যাবেন কার বাড়ি?

তারপর অবশ্য সেই বিকেলবেলা দশজনকে জিজ্ঞেস করে-করে গিয়ে পেঁছে-ছিলাম শেষপর্যন্ত ছুটিপুর। চারদিকে সন্ধ্যে নেমে এসেছে তখন। দু'পাশে ধান বোনা হয়েছে, জলে থইথই করছে ক্ষেত। মাঝখান দিয়ে পেছল আলের পথ। অনেক উঁচুতে পৃথিবীর ছাদের ওপর দিয়ে কয়েকটা বিচ্ছিন্ন বাদুড় উড়ে চলেছে দক্ষিণ দিকে। সামনের আমবাগানের ঢালু জমিটার ওপর দিয়ে শেষ গরু-ক'টা জঙ্গলের ছায়ার মধ্যে মিশে গেল। ছুটিপুরে গিয়ে যখন পেঁছুলাম তখন বেশ অন্ধকার।

একজন কৃষাণ-গোছের লোক বললে—এ হলো মালো-পাড়া, মল্লিকমশাই থাকেন পুবপাড়ায়—এই বাঁশঝাড়ের পাশ বরাবর গিয়ে পড়বেন বারোয়ারি-তলায়, তার ডানধার-পানে পুবপাড়া—

চলতে চলতে ভাবছিলাম—বলা নেই কওয়া নেই, হয়ত মল্লিকমশাই খুব অবাক হয়ে যাবেন। একদিন কত পীড়াপীড়ি করেছেন এখানে আসবার জন্যে। তখন আসা হয়নি। সেই মল্লিকমশাই অফিস থেকে রিটায়ার করলেন, ফেয়ার-ওয়েল হলো তাঁর—তখনও কথা দিয়েছিলাম—যাবো মিনুর বিয়েতে, নিশ্চয় যাবো, কথা দিচ্ছি—

মল্লিকমশাই বলতেন—আগের দিন খবর দিও, আমি পুকুরে ঝোরা দিয়ে মাছ ধরিয়ে রাখবো, আর উমেশ ময়রাকে কাঁচাগোল্লার বরাত দিয়ে রাখবো, তাই খাবে—শেষে মিনুর গানও শুনিয়ে দেব—

আশ্চর্য, এই এতখানি পথ হেঁটে বত্রিশ বছর ধরে কেমন করে একটানা চাকরি করে এসেছেন মল্লিকমশাই! ভোরবেলা সাতটা বাজতে বেরুতেন বাড়ি থেকে আর ফিরতেন রাত আটটায়। আর তারই মধ্যে ইঁট পোড়ানো, বাড়ি করা, পুকুর

কাটানো—ক্ষেতখামারের তদারক···

আমার সঙ্গে কেমন করে যে অমন বন্ধুত্ব হয়েছিল কে জানে। অথচ আমি তো প্রায় তাঁর ছেলেরই বয়সী।

মনে আছে প্রথম দিন আমাকে বলেছিলেন—এটা ক্যামেরা নাকি, মুকুন্দ? তুমি নিজে ছবি তুলতে পারো?

তারপর বলেছিলেন—তা দাও-না মিনুর একটা ছবি তুলে ভায়া, ওর ভারি ছবি তোলার শখ—একদিন তুমি চলো আমাদের দেশে—যা দাম লাগে আমি দেব—

ভূধরবাবু বলতেন—মল্লিকমশাই, আপনি যে এত মেয়ে-মেয়ে করেন—মেয়ে তো বিয়ে হলেই পর হয়ে গেল—

ওপাশ থেকে সুধীরবাবু বলতেন—এই দ্যাখোনা আমার জামাই-এর আক্কেলটা, যতবার ছেলে হবে আমার কাছে পাঠাবে, আর মেয়েও তেমনি হয়েছে—আসে আসুক কিন্তু একেবারে খালি হাতে! আমার তো এই মাইনে—সব দিক সামলাই কী করে?

সনাতনবাবু বলতেন—কথাতেই তো আছে—জন-জামাই-ভাগনা তিন নয় আপনা—

বুঝতে পারতাম মল্লিকমশাই কথাগুলো শুনে অপ্রসন্ন হতেন। চুপি চুপি বলতেন—জয়ন্ত আমার সেইরকম জামাই নাকি তোমরা ভাবো, অমন ছেলে হাজারে একটা মেলে না—

জিজ্ঞেস করলাম—আপনার মেয়ের কি বিয়ে হয়ে গেছে নাকি?

মল্লিকমশাই বললেন—তা একরকম হওয়াই বলতে পারো—শুধু দেরি হচ্ছে ওর চাকরির জন্যে—সীতানাথবাবুকে বলে আমিই তো ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম ইছাপুরে, সেখান থেকে বদলি হয়েছে জব্বলপুরে, এইবার একটা প্রমোশন হলেই ফোরম্যান একেবারে—

বললাম—তা হলে বিয়েটা করে রাখতে দোষ কী?

মল্লিকমশাই বলতেন—আমিও তো তাই বলি—সেবার ছুটি নিয়ে সেই কথা বলতেই গিয়েছিলাম জব্বলপুরে, বেশ জায়গা, সাহেবদের বাঙলো পেয়েছে, চাকর-বাকরে রান্না করে—আমি বললাম—কেন তোমার এসব হাঙ্গামা করা, মিনু এলে একদিনেই তোমার ঘর-সংসারের শ্রী বদলে যাবে—কেউ নেই তোমার সংসারে, তুমি কার পরোয়া করবে? তা, কী বলে জানো?

বললাম—কী?

—বলে—টাকা জমাচ্ছি আমি, বিয়েতে আপনাকে একপয়সা খরচ করতে দেব না, কাকাবাবু।

—আপনি কী বললেন?

—আমি আর কী বলবো, আমি চলে এলাম, তা তুমি কী ভাবছো আমি কিছু খরচ না-করে পারি? আমার তো এদিকে সব তৈরি, সেদিন যে ইট পোড়ালাম, সে বাড়ি তো জামাই-এর জন্যেই—সব তৈরি—খাট, আলমারি, ড্রেসিং আয়না, ষোলোভরির গয়না পর্যন্ত গড়িয়ে রেখেছি—দানের বাসন কিনেছি এক একটা করে, গায়ে-হলুদের কাপড় পর্যন্ত কিনে রেখেছি—মিনুর মা নেই, আমাকেই তো সব করতে হবে—সাধে কি আর বলি, জামাই তো অনেকেরই দেখছো—আর বিয়ের সময় আমার জামাইকেও দেখো—খবর দেব তোমাকে—

সুধীরবাবু বলতেন—তুমি ওই বুড়োর কথা বিশ্বাস করো নাকি, মুকুন্দ আজ পাঁচবছর ধরে শুনে আসছি ওই এক কথা। আমি কতদিন বলেছি—একটা ভালো পাত্র আছে, আপনার মেয়ের সঙ্গে দিন দিয়ে, আপনার মেয়ে সুন্দরী একটা পয়সা নেবে না; তা উনি বলেন—না, মেয়ের আমার পাত্র ঠিক হয়ে আছে—

একদিন সরাসরি বলেই ফেলেছিলাম—আচ্ছা মল্লিকমশাই, ভগবান না করুন—যদি জয়ন্ত শেষপর্যন্ত বিয়ে না-ই করে—এতদিন হয়ে গেল—

মল্লিকমশাই-এর কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাস। বলতেন—তুমি বলো কি মুকুন্দ, জয়ন্তকে আমি চিনি না! আমি ওকে মানুষ করলাম, ছোটবেলায় বাপ-মা মারা গিয়েছিল, আমি না দেখলে, ও কি বাঁচতো? ইস্কুলের মাইনে দিয়ে পড়িয়ে চাকরিতে ঢোকানো ইস্তোক সব যে আমি করেছি—নইলে ধর্মে ওর সইবে—মাথার ওপরে ভগবান বলে একজন আছেন তা মানো তো?

সুধীরবাবু সব শুনে বললেন—শুনলে তো, এখন কী জবাব দেবে দাও—

তারপর একটু থেমে বললেন—ওর মেয়েটি কিন্তু ভারি সুশ্রী ভাই, লক্ষ্মী প্রতিমার মতো চেহারা, এমন চমৎকার তার ব্যবহার, একবার দেশে গিয়ে দেখেছিলাম। জয়ন্ত গান ভালোবাসে বলে মেয়েকে উনি মাস্টার রেখে গান শিখিয়েছেন, জয়ন্ত ভালো-মন্দ খেতে ভালোবাসে বলে নানান্ রকমের রান্না শিখিয়েছেন—

এক এক দিন দেখতাম মল্লিকমশায় মনোযোগ সহকারে চিঠি লিখছেন।

আমি কাছে যেতেই বললেন—জয়ন্তকে আর একটা চিঠি লিখলাম—

বললাম—আগেকার চিঠির উত্তর পেয়েছেন নাকি?

বললেন—না, সেইজন্যেই তো লিখছি আবার—

—আপনার চিঠির উত্তর দেয় না, এটাই বা কী রকম?

—তা ভাই, এ তো আর আমাদের মতো কেরানীগিরির চাকরি নয়, অফিসে বড় খাটুনি ওর, সময়ই পায় না—

তবু কখনও মনে পড়েনা জয়ন্ত একটা চিঠিরও উত্তর দিয়েছে।

একদিন এমনি করে রিটায়ার করবার দিনও এল। চাঁদা তুলে ফেয়ারওয়েল

দেওয়া হলো মল্লিকমশাইকে। যাবার দিন মল্লিকমশাই-এর চোখে জল এসে গিয়েছিল। বত্রিশ বছরের সম্পর্ক ছাড়তে কষ্ট হয় বৈকি! আমাকে একান্তে ডেকে নিয়ে বলেছিলেন—মিনুর বিয়েতে তোমার যাওয়া চাই কিন্তু ভাই—

আমি বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলাম। বললাম—দিনস্থির হয়ে গেছে নাকি?

—ওই দিনস্থির করাটুকুই যা বাকি—নইলে বিয়ে ওদের একরকম হয়েই গেছে ধরে নিতে পারো, ওদের ছুটি পাওয়া খুব শক্ত কিনা, বিয়ের ছুটি তা-ও দেবেনা বেটারা, তা বলাও যায় না, একদিন হয়ত হুট করে এসে বলতে পারে—এখুনি বিয়ে হয়ে যাক, একদিনের ছুটি হয়ত মেরে-কেটে পেয়েছে।

বললাম—একদিনের মধ্যে সব যোগাড়-যন্ত্র করতে পারবেন?

মল্লিকমশাই এবার হেসে ফেলেছিলেন—যোগাড় তো সব করেই রেখেছি ভায়া, মায় ফুলশয্যার বন্দোবস্তও শেষ—শুধু কাঁচা বাজারটা, তা সে আমার ভাইপো আদিনাথ আছে, সব করে ফেলবে সে।…

এসব পাঁচবছর আগের ঘটনা। মল্লিকমশাই রিটায়ার করবার পরও পাঁচ-বছর কেটে গেছে। আর দেখা হয়নি তাঁর সঙ্গে। জানি বেঁচে আছেন। এই পর্যন্ত।

ভাবছিলাম—এতদিন পরে, বলা নেই কওয়া নেই, হাঠাৎ আমাকে কেমন ভাবে গ্রহণ করবেন কে জানে!

কিন্তু পুবপাড়ায় পৌঁছে আর বেশী দেরি হলো না। ছাড়া-ছাড়া বাড়ি, চারিদিকে গাছপালার জঙ্গল। বেশ ঘন হয়ে এসেছে অন্ধকার। কাছাকাছি কোনো বাড়িতে ঢোল আর শানাই বাজছে, ঘন ঘন শাঁখের আওয়াজও আসছে। বোধহয় কোনো উৎসব চলেছে কোথাও।

বাড়ির সামনে গিয়ে ডাকতেই একজন বেরিয়ে এল।

বললে—মল্লিকমশাই? তাঁর তো অসুখ—

বললাম—অসুখ! কী অসুখ?

—অসুখ—মানে…

ছেলেটি যেন কেমন আমতা-আমতা করতে লাগল।

তারপর বললে—আপনি কোথা থেকে আসছেন?

বললাম—কলকাতা। বলোগে মুকুন্দ এসেছে। বি-এন-আর অফিস থেকে—

অফিসের নাম শুনে যেন কেমন উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলো ছেলেটি।

জিজ্ঞেস করলাম—তোমার নাম কী?

—আদিনাথ।

—তুমি কি মল্লিকমশাই-এর ভাইপো?

আদিনাথ আশ্চর্য হয়ে গেছে। বললে—জানলেন কী করে?

বললাম—আমি জানি সব—কিন্তু মল্লিকমশাই-এর সঙ্গে আমার দেখা করতেই হবে—

—কিন্তু…

আদিনাথ তবু যেন কেমন দ্বিধা করতে লাগলো।

বললে—তিনি চোখে দেখতে পান না—

—সেকি !— আমার তখন বিস্ময়ের আর অন্ত নেই।

—হ্যাঁ, আজ চারবছর অন্ধ হয়ে গেছেন, শুধু চুপচাপ বসে থাকেন নিজের ঘরে—

বললাম—তা হোক, আমাকে তিনি অনেকবার এখানে আসতে বলেছেন— —একবার দেখা না-করে যাবো না—

আদিনাথ তবু যেন কোনো উৎসাহ দেখায় না। কিন্তু এবার অন্ধকারের মধ্যেও দেখতে পেলাম তার মুখখানা যেন ফ্যাকাশে হয়ে এল। হারিকেনের মৃদু আলোয় তার দু'চোখের পাতাগুলো কেমন ছলছল করছে।

হঠাৎ কান্নার মতন করে যেন আদিনাথ কাকিয়ে উঠলো।

বললে—আপনি যেন কিছু বলবেন না তাঁকে—কাকাবাবুর হার্ট বড় দুর্বল। ডাক্তারে কেবল বিশ্রাম নিতে বলেছে—আপনার পায়ে পড়ি, আপনি…

হঠাৎ ছেলেটির এই ব্যবহারে কেমন স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। এই স্বল্পালোকিত পরিবেশে, চারদিকে ঝিঁঝিপোকার শব্দ আর অদূরের ঢোল আর শানাইয়ের মূর্ছনার সঙ্গে একমুহূর্তে সমস্ত অতীত থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লাম।

আদিনাথ বললে—চলুন, নিয়ে যাচ্ছি আপনাকে, কিন্তু আপনি যেন কিছু বলবেন না—

আমি মন্ত্র-চালিতের মতো পেছন পেছন চলতে লাগলাম। সদর দরজা পেরিয়ে বাড়ির অন্দরমহলেও কোনো লোকজনের সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। যেন মৃত্যুপুরীর অলিন্দ দিয়ে আমি কোন্ অনাবিষ্কৃত অনন্তের সন্ধানে চলেছি।

আমি সামনে এগিয়ে একবার বললাম—বাড়িতে কোনও বিপদ চলছে নাকি ?

আদিনাথ হাতের সঙ্কেত করে বললে—চুপ, কাকাবাবু শুনতে পাবেন—

তারপর একটা ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। গলা নীচু করে বললে—উনি যা বলবেন আপনি 'হ্যাঁ' বলে যাবেন—আপনার পায়ে পড়ি, আমাদের বাঁচাবেন—

বললাম—কী হয়েছে ? কিছুই বুঝতে পারছি না যে—

আদিনাথ তেমনি গলা নীচু করে বললে—আর চেপে রাখা যাচ্ছিল না— আপনাকে সব বলবো পরে—কাকাবাবুর মেয়ের আজকে বিয়ে…

আমি রুদ্ধনিশ্বাসে বললাম—কার ? মিনুর ?

আদিনাথ কী যেন উত্তর দিতে যাচ্ছিল। কিন্তু বাধা পড়লো। ঘরের ভেতর থেকে মল্লিকমশাই এর গলা শোনা গেল—কে ? কে ? কে ওখানে কথা কয় ?

আদিনাথ আমাকে নিয়ে ঘরে ঢুকে পড়লো। বললে—আমি,—কাকাবাবু!

- সঙ্গে কে? কার সঙ্গে কথা বলছিলে?

—ইনি এসেছেন মিনুর বিয়েতে কলকাতা থেকে। আপনি বলেছিলেন নিমন্ত্রন করতে—বি-এন-আর অফিসের লোক।

সঙ্গে সঙ্গে মল্লিকমশাই উত্তেজিত হয়ে উঠলেন—কে?—সুধীর? সনাতন? মুকুন্দ?

এগিয়ে গিয়ে বললাম—মল্লিকমশাই, আমি মুকুন্দ।

আমার উত্তরটা শুনেই মল্লিকমশাই যেন উত্তেজনায় আনন্দে উঠে বসবার চেষ্টা করতে লাগলেন। বললেন—মুকুন্দ! মুকুন্দ তুমি এসেছ? —আর, ওরা এল না—সুধীর, সনাতন?

আদিনাথ এগিয়ে গিয়ে বললে—ইনি বলছিলেন, ওঁদের আসবার ইচ্ছে ছিল কিন্তু অফিসে ছুটি পাননি।

এবার ঘরের ভেতরে ভালো করে চেয়ে দেখলাম। মল্লিকমশাই একটা তক্তপোশের ওপর চিত হয়ে শুয়ে আছেন। সমস্ত শরীরে চাদর ঢাকা। মাথার পাশে টেবিলের ওপর একটা হারিকেন জ্বলছে। কয়েকটা ওষুধের শিশি, জলের গ্লাস।

আমি কথা বলতে চেষ্টা করলাম—আপনার চোখ খারাপ হয়েছে জানতাম না তো।

মল্লিকমশাই হাসলেন। বললেন—বয়েস হয়েছে, যাবারও সময় হয়ে এল মুকুন্দ, কিন্তু তার জন্যে আমার দুঃখ্যু নেই, আমার মিনুর বিয়েটা যে শেষ-পর্যন্ত হলো, তাতেই আমার সব দুঃখ্যু মিটে গেছে, ভায়া—

তারপর থেমে বললেন—তুমি যে এসেছ মুকুন্দ, আমি তাইতেই ভারি খুশি হয়েছি। চিঠি ঠিক সময়ে পেয়েছিলে?

আদিনাথ আমার দিকে চাইলো।

আমি বললাম—হ্যাঁ, চিঠি ঠিক সময়ে পেয়েছিলাম, আমি আপনাকে কথা দিয়েছিলাম মিনুর বিয়েতে আসবো—

মল্লিকমশাই এবার বললেন—আদিনাথ—মুকুন্দকে তুমি ফার্স্ট ব্যাচেই খাইয়ে দেবে। ওর যাবার ট্রেনের সময়—

আমি কেন জানিনা বলে ফেললাম—আমার খাওয়া হয়ে গেছে, মল্লিকমশাই।

মল্লিকমশাই যেন তৃপ্তি পেলেন; শুনে বললেন—ভালোই করেছ। মাংসটা কেমন খেলে? আর, উমেশ ময়রার কাঁচাগোল্লা?

বললাম—খাসা—চমৎকার।

মল্লিকমশাই বললেন—আদিনাথ, তুমি নিজে খাবার সময় কাছে ছিলে তো?

আদিনাথ টপ করে বললে—হ্যাঁ কাকাবাবু, আমি নিজে খাইয়েছি ওঁকে—

মল্লিকমশাই আবার বললেন—বর দেখলে, মুকুন্দ—জয়ন্তকে দেখলে ? কেমন জামাই করেছি বলো ? তখন তো সবাই তোমরা ঠাট্টা করতে ? বলতে জয়ন্ত বিয়ে করবে না—কিন্তু মাথার ওপর একজন ভগবান আছেন এ-কথা মানো তো ? তোমরা আজকালকার ছেলে ভগবান-টগবান মানো না—কিন্তু আমার অসীম বিশ্বাস ছিল ভাই, ছোটবেলা থেকে।

তারপর একটু থেমে আবার বললেন—ওই-যে যে-বাড়িতে বসে তুমি খেলে, ওই বাড়িটাতেই বিয়ের ব্যবস্থা করলাম ভাই, ওটা দিয়ে যাবো মেয়ে-জামাইকে, আর এই বাড়িটে হচ্ছে আমার পৈতৃক, শরীরটা খারাপ বলে ওইসব হাঙ্গামার মধ্যে আমি আর গেলাম না—আমি আদিনাথকে বললাম—আমি নিরিবিলিতে এখানেই থাকবো—তা আদিনাথ একাই সব করছে—

বললাম—ভালোই করছেন—

মল্লিকমশাই বললেন—দ্যাখো ভাই, ভগবানের ওপর অসীম বিশ্বাস ছিল বলে বরাবর আমি বিশ্বাস করতুম জয়ন্ত রাজী হবেই—এদিকে চারশো টাকা মাইনে পায়, আর ওই তো বয়েস, এবার ফোরম্যান হয়েছে, এর পর একটা পরীক্ষা দিলেই একেবারে অফিসার হয়ে যাবে—তা জয়ন্তকে আমি কিছু খরচ করতে দিইনি—প্রভিডেন্ট ফাণ্ডে আমি পনেরো হাজার টাকা পেয়েছিলাম জানো তো. সেটা সব খরচ করলাম মিনুর বিয়েতে—

তারপর আদিনাথকে লক্ষ্য করে বললেন—আদিনাথ, ওদিকে কোনো গোল-মাল হচ্ছেনা তো ? সব দিকে নজর রাখবে, কেউ যেন না-খেয়ে চলে যায় না—টাকার জন্যে ভেবো না—

আদিনাথ বললে—না, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন কাকাবাবু, আমি সব দেখছি—

আমি আর স্থির থাকতে পারছিলাম না। বললাম—এবার আমি আসি মল্লিকমশাই, এরপর গেলে আর ট্রেন পাবোনা হয়ত—

মল্লিকমশাই বললেন—আচ্ছা, এসো ভাই—খুব কষ্ট হলো তোমার।—আদিনাথ, মুকুন্দর যাওয়ার বন্দোবস্ত করে দিও—

সেই নিঃসঙ্গ ঘরের মধ্যে মল্লিকমশাইকে রেখে সোজা উঠে বাইরে এলাম। তারপর অন্ধকারে পা ফেলে-ফেলে একেবারে সদর দরজার কাছে এসে পৌঁছুলাম। আমার যেন নিশ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছিল। চেয়ে দেখি আদিনাথও হারিকেনটা নিয়ে সংগে সংগে এসে দাঁড়িয়েছে পেছনে।

আদিনাথও যেন আমার মতো নির্বাক্ হয়ে গেছে।

তার চোখে চোখ পড়তেই দেখলাম আদিনাথ কাঁদছে।

মুখ দিয়ে যেন কিছু বলতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু কথা বেরুল না।

আদিনাথ-ই মুখ খুললে। বললে—আপনি যেন কাউকে কিছু বলবেন না!

এতক্ষণে রাস্তায় নেমে এসেছি। বাইরে অন্ধকার। চারদিকে বাঁশঝাড় আর জঙ্গল। কোনও দিকে কিছু স্পষ্ট দেখা গেল না। শুধু অদূরের ঢোল-শানাইয়ের শব্দ ভেসে আসছে। দু'-একবার শাঁখও বেজে উঠছে। মনে হলো— শানাইটা বিনিয়ে বিনিয়ে কেবল বুঝি বিসর্জনের সুরই বাজাচ্ছে।

হঠাৎ মুখ ফেরালাম।

আদিনাথও আমার দিকে চেয়ে থমকে দাঁড়ালো।

বললে—আপনি খেয়ে যাবেন না?

মনে আছে আদিনাথের হাত-দুটো চেপে ধরেছিলাম। বলেছিলাম—কিছু মনে কোরোনা তুমি—কিন্তু এর পর খেতে আমাকে তুমি বোলোনা, ভাই—

—অন্তত গরীবের বাড়িতে ডাল-ভাত-চচ্চড়ি যা জোটে—

সেদিন অভুক্ত অবস্থায়ই চলে এসেছিলাম মনে আছে। বারোয়ারি-তলা পর্যন্ত আদিনাথ আমাকে এগিয়ে দিতে এসেছিল। আমাকে স্টেশন পর্যন্ত এগিয়ে দিতে আসছিল। কিন্তু আমি বারণ করেছিলাম।

বললাম—তোমাকে আর আসতে হবেনা ভাই, তুমি মল্লিকমশাইকে গিয়ে দ্যাখো—

আদিনাথ বলেছিল—কিন্তু, কাকাবাবু জানতে পারলে রাগ করবেন—

—কিন্তু জানাবে কেন তাঁকে?

এ-কথার উত্তরে আদিনাথ কোনো জবাব দেয়নি। আমার দিকে চেয়ে কেমন যেন কোনও নতুন প্রশ্নের অপেক্ষা করছিল।

আমি আর কৌতূহল দমন করতে পারলাম না। বললাম—জয়ন্ত কি চিঠি দিয়েছিল তোমাদের—শেষ পর্যন্ত?

আদিনাথ বললে—না, কাকাবাবুর একখানা চিঠিরও জবাব দেয়নি—

—সে কি জব্বলপুরেই আছে? একবার গেলেনা কেন সেখানে?

—গিয়েছিলাম। কিন্তু দেখা হয়নি—

—কেন?

—তার চাকর ঢুকতেই দিলেনা বাড়ির ভেতর। দুটো কালো-কালো কুকুর তাড়া করে এল কামড়াতে—

—তার চাকর কী বললে?

—চাকরটা বললে—মেমসাহেব মানা করে দিয়েছে। আমিও শুনলাম জয়ন্ত এক মেমসাহেবকে বিয়ে করেছে, ছেলেও হয়েছে—

—তার পর—? যেন নিজেও হতবুদ্ধি হয়ে নির্বোধের মতো প্রশ্ন করে বসলাম।

আদিনাথ বললে—তারপর আর কি, কাকাবাবুও অবুঝ, তাঁরও হার্ট খারাপ হয়ে গেছে,—এ-খবর দিতে পারিনি তাঁর কাছে। ডাক্তারবাবু বারণ করে-

ছিলেন—। কিন্তু আর বেশিদিন চেপে রাখাও যাচ্ছিল না—ওঁকে বাঁচাবার জন্যে এই পথ নিতে বাধ্য হলাম, এ ছাড়া আর গতিও ছিল না—আমার মা এই বুদ্ধি-ই দিলেন—

বারোয়ারি-তলার বিরাট বিরাট বটগাছের তলায় কেমন নির্বোধের মতন খানিক চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। আশেপাশে চারদিকে পাকা-পাকা ফলগুলো টপ টপ করে পড়ছে। মনে হলো—যেন কারও চোখের-জল-পড়ার শব্দ ওটা। তবে কি নির্জীব গাছটাও সব জানে! চেয়ে দেখলাম—আদিনাথ তখনও কাঁদছে। মনে পড়লো—মল্লিকমশাই বলেছিলেন—'মাথার ওপর ভগবান বলে একজন আছেন, তা মানো তো?'

হঠাৎ বললাম—এবার আসি, ভাই—

আদিনাথ হারিকেনটা উঁচু করে ধরলো।

সে-আলোয় সামনের পথটা একটু ঘোলাটে হয়ে এল।

হঠাৎ ফিরে দাঁড়ালাম। যে-মেয়েটিকে নিয়ে এত-কিছু কাণ্ড, এত মুখর অভিনয়, তার কথা তো এতক্ষণ একবারও মনে আসেনি। মল্লিকমশাই-এর দিকটাই সবাই দেখেছে। কিন্তু তার কথা তো কেউ ভাবছে না। ওই ঢাক-ঢোল শানাইয়ের মূর্ছনা আর শাঁখের মঙ্গলধ্বনির অন্তরালে সে-ও কি একজন অন্যতম অভিনেত্রী হয়েই আছে? জয়ন্তর জন্যে তার গান শেখা আর রান্না শেখার কৃচ্ছ্র সাধনের ইতিহাস কি আজ এই পরিণতির জন্যে প্রস্তুত ছিল? মনে হলো—ও বটফল নয়, ও যেন সেই মেয়েটিরই চোখের জল—আমাদের আশেপাশে চারদিকে টপ টপ করে ঝরে পড়ছে। ওকে শুধু জয়ন্তই উপেক্ষা করেনি—মল্লিকমশাই আদিনাথ, আদিনাথের মা—সকলের কাছেই সে উপেক্ষিতা।

আদিনাথ আলোটা উঁচু করে তখনও দাঁড়িয়ে ছিল।

কাছে গিয়ে বললাম—আর…আর…

আদিনাথ আমার দ্বিধা ভেঙে দিয়ে বললে—বলুন—

—আর সেই মল্লিকমশাই-এর মেয়ে? সে জানে?

আদিনাথ বললে—মিনুর কথা বলছেন? তার মত আছে, সে তো কাকাবাবুর মতো অবুঝ নয়! তা ছাড়া এ-পাত্রও তো খারাপ নয়, দেড়শো বিঘে ধানজমি আছে, এক বিঘের ওপর জমিতে বাস্তুবাড়ি, বছরের খাবার ঘরেই হয় শুধু আগের পক্ষের একটা মেয়ে আছে—তা এত কাণ্ডের পর একজন যে রাজি হয়েছে, এই তো সৌভাগ্য বলতে হবে মিনুর পক্ষে—

বংশীর মুখখানা পাংশু কঠিন হয়ে এসেছে। চোখ-দুটো স্থির। এখনি যেন স্খলিতমূল গাছের মতো ভেঙে পড়বে! ভয়ার্ত মুখখানা এক বীভৎস দৃশ্যের মতো স্মৃতির পরদায় আনাগোনা করে। সেই মুখখানাকে স্মরণ করতে গিয়ে এই মধ্যরাত্রির অন্ধকারেও সুপ্রিয় শিউরে উঠলো।

সুপ্রিয়র জীবনে প্রথম ফাঁসির হুকুম।

আগেও খুনের আসামী এসেছে। মেয়েমানুষের রেষারেষি নিয়ে দুই বন্ধুর খুনোখুনি। যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের হুকুম দিতে হয়েছিল সেবার। কিন্তু সে তবু ভালো। তবু এই পৃথিবীর আলো-বাতাসের সংস্পর্শ পাওয়া যাবে। পরমায়ু হয়ত ক্ষয় হবে, কিন্তু দম বন্ধ করে আইনের দোহাই দিয়ে হত্যা—সে বড় ভীষণ! ফাঁসি কখনও দেখেনি সুপ্রিয়। ফাঁসির আসামীরা ফাঁসির সময় কী ভাবে কে জানে। শেষমুহূর্তে কত হাস্যকর অনুরোধ করে ফাঁসির আসামীরা। কে একজন ফাঁসির আগের দিন চেয়েছিল একছড়া ফুলের মালা, একটা আদ্দির পাঞ্জাবি আর একশিশি আতর।

কিন্তু আর ভাবা যায় না। সমস্ত মাথাটা যেন পাথরের মতো ভারি হয়েছে। ফাঁসির রায় দেবার পর সুপ্রিয় আইন-মাফিক চোখ-দুটো বন্ধ করেছিল, তারপর তার দোয়াত আর কলম সরিয়ে নিয়েছিল ওরা। কিন্তু তিনটে অ্যাসপিরিনের বড়ি খেয়েও সমস্ত শরীর যেন কেমন অসহনীয় হয়ে উঠেছে! সন্ধ্যাবেলায় বাড়িতে আর থাকতে পারেনি সুপ্রিয়। চা খেয়েই একলা বেরিয়ে পড়েছে। নদীর ধারের নিরিবিলিতে ঠাণ্ডা হাওয়ায় মাথাটা হালকা হওয়ারই কথা। কিন্তু এই এখানেও বংশীর পাংশু কঠিন মুখখানার চেহারা মনে পড়ে! চোখ-দুটো স্থির। এখনি এই অন্ধকারের দৃশ্যপটে বংশীর সহস্র মুখ যেন নিঃশব্দে অট্টহাস্য করে উঠছে!

কাল সারা রাত জেগে রায় লিখেছিল সুপ্রিয়। তারপর আজকের বংশীর আর্তনাদ আর চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল পড়া। ঠিক তারপর থেকেই সুরু হয়েছে মাথাধরা।

কিন্তু বিচারে যদি ভুল হয়ে থাকে! দণ্ডবিধির সূক্ষ্ম বিচারে যদি কোথাও গলদ থেকে থাকে। এমন হতে পারে, পুলিশ মিথ্যে সাক্ষী সাজিয়েছে। তা অবশ্য হবে না। কিন্তু এমন হতে পারে—খুন করার ইচ্ছে হয়ত বংশীর ছিল না। শুধু প্রতিহিংসার বশে ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল বংশী আর মারাত্মক-ভাবে আঘাত করেছিল লক্ষ্মণকে! ওই একটু তফাতের জন্যে বংশীর বেঁচে থাকা আর মরার প্রশ্ন নির্ভর করছে।

পকেট থেকে সিগ্রেট কেস বার করে একটা সিগ্রেট ধরালে সুপ্রিয়।

এই প্রথম ফাঁসির হুকুম! চাকরিতে প্রোমোশন পেয়ে প্রথম মামলা। আজ প্রমীলার সঙ্গে ভালো করে কথা বলেনি সুপ্রিয়। কোথায় বংশীর বউ বাসন্তী হয়ত খুব কাঁদছে। সাক্ষ্য দিতে এসেছিল বাসন্তী। কাঠগড়ায় বংশীর দিকে চেয়ে হাউহাউ করে কেঁদে উঠেছিল।

জেরায় বাসন্তী বলেছিল—সব দোষ আমার হুজুর, আমাকে নিয়েই ওদের গণ্ডগোল—আমাকে জেলে দিন, হুজুর—

সিগ্রেটের শেষ অংশটুকু ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সুপ্রিয় বাড়ির দিকে ফিরলো।

এ-দিকটা নির্জন। বড় বড় শিশুগাছ দু'পাশে। মাঝখান দিয়ে অন্ধকার রাস্তা। জনহীন রাস্তায় চলতে চলতে সুপ্রিয়র যেন মনে হলো পেছনে নিঃশব্দ পদে কে তাকে অনুসরণ করছে। অথচ সত্যি-সত্যি তো আর ফাঁসি বংশীর হয়নি এখনও। এখনও অনেক সূর্যের অনেক আলোর তাপ পড়বে এই পৃথিবীর ওপর। অনেক বায়ু নিশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করবে বংশী দাস।

এখানে এসে রাস্তাটা বাজারের দিকে ঘুরে গিয়েছে। ওদিকে উকিল-পাড়া। ভবনাথবাবু বংশী দাসের পক্ষ নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু সাক্ষ্য-প্রমাণে এমন কিছুই ছিল না, যাতে বংশী দাসকে বাঁচানো যায়। কিন্তু সুপ্রিয়র ক্ষমতা কতটুকুই বা!

সাক্ষী ভূষণ গাজীর কথাগুলোও মনে পড়লো। সে দেখেছে সব। তিনবার ছোরা চালিয়েছিল বংশী দাস লক্ষ্মণের বুকে! তারপর বাড়ি ফিরে গিয়ে হঠাৎ কী মনে হয়েছে বংশীর। জামা-কাপড় বদ্‌লে আবার বেরিয়েছে—

বাসন্তী বলেছিল—ভাত বেড়েছি—খেয়ে যাও—

—দাঁড়া আসছি— বলে বংশী নাকি আবার এসেছিল এইখানে। এই শিশু-গাছের জঙ্গলের পথে। তার পর সেই মৃত লক্ষ্মণের দেহটা নিয়ে···

—নমস্কার—'

চম্‌কে উঠেছে সুপ্রিয়। ভবনাথবাবু সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। সুপ্রিয়ও দু'হাত তুলে নমস্কার করলে।

ভবনাথবাবু বললেন—একটা কথা ছিল স্যার, আপনার সঙ্গে—

সুপ্রিয় কৌতূহলী দৃষ্টিতে চাইলে। বংশী দাসের কথা! বংশী দাসের সঙ্গে জেলে দেখা করতে চেয়ে ওর বউ কাল নাকি দরখাস্ত করেছিল। তা সুপ্রিয় কী করতে পারে! বংশী দাস জেলখানায় আছে পুলিশের হেফাজতে। এখন বংশী দাসের জীবন ভারি দামী! অত্যন্ত যত্ন আর অত্যন্ত সাবধানতা নেওয়া হবে বংশী দাসের জীবনের জন্যে। যখন সে স্বাধীন ছিল তখন সে খেতে পাচ্ছে কি উপোস করছে, তা দেখবার কেউ ছিল না। কিন্তু এখন আসামী সে। যে-সে আসামী নয়, খুনের আসামী। তার খাওয়া, থাকা, বাঁচার ব্যবস্থা নিয়ে

পুলিশের ত্রুটি হবে না।

সুপ্রিয় বললে—বলুন—

ভবনাথবাবু বললেন—এখানে র‍্যাশনের দোকানে কাপড় যা এসেছে স্যার, পরা যায় না—ভেতরে ভেতরে ভালো কাপড়গুলো ব্ল্যাক-মার্কেট হয়ে যাচ্ছে খবর পেলাম—

গোটাকতক বাজে কথা বলে ভবনাথবাবু চলে গেলেন। আশ্চর্য লাগলো সুপ্রিয়র। তার মক্কেলের আজ ফাঁসির রায় বেরুল, আর আজই নিশ্চিন্ত মনে ভবনাথবাবু কাপড়ের কথা ভাবছেন! সুপ্রিয় ভাবলে একবার ডাকবে নাকি ভবনাথবাবুকে? প্রবীণ উকিল তিনি। পনেরো দিন সময় দিয়েছে সুপ্রিয় আপীলের জন্যে। আপীল করবার কথাটা একবার মনে করিয়ে দিলে হতো। কিন্তু ভবনাথবাবু তখন অনেকদূরে চলে গেছেন।

বাড়ি ফিরে নিজেকে যেন কেমন দুর্বল মনে হলো সুপ্রিয়র।

প্রমীলা গায়ে হাত দিয়ে বললে—একি, গা যে গরম তোমার—জ্বর হলো নাকি—

সকালবেলাই জ্বর বেড়ে গিয়ে একশো তিন ডিগ্রীতে দাঁড়াল। মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা। সমস্ত মাথাটা যেন কে কেটে ফেলছে! প্রমীলা বললে—পরশু রাত জেগেই তোমার এই হয়েছে—

রাত জাগার জন্যে যে জ্বর হয়নি, সুপ্রিয় তা ভালো করেই জানে। তবু শরীর তার সহজে সারবেনা মনে হলো। সেইদিনই লম্বা ছুটির দরখাস্ত করে দিলে সুপ্রিয়।

লম্বা তিন মাসের ছুটি। কলকাতায় এসে সুপ্রিয় বিশ্রাম নিল অনেকদিন। জ্বর আজকাল আসে না। এখানে এসে পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হলো। প্রচুর বই পাওয়া যায়—কিন্তু ভয় হয় মনের ভেতর। আবার যেতে হবে ফিরে। আবার সেই শিশুগাছের জঙ্গলে—সেই ভবনাথবাবু—সেই আদালত!

বংশী দাস আপীল করেছে হাইকোর্টে।

খবরটা পেয়ে অনেকটা স্বস্তি পেলে সুপ্রিয়।

প্রমীলা গাড়ি নিয়ে বেরোয় এদিক-ওদিক। নানা লোকের সঙ্গে তার দেখা করা দরকার। সুপ্রিয়র চাকরিতে অভাবনীয় উন্নতি হয়েছে—খবরটা বোধ হয় চারিদিকে প্রচার করা দরকার। আত্মীয় অনাত্মীয়, পরিচিত অপরিচিত সকলের ঈর্ষার উদ্রেক হলে প্রমীলার সার্থকতা প্রমাণ হবে!

সিনেমার শেষ শো'তে গিয়ে বসেছিল সুপ্রিয়। কখন আরম্ভ হয়েছে, কখন শেষ হলো বুঝতে পারা যায়নি। ট্রাম-বাস বন্ধ হয়ে গেছে। ট্যাক্সি করা চলতো। কিন্তু গ্রীষ্মকালের রাত। আবার অনেকদিন পরে অন্ধকারে একলা একলা হাঁটতে

ইচ্ছে হলো সুপ্রিয়র।

চৌরঙ্গি ধরে হাঁটতে লাগলো সুপ্রিয়। বড় নির্জন রাস্তা। হঠাৎ অনেক দূর এসে সুপ্রিয়র মনে হলো কে যেন নিঃশব্দপদে তাকে অনুসরণ করছে। পেছন ফিরে চাইলে সুপ্রিয়। কেউ তো কোথাও নেই! অনেকদিন আগের সেই শিশুগাছের জঙ্গলের রাস্তার কথা মনে পড়লো। সেদিন রায় দিয়েছে সুপ্রিয় বংশী দাসের খুনের মামলায়। বংশী দাস! নামটা মনে পড়তেই ভয়ে শিউরে উঠলো সুপ্রিয়। কিন্তু সে তো এখনও হাজতে! এখনও পুলিশ প্রহরী পাহারা দিচ্ছে বংশী দাসের অমূল্য পরমায়ুকে! সে তো এখনও বেঁচে আছে! সে আপীল করেছে। হাইকোর্ট পুজোর ছুটির পর খুললেই আবার তার মামলার আপীলের শুনানি হবে।

কে জানে! হয়ত অবিচার হয়েছে বংশী দাসের ওপর। ভারতীয় দণ্ডবিধির তিনশো-দুই ধারা প্রয়োগ করা হয়ত অন্যায় হয়েছে!

অনেক দূর আসতে আসতে ভবানীপুরের রাস্তায় সুপ্রিয় দেখলে এখানে রাত অনেক হয়েছে। দু' একটা পানের দোকান তখনও খোলা আছে। এবার একটা ট্যাক্সি করলে হয়।

হঠাৎ সুপ্রিয় দেখলে—জনহীন রাস্তার ওপর দিয়ে অত্যন্ত মৃদু গতিতে সাইকেল চালিয়ে চলেছে একটা পুলিশ-সার্জেন্ট আর তারই পেছন পেছন চলেছে আর-একটা কনস্টেবল একটা ছোট থলি হাতে নিয়ে। থলির ভেতরে যেন ভারী কিছু রয়েছে।

মন্থরগতি সাইকেলের ওপর পুলিশ সার্জেন্ট এদিক-ওদিক চাইছে।

হঠাৎ গতি থেমে গেল সাইকেলের। ফুটপাথের একধার থেকে একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ শব্দে চীৎকার করতে করতে এগিয়ে এল।

সার্জেন্টের ইঙ্গিত পেয়ে পিছনের কনস্টেবল তার থলি থেকে কী একটা জিনিস ছুঁড়ে ফেললে কুকুরটার দিকে। কুকুরটা দৌড়ে গিয়ে নিমেষের মধ্যে মুখে পুরে দিলে। বোধহয় লোভনীয় মুখরোচক কোনো খাদ্যপিণ্ড। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বিকট চীৎকার করে কুকুরটা বনবন করে চরকির মতো ঘুরতে লাগলো। তার কিছুক্ষণ পরে আর নড়লনা কুকুরটা—

কিছুক্ষণ চেয়ে দেখলে সুপ্রিয়।

সার্জেন্টের ইঙ্গিত পেয়ে কনস্টেবলটা এসে সুপ্রিয়কে বললে—বাবুজী, ওদিকে দেখবেন না—সরে যান—

মাথাটা সত্যিই সেদিনকার মতো আবার ঘুরতে শুরু করেছে সুপ্রিয়র। অনেক দূরে গিয়ে সুপ্রিয়র মনে হলো ঠিক আগেকার মতন যেন আর-একটা কুকুরের বিকট একটা চীৎকার উঠল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে সমস্ত নিস্তব্ধ। তবে কি সারা রাত এমনি চলবে?

সামনে থেকে একটা ট্যাক্সি নিয়ে উঠে পড়ল সুপ্রিয়। আজ আর হাঁটার শক্তি নেই তার।

প্রমীলা গায়ে হাত দিয়ে বললে—একি, আবার তোমার জ্বর এল—রাত্রে হেঁটে বেড়িয়েই তোমার অসুখ করেছে—কী-যে তোমার হাঁটার শখ—গাড়ি থাকতে এত হাঁটা—

রাস্তায় হাঁটার জন্যে যে জ্বর হয়নি তা সুপ্রিয় ভালো করেই জানে। তবু শরীর তার সহজে সারবে বলে মনে হলো না। অথচ ছুটিও তার ফুরিয়ে এসেছে। আবার সেই আদালত, শিশুগাছের জঙ্গল—সেই ভোলানাথবাবু—সেই বংশী দাস, বাসন্তী···লক্ষ্মণের মৃত আত্মা···

সব জিনিস সংগ্রহ করা হচ্ছে। বিদেশে অনেক জিনিস পয়সা থাকলেও সময়মতো পাওয়া যায় না। ছোটখাটো স্টেশনারী জিনিস—টুথপেস্ট থেকে আরম্ভ করে তোয়ালে, গামছা, পাপোশ, ঝাড়ন—যাবতীয় সংসারের খুঁটিনাটি জিনিস।

তারপর আছে প্রমীলার শাড়ি, ব্লাউজ, গয়না···

সুপ্রিয়র নিজের স্যুট্, ছাতা, জুতো, ফ্লাস্ক—কী নয়!

প্রমীলা নিজের জিনিসগুলো সুযোগমতো নিজেই কিনে নিয়েছে। সুপ্রিয়কে কিনতে যেতে হলো টুকিটাকিগুলো। সকালবেলা বেরিয়ে এ-দোকান ও-দোকান ঘুরে কিনতে হলো সব। আবার প্রায় বহুদিনের মতো যাওয়া। হয়ত একবছর পরে কলকাতায় আসবার সুযোগ হবে।

সুপ্রিয় জিনিসগুলো কিনে যখন বাড়ি ফিরল তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে।

চাকরটা গাড়ি থেকে মালপত্র এনে নামিয়ে রাখল।

প্রমীলা বললে—এটা কী গো! দড়ি একগাছা কিনেছ কী করতে?

—দড়ি!

নিজেই অবাক্ হয়ে গেছে সুপ্রিয়। দড়ি কেনবার তো কথা ছিল না। দড়িটা কখন সে কিনলে! সরু সাদা সুতোর তৈরী চমৎকার কয়েক গজ দড়ি! সুপ্রিয় চম্‌কে উঠলো। এতখানি দড়ি সে কেন কিনেছে!

প্রমীলা বললে—দড়ি নিয়ে কি গলায় দেব নাকি?

তাই তো বটে! সুপ্রিয়র যেন মাথার ভেতর সব গোলমাল হয়ে গিয়েছে। চকচকে ঝকঝকে দড়িটা যেন জীবন্ত একটা সাপের মতো সুপ্রিয়র দিকে ফণা তুলে চেয়ে দেখছে! মাথাটা কি আবার ব্যথা করে উঠছে! আবার বোধহয় তার জ্বর আসবে।

খাওয়া-দাওয়ার পর সুপ্রিয় ইজিচেয়ারে শুয়ে খবরের কাগজ নিয়ে বসলো। সকাল থেকে আজ খবরের কাগজ দেখাও হয়নি একবার।

কাগজটা খুলেই চমকে উঠলো সুপ্রিয় !

বড় বড় হেড-লাইনে লেখা রয়েছে—কোনো এক ফাঁসির আসামী আত্মহত্যা করেছে। ফাঁসির প্রাক্কালে বিষপানে আত্মহত্যা করেছে।

খবরটা পড়তে পড়তে হঠাৎ সুপ্রিয়র বংশী দাসের কথা মনে পড়লো। বাসন্তী তো বংশীকে বাঁচাতে পারে। দেখা করবার সময় লুকিয়ে বিষ নিয়ে গিয়ে দেখা করতে পারে সে। তারপর আর জেলের ফাঁসির দড়ি তাকে স্পর্শ করবে না। অব্যাহতি পাবে বংশী। ফাঁসির দড়ির অপমান থেকে অব্যাহতি পাবে ! তা ছাড়া শুধু কি বংশী-ই অব্যাহতি পাবে ? সুপ্রিয়কেও তো অব্যাহতি দিয়ে যাবে ! প্রতিদিনের এই মানসিক অশান্তির উপদ্রব থেকে বংশী তাকে অব্যাহতি দিতে পারে।

ছুটি ফুরিয়ে গেছে। রাত্রের ট্রেনে যাওয়া। আবার সেই আদালত—সেই শিশুগাছের জঙ্গল—সেই ভবনাথবাবু···

প্রমীলা আত্মীয়-স্বজনদের বাড়ি দেখা করতে চলে গেছে।

সকালবেলা খবরের কাগজ পড়তে পড়তে হঠাৎ একটা খবরে সুপ্রিয়র চোখ আটকে গেল।

বংশী দাসের মামলার আপীলের রায় বেরিয়েছে। সুপ্রিয়র সমস্ত শরীরে যেন রোমাঞ্চ হলো। পুজোর ছুটির পর হাইকোর্ট খোলার সঙ্গে সঙ্গে বংশী দাসের বিচার সুরু হয়েছিল। এতদিনে তার যবনিকাপাত হয়েছে। সুপ্রিয় একটা মুক্তির নিশ্বাস ফেললে। হঠাৎ তার মনে হলো যেন বহুদিন পরে রোগমুক্ত হয়েছে সে। জানলা দিয়ে শরতের রোদ এসে মেঝেতে পড়েছে। সেই রোদের সোনা যেন বিধাতার আশীর্বাদ বলে মনে হলো সুপ্রিয়র কাছে।

পাশের বারান্দায় চাকরটা মালপত্র বাক্স বিছানা গুছিয়ে রাখছিল। সুপ্রিয় সেখানে গেল। সেইদিনের কেনা দড়িটা দিয়ে একটা বিছানার বান্ডিল কষে কষে বাঁধছে চাকরটা। সুপ্রিয়ই দড়িটা কিনে এনেছিল। কিন্তু চাকরটা সেটাকে কাজে লাগিয়ে দিয়েছে। সুপ্রিয়র আর কোনো দায়িত্বই নেই—

অনেক দেরি করে প্রমীলা ফিরে এল। একতলায় প্রমীলার গলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে···

ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে জানলার বাইরে দৃষ্টি দিয়ে সুপ্রিয়র মনে হলো অবিচার তবে সে করেনি। আইন পাস করা তার তবে ব্যর্থ হয়নি। বংশী দাসের ফাঁসি হয়েছে, সুপ্রিয় বেঁচেছে ! অন্তত তার মান-মর্যাদা বজায় রইল। তার বিচার নির্ভুল।

একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললে সুপ্রিয়।

আর একজন মহাপুরুষ

"যে মহাপুরুষের স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেবার জন্যে আমরা আজ এখানে সমবেত হয়েছি, তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে যদি এই বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা তাদের জীবন গঠন করে—তাঁর জীবনদর্শনকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করে, তবেই আমাদের আজকের এই সভা সার্থক। আমি সমবেত ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলাদের অনুরোধ করি, তাঁরা যেন এই মহাপুরুষের সাধনাকে সফল করতে চেষ্টা করেন। বাঙলাদেশ আজও নিঃস্ব হয়নি···আমাদের অনেক সৌভাগ্য যে, করুণাপতিবাবু আমাদের এই বাঙলাদেশেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন ···রামমোহন-বিবেকানন্দের বাঙলা দেশ, বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের বাঙলা দেশ, নেতাজী-দেশবন্ধুর বাঙলা দেশ—এই বাঙলাদেশ-ই আর একজন—আর একজন মহাপুষের জন্মভূমি—ধন্য বাঙলাদেশ, ধন্য করুণাপতিবাবু—ধন্য আমরা···"

এক এক জন বক্তৃতা দেন আর প্রচুর হাততালি।

করুণাপতি বালিকা বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে বিরাট সভা বসেছে। এই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা করুণাপতি মজুমদারের জন্মবার্ষিকী। ওপাশে করুণাপতিবাবুর বিরাট অয়েল-পেন্টিং ঝুলছে। তার ওপর প্রকাণ্ড ফুলের একটা মালা ঝুলছে। লাল শালু আর হলদে চাদরের ওপর পদ্মফুল-আঁকা শামিয়ানা! ডায়াস-এর ওপর গণ্যমান্য কয়েকজন লোক। ফুড-মিনিস্টার প্রধান সভাপতি। জেলখাটা কয়েকজন দেশনেতা, কয়েকজন সাহিত্যের পাণ্ডাও উপস্থিত।

একে একে অনুষ্ঠান হচ্ছে। প্রথম শ্রেণীর কয়েকজন ছাত্রীর সঙ্গীত। তার পর সভাপতি-বরণ। নান্দীপাঠ, প্রধান অতিথি! সভার উদ্বোধন! মাল্যদান। তারপর কবিতা-আবৃত্তি, নৃত্য, একক সঙ্গীত, বক্তৃতা। শোনা গেছে, শেষে প্রচুর জলযোগের ব্যবস্থাও নাকি আছে।

করুণাপতির বড় ছেলে তথাগত মজুমদার বড় ব্যস্ত। তাঁকেই সব দেখা-শোনা করতে হচ্ছে। বর্ধমানের এস-ডি-ও। তার পরের ছেলে রাতুল মজুমদার বেহারের সিভিল সার্জেন। তার পরের ছেলে পল্লব মজুমদার রেলওয়ের চীফ ইঞ্জিনীয়ার। তার পর আরও অনেক আছে। সকলের নাম জানি না—মুখ চেনা। সবাই কৃতবিদ্য। সাত ছেলে, তিন মেয়ে। সবাই আজ চারদিক থেকে এসে জুটেছে। বাবার জন্মবার্ষিকীতে তাদেরই তো খাটবার কথা। তবু মহাপুরুষরা কোনও দেশ-কালের গণ্ডিতে আবদ্ধ নন। তাই দেশের লোকদের দায়িত্বও কম নয়?

ওপাশে খবরের কাগজের রিপোর্টাররা সার বেঁধে খাতা পেনসিল নিয়ে বসে লিখছে। বাঁ-পাশে মহিলাদের জায়গা। তিন মেয়ের সঙ্গে প্রধান শিক্ষয়িত্রীও বড়

পরিশ্রম করছেন। গণ্যমান্যরা যদি অভ্যর্থিত না হন, জলযোগের আগেই যদি তাঁরা চলে যান! তাঁদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সব দিকে।

তথাগত একবার কাছে এসে নীচু হয়ে বললে—কাকাবাবু, আপনাকে কিছু বলতে হবে—

মুখ তুলে চাইলাম। অনেক ছোটবেলায় দেখেছি। সঙ্গে আর একটি ছেলে। বললাম—এটি কে—তোমার ছেলে নাকি?

তথাগত বললে—না, ছোট ভাই—দেখেননি একে—এর নাম পরাশর—

পরাশর হাত জোড় করে নমস্কার করলে। বয়েস বেশি নয়। দেখে মনে হলো যেন চিনি-চিনি।

করুণাপতির সব ছেলেমেয়েদেরই চিনতাম। সাতটি ছেলে, তিনটি মেয়ে। যতদূর মনে পড়ে, তখন কিন্তু নামের এত বাহার ছিল না। কিন্তু পরাশর? এ কবে হলো?

বললাম—একে তো কখনও দেখিনি—

তথাগত বললে—এ আমার ছোট ভাই···তা হলে এর পরেই কিন্তু কাকাবাবু আপনাকে বাবার সম্বন্ধে কিছু বলতে হবে—

তখন দেশসেবকদের একজনের বক্তৃতা চলছিল। করুণাপতিবাবুর অসংখ্য গুণাবলীর বর্ণনা দিচ্ছিলেন। কত গোপন দান ছিল তাঁর। কত বিধবার ভরণপোষণ করতেন। দেশের ছেলেমেয়েরা কেমন করে একদিন মানুষ হবে, সেই চিন্তাই সারাদিন করতেন তিনি। আজীবনের সমস্ত উপার্জন কেমন করে এই 'করুণাপতি বালিকা বিদ্যালয়ে'র জন্যে দান করে গেছেন। নীরব, একনিষ্ঠ কর্মী তিনি—কখনও যশের জন্যে লালায়িত হননি। ইনিয়ে-বিনিয়ে তিনি প্রমাণ করতে লাগলেন করুণাপতিবাবু আমাদের দেশের আর-একজন মহাপুরুষ—

একে একে সকলের বক্তৃতা হয়ে গেল!

তথাগত এবার কাছে এসে মুখ নীচু করে বললে—এবার আপনার পালা কিন্তু—

সভাপতি ফুড-মিনিস্টার নাম ঘোষণা করলেন—

আমি উঠে মাইক্রোফোনের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম।

করুণাপতির সম্বন্ধে আমি কী যে বলবো! অথচ এই সভায় আমার চেয়ে তাকে আর কে অমন করে জানতো! প্রায় তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আগেকার ঘটনা।

তখন দুজনেরই রেলের চাকরি। সিভিল সার্জেনের বাড়িতে আমাদের তাসের আড্ডা ছিল। সন্ধ্যে থেকে শুরু হয়েছে—তারপর রাত এগারোটাও বাজতে চললো। কম্পাউন্ডার হরনাথ তখন বেশ কিছু মোটারকম জমিয়ে নিয়েছে।

সিভিল সার্জেন হেরেছে, আমিও তাই। আর স্যানিটারি ইন্সপেক্টর রামালিঙ্গমের না হার, না-জিৎ। বাইরে ঝমঝম করে বৃষ্টি হচ্ছে।

এমন সময় সিভিল সার্জেনের বাড়ির কুকুরটা ঘেউ-ঘেউ করে ডেকে উঠলো।

সিভিল সার্জেন বললে—দ্যাখ্ তো ফলাহারি, কে ডাকে—

জুলাই মাসের মাঝামাঝি। সন্ধ্যে থেকে বৃষ্টি নেমেছে। খেলাটাও তখন বেশ জমজমাট। কারুরই তখন ওঠবার ইচ্ছে নেই। আর বাড়িও কারও দূরে নয়। দু'পা গেলেই যে-যার কোয়ার্টারে ঢুকে পড়া।

ভয় ছিল সিভিল সার্জেনের। কিন্তু শমন এল আমারই।

স্টেশনের জমাদারকে পাঠিয়েছে করুণাপতি। স্ত্রীর ভীষণ অসুখ। এখনি যেতে লিখেছে। জমাদার রামভক্ত হ্যান্ড-সিগন্যাল ল্যাম্প নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। অন্ধকার বারান্দায় নীল-কোট-পরা জমাদারকে যেন যমদূতের মতো দেখাচ্ছে। কিন্তু তা হোক—তবু যেতে হবে। যেতেই হবে। স্টাফের অবশ্য মিথ্যে অসুখ হলে একদিন পরে দেখতে গেলেও চলে। শেষ পর্যন্ত একখানা আনফিট সার্টিফিকেটের পরোয়া। তাতে বড়জোর লাভ একটা রুইমাছ, নয়তো কলকাতা থেকে আনিয়ে-দেওয়া এক সের পটোল। কিন্তু করুণাপতির সঙ্গে আমার অন্য সম্বন্ধ। এক জেলার মানুষ। এক স্কুল থেকে পাস-করা।

জিজ্ঞেস করলাম—ডাউন-গাড়ি কিছু আছে নাকি যাবার?

রামভক্ত বললে—কন্ট্রোল অফিসে খবর নিয়ে এসেছি—'টু-নাইনটিন' অর্ডার হয়েছে সাড়ে বারোটায়। সেইটেতে যাওয়াই সুবিধে।

মালগাড়ির ব্যাপার। সাড়ে বারোটায় যদি অর্ডার হয়ে থাকে, তা হলে সাড়ে বারোটাতেই যে ছাড়বে তার কোনও ঠিক নেই। শেষ মুহূর্তে ড্রাইভার 'সিক্ রিপোর্ট' করতে পারে। গার্ড ঘুম থেকে উঠতে দেরি করতে পারে। কত রকমের হাঙ্গামা।

তাড়াতাড়ি বাড়ি থেকে খাওয়া-দাওয়া সেরে বেরুলাম। ঘটনাচক্রে গাড়িও রাইট টাইমে ছাড়লো। মালগাড়ির ব্রেক-ভ্যানের মধ্যে টিমটিম করছে হারিকেনের আলো। দুটি ছোট ছোট বেঞ্চি। গার্ড নিজের বিরাট বাক্সটার ওপর বসতে বললে। রামভক্তও দরজাটা ভেজিয়ে কমোডটার পাশে হাঁটু জুড়ে বসলো। বাইরে বৃষ্টির বিরাম নেই।

থ্রু ট্রেন। ঝড়ের মতো উড়ে চলেছে। উড়ে চলুক আর নাই চলুক—অন্তত ভেতরে বসে আমাদের তাই মনে হলো। ঝনঝন কটকট শব্দ আর দুলুনি। ঠিক দুলুনি নয়, ঝাঁকুনি। ঝাঁকুনির জ্বালায় বাক্সটা দু'হাতে ধরে বসে আছি। কন্ট্রোল অফিসে বলা ছিল যে বড়মুণ্ডায় যেন গাড়ি থামানো হয়। বড়মুণ্ডার স্টেশনমাস্টার করুণাপতি।

ছোট স্টেশন বড়মুণ্ডা। রাত্তিরবেলা স্টেশনটাকে দেখাই যায় না। ছোট্ট

একটা ঘর। জানালার কাচ দিয়ে হারিকেনের আলোটা পর্যন্ত বৃষ্টির জন্যে দেখা যাচ্ছে না। মালগাড়ির ব্রেকটা থামলো স্টেশন থেকে একমাইল-টাক দূরে। সাবধানে দুটো ধাপ নেমে রেলের লাইন আর দু'পাশে জড়ো-করা ব্যালাস্ট। ক্রেপ সোলের জুতো দুটো লাইনের মধ্যেকার জলে ছপ্ ছপ্ শব্দ করে। চারিদিকে জলা আর আগাছা। আর ধু-ধু করছে মাঠ। ঝড়ের ঝাপটা। ব্যাঙের আর ঝিঁঝির ডাকে ভয় করে ওঠে। কেবল বিন্দুর মতো দূরের সিগন্যালের লাল আলোটা স্থির হয়ে জ্বলছে। নামবার পরেই লাল বিন্দুটা নীলে রূপান্তরিত হলো—আর গাড়িটা এক ঝাঁকানি দিলে। তার পর চাকায়, স্প্রিং-এ, ব্রেকে, ওয়াগনে, ইঞ্জিনে মিলে সে এক বিচিত্র ঝঙ্কার দিতে-দিতে চলতে শুরু করলো।

স্টেশন থেকে দোতলা সমান নিচুতে করুণাপতির কোয়ার্টার। রামভক্ত রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে গেল।

করুণাপতি জাফরিওয়ালা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। বললে—এসেছ ভাই —বাঁচালে—

সামনে জাফরি-দেওয়া বারান্দা। বারান্দা মানে একফালি জায়গা। বৃষ্টির ভেতরে সব ভিজে যায়। কিন্তু তারই ভেতরে ঘুঁটের বস্তা, একটা তেলচিটে ডেক-চেয়ার, দুখানা দড়ির খাটিয়া, বেতের দোলনা, ছেলেমেয়েদের জুতোর আস্তিল—সব কিছু—

ছেঁড়া ফতুয়া গায়ে করুণাপতি যেন বিব্রত বোধ করতে লাগলো হঠাৎ একটা বিড়ি ধরিয়ে ফেললে। বললে—কোথায় যে তোমাকে বসতে দিই—

বললাম—বসতে তো আসিনি, তুমি অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন—

বললে—না, না, তবু—ওই দ্যাখো না—ঘর দেখছ তো—

ঘরের ভেতরে চেয়ে দেখলাম। বারান্দার আলোটা ভেতরে গিয়ে পড়েছে। সমস্ত ঘরটা জোড়া ময়লা মশারি। ঘরের ভেতরে ঢোকবার উপায় নেই।

রামভক্ত ওষুধের ব্যাগটা নামিয়ে দিয়েছে।

করুণাপতি বললে—তুমি আর দাঁড়িয়ে ভাবছো কেন রামভক্ত, সারাদিন তো তোমার খাটুনির শেষ নেই—যাও একটু গড়িয়ে নাও গে—কাল সকাল থেকেই আবার ডিউটি—এখন তো ডাক্তারবাবু এসে গেছেন। বুঝলে ভাই, রামভক্ত আছে বলে তাই দুটি ভাত পাচ্ছি—নইলে কী যে হতো—

বললাম—সে কথা থাক্—বউদিকে দেখি চলো—

পাশের ঘরটাতেই রোগী শুয়ে। সাত ফুট বাই ছয় ফুট একখানা ঘর। দেওয়ালের কুলুঙ্গিতে একটা ছোট টেবিল-ল্যাম্প। খাটের ওপর গিয়ে বসলাম।

বললাম—জ্বরটা নেওয়া হয়েছে নাকি—

—জ্বর নেব কী করে, থারমোমিটার কি আছে? একটা সাবান কিনতে গেলেও সেই বিলাসপুরে যেতে হয়—আর কিনলেই কি থাকবে অপোগণ্ডদের

জ্বালায়—একটি-দুটি নয় তো—দশটি যে—সোজা কথা!—গাছ যে ওদিকে খুব ফলন্ত—বুঝলে কিনা—

জ্বর রয়েছে খুব। বুক পরীক্ষা করলাম। জিভ দেখলাম। একটু বরফ থাকলে ভালো হতো। সাদা ফ্যাকাশে চোখ দুটো। চোখের তলাটা টেনে দেখলাম—রক্তহীন। সমস্ত শরীরটাই যেন বড় নীল-নীল বলে মনে হ'লো। হাতের পায়ের শিরাগুলো নীল হয়ে বাইরে ফুটে উঠেছে।

করুণাপতিকে জিজ্ঞেস করলাম—কখন থেকে এরকম হলো—

বললে—এই পরশু এমনি সময় থেকে, প্রথমে ভাবলাম পড়ে ফড়ে গেছে বুঝি …তার পর কাল সকাল থেকে এমন হলো যে, কাপড় একেবারে ভেসে গেল, ভাই—শয্যাশায়ী একেবারে, ভাবলাম কী করি—আমি বইটা খুলে দেখে দিলাম দু'-ডোজ ক্যামোমিলা টু-হান্‌ড্রেড—শেষে আজকের অবস্থা দেখে আর ভরসা হলো না—রামভক্তকে পাঠালাম তোমার কাছে—

জিজ্ঞেস করলাম—ক'মাস হলো—

করুণাপতিও জানে না—স্ত্রীর দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলে - হ্যাঁগো, ক'মাস হলো তোমার—শুনছো—ডাক্তারবাবু জিজ্ঞেস করছেন ক'মাস হলো—

কোনও উত্তর না পেয়ে করুণাপতি শেষে নিজেই বললে—পাঁচ-ছ' মাসের বেশি নয়—

বললাম—বরফ যখন নেই, তখন কপালে জলপটি দিতে হবে, আর, একটু গরম জলের ব্যবস্থা করতে পারো—তলপেটে সেঁক দিলে ভালো হতো—

রামভক্তকে আবার ডাকতে হলো। করুণাপতি বললে—তোমার কষ্ট হলো রামভক্ত—কিন্তু আমি-যে বিপদে পড়েছি, কী করবে বলো—

সঙ্গে করে মিকশ্চার এনেছিলাম। দিলাম এক দাগ খাইয়ে। কোনোরকম চোট না লাগলে এমন হবার তো কথা নয়।

একটু পরেই রোগীর যেন বেশ আরাম হলো। দেখলাম ঘুম এসেছে—

করুণাপতি বললে—এবার বাইরে একটু বসবে চলো—তোমাকেও খুব কষ্ট দিলাম—

বাইরে ডেক-চেয়ারটায় বসলাম। করুণাপতি সামনে টুল নিয়ে বসে আর-একটা বিড়ি ধরালে। বাইরে তেমনি অঝোর বৃষ্টি। কলকল শব্দ করে সামনের রাস্তা দিয়ে জলের স্রোত বয়ে চলেছে।

করুণাপতি বললে—সেরে যাবে—কী বলো ডাক্তার—

—দেখা যাক্—

করুণাপতি আবার বললে—কপাল, সবই কপাল—এত লোকই তো বিয়ে করেছে—কিন্তু এমন বছর বছর ছেলে-হওয়া কখনো দেখেছ, ভাই—এ যেন ঠিক কাঁঠাল গাছ—আজ বারো বছর বিয়ে হয়েছে, প্রথম দুটি বছর কেবল ফাঁক

গিয়েছিল, তার পর সেই যে শুরু হলো, আর থামতে চায় না—নাগাড়ে চলেছে একটানা—কী খেয়ে যে এমন স্বাস্থ্য করেছে কে জানে বাবা, এমন ফলন্ত মেয়েমানুষ আমি আর দেখিনি—অথচ মাসের মধ্যে তো অর্ধেক রাত ঘরেই শুই না, নাইট-ডিউটি করতে হয়—

মশারির মধ্যে ছোট ছেলের কান্না শোনা গেল।

করুণাপতি উঠলো।

—ওই বাঁশী বেজেছে—ও নিশ্চয়ই ক্ষেন্তি— করুণাপতি মশারির ভেতর ঢুকতে গিয়ে কেমন টান পড়ে মশারির দুটো কোণ খুলে গেল।

—দুত্তোর ছাই—এমন জানলে কোন শালা বিয়ে করতো— দু'হাতে মশারিটা টেনে বাইরে সরিয়ে দিলে করুণাপতি। দেখলাম—গড়া গড়া ছেলে-মেয়েরা শুয়ে আছে। একজন আর-একজনের ঘাড়ে পা দিয়ে। গুণে দেখলাম দশটি। সাতটি ছেলে, তিনটি মেয়ে। দুটো-তিনটে ছেলে বিছানা বুঝি ভিজিয়ে দিয়েছিল। করুণাপতি সেই ভিজে বিছানার ওপরেই পিঠ চাপড়ে ক্ষেন্তিদের ঘুম পাড়াতে চেষ্টা করলে। ছোটটির বয়েস ছ'মাসের বেশি নয়। করুণাপতির দিকে চেয়ে দেখলাম। ও তো এমন ছিল না আগে। ও কি পৃথিবীর কিছু খবরই রাখে না! আজকাল তো কত রকমের উপায় বেরিয়েছে। খবরের কাগজেও তো সে-সব জিনিসের বিজ্ঞাপন থাকে।

ঘুম পাড়িয়ে উঠে এল করুণাপতি। আবার একটা বিড়ি ধরালে।

বললে—বিয়ের পর বোঁচা যখন প্রথম হলো, ভাবলাম আর নয়, একটি ছেলে—সামান্য যা চাকরি, একটি ছেলেকে ভালো করে মানুষ করে যাবো—কিন্তু বউ বললে আর একটি মেয়ে হলে হতো—তা হোক বাবা, তোমার যখন শখ, তখন হোক—কিন্তু পরের বছরেই হোল একটা ছেলে—তার পর থেকে আর কামাই দেয়নি ভাই—তাই বলি বউকে মাঝে মাঝে যে, তুমি কোনো বড়লোকের ঘরে পড়লে ভালো হতো—ছেলেমেয়েগুলো অন্তত পেট পুরে তো খেতে পেতো—এ আমার কাছে এসে শুধু ব্যাঙাচির মতো বাঁচা—একটা ভালো জামা কিনে দিতে পারি না—পেট ভরে খেতে দিতে পারি না—তার পর যদি বাঁচে, তো লেখাপড়া শেখাবোই বা কেমন করে, আর মেয়ে-তিনটের বিয়েই বা দেব কী করে ভগবান জানেন—

ফস ফস করে করুণাপতি বিড়িতে টান দিলে কিছুক্ষণ।

—এদিকে ভাই, চাকরিটাও যদি একটু ভদ্রলোকের মতন হতো তো বাঁচতুম—হেড-অফিসে মুরুব্বি তো তেমন নেই কেউ—এখন কেবল মাদ্রাজীর রাজত্ব, এই দ্যাখোনা ছিলাম রায়গড়ে, দু-পয়সা হচ্ছিল, দিন গেলে কিছু-না-হোক তিন চারটে টাকার মুখ দেখতে পেতুম, কারবারী মহাজন দু'পাঁচজন দিত হাতে গুঁজে, ওয়াগন-ভর্তি মুড়ি বুক্ হতো, মুড়িও পেতুম, ওয়াগন-পিছু চার আনা

হিসেবে আবার···তা ধরো তোমার গিয়ে বেশ ছিলাম সেখানে, মাইনেটায় হাত পড়তো না,—কিন্তু তেলেঙ্গীদের চক্ষুশূল হলো, হেড-অফিসের আয়ার-সাহেবকে ধরে ভেঙ্কটরাও সেখেনে গিয়ে এখন রাজত্ব করছে আর আমায় বদলি করে দিয়েছে এই বড়মুণ্ডায়, এখানে পানটি পর্যন্ত কিনে খেতে হয়—দুঃখের কথা আর কী বলবো ভাই—

রামভক্ত এসে বললে—এবার মা ঘুমোচ্ছে—আর কি জলপটি দিতে হবে ?

করুণাপতি বললে—না থাক্, এবার তুমি একটু বিশ্রাম করোগে যাও, রামভক্ত—কাল ভোরবেলা থেকেই তোমার তো আবার ডিউটি—

রামভক্ত চলে যাবার পর করুণাপতি বললে—এই রামভক্তকেই দ্যাখোনা—বেটা অনেক টাকার মালিক—সুদে খাটায়—এখনও আমার কাছে শত খানেক টাকা পায় বেটা—বিনা-টিকিটের প্যাসেঞ্জাররা ছিট্‌কে-ছিট্‌কে ট্রেন থেকে নেমে এদিক-ওদিক দিয়ে পালাবার চেষ্টা করে, ও গিয়ে ধরে, তা মাসে ওর পঞ্চাশ-ষাট টাকা উপরি আয়···দেশে বউ আছে, ছেলেপিলের বালাই নেই—টাকা পাঠিয়ে দেয়, আর এখানে একজন জোয়ান দেখে জাতওয়ালীকে রেখেছে, সে-ই রান্নাবান্না করে, রোগ হলে সেবা করে···আর রোগ না হলে আরাম্‌সে পা টেপায়—

গল্প করতে করতে একটু যেন তন্দ্রার মতন আসছিল। হঠাৎ করুণাপতির ডাকে উঠে বসলাম। যন্ত্রণায় ছটফট করছে রোগী। উঠে ঘরে গেলাম। অবস্থা দেখে বড় ভয় হলো। পেটে অসম্ভব যন্ত্রণা। মুখ নীল হয়ে আসছে। সমস্ত শরীর সঙ্কুচিত হয়ে আসে একবার, আর সঙ্গে সঙ্গে আর্তনাদ। হাতের কাছে আর কোনো ওষুধও নেই। কিন্তু কেন এমন হলো !

বললাম—এখন বিলাসপুরে যাবার কোনো গাড়ি আছে, করুণাপতি—একটা ওষুধ আনলে হতো—

বৃষ্টির মধ্যেই করুণাপতি দৌড়ে একবার ষ্টেশনে গেল। তখুনি আবার ফিরে এসে বললে—সেই ভোরের আগে আর তো গাড়ি নেই, ডাক্তার—কী হবে—

সেদিন সেই রাত্রে মনে আছে, করুণাপতির স্ত্রীকে বাঁচাবার সে-কী আপ্রাণ চেষ্টা আমার ! যে ওষুধটা দরকার শেষ পর্যন্ত সেটা আনানোও হয়েছিল বিলাসপুর থেকে ! কিন্তু রোগীর সমস্ত শরীর যেন ক্রমেই নীল হয়ে আসছিল।

করুণাপতি বলেছিল—টাকা থাকলে কি আজ আমার ভাবনা—

বললাম—টাকা দিয়ে কি জীবন পাওয়া যায় নাকি—

করুণাপতি বললে—টাকা নেই বলেই তো এই বড়মুণ্ডায় পড়ে আছি—এখনি যদি হেড-অফিসে গিয়ে হাজারখানেক টাকা নিতাইবাবুর হাতে গুঁজে দিতে পারতাম—আর আয়ার-সাহেবকে হাজার-চারেক, তা হলে দেখতে ওই ভেঙ্কটরাওয়ের জায়গায় আমিই গিয়ে বসতাম—বউও বাঁচতো, ছেলেপুলেগুলো-কেও খাওয়াতে পরাতে, লেখাপড়া শেখাতে পারতাম—

সেদিন শেষরাত্রে করুণাপতির স্ত্রী শেষ পর্যন্ত মারা গিয়েছিল। সমস্ত শরীরে কী-যে একরকম বিষক্রিয়া শুরু হলো, কেমন সন্দেহ হলো আমার। এ তো সহজ স্বাভাবিক মৃত্যু নয় !

সেদিন আমার হাত-দুটো ধরে শোকসন্তপ্ত করুণাপতির কী অঝোরধারে কান্না ! বললে—তোমাকে বলেই বলছি ভাই—বউটাকে আমি-ই মারলাম আজ—

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম কথাটা শুনে।

করুণাপতি বলতে লাগলো—দশটা ছেলেমেয়ের পর একদিন যখন শুনলাম আবার নাকি একটা হবে—তখন ভাই, খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে ওষুধ আনলাম একটা—সেইটে খাওয়ার পর থেকেই—

করুণাপতি কথা শেষ করতে পারলে না।

অবস্থা নিজের চোখে তো আমি দেখছি। তখনও ছেলেমেয়েরা সেই স্বল্প-পরিসর ঘরে গাদাগাদি করে শুয়ে আছে, করুণাপতির ছেঁড়া ফতুয়া আর ঘন-ঘন বিড়ি খাওয়া, আর ওই নির্বান্ধব নিঃস্ব বড়মুণ্ডা স্টেশন—যেখানে ষ্টেশন-মাস্টারকে পয়সা দিয়ে কিনে পান খেতে হয়।

সেদিন-যে ডাক্তার হয়েও মিথ্যে ডেথ-সার্টিফিকেট দিয়েছিলাম আমি, সে শুধু করুণাপতির মুখের দিকে আর তার অসংখ্য অপোগণ্ডদের দিকে চেয়েই।

কিন্তু সেদিন আমিই কি ভেবেছিলাম যে, সেই করুণাপতিকেই আবার কয়েক বছর পরে রঙ্গমঞ্চের আর-এক দৃশ্যে আর-এক নতুন ভূমিকায় দেখতে পাবো। কিন্তু অন্য ভূমিকা হলেও চামড়ার নীচের রক্তটা ছিল দুজনেরই এক জাতের।

আমি সেদিন একটা আলু-চুরির মামলায় সাক্ষ্য দিয়ে ফিরছি। যুদ্ধ তখন বেশ ঘোরালো হয়ে বেধেছে। সিভিল টাউন থেকে বিকেলবেলা ফিরলাম তাজপুর জংশনে। যুদ্ধের প্রয়োজনে তাজপুর একটা বড় ঘাঁটি হয়ে উঠেছে। আশেপাশে ধানের আর কাপড়ের মিল। বড় বড় চার-পাঁচটা শহরতলির কাছাকাছি। শহর-তলির আশেপাশে দুটো ডলোমাইট-এর খনি আছে ছ'মাইল দূরে। তার পর আছে চামড়ার কারবার। সিভিল টাউনটাই দেখবার মতো। সিমেন্ট-করা রাস্তা। আর একদিকে চলে গেছে ডিহিরির ব্রাঞ্চ লাইন। জি-আর-পি'তে গিয়ে মিশেছে। ঘি, দুধ আর ছানার দেশ। স্টেশনের সামনে বুকের পাঁজরার মতো অসংখ্য লাইন মাইল-দুই জুড়ে পড়ে আছে। কালো গ্র্যানাইট পাথরের স্টেশন-বিল্ডিং। অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান আর ইউরোপিয়ানদের কলোনি। স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, মারোয়াড়ী, মহাজন—কিছুরই অভাব নেই।

দোতলার ওয়েটিং রুমের জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে ওইসব দেখছিলাম।

একজন বেয়ারা এসে বললে—বড়সাহেব সেলাম দিয়া—

—কোন্ বড়সাহেব ?

—টিশন-মাস্টার—

স্টেশনমাস্টার ! কোন্ সাহেব ? তাজপুর জংশনের স্টেশনমাস্টার বরাবরই সাহেব। আগে ছিল ম্যাক্‌মারকুইস, তার পর আসে লী-বেনেট, তার পর কে ছিল জানি না। অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের জন্য নির্দিষ্ট আরো কয়েকটা স্টেশনের মধ্যে তাজপুর জংশন একটা।

বেয়ারা আমার প্রশ্নের উত্তরে বললে—মজুমদার সা'ব—

ভাবলাম তারক মজুমদার হয়ত। ওয়ালটেয়ারে ছিল। হয়তো প্রোমোশন পেয়ে এখানে এসেছে। আমাকে চেনে। একবার অ্যাপেন্ডিসাইটিস অপারেশন করেছিলাম তার। আমার হাতে জীবন ফিরে পেয়েছে।

খসখস-দেওয়া ঘরে ঢুকে কিন্তু দেখলাম করুণাপতি মজুমদারকে—

বলাই বাহুল্য যে, অবাক হয়েছিলাম। সামনে অ্যাশ-ট্রে'তে চুরুটটা রেখে উঠলো করুণাপতি। উঠলো আমাকে অভ্যর্থনা করতে।

সামনের চেয়ারে বসিয়ে বললে—শুনলাম তুমি এসেছিলে কোর্টে—শুনেই তোমার কাছে যাচ্ছিলাম, কিন্তু খবর পেলাম ওয়েটিং-রুমে আরো অনেক প্যাসেঞ্জার রয়েছে, সে যা হোক—আজকে থাকছো তো—তোমার সঙ্গে আমার জরুরী দরকার আছে—

তারপর আমার উত্তরের প্রতীক্ষা না করে, চকচকে পালিশ করা পেতলের কলিং-বেলটা বাজিয়ে দিলে করুণাপতি। বেয়ারা আসতেই হুকুম হয়ে গেল—ডাক্তারসা'ব কা সামান মেরা বাঙলোমে পৌঁছা দেও, ঔর পঁয়তালীকে মেরা পাশ ভেজ দেও—

পঁয়তালী এল। করুণাপতি বললে—ডাক্তার-সাহেব খাবেন আজকে—বেশ মুখরোচক রাঁধো দিকিনি কিছু—

আমার অবশ্য অবাক হবারই কথা। টেবিলের সামনে টাই-স্যুট-পরা করুণাপতি। বনাতের টেবিলের ওপর একটুকরো কাগজের চিহ্ন পর্যন্ত নেই। সিগ্রেটের টিন রয়েছে একটা, তার পাশে জ্বলন্ত চুরুট আধখানা। পুরোপুরি সাহেবী কায়দাকানুন। যেন ভিক্টোরিয়ান যুগের রোমান্টিক লেখকের লেখা কোনো উপন্যাসের গল্পের মতন। বিশ্বাস না-হবার গল্প।

দু'চারজন মারোয়াড়ী মহাজন ওয়াগন-সাপ্লাই নিয়ে কথা বলতে ঢুকলো।

করুণাপতি তাদের সঙ্গে খানিকক্ষণ কথা বললে। তারপর বললে—চলো যাই—

করুণাপতির সঙ্গে বাইরে এলাম। তখনও দু'চারজন পেছন পেছন আসছিল। করুণাপতি বললে—আজ হবে না—কাল সকালে সব এসো—ওয়াগন এসেছে সাত-আটখানা—

যেন ক্ষুণ্ণ মনে সবাই বিদায় নিলে।

এ-বাঙলোয় আগে সাহেবরা বাস করে গেছে। সাহেবদের জন্যেই তৈরী বাঙলোয় ঢুকতেই একজন এসে করুণাপতির হাতের টুপিটা আর গায়ের কোট খুলে নিলে। একটা গোল টেবিলের সামনে বসলাম দুজনে। বললাম—সাতটায় যে আমার ট্রেন. করুণাপতি —

—জানি— করুণাপতি বললে—কিন্তু এ-ও জানি যে তোমার আজ না-গেলেও চলবে—

তার পর দু'গ্লাস ঠাণ্ডা সরবত এল। করুণাপতি বললে—রাত্রে তোমার জন্যে ভাত না রুটি, কী হবে ডাক্তার—

বড়মুণ্ডা স্টেশনের সেই ছোট রেলের খুপিটার কথাই আমার বার বার মনে পড়তে লাগলো। সাত ফুট বাই ছ'ফুট ঘর-দুটোর চেহারা এখানে বসে মনে পড়া যেন অন্যায়। কিন্তু ক'টি বছরই-বা কেটেছে! এরই মধ্যে কী এখন ঘটেছে যে এমন আমূল পরিবর্তন হতে হয়। যুদ্ধ অবশ্য বেধেছে—যুদ্ধে আমাদের পক্ষে হারও হচেছ বটে—জিনিসপত্রের দর বাড়ছে এই যা—বাঙলাদেশে একটা দুর্ভিক্ষও হয়ে গেছে—এ দূরদেশে সে-খবরও পেয়েছি। কিন্তু তারা কোথায় সব? বাড়িটা যেন বড় নিস্তব্ধ মনে হলো। কোথায় বোঁচা-ক্ষেন্তির দল?

বললাম—ছেলেমেয়েদের কাউকে দেখছিনে যে—

—তারা তো কেউ এখানে থাকে না আর—তথাগত এবার ফার্স্ট-ক্লাস ফার্স্ট হয়েছে ল'-তে—ভাবছি ওকে দেব সিভিল সার্ভিসে, আর রাতুল তো এবার ফাইন্যাল এম-বি দিয়েছে, এখনও রেজাল্ট বেরোয়নি—আর সেজ ছেলে পল্লবকে দিয়েছি শিবপুরে···আর সবগুলো হোস্টেলে-বোর্ডিং-এ থেকে পড়ছে—জানো তো এখানে থাকলে লেখাপড়া কিচছু হবে না—তাই···

শুধু বললাম—ভালোই করেছ—কিন্তু···

করুণাপতি যেন বুঝতে পারলে আমার মনের কথাটা। বললে—তুমি ভাবছ ডাক্তার—এসব কেমন করে হলো—কেমন করে যে হলো—আমিও ঠিক তোমায় বোঝাতে পারবো না—সেই যে বড়মুণ্ডা স্টেশনে আমার স্ত্রী···খুন-ই তাকে করলাম বলতে পারো—সেই হলো আমার শুরু—সেই স্ত্রী মরার পর থেকেই আমার সময় ভালো হলো, ভাই—

তবু বুঝতে পারলাম না—

করুণাপতি বললে—আয়ার-সাহেব রিটায়ার করলে আর রস্-সাহেব হলো এস্টাবলিশ্মেন্টের কর্তা—আর তখন হাতে ছিল বউ-এর গয়নাগুলো। সেইগুলো সব বেচলাম—কয়েক হাজার টাকা সঙ্গে নিয়ে গেলাম হেড-অফিসে—নিতাইবাবুও তখন রিটায়ার করেছে—তখন সেই চেয়ারে প্রোমোশন পেয়েছে রতনবাবু। লোকটা বরাবর মাতাল জানতাম—সোজা একেবারে বাড়িতে নিয়ে গেলাম দুটি আসল

মাল—বোতলের চেহারা দেখেই চোখ-দুটো চকচক করে উঠলো রতনবাবুর—

করুণাপতি থামলো।

বললাম—তার পর—

—তোমাকে বলেই বলছি—আর কাউকে তো এসব বলাও যায় না—তা ছাড়া যত সহজে বলছি, জিনিসটা তো অত সহজও নয় ভাই—কিন্তু আমার যে তখন সঙিন অবস্থা, হয় এসপার নয়তো ওসপার—শেষে যে কী করে কী হলো—চাকা আমি গড়িয়ে দিলুম—আর সে-ও গড়িয়ে চললো—। নইলে সেই রতনবাবু, যে আগে দেখা হলে কথাই বলতো না—একগ্লাসের বন্ধু হয়ে গেলাম—আর শুধু কি তাই—সেই বাঘের-বাচ্ছা রস্-সাহেব, যাকে দেখলেই ভয় হতো, শেষকালে সে-ও নেশার ঝোঁকে কাঁধে হাত দিয়ে কথা বলতে লাগলো—

করুণাপতি গল্প বলে আর থামে একটু।

কেমন করে করুণাপতি বড়মুণ্ডা থেকে বদ্‌লি হলো নবাবগঞ্জ, সেখানে দিন গেলে তিন-চারটে টাকা হতো—সেখান থেকে বদ্‌লি হলো ভাটাপাড়ায়—সেখানে দিন গেলে গড়ে পঞ্চাশ-ষাট টাকা—তার পর যুদ্ধ শুরু হলো। সেখান থেকে বদ্‌লি নাইনপুরে, তার পর বিলাসপুরে, তার পর টাটানগরে—তার পর এই তাজপুরে। দিন গেলে এখানে তিনশো-চারশো টাকাও হয় কোনো-কোনো দিন। এক-একটা ওয়াগন-পিছু দু'শো-তিনশো করে ঘুষ!

করুণাপতি বললে—গয়না বেচে সাত হাজার টাকা দিইছি বটে দুজনকে—সেটা ঘুষও বলতে পারো—কিন্তু ব্যাপারটা স্রেফ আসলে ভাগ্য—কই' কত লোকই তো এখন ঘুষ দেবার জন্যে তৈরি—কিন্তু ঘুষ দেওয়া বা নেওয়া কি অতই সহজ হে—

করুণাপতি আবার বললে—এই দ্যাখোনা, আড়াইশো টাকা তো মোটে মাইনে পাই মাস গেলে, কিন্তু দশটা ছেলেমেয়ের লেখাপড়ার পেছনেই মাসে সাত-শো টাকা পড়ে যায়—তার পর আজকালকার বাজারে হোস্টেল-বোর্ডিং-এর খরচটা ভাবো একবার—তা রস্-সাহেবের সঙ্গে আমার কথা হয়ে গেছে—বছরে বড়দিনের সময় পঁচিশ হাজার টাকা মেমসাহেবের কাছে দিয়ে আসি—কখনও আমায় বদ্‌লি করবে না এখান থেকে—আর দেবার মধ্যে আর একটা জিনিস দিতে হয়েছে—জেনারেল ম্যানেজারকে একখানা নতুন ক্যাডিলাক্—কাজটা একেবারে পাকা করে নিয়েছি, ভাই—

বাইরে অন্ধকার হয়ে এলো। সামনের বাগানটায় অনেক ফুলের বাহার।

কথাবার্তার মধ্যেও কয়েকজন মহাজন দেখা করে গেল। সকলের একই বক্তব্য। ওয়াগন। যে কোনও প্রকারে ওয়াগন চাই। করুণাপতির বাড়িতে কয়েক ঘণ্টা বসে মনে হলো পৃথিবীতে বুঝি মানুষের একটিমাত্র পরমার্থ কাম্য—তা হচ্ছে 'ওয়াগন'। ওয়াগনের যে এত চাহিদা, এত বাজারদর—তা কে জানতো! এক-

একটা ওয়াগনের জন্যে দু'শো-তিনশো টাকা অগ্রিম দিয়ে যায়। রেলের পাওনা যা, তা পরে হবে—আগে তো গেট্-ফি দাও, পরে দর্শন।

সন্ধ্যেবেলা করুণাপতি বললে—যেজন্যে তোমায় ডাকা—সেইটে এবার বলি—

করুণাপতি কেমন গলাটা নামিয়ে আনলো।

—বড়মুণ্ডা স্টেশনে আমার স্ত্রীর বেলায় একবার সেই ভুল করেছিলাম—খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনের ওষুধ খাইয়ে বউটাকে তো মেরেই ফেললাম—কিন্তু এবার আর ওই রিস্ক্ নেব না—তোমার সঙ্গে দেখা না-হলে তোমাকে আমি খবর পাঠাতাম—

অবাক হয়ে গেলাম। বললাম—তুমি কি আবার বিয়ে করেছ নাকি—

—না, বিয়ে নয়, কিন্তু তবু ও-ঝঞ্ঝাটে দরকার কী?

আমি কিছু বলবার আগেই করুণাপতি ধুতি-পাঞ্জাবি পরে নিয়ে ট্যাক্সি ডাকতে বলে দিয়েছে।

চকবাজারের কাছে এসে একটা বাড়ির সামনে ট্যাক্সি থামলো। নেমেই করুণাপতি বললে—এসো ডাক্তার—চলে এসো—

মাথা নীচু করে সিঁড়ি দিয়ে উঠছি। কিন্তু ওপরে উঠে ভারি ভালো লাগলো। করুণাপতিকে দেখে ঝি-চাকর ছুটে এসেছে। করুণাপতি গিয়ে একেবারে খাটে বসে নির্মলাকে খবর দিতে বললে। সাদা ধবধবে উজ্জ্বল আলো। খানিক পরে নির্মলা এল।

করুণাপতি বললে—ডাক্তার, এর-ই। এরই কথা বলছিলাম—

এই সুদূর দেশে বাঙালী মেয়েকে কোথা থেকে সংগ্রহ করলে করুণাপতি!

করুণাপতি বললে—এমন ওষুধ দেবে ডাক্তার, যাতে স্বাস্থ্যের কোনো ক্ষতি না হয়—কী বলো, নির্মলা—আজ তিনমাস মাত্র হয়েছে—বেশী ভয়ের ব্যাপার নয়—এ-তোমার পাঁচ-ছ'মাস নয় যে…

নির্মলা আমার দিকে একবার ভয়ে-ভয়ে তাকাল। তার পাণ্ডুর চোখের দিকে চেয়ে আমি যেন কেমন ভয় পেয়ে গেলাম। চোখের সামনে নিজের ভাবী হত্যাকারীকে দেখলে কেমন ভাব হয় মনে, বলতে পারবো না। কিন্তু আমার মনে হলো—চাউনিটা যেন অনেকটা সেই রকম—

করুণাপতি বললে—তাজপুর বড় শহর—যা-কিছু ওষুধপত্তর লাগবে, এখানে তোমায় আমি সব যোগাড় করে দিতে পারবো—তার জন্যে কিছু ভেবো না—তবে দেখো ভাই, আমার ওই একটা অনুরোধ—এমন ওষুধ দেবে যাতে স্বাস্থ্যের কোনও ক্ষতি না হয়—কী বলো, নির্মলা—

নির্মলাকে সাক্ষী মানা হচ্ছে, কিন্তু নির্মলা যেন কাঠের পুতুলের মতো

মুখ নীচু করে চেয়ারের ওপর স্থির হয়ে বসে রইল। সুডোল ফরসা দুটো পা যেন থরথর করে কাঁপছে মনে হলো।

—তা হলে ওই কথাই রইল—কাল ওষুধপত্তর যোগাড় করে একেবারে নির্মলাকে দেখে যাবে—কী বলো— করুণাপতি আবার বললে।

অনেকদিন আগেকার কথা। তবু স্পষ্ট সব মনে আছে। সেদিন আর ফিরে যাওয়া হয়নি, পরদিন রাত্রের ট্রেনে গিয়েছিলাম। করুণাপতির হাজার অনুরোধও আমাকে টলাতে পারেনি। যা হোক, পরদিন সকালে করুণাপতি যেতে পারেনি চকবাজারের বাড়িতে। ওষুধপত্র নিয়ে আমি একলাই গিয়েছিলাম। ওর বুঝি হঠাৎ কাজ পড়ে গেল একটা।

নির্মলার সেদিনকার কথাগুলো যেন এখনও আমার কানে বাজছে—

নির্মলা অনেকক্ষণ কথাবার্তার পর বলেছিল—আপনাদের দুজনে খুব বন্ধুত্ব বলে মনে হলো—কিন্তু আপনার বন্ধুকে একটা উপদেশ দিতে পারবেন?

জিজ্ঞেস করেছিলাম—কী? কী উপদেশ—

হঠাৎ চুপ করে গিয়েছিল নির্মলা। আমার প্রশ্নের কোনও জবাব দেয়নি—।

তবু বার বার প্রশ্ন করার পর শুধু বলেছিল—না থাক্, উনি বড়লোক, কথাটা ওঁর কানে গেলে ক্ষতি ই হবে আমার, মিছিমিছি মাঝখান থেকে হয়তো রেগে গিয়ে মাসোহারা বন্ধ করে দেবেন। দেশে আমার মা উপোস করবে, বাবার চিকিৎসা হবে না, ভাইবোনদের লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যাবে—তার চেয়ে আপনি যা করতে এসেছেন তাই করুন—

নির্মলার চোখের ওপর চোখ রেখে জিজ্ঞেস করলাম—তবে কি এতে তোমাব অনিচ্ছে আছে?

নির্মলা বলেছিল—আমার ইচ্ছে-অনিচ্ছের প্রশ্ন কেন তুলছেন—আমার তো স্বাধীন ইচ্ছে বলে কিছু থাকতে নেই—আমার কাছে আমার বাবার চিকিৎসা, মা'ব সংসার-খরচ, ভাইবোনদের মানুষ হওয়ার প্রশ্নটাই বড়—যাক্, কী করতে হবে আমায় বলুন—

দুপুরবেলা ফিরে এসে করুণাপতিকে বলেছিলাম—হলো না করুণাপতি—

করুণাপতি অবাক হয়ে গেল। —কেন?

—তিনমাস বাজে কথা—দেখে বুঝলাম ছ'মাস—এখন কোনও রকম রিস্ক্ নেওয়া উচিত নয়। জীবনহানি হতে পারে—

—তা হলে কী হবে?— করুণাপতি যেন চিন্তিত হয়ে পড়লো।

—একটা উপায় আছে।

করুণাপতি উদ্‌গ্রীব হয়ে চেয়ে রইল আমার দিকে।

—একটা উপায়। নির্মলা মেয়েটি তো ভালো মেয়ে বলেই মনে হলো, আর

তোমারও তো ঘরে স্ত্রী নেই—বিয়ে করো-না কেন ওকে—

হো-হো করে সাড়ম্বরে হেসে উঠেছিল করুণাপতি।—বিয়ে? পাগল নাকি! এতগুলো ছেলের বাবা হয়ে! হো-হো করে করুণাপতি সেদিন হেসে উঠেছিল।

সেই রাত্রের ট্রেনেই আমি তাজপুর ছেড়ে চলে এসেছিলাম।

তার পর করুণাপতির সঙ্গে আর দেখা হয়নি। চাকরি থেকে রিটায়ার করে করুণাপতি কলকাতায় বাড়ি করেছিল। দেখা ক্বচিৎ হতো। একবার খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখেছিলাম, তার বালিকা বিদ্যালয়ের জন্যে একজন সুন্দরী শিক্ষিতা স্বাস্থ্যবতী হেড-মিস্ট্রেস চাই। তেমন হেড-মিস্ট্রেস পেয়েছিল কিনা, সে-খবর পাইনি। তবে শুনেছিলাম ছেলেমেয়েরা কৃতী হয়েছে।

রাস্তায় ঘটনাচক্রে একদিন দেখা হয়েছিল করুণাপতির সঙ্গে। বললে—ভালো হেড-মিস্ট্রেস পাচ্ছি না, ভাই—তোমার সন্ধানে আছে কেউ?

তার পর বলেছিল—গোটা-পঞ্চাশেক ফ্যান কিনবো, মোটা কমিশন দেবে এমন কোনো পার্টি আছে—আর গোটা ছয়েক সেলাইএর কল—

জিজ্ঞেস করেছিলাম—রিটায়ার্ড-লাইফ কেমন লাগছে তোমার, করুণাপতি?

করুণাপতি বললে—রিটায়ার আর করলাম কোথায় ভাই—এখন ওই ইস্কুল চালাচ্ছি—তা মাস গেলে ফেলে ছড়িয়ে শ'-পাঁচ-ছয় থাকে—আর অনারেবল্ প্রফেসন তো বটে—

সেই শেষ দেখা। তার পর বোঁচা কবে 'তথাগত' হলো, ক্ষেন্তি কবে 'তপতী' হলো—সে-খবর কানে আসেনি।

বহুদিন পরে এবার কলকাতায় আসতে 'করুণাপতি বালিকা বিদ্যালয়ে' করুণাপতির জন্মবার্ষিকী উৎসবে নিমন্ত্রণ হয়ে গেল।

সভায় ডায়াস-এর ওপর বসে ভাবছিলাম পুরানো সব কথা। তথাগতর পাশে ওর ছোট ভাই পরাশর—অনেকটা যেন নির্মলার মতোই মুখের আদলটা। তবে শেষ পর্যন্ত নির্মলাকে কি বিয়ে করেছিল করুণাপতি? কিংবা······কিংবা······ কিন্তু সে-কথাটা কল্পনা করতেও লজ্জা হলো।

তা হোক—করুণাপতি আসলে যাই হোক, পৃথিবী হয়তো তাকে মহাপুরুষ বলেই একদিন জানবে। আমি নগণ্য ডাক্তার—আমি চিরকাল বাঁচবো না। করুণাপতির কলঙ্কময় অতীতের সব সাক্ষ্য যখন একেবারে মুছে যাবে—তখন আমিই-বা কোথায়? কলকাতার কোনো বড় রাস্তা হয়তো করুণাপতির নামের সঙ্গে জড়িয়ে থাকবে। ভেজাল ঘি-তেল খাইয়ে যারা লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু ঘটিয়েছে—তাদের কত মর্মরমূর্তি কলকাতার রাস্তায় পার্কে ছড়িয়ে রয়েছে। প্রাতঃস্মরণীয় হয়ে আছেন তাঁরা। তবে, মাঝখান থেকে আমি কেন নিমিত্তের ভাগী হয়ে থাকি? আগামীকালের স্কুলের ছাত্ররা হয়তো পাঠ্যপুস্তকের পাতায় করুণাপতির

জীবনী পড়ে নতুন আদর্শ গ্রহণ করবে—তাতে আমি বাধা দেবার কে ?…

কী জানি কী-যে হলো, মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়িয়ে আমিও বললাম : "করুণাপতিকে আমি ছোটবেলা থেকে চিনতাম, করুণাপতি ছিলেন সত্যকার করুণাপতি—সদাশয়, মহৎ, মহৎপ্রাণ পুরুষ। অতি ছোট অবস্থা থেকে কেবলমাত্র পুরুষকার, আত্মবিশ্বাস ও কর্মনিষ্ঠার ওপর নির্ভর করে তিনি বড় হয়েছিলেন—তাঁর জীবনে অসত্যের বা মিথ্যার কোনও স্থান ছিল না। তাঁর জীবন আমাদের এই শিক্ষাই দেয় যে, সত্যের জয় একদিন অনিবার্য—সত্যনিষ্ঠ মানুষ একদিন স্বপ্রতিষ্ঠ হবেই। বহুদিন আগে বহুবার করে বহু মহাপুরুষ ওই এক-ই কথা বলে গেছেন। বুদ্ধ, চৈতন্য, বিবেকানন্দ, গান্ধী—তাঁরা যা বলে গেছেন, করুণাপতি নিজের জীবন দিয়ে তাই-ই কাজে পরিণত করে গেছেন—করুণাপতি বার বার বলতেন, 'ফাঁকি দিয়ে কিছু লাভ হয় না'—মহাপুরুষের এই বাণী-ই করুণাপতিকে প্রাতঃস্মরণীয় করে রাখবে…"

মানুষের সংসারে কত চরিত্রই যে দেখলাম। এক-একটা মানুষ দেখেছি, আর একটা মহাদেশ আবিষ্কারের আনন্দ পেয়েছি। পৃথিবীতে সব মানুষ সব কিছু পায় না, সেজন্যে আমার অভাববোধ হয়ত আছে, কিন্তু অভিযোগ নেই। আমি গোয়া-বাগানের মেসে সুধা সেনকে দেখেছি, বিলাসপুরের বাণীবিদ্যায়তনে প্রমীলা সরকারকে দেখেছি, দেখেছি রাণী দে, রুনু রায়, লিলি পালিতকে। দেখেছি মিসেস সুজাতা স্বামীনাথনকে জব্বলপুরের শিয়ালকোট লজ-এ। আরো দেখেছি 'নীলনেশা'র রায়-সাহেবকে, প্রফেসরপত্নী কণিকা দেবীকে। আর, আরো দেখেছি সবজিবাগানের সুরুচি আর সদানন্দবাবুকে। ওদের সকলকে নিয়ে গল্প উপন্যাস লিখেছি—কিন্তু আরো কতজনকে নিয়ে যে আমার আজো লেখা হয়নি তাও তো বলে শেষ করা যায় না।

এই যেমন আজকের রাণীসাহেবা।

রাণীসাহেবাকে আজ এতদিন পরে আবার বেহারের এই দুর্গম পল্লীতে দেখতে এলাম। দীর্ঘ পঁচিশ-তিরিশ বছরের সম্পর্ক। মনে হলো, ভবিষ্যতে যদি কাউকে নিয়ে গল্প লিখি তো সে এই রাণীসাহেবাকে নিয়েই লেখা উচিত।

সেই পাঁচশো মাইল দূর থেকে আমরা এসেছি। লাহেড়িয়া সরাইতে নেমে মোটরে তিরিশ মাইলের রাস্তা। মৃণালিনীর বিয়ে—রাণীসাহেবার একমাত্র মেয়ে মৃণালিনী।

অনেকদিন পরে যখন হবেনা-হবেনা করে প্রথম সন্তান হলো, গোকুল জিজ্ঞেস করেছিল—কী নাম রাখা যায় রে মেয়ের ?

তখন সংস্কৃত সাহিত্য নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করছি। নাম দিয়েছিলাম—শকুন্তলা।

কিন্তু সে-নাম টেঁকেনি। শেষ পর্যন্ত মা'র ইচ্ছের কাছে বাবার ইচ্ছের পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছিল। সেই নামের ব্যাপারেই শুধু নয়। গোকুল যখন নামে-প্রতিভায় প্রতিষ্ঠায় বড় হলো, রায়সাহেব হলো, তখনও কঠোর হাতে পেছন থেকে যে-মানুষটি শাসন করতো সে মৃণালিনীর বাবা নয়, তার মা—আজকের এই রাণীসাহেবা। কত সম্বর্ধনা-সভায় উঠে বক্তৃতায় বলেছে গোকুল—আমার উন্নতির মূলে রয়েছে, আমার স্ত্রী—তিনি আমায় দিয়েছেন তাঁর একনিষ্ঠ ভালবাসা, তাঁর সেবা, তাঁর যত্ন, তাঁর ঐকান্তিকতা—

সত্যিই বিয়ের আগে কী ছিল গোকুল আর পরে কী-ই না হয়েছিল! এ তো যুদ্ধের হিড়িকে ফুলে-ফেঁপে বড়লোক হওয়া নয়, ধাপে ধাপে কেবল উঠেছে গোকুল, শুধু আরো বড় ধাপে ওঠবার জন্যেই। চেম্বার অব কমার্স, এম.এল.এ. সেনেট-সভা, স্বদেশ-বিদেশ সমস্ত জুড়ে মরবার শেষ দিনটি পর্যন্ত কেবল

সাফল্য আর সাফল্য। যাতে হাত দিয়েছে, তাতেই লাভ। সমস্তর মূলে নাকি গোকুলের স্ত্রী। ওর স্ত্রীর ভালবাসা।

আমি শুনতাম। কিন্তু ভেবে পেতাম না, শুনে হাসবো না কাঁদবো!

কিন্তু সে-সব কথা এখন থাক্।

কলকাতা থেকে পাঁচশো মাইল দূরে বেহারের এই দুর্গম পল্লীতে রাণী-সাহেবার মেয়ের বিয়েতে এসে যদি সেদিনকার সব কথা, সব ইতিহাস মনে পড়ে যায়, তো মনকে দোষ দিই কী করে।

বিরাট বাড়ি। ঠিক বাড়ি নয়, প্রাসাদই বটে। শুনলাম, সাতানব্বই বিঘের ওপর বাড়িখানা। বিয়ে কাল, কিন্তু সকাল থেকে যে ব্যাপার চলেছে তাতে কে বলবে দেখে যে, বিয়ে আজকে নয়। আমরা যাঁরা অতিথি তাঁদের আদর আপ্যা-য়নের আয়োজন চূড়ান্ত। দশখানা গ্রামের হাজার হাজার প্রজা সকাল থেকে পাতা পেড়েছে। লাড্ডু, পেঁড়া, গুলজামুন, বালুসাই, পুরি, বরফির ছড়াছড়ি চারিদিকে। মুনশীজী এক এক বার এসে খবর নিয়ে যায় সকলের কোনো অসু-বিধে হচ্ছে কিনা।

পরের দিন কখন বর এল, কখন বিয়ে হলো, ভিড়ের মধ্যে কিছু দেখাই গেল না। তবু দেখবার চেষ্টা করেছিলাম বৈকি। রায়সাহেব গোকুল মিত্তিরের এক-মাত্র উত্তরাধিকারিণী যে, তার স্বামীকে দেখবার ইচ্ছে ছিলই। কিন্তু বৃথা চেষ্টা।

বিয়ের পরদিন মুনশীজীকে বললাম—একবার রাণীসাহেবার সঙ্গে দেখা করতে পারা যায় না?

মুনশী হয়ত প্রথমে অবাক হয়েছিল। কিন্তু চেষ্টা করবে বলে শেষ পর্যন্ত অন্দরমহলে খবর পাঠালে। খবর যেতে-আসতে তাও প্রায় এক ঘণ্টা লাগলো। সত্যিই তো বিয়ে-বাড়ি—সবাই ব্যস্ত। এখন একজন বৃদ্ধের সঙ্গে দেখা করতে কারই-বা অবসর হবে। কিন্তু তা নয়। মুনশীজী বললে—না হুজুর, রাণী-সাহেবার কড়া হুকুম আছে, পুরুষ মানুষ কেউ যেন অন্দরমহলে না ঢোকে।

মুনশীজীর কথা যে বর্ণে বর্ণে সত্যি, তা পরেই টের পেলাম। সদর আর অন্দরের মাঝামাঝি একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে আমাকে বসালো। দক্ষিণদিকে একটি মাত্র দরজা। দরজার ওপাশেই অন্দরের সীমানা। দরজায় পর্দা খাটানো। ঘোমটা দিয়ে একজন ঝি এসে দাঁড়ালো দু'ঘরের মাঝখানে।

মুনশীজী আমায় ইঙ্গিত করলে—রাণীসাহেবা এসেছেন—যা বলবার শীগগির বলে দিন—বড় ব্যস্ত উনি।

এমন অবস্থার জন্যে ঠিক প্রস্তুত ছিলাম না। এমন দিনও গেছে, যেদিন রাণী-সাহেবার সামনাসামনি বসে কথা বলেছি। আজ হঠাৎ এতদিন পরে বাঙলাদেশ ছেড়ে এসে বেহারের এই জমিদারীতে বসে পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে বিগত স্বামীর

বন্ধু বন্ধুর সঙ্গে কথা বলতে এই সঙ্কোচ,' এই আয়োজন, এ আমার পছন্দ হলো না। এমন জানলে আমিই কি এমন প্রস্তাব করতাম! নিজেকে যেন অপমানিত মনে করলাম। রায়সাহেব গোকুল মিত্তিরের বিধবা স্ত্রীর অগাধ সম্পত্তি থাকতে পারে—কিন্তু আমরা দুজনে একসময় তো ঘনিষ্ঠ বন্ধুই ছিলাম। সে-বন্ধুত্বের দাবীও কি কিছুই নয়!

মৃণালিনীর বিয়েতে দেবার জন্য কলকাতা থেকে একটা শাড়ি এনেছিলাম। সেখানা মুনশীজীর হাতে দিয়ে বললাম—না, আমার কিছু কথা বলবার নেই—এইটে রাণীসাহেবাকে দিয়ে দিও।

বলে আর কালক্ষেপ না করে সোজা বাইরে চলে এলাম। তখনি সমস্ত বন্দোবস্ত করে একটা টাঙ্গা ডাকিয়ে নিয়ে স্টেশনে রওনা দিলাম। আজ অবশ্য গোকুল বেঁচে থাকলে এমন ঘটতো না। কিন্তু তা সত্ত্বেও কেন যে এখানে কিসের টানে এত দূরদেশে এসেছিলাম, তাই ভেবেই নিজের মনকে ধিক্কার দিলাম। কে রাণীসাহেবা! কোথাকার রাণী! আমার কে তারা? মনে পড়তে লাগলো গোকুলের কথাগুলো। অর্থের অভাব গোকুলের কখনও অবশ্য হয়নি। বিয়ের পর থেকেই বৃহস্পতি তুঙ্গী হয়েছিল ওর জীবনে। ধনে, মানে, প্রতিষ্ঠায় বন্ধুদের মধ্যে আর কে অমন সাফল্যের সপ্তম স্বর্গে উঠতে পেরেছিল? কিন্তু অমন হতভাগ্যও আমি জীবনে তো কম দেখেছি!

কোনো মহিলা-সভার সম্পাদিকা একবার চাঁদার খাতা নিয়ে এসেছিলেন গোকুলের বাড়িতে। ধনবান গোকুলের কৃপাপ্রার্থী তাঁরা। বাইরের ঘরে চেয়ারে বসিয়ে গোকুল কথা বলছিল, এমন সময় ভেতরের পর্দা ঠেলে এই রাণীসাহেবা বেরিয়ে এসেছিলেন!

ঘরে ঢুকে বলেছিলেন—বের করে দাও এঁকে, এখনি বের করে দাও—গোকুল যতখানি স্তম্ভিত, তার চেয়ে বেশি স্তম্ভিত মহিলা-সভার সম্পাদিকা।

রাণীসাহেবা বলেছিলেন—তুমি যদি বের করে না দাও, আমারও বের করে দেবার অধিকার আছে—দারোয়ান—দারোয়ান—

চীৎকার করে দারোয়ানকে ডাকতে লাগলেন রাণীসাহেবা। ঘরের মধ্যে আরো দুজন ভদ্রলোক, একজন টাইপিস্ট, আশেপাশে চাকর, দারোয়ান, ঝি, ঠাকুর। কারোর দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। কলকাতার ধনীসমাজে তখন সবেমাত্র প্রভাব প্রতিপত্তি শুরু হয়েছে গোকুলের। বউবাজারের ছোট দোতলা বাড়িটা ছেড়ে লেক রোডের চারতলা বাড়িটা সবে তুলেছে। হাওড়ায় দু'দুটো জুট মিল চলছে, আবার সেই সঙ্গে গিরিডির একটা অভ্রখনিও কিনেছে। ওদিকে কাউনসিলের ইলেকশনে দাঁড়াবে কিনা ভাবছে—অবস্থাটা এই রকম। মোট কথা, সেদিনকার সেই ঘটনাটা যেমন অবিশ্বাস্য তেমনি অপমানজনক। কোনও সূত্রে প্রকাশ্যে বাইরের ঘরে তাঁর আসবার কথাও নয়।

দারোয়ান এখনি এসে যাবে! কাণ্ডজ্ঞানহীন স্ত্রীর আচরণে হতবাকও বটে, ক্ষুব্ধও বটে। গোকুল উঠে দাঁড়ালো। কিন্তু কাকে সে নিবারণ করবে! স্ত্রীর মুখের ওপর কথা বলার সাহস আর যারই থাক গোকুলের নেই।

সম্পাদিকা পর্দানশীনা নন। দশ রকম মানুষের সঙ্গে মেলামেশার অভিজ্ঞতা আছে। ব্যাপারটা বুঝলেন। উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—আচ্ছা, আমি এখন উঠি তা হলে স্যার। একদিন সময়মতো অফিসে দেখা করব বরং—

বাঘের মতন লাফিয়ে উঠলেন স্ত্রী।

—তা তো করবেনই—কিন্তু খবরদার বলছি, ও-হাসি আমি চিনি—হাসতে হাসতে ঘাড় নেড়ে এলোখোঁপা দুলিয়ে পরপুরুষের সঙ্গে কথা বলতে খুব ভালো লাগে তা-ও জানি—আরো ভালো লাগে যদি সে-মানুষটি দেখতে ভালো হয়, লক্ষ টাকার মালিক হয়। চাঁদা চাইবার নাম করে···ছি ছি পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে সব দেখেছি যে···

—আঃ, কি হচ্ছে মিন্টু— ক্ষীণ প্রতিবাদ করতে চেষ্টা করে গোকুল।

—তুমি থামো দিকি। আমি না থাকলে কবে তুমি এদের পাল্লায় পড়ে মারা যেতে। ছি ছি, তোমাকে আমি দোষ দিই না—কিন্তু সংসারে এমন সরল হলে কি করে চলবে?

মহিলাটি তখন এক ফাঁকে সরে পড়েছেন।

কিন্তু পরদিন থেকে ব্যবস্থা হলো অন্যরকম। গোকুলের ড্রাইভারের পাশে দিবারাত্র আর একজনকে দেখা যেতে লাগলো।

গোকুল মোটরে যেতে যেতে জিজ্ঞেস করলে—তোর পাশে ও কে রে যজ্ঞেশ্বর?

যজ্ঞেশ্বর পুরোনো ড্রাইভার। বললে—আজ্ঞে সৌরভীর বড় ভাই।

মোটরে ওঠবার সময়ে গোকুলকে নমস্কার করেছিল একবার। মনে পড়লো এখন। লোকটা আর একবার পেছন ফিরে নমস্কার করলে। বললে—আমার নাম হরিশ স্যার, সৌরভী আমার ছোট বোন হয়।

স্ত্রীর ডান হাত সৌরভী। সেই সৌরভীর বড় ভাই।

অফিসে ঢুকে বসেছে গোকুল। কাজ করছে। মাঝে মাঝে অকারণে হরিশ ঘরের ভেতর উঁকি মারে।

—কিছু দরকার আছে?

উত্তর দেয় না হরিশ। টুপ্ করে মাথাটা সরিয়ে নেয়। এক এক দিন ইচ্ছে হয় অফিস থেকে বেরিয়ে একবার সিনেমায় যায়। কিন্তু স্ত্রীর কড়া বারণ আছে ওতে। সিনেমা মানেই তো ওই। দেয়ালে প্ল্যাকার্ডগুলো দেখ না। বাইরে যার ওই, ভেতরে যা আছে তা কল্পনা করেই নাও। আগে না বলে-কয়ে কয়েকদিন ঢুকেছে ভেতরে। মাথাটা যেন ঠাণ্ডা হয়ে যায় বেশ। কিন্তু হরিশ আসার পর

থেকে কেমন যেন সংকোচ হয় গোকুলের।

স্ত্রী বলেন—কেন, গাড়িতে হরিশ থাকা তো ভালো, রাস্তায়-ঘাটে কতরকম বিপদ-আপদ আছে, দেশে ধর্মঘট তো রোজ লেগেই রয়েছে—আর তা ছাড়া তোমার সুবিধের জন্যেই তো রাখা।

যত কাজই থাক রাত আটটার পর গোকুলের আর বাইরে থাকবার হুকুম নেই। একেবারে অন্দরমহলে গিয়ে ঢুকতে হবে। সে-নিয়ম যেমন কঠোর তেমনি অমোঘ।

স্ত্রী বলছেন—রাত্তির বেলায় যারা ব্যবসা চালায় তাদের বলে বেশ্যা। অমন পয়সার দরকার নেই আমার। একবেলা খাবো, ভিক্ষে করে পেট চালাবো, তাও ভালো—তবু—

গোকুল আমাদের বলেছে—না ভাই, ও সব জিনিস তর্ক করবার নয়—ও যা চায় না, তেমন কাজ না-ই বা করলাম।

স্ত্রীর মতেই চলেছে গোকুল সারাজীবন, স্ত্রীর পরামর্শ মতোই কাজ করেছে। একটা পয়সা কাউকে চাঁদা বা ধার দিতে গেলে স্ত্রীর অনুমতি নিয়ে তবে দিয়েছে। বাড়িতে এসে সারাদিন কোথায়-কোথায় গিয়েছে, কার-কার সঙ্গে দেখা করেছে বা দেখা হয়েছে, সমস্ত সবিস্তারে বলেছে স্ত্রীকে। টাকা, পয়সা, আধলা, পাইটি পর্যন্ত স্ত্রীর হাতে তুলে দিয়ে তবে ছাড়া পেয়েছে।

একবার খুব অসহ্য হওয়াতে ডাক্তার সেনগুপ্তের কাছে ও গিয়েছিল।

গোকুল সমস্ত খুলেই বলেছিল—দেখুন, আমার স্ত্রী আমাকে বড় সন্দেহ করেন। সন্দেহ মানে তিনি মনে করেন আমাকে বিপথে নিয়ে যাবার জন্যে বিশ্ব-সংসারের সমস্ত নারীজাতি বুঝি উন্মুখ হয়ে আছে—আমার মতো সুপুরুষ কলকাতা শহরে আর দ্বিতীয়টি নেই—এ-রোগের কি চিকিৎসা?

—ছেলেপুলে হয়েছে আপনার? ডাক্তার জিজ্ঞেস করেছিলেন।

—না।

—ছেলেপুলে হলেই সেরে যাবে—কিছু ভাববেন না। যাতে ছেলে হয় বরং সেই চিকিৎসা করান।

সে-চিকিৎসা করাতে হয়নি শেষ পর্যন্ত। কারণ কয়েক বছর পরেই মেয়ে হলো গোকুলের।

মেয়ে হবার পর একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম—এখন কেমন চলছে গোকুল, ব্যাধি কমেছে?

—না ভাই, বরং আরো বেড়েছে— গোকুল ম্রিয়মাণ হয়ে জবাব দিলে।

—সে কি!

আমার কিন্তু বরাবর মনে হতো গোকুল হয়তো ঠিক সত্যিকথা বলে না। কোথায় যেন একটা গর্ববোধ আছে মনের ভেতরে। অন্যের স্ত্রীরা যেন ওর স্ত্রীর

তুলনায় কম সতীসাধ্বী! কম পতিপ্রাণা! ওর মনে হতো ওর উন্নতির মূলে আছে ওর স্ত্রীর একনিষ্ঠতা। বুঝি ওর স্ত্রীর কল্যাণেই ওর সমস্তিপুরের একটা সুগার মিল, হাওড়ার দুটো জুট মিল, ওর রায়সাহেব উপাধি, ওর কলকাতার সাতখানা বাড়ি, লাহেড়িয়াসরাই-এ ওর জমিদারী—সব!

যা হোক, সেই গোকুল মিত্তির—লেট রায়সাহেব গোকুল মিত্তিরের মেয়ে মৃণালিনীর বিয়ের নিমন্ত্রণে 'না' বলতে পারিনি। পুরনো বন্ধুত্বের টানে পাঁচশো মাইল দূরে থেকে এই বয়েসে এই পল্লীগ্রামে এসেছি। কিন্তু স্টেশনের ওয়েটিং-রুমের মধ্যে চুপচাপ বসে-বসে মনে হলো আমি না এলেই বা কে কী মনে করতো! কার কী এমন ক্ষতি হতো!

এখনো ট্রেন আসতে দু'ঘণ্টা দেরি।

হঠাৎ মুনশীজী শশব্যস্তে ঘরে ঢুকলো!

বললে—রাণীসাহেবা পাঠিয়ে দিলেন আমাকে—আপনি চলে যাবেন না। ই চিঠিটা রাণীসাহেবা পাঠিয়েছেন আমার হাতে।

মনে হলো বলি—রাণীসাহেবা তোমাদের রাণীসাহেবা, আমার কে? কিন্তু নিজেকে শান্ত করে চিঠিটা পড়লাম। অনেক অনুনয় করে লিখেছেন—'আপনি যদি রাগ করে চলে গেলে মিনুর অকল্যাণ হবে। বর-কনে চলে যায়নি এখনও। অতিথি দেবতার সমান। আপনার সংগে আমারও কিছু কথা ছিল—বর-কনে চলে যাবার পর বলবো ইচ্ছে ছিল। এ-সুযোগ হয়তো আর পাবো না, দয়া করে ফিরে আসবেন, আমার মান রাখবেন—'

রাণীসাহেবার মোটরে করে শেষ পর্যন্ত সত্যি সত্যিই আবার ফিরে আসতে হলো।

বিদায়ের সময় ভালো করে বরকে দেখলাম। শুনলাম মতিহারীর লোক। সেখানেই ওদের জমিদারী। রাণীসাহেবার চেয়েও বড় জমিদার ওরা। ছেলের বয়স যেন মৃণালিনীর চেয়ে কমই মনে হলো। বেহারে তিন-চার পুরুষের বাস। সেখানে থাকতে থাকতে চেহারায় পুরোপুরি বেহারী হয়ে গেছে। পাশে মৃণালিনীর বিরাট ঘোমটা, তা-ও যেন কেমন অবাক লাগলো। 'সুনীতি-শিক্ষায়তন' থেকে আই. এ. পাস করেনি বটে, কিন্তু কিছুদিন তো সেকেন্ড ইয়ারে ক্লাস করেছিল। সেই মেয়ে যাকে নিয়ে এত কাণ্ড, সে-ই বা অমন অতখানি ঘোমটা কেমন করে দিতে পারলো!

বর কনে চলে গেল। বিয়ের উৎসব কিন্তু তখনও এতটুকু কমেনি। গ্রামের হাজার হাজার লোক নাকি ক'দিন ধরে এমনি খাওয়া-দাওয়া করবে। রাণীসাহেবার একমাত্র মেয়ের বিয়ে, তাঁর হয়তো এই শেষ উৎসব।

সন্ধ্যাবেলা রাণীসাহেবা লিখে পাঠালেন—আজ রাত্রিটা আমায় ক্ষমা

করবেন—আমার মন বড় খারাপ, কাল দিনের বেলার ট্রেনে যাবার বন্দোবস্ত কর দেব এবং যদি সকালে আপনার অসুবিধে না হয়, সেই সময়ে সাক্ষাৎ হবে।

রাত্রে শুয়ে শুয়ে অনেক পুরনো কথা মনে আসতে লাগলো।

পুরনো বলে পুরনো!

সে প্রায় তিরিশ বছর আগের ঘটনা। শুধু ঘটনা বললে ভুল বলা হবে আমার জীবনে সে এক দুর্ঘটনাই বটে। আর রাণীসাহেবা! কিন্তু তখন তে তিনি রাণীসাহেবা হননি—তখন তিনি জামসেদপুরের আরতি রায়। সেকেন্ ইয়ারের ছাত্রী।

গোকুল মিত্তিরের বিয়ের খবরটাও বন্ধুমহলে সেই সময়ে হঠাৎ শোনা গেল

বরযাত্রীরা কলকাতা থেকে দল বেঁধে বরের সংগে যাবে টাটানগর। আ আমি? আমি তখন কাকার বারো নম্বর সি-রোডের কোয়ার্টারে সামনের ঘরটা ছুটি কাটাতে গেছি। হঠাৎ গোকুলের চিঠি পেলাম—তোর সামনের বাড়িতে বিয়ে করতে যাচ্ছি—তৈরী থাকিস্, সদলবলে পরশু বিকেলবেলা হাজির হবো।

তখন নজরে পড়লো, সত্যি সত্যি সামনের ষোল নম্বরের বাগানে ম্যারা বাঁধা হচ্ছে বটে! সামনের বাড়িতে যেন উৎসবের ছোঁয়াচ লেগেছে এরি মধ্যে সামনে দু'-তিনটে মোটর, লোকজন।

মাঘ মাস। প্রচণ্ড শীত পড়েছে। সেদিনই একলা একলা অনেক রাত পর্যন্ একখানা বই নিয়ে পড়ছিলাম। কাকা কাকিমা সবাই ভেতরে ঘুমিয়ে পড়েছে হঠাৎ অত্যন্ত মৃদুস্বরে দরজায় একটা টোকা পড়লো। তারপর আর একবা উঠে র‍্যাপারটা ভালো করে গায়ে দিয়ে দরজাটা খুলে পর্দাটা সরাতেই বিস্ম নির্বাক হয়ে গেছি!

সেই শীতের ঠাণ্ডা রাত—চারিদিকে অন্ধকার—মনে হলো মানুষ নয় যে পরী। বাইরের কুয়াশা যেন পরী হয়ে ঘরের মধ্যে আগুন পোয়াতে এসেছে।

মেয়েটির কত বয়েস হবে? আঠারো-উনিশ। আমার হাঁটুর ওপর মুখ রে সে কী অঝোরে কান্না! এমন ঘটনায় বিভ্রান্ত না হয়ে কি উপায় আছে?

বললাম—কে আপনি, কী চান?

দু'কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে অনেকবার প্রশ্ন করলাম। আমার প্রশ্নে কান্না তা আরো করুণ হয়ে উঠলো। কিছুতেই বুঝতে পারলাম না কী চায়, কেন এসে সে এত রাত্রে।

পঁচিশ-তিরিশ বছর আগেকার ঘটনা। সব কথা মনে নেই আজ।

তবু কাঁদতে কাঁদতে সে-রাত্রে মেয়েটি যা বলেছিল তা যেমন অস্বাভাবি তেমনি কৌতুকপ্রদ। তেরো নম্বর সি-রোডের বাড়িতে যে ছেলেটি থাকে, তা আমায় তখুনি ডেকে দিতে হবে। তার নাম নাকি বিকাশ। বাড়ির সামনে যে ঘর, তার পুব দিকের জানালায় গিয়ে ডাকলেই সে আসবে। তার সঙ্গে সে

রাত্রে দেখা হওয়া মেয়েটির নাকি বিশেষ দরকার।

মেয়েটি বললে—আমি গেলে কেউ দেখতে পাবে। আপনি দয়া করে একবার বিকাশকে ডেকে আনুন। জিজ্ঞেস করলে বলবেন, আরতি তাকে ডাকছে—আমি বিশেষ বিপদে পড়েছি।

আরতি বসলো আমারই বিছানায়।

আর আমি তার নির্দেশমতো অগত্যা সেই শীতের মধ্যে ডাকতে গেলাম তেরো নম্বরের অজ্ঞাতকুলশীল বিকাশকে। সেদিন ভারি রহস্যময় মনে হয়েছিল এই ঘটনা। বিকাশ যখন এল, আরতির চোখে সে কী ব্যাকুল ভয়ার্ত আবেদন! বিকাশকে ঘরে পৌঁছিয়ে দিয়ে আমার কী কর্তব্য ভাবছিলাম, মেয়েটি বললে—আপনি দয়া করে বাইরে একটু বসুন, একটু কষ্ট দেব আপনাকে।

আমার ঘরের বিছানায় ওদের দু'জনকে বসিয়ে আমি নির্বোধের মতো বাইরে চলে এসে বারান্দায় বেতের চেয়ারটায় বসলাম।

তারপর সেই শীতার্ত রাত কেমন করে কাটলো তা আজ আমার মনে থাকবার কথা নয়। শুধু এইটুকু মনে আছে যে, সমস্ত রাত ওদের ঘরের আলো জ্বলছে আর আমি না-ঘুম না-জাগরণে সেই বেতের চেয়ারে বসে পলে-পলে শীতে জমে বরফ হয়ে গেছি। তারপর কখন কাকার ওয়াল-ক্লকটায় বারোটা বেজেছে, একটা বেজেছে, দুটো বেজেছে, তিনটেও বেজেছে- সব টের পেয়েছি। ঘরের ভেতরের টুকরো টুকরো কথা, কান্নার আভাস বাইরে ভেসে এসেছে। পাশের চেরি গাছটার পাতা থেকে টপ্ টপ্ করে শিশির ঝরে পড়েছে সারা রাত। আমার গায়ে শুধু একটা পুলওভার। জামশেদপুরের সেই কনকনে ঠাণ্ডা শীতকে সে-পুলওভার কতটা আর আটকাতে পারে।

ভোর হবার আগে ওরা যখন বেরিয়ে যায়, আমার সঙ্গে কোন কথা বলা বা আমাকে ধন্যবাদ দেওয়ার প্রয়োজনও মনে করেনি। মনে আছে পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠতে আমার প্রায় বেলা ন'টা বেজে গিয়েছিল।

কিন্তু বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হওয়ার বুঝি তখনও আমার অনেক বাকি ছিল। বরযাত্রীর দলবল নিয়ে গোকুল এল বিয়ের দিন সকালে। কিন্তু বিয়ের আসরে বউ দেখতে গিয়ে আমার বাক্‌রোধ হয়ে এল!

আরতি রায়! সেই রাত্রে আমার ঘরে আসা সেই মেয়েটি!

গোকুল বোধ হয় বউ দেখে খুশীই হয়েছিল। বরযাত্রীর দলের সঙ্গে কলকাতায় চলে এলাম। কিন্তু নিজের বিবেকের সঙ্গে যে-বিরোধ সমস্ত মনকে ক্ষতবিক্ষত করে দিচ্ছিল—তা কেমন করে চেপে রেখেছি সারাজীবন, তা আমার অন্তরাত্মাই জানে।

বউভাতের দিন বন্ধুরা এক-একটা উপহার তুলে দিয়েছে নববধূর হাতে। কারোর দিকে মুখ তুলে চায়নি নববধূ। আমি কিন্তু আর একবার ভালো করে

চেয়ে দেখলাম সেদিন সেই সুযোগে। মনে হলো ধুতির নরুন পাড়ের মতো সাদা মুখে একটা বিষাদ, পাউডার আর স্নোর প্রান্তে আলতোভাবে ঝুলছে। সেই বিষাদটুকুই নববধূর সমস্ত অবয়বে একটা অভিনব মাধুর্য এনে দিয়েছে যেন, সেদিন মনে হয়েছিল—আমিই কি ভুল করেছি, না, ও শুধু আমার নিজস্ব একটা ভাষ্য—যার পেছনে যে-যুক্তি আছে তাও বুঝি আমার মনগড়া। অনেকবার মনের গোপন সংবাদটা বিশ্বস্ত বন্ধুদের বলি-বলি করেও বলা হয়নি। গোকুলকে বলা তো দূরের কথা।

পরে অনেকদিন গোকুল বলেছে—ভারি ইনটেলিজেন্ট, জানলি—কিন্তু তোর ওপর খুব রাগ। কেন বল্ তো?

বলতাম—ব্যাচিলরদের ওপর বন্ধুর বউদের ওরকম একটু রাগ থাকেই।

তারপর আস্তে আস্তে গোকুল বড়লোক হলো। অল্পবিত্ত থেকে মধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত থেকে ধনী, ধনী থেকে কোটিপতি। সে-ইতিহাস এখানে অবান্তর। কখনও ক্বচিৎ কদাচিৎ দেখা হতো, আবার কখনও ঘন ঘন। অত বড় ব্যবসাদার নানান কাজের মানুষ। কিন্তু বরাবর দেখে এসেছি রাত আটটার পর কখনও বাইরে থাকেনি।

বলেছে—না ভাই, ও সব তর্ক করবার জিনিস নয়—ও যা চায় না তেমন কাজ নাই বা করলাম।

সম্বর্ধনা-সভায় দাঁড়িয়ে গোকুল বলেছে—আমার এই উন্নতি—যার জন্যে আপনারা আমাকে সম্মান দিচ্ছেন, সে-সম্মান আমার প্রাপ্য নয়, তার অনেকখানিই প্রাপ্য আমার স্ত্রীর। আমি অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করছি এমন স্ত্রী, এমন স্ত্রার ঐকান্তিক নিষ্ঠা ভালবাসা সেবা ও যত্ন না পেলে আমি জীবনে কিছুই করতে··· ইত্যাদি—

সংবাদপত্রে সে-রিপোর্ট সবিস্তারে ছাপা হয়েছে। আমি পড়েছি। আমরা সবাই পড়েছি। কিন্তু নিজের কৌতূহল আর, আর সেই রাত্রের গোপন ঘটনাটির কথা মারণমন্ত্রের মতো বুকে পুষে রেখে নিজের মনেই ক্ষতবিক্ষত হয়েছি। বহুদিন পরে আর একবার টাটানগরে গিয়েছিলাম। সেই অজ্ঞাতকুলশীল বিকাশের খোঁজও করেছিলাম। কাকার বাড়ি সি-রোড থেকে তখন এফ্-রোডে বদলি হয়েছে। কিন্তু জীবনে অনেক জিনিস হারিয়ে যাওয়ার মতো বিকাশও সেদিন হয়তো সৌভাগ্যক্রমে হারিয়েই গিয়েছিল এবং অনেকদিন পরে যখন দেখা হলো···কিন্তু সে-কথা এখন থাক। নইলে রাণীসাহেবাকে নিয়ে আজ গল্প লেখবার এই চেষ্টাই বা কেন!

এরপর গোকুল মিত্তির বউবাজার থেকে লেক রোড, লেক রোড থেকে ভবানীপুর, ভবানীপুর থেকে থিয়েটার রোড-এ। ধাপে ধাপে উঠে গেছে। সাধারণ লোক থেকে রায়সাহেব হয়েছে। দশজনের একজন ছিল, ক্রমে দশজনের

শীর্ষে উঠেছে। বাইরে থেকে আমরা দেখেছি গোকুলকে। বাহবা দিয়েছি। কিন্তু গোকুল বরাবর বলেছে—না না, আমি কিছু নয় ভাই—এর পেছনে আছে মিসেস মিত্তির—আরতি—মিন্টু—

আমরা যখনি আমাদের স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার কথা বলেছি, গোকুল সাপ দেখার মতন লাফিয়ে উঠে পালিয়ে গেছে। এ নিয়ে আমাদের মধ্যে হাসাহাসি, তামাশা হয়েছে।

আমার স্ত্রী বলেছে—কেন, হাসির কী আছে, ওই তো ভালো। তোমাদের যেমন মেয়েমানুষ দেখলেই জিভ দিয়ে নাল পড়ে?

চাঁদা চেয়ে বা ধার চেয়ে কখনও কেউ হতাশ হয়নি গোকুল মিত্তিরের কাছে। তবু মহিলা-সমিতি, গার্ল স্কুল কিংবা দুঃস্থ বিধবা—এসব ব্যাপারে একটি পয়সা কখনও দেয়নি গোকুল, এক আমাদের 'সুনীতি-শিক্ষা-সদন' ছাড়া। গোকুল বলতো—কী করবো, আরতির আপত্তি যে—

গোকুলের উন্নতির সঙ্গে আমি যদিও বরাবর জড়িত ছিলাম—কিন্তু ওর চরিত্রের ওই দিকটার কথা মনে হতেই কেমন যেন করুণার চোখে দেখতাম ওকে। মনে হতো ইচ্ছে করলেই এক দণ্ডে গোকুলের জীবন বরবাদ করে দিতে পারি। ও হয়তো আত্মহত্যা করবে শুনে। কিন্তু আবার এক এক বার মনে হতো আমারই ভুল। আমার মনের কিংবা চোখের ভুল। মনে হতো, সেদিন সেই শীতের রাত্রে বারো নম্বর সি-রোডের সামনের ঘরটার ঘটনা শুধু নিছক বিভ্রম মাত্র—আর কিছু নয়। আসলে গোকুলের ক্রম-উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নিজের কৌতূহলের মাত্রাটাও দ্বিগুণ চতুর্গুণ হয়ে বেড়েই চলেছিল।

এর পরের ঘটনা আরতি রায়কে নিয়ে নয়। আরতি তখনও রাণীসাহেবা হননি। তখন কেবল মিসেস মিত্র। প্রচুর প্রতিষ্ঠার শিখরে উঠে রায়সাহেব গোকুল মিত্তির যখন মারা গেল হঠাৎ, তখন কারবার নিজের হাতে নিলেন মিসেস মিত্র। স্বামীর জীবিত অবস্থায় যেমন আড়ালে থেকে স্বামীকে পরিচালনা করতেন, তেমনি আড়ালে থেকেই তখন থেকে ব্যবসা পরিচালনা করতে লাগলেন তিনি।

ঘটনাটা সেই সময়ের।

শকুন্তলা নয়—মৃণালিনী। মৃণালিনী ম্যাট্রিক পর্যন্ত পর্দা-স্কুলে পড়েছে। গোকুল মিত্তির ওই মৃণালিনীর স্কুলে যাওয়ার জন্যেই পাল্কি-গাড়ি কিনেছিল। রবারের টায়ার লাগানো চাকা। জানালা-দরজার খড়খড়ি বন্ধ। দুটো মোটা ওয়েলার ঘোড়া। দুটো মোটর থাকতেও কেন যে এই ব্যবস্থা জিজ্ঞেস করতে গোকুল বলেছিল—ও-সব কথা থাক ভাই—আরতি যখন চায় তখন ও নিয়ে আর···

তারপর ভর্তি হলো আমাদের 'সুনীতি-শিক্ষা-সদনে'। গীতা-পাঠ, স্তোত্র-পাঠ আর তার সংগে আই-এ'র কোর্স। এখানে ভর্তি হওয়ার পেছনে মিসেস্ মিত্রের নিশ্চয়ই সম্মতি ছিল। কারণ স্ত্রীর বিনা-পরামর্শে কোনও কাজ করবার পাত্র গোকুল নয়।

তখন গোকুল বেঁচে নেই। সমস্ত কাজ-কারবারের কলকাঠি মিসেস্ মিত্রের হাতে। সেই সময়ে একদিন আগুন জ্বলে উঠলো।

মৃণালিনী সেদিন কলেজে নিয়মমতো গেছে। ক্লাস বসে গেছে। হঠাৎ মিসেস মিত্রের চিঠি নিয়ে এসে হাজির মিসেস্ মিত্রের দারোয়ান। পিওন-বুকে সই দিয়ে চিঠি নিলাম। চিঠি খুলে পড়তে গিয়ে মাথায় বজ্রাঘাত হলো।

সিল-করা চিঠি। বিশেষ জরুরী এবং গোপনীয়।

টাইপ-করা তিন পৃষ্ঠা চিঠি। নিচেয় মিসেস্ মিত্রের সই।

পত্রের বিবরণে প্রকাশ—মিসেস্ মিত্রের মেয়ে মৃণালিনী নাকি প্রেমপত্র লিখেছে 'সুনীতি-শিক্ষা-সদনে'র ইংরাজীর প্রফেসার বিভূতি ঘোষালের কাছে এবং বিভূতি ঘোষাল সে-চিঠির জবাবও দিয়েছে। এমন একখানা দু'খানা নয়, অনেকদিন ধরে অনেক চিঠিই লেখা হয়েছে। কিন্তু মিসেস্ মিত্তির এখন ধরে ফেলেছেন সমস্ত। সংগে সংগে তিনি মৃণালিনীর কলেজে আসা বন্ধ করেছেন। শুধু তাই নয়, এখন জানতে চেয়েছেন বিভূতি ঘোষালের মতো প্রফেসারকে কেন এখনি বরখাস্ত করা হবে না এবং বিশ্ববিদ্যালয় কেন 'সুনীতি-শিক্ষা-সদন'কে এখনি ভেঙে দেবে না। যেখানে মেয়েদের শিক্ষার নামে চরিত্রহীনতার এমন হাতেখড়ি দেওয়া হয় এবং যে-প্রতিষ্ঠানে অসচ্চরিত্র লম্পট শিক্ষকদের বেছে বেছে নিযুক্ত করা হয় মেয়েদের প্রলুব্ধ করার জন্যে—সে-প্রতিষ্ঠান তুলে দেবার জন্যে কোনও আইন দেশে আছে কিনা—এবং না থাকলে সে-আইন এখনি কেন প্রবর্তন করা হবে না তাই জানতে চেয়েছেন। সুশিক্ষার নামে এইসব প্রতিষ্ঠানে ভদ্রঘরের যুবতী মেয়েদের যে এইভাবে অনাচার ও দুর্নীতি শিক্ষা দেওয়া হয় তা বহুলোক বহুদিন ধরেই সন্দেহ করে আসছেন। কিন্তু ভদ্রবেশী গুণ্ডাদের কূটনীতিতে এতদিন সকলের দৃষ্টি অন্ধ হয়ে ছিল। 'সুনীতি শিক্ষা-সদনে'র এ দৃষ্টান্ত এবার সকলকে··· ইত্যাদি···

তিন পৃষ্ঠাব্যাপী অভিযোগ। শেষে লিখেছেন—দেশবাসী তথা বিশ্ববিদ্যালয় এর কোনও প্রতিবিধান না করলে তিনি আদালতের দ্বারস্থ হতে বাধ্য হবেন॥

এর একখানা নকল তিনি পাঠিয়েছেন ভাইস-চ্যানসেলারের কাছে—আর একখানা চ্যানসেলারের কাছে। এবং লিখেছেন যে, উত্তরের জন্যে তিনি পনেরো দিন অপেক্ষা করবেন—জবাব না পেলে তিনি অন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হবেন।

গোকুল বেঁচে নেই। তবু গোকুল বেঁচে থাকলেও কোন সুরাহা হতো বলে

মনে হয় না। কারণ মিসেস্ মিত্রের কথাই শেষ কথা জানতাম! কিন্তু চিঠিটা পড়ে হাসিও পেল। কারণ জামশেদপুরের সেই বারো নম্বর সি-রোডের ঘটনা তো নিছক কল্পনাও নয়।

কিন্তু চিঠিটা নিয়ে চুপ করে বসে থাকতেও পারলাম না। তখনি বিভূতি ঘোষালকে ডেকে পাঠালাম। ছোকরা মানুষ। ওদিকে বাঙালী ছাত্রদের মধ্যে রত্নও বলা যায়। অনেক দেখে-শুনেই তাকে ভর্তি করেছিলাম! ইংরেজী, হিস্ট্রি আর ইকনমিক্সে এম· এ· দিয়েছে। তিনটেতেই ফার্স্ট। চিরকাল এখানে চাকরি করবে না। আরো উন্নতি করার উচ্চাকাঙ্ক্ষা আছে।

সেদিন আমার প্রশ্নের উত্তরে যে-কথা সে বলেছিল, তাতে তার বিশেষ কোনও দোষ আমি পাইনি।

এক কথায় সে বলতে চেয়েছিল—তারা দু'জনেই দু'জনকে ভালবাসে—

সেদিনকার মৃণালিনীকেও আজ মনে করতে চেষ্টা করলাম! খড়খড়ি বন্ধ পালকি-গাড়ির মধ্যে বন্দী হয়ে আসতো রোজ। মিসেস্ মিত্রের কড়া নজর আর কচুয়ান, চাকর, ঝি, দারোয়ানের নজরবন্দী হয়ে থেকে থেকে বোধ হয় কলেজের এলাকায় ঢুকেই সে জীবন ফিরে পেত। চটুল চলা আর কথা বলার ভঙ্গী থেকে বুঝতাম এখানেই একমাত্র সে বুঝি মুক্তির স্বাদ খুঁজে পেয়েছে। সিঁড়ি দিয়ে তার লাফিয়ে লাফিয়ে দোতলায় ওঠা, ক্লাসের বাইরে দুর্দম ছোটাছুটি আর তারপর ঠিক বাড়ি যাবার আগে পালকি-গাড়িটা যখন ঘেরা কলেজ কম্পাউন্ডের ভেতর এসে ঢুকতো তখন অকারণে বাড়ি যেতে দেরি করা আর যাবার আগে তার সেই চেহারা বিষাদ-মলিন হয়ে যাওয়া—সমস্তর যেন একটা মানে ছিল। আজ সেই মেয়েকেই দু'হাত নিচু ঘোমটা দেওয়া অবস্থায় তার চেয়ে কমবয়সী স্বামীর সঙ্গে শ্বশুরবাড়ি যেতে দেখে তাই অত অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।

যা হোক, চিঠিটা পেয়েই মিসেস্ মিত্রের বাড়ি গেলাম তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। দেখাও হলো।

কিন্তু কে চিনতে পারবে সেদিনের সেই আরতি রায়কে! সাদা থান, তুষার-ধবল গায়ের রং আর প্রচুর স্থূল মাংসপিণ্ডের তলায় জামশেদপুরের সে-মেয়েটি বুঝি কবে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে।

কিন্তু আশ্চর্য, যতক্ষণ ছিলেন সামনে বসে, একবারও আমার চোখে চোখ রাখলেন না। হয়তো ভেবেছিলেন যদি চোখের জাফরি দিয়ে সেই কুমারী আরতি রায় হঠাৎ এক ফাঁকে উঁকি মেরে দেখে ফেলে। কিংবা যদি আমি চিনে ফেলি সেই আরতি রায়কে।

অনেকক্ষণ পরে ক্ষিপ্ত হয়ে বলেছিলেন—যাদের হাতে ছেলেমেয়ের চরিত্র-গঠনের দায়িত্ব, তারাই যদি এমন করে তাদের সর্বনাশ করে তাহলে বাপ-মায়ের মনে কতখানি দুঃখ হয় তা ভাবুন তো একবার—

আমার অবশ্য চুপ করে শোনবারই পালা। যিনি কথা বলছেন তিনি তখন আর বন্ধুপত্নী নন, রায়সাহেব গোকুল মিত্রের প্রচুর সম্পত্তিশালিনী বিধবা স্ত্রী।

বললেন—আপনারা ও-স্কুল উঠিয়ে দিন। যদি না দেন তবে জানবেন, ও আমিই উঠিয়ে দেব—দেহের ধর্মনাশ, আর মনের ধর্মনাশ, ও একই কথা।

তারপর পাশের দিকে চেয়ে ডাকলেন—প্রফুল্লবাবু—

গোকুলের পুরনো টাইপিস্ট প্রফুল্ল কাজ করছিল একপাশে। মিসেস্ মিত্রের ডাকে উঠে এল কাছে।

মিসেস্ মিত্র কপালের চুলগুলো ডানহাত দিয়ে সরিয়ে দিয়ে বললেন—একশো সাতের সি ফাইলটা আনুন তো একবার।

ফাইলটা আসতেই মিসেস্ মিত্র সেখানা খুললেন। বললেন—প্রফুল্লবাবু, এই তেত্রিশের ফোলিওটা দেখে রাখুন। মাসে মাসে 'সুনীতি-শিক্ষা-সদনে'র নামে যে পাঁচ হাজার টাকা চাঁদা বন্দোবস্ত আছে, আজ একটা চিঠি ড্রাফ্‌ট করে দেবেন ওটা ক্যান্‌সেল্‌ড্ হবে—আর ওদের ওখানে যে পঞ্চাশখানা পাখা দেওয়া আছে ওগুলোও ফেরত দেবার কথা লিখে দেবেন ওই সঙ্গে।

তারপর বাঁ পাশে দরজার দিকে চেয়ে ডাকলেন—সৌরভী!

সৌরভী এল।

বললেন—যজ্ঞেশ্বরকে একবার ডেকে দে তো।

যজ্ঞেশ্বর সামনে আসতেই বললেন—যজ্ঞেশ্বর শুনে রাখ্, কাল যখন আপিসে যাবি একবার খগেনবাবু, আমাদের একাউন্‌টেন্টকে দেখা করতে বলবি তো—আমার সঙ্গে যেন একবার দেখা করেন বাড়িতে—বলবি বিশেষ দরকার।

তারপর সৌরভীর দিকে চেয়ে আবার বললেন—হ্যাঁরে, মিনু বার্লি খেয়েছে, না এখনও···একবার জ্বরটা দেখলে হতো যে···যজ্ঞেশ্বর শোন্ ইদিকে।

যজ্ঞেশ্বর ঝুঁকে পড়ে বললে—মা।

—এবার বড় ডাক্তারবাবুকে খবর দে তো—গাড়ি নিয়ে যা, নইলে দেরী হবে—বলবি এখনি যেন আসেন—প্রফুল্লবাবু, আপনি এ-মাসে ডাক্তারবাবুর দোকানের বিলগুলো এখনও দেননি কেন? কাজে আপনাদের বড় গাফিলতি হয়—আমি যেদিকে না দেখবো···

দশটা কাজের মধ্যে মিসেস্ মিত্রকে যেন কেমন দিশেহারা দেখলাম। ঠিক যেন সামঞ্জস্য করতে পারছেন না জীবনের সঙ্গে। কোথায় কোন্ ফুটো দিয়ে বুঝি সব নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ আমার দিকে না চেয়েই আমাকে বললেন—ও, আপনি এখনও বসে আছেন—আপনাকে চা আনিয়ে দিচ্ছি,—সৌরভী চা নিয়ে আয় তো এক কাপ।

কী জানি হঠাৎ মিসেস্ মিত্রের চিঠিটা পেয়ে যেমন উদ্বিগ্ন হয়েছিলাম সামনাসামনি ওঁকে প্রত্যক্ষ দেখে তেমনি ওঁর ওপর করুণা হলো। অর্ধমৃতের

ওপর আঘাত করতে ইচ্ছে হলো না। মিসেস্ মিত্র কি সত্যি সত্যিই সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ!

সেদিন বাড়ির বাইরে এসে বাড়িটার দিকে ভালো করে চেয়ে দেখেছিলাম। চারদিকে উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা জেলখানার মতো। অমন রক্ষা-ব্যবস্থা কিসের জন্যে? জানালাগুলোর সামনে দেড় হাত জায়গার ব্যবধানে খড়খড়ির আবরণ দেওয়া। চন্দ্র-সূর্যও যেন ওখানে প্রবেশ করতে না পাবে।

শেষ পর্যন্ত সত্যি 'সুনীতি-শিক্ষা-সদনে'র মাসিক মোটা চাঁদাটা বন্ধ হয়ে গেল। গোকুল মিত্রের ধার দেওয়া পঞ্চাশখানা পাখা, তাও একদিন ওদের লোক এসে খুলে নিয়ে গেল। তবু টিম্ টিম্ করে চলতে লাগলো প্রতিষ্ঠান। শেষে একদিন তাও বন্ধ হয়ে গেল।

তারপর একদিন কার কাছে যেন শুনেছিলাম যে মিসেস্ মিত্র মেয়েকে নিয়ে তাঁর লাহেড়িয়াসরাই-এর জমিদারীতে গিয়ে বাস করছেন। জনতা, কোলাহল, শহর সভ্যতা থেকে দূরে পালিয়ে গিয়ে তিনি হয়তো আত্মরক্ষা করতেই চেয়েছিলেন। কুমারী জীবনে নিজে যে দুর্বলতার প্রশ্রয় দিয়েছেন আরতি রায়, মিসেস্ মিত্র হয়ে তিনি সারাজীবন তার প্রায়শ্চিত্তই হয়তো করে গেলেন এবং নিজের কন্যার মধ্যে যাতে তাঁর কোন বিগত দুর্বলতার ছাপ না পড়ে, তার সেই শুভ প্রচেষ্টাই হয়তো তাঁকে তাঁর লাহেড়িয়াসরাই-এর দুর্গম বন্দীনিবাসে আবদ্ধ করেছে। আমার ধারণা যে ভুল নয়, তা আজ মৃণালিনীর লম্বা ঘোমটা আর তার কমবয়েসী স্বামীকে দেখেই বুঝতে পারলাম।

মুনসীজীও বলছিল—ওঁরা হুজুর বড় ভারি জমিন্দার, বনেদী বংশ ওঁদের, ওঁদের বংশের নিয়মই আলাদা, বউ শ্বশুরবাড়ি গেলে জীবনে আর কখনও বাপের বাড়িতে আসতে পারবে না। এই যে আজ শ্বশুরবাড়ি ঢুকলো তো ঢুকলোই—আর বেরুবে না—বড় ভারি বনেদী জমিন্দার ওঁরা হুজুর।

সকালবেলা নিয়মিত জলযোগের পর ডাক পড়লো।

মহলের পর মহল পেরিয়ে মুনসীজী আজ একেবারে অন্দরমহলে নিয়ে এসেছে। আজ আরতি রায়ও নয়, মিসেস্ মিত্রও নয়, আজ রাণীসাহেবা! সেই দুর্গম পল্লীপ্রাসাদের অভ্যন্তরে অন্দরমহলের একটি ঘর দেখলাম পরিপাটি করে সাজানো। চারপাশে কলকাতার সোফা কোউচ। দেয়ালের সারা গায়ে গোকুলের নানা বয়েসের নানা ভঙ্গীর ফটো। দুটো মানুষ-সমান অয়েলপেন্টিং। একটা গোকুলের আর একটা রাণীসাহেবার।

খানিক পরে পাথরের প্লেটে ফল আর মিষ্টি এল। আর তার পেছনে পেছনে এসে হাজির হলেন রাণীসাহেবা।

বহুদিন পরে দেখছি। বিচলিত হলাম। সত্যি এ-যেন অন্য মানুষ!

এসেই বললেন—ওটা খেতে আপত্তি করবেন না। ওটা প্রসাদ—আমার বিগ্রহ

দেওকীনন্দনের।

তারপর সামনে বসলেন। আরো শুচি-শুভ্র আর তুষার-ধবল হয়েছে তাঁর অবয়ব। একটু আগেই স্নান সেরে পুজো সেরে আসছেন বোধ হয়। কপালে চন্দন-চর্চিত জোড়া ভৃগুপদরেখা। হাতে নাম-জপের থলি। ভেতরে আঙুলটা নিঃশব্দে নড়ছে। বুঝি ইষ্ট-নাম জপ করছেন।

বললেন—কেমন জামাই দেখলেন আমার ?

তারপর খানিক থেমে বললেন—জানেন, মিনুর বিয়ের জন্যে আমার ভারি ভাবনা ছিল—আজ আমি সত্যিকারের স্বাধীন।

দেওয়ালের অয়েলপেন্টিংখানা দেখিয়ে বললেন—উনি বলতেন বটে যে আমিই নাকি ওঁর উন্নতির মূলে। কিন্তু উনি ছিলেন দেবতা, ওঁর স্পর্শ পেয়ে আমিই বরং ধন্য হয়ে গেছি। ওঁর ভালবাসা না পেলে কি আজ মিনুকে ঠিক নিজের মনের মতন করে মানুষ করতে পারতুম—নিজের পছন্দমত ঘরে-বরে দিতে পারতুম। আজ উনিও নেই—মিনুও গেল—আপনারা সবাই এসে দাঁড়িয়ে-ছিলেন তাই কোন বাধা এল না, তা ছাড়া—

আরো এমনি দু'-একটা কথা হলো। আশ্চর্য হলাম। এ-যেন সে-মানুষ নন। আরতি রায়, মিসেস্ মিত্র আর আজকের এই রাণীসাহেবা, এরা যেন একজন নয়—তিনজনের তিনটি বিভিন্ন রূপ। অথচ পঁচিশ-তিরিশ বছর ধরে ওঁকে চিনে এসেছি, তবু মনে হলো চেনার যেন আর শেষ নেই। যেন এ-চেনার শেষ হবেও না। কবেকার কোন্ আরতি রায়—সে কি আজ রাণীসাহেবাকে দেখলে চিনতে পারবে ? কিংবা হয়ত রাণীসাহেবাও আজ আরতি রায়কে একেবারে সম্পূর্ণরূপে ভুলে গেছে। আরতি রায়কে দেখে রাণীসাহেবাও আজ বুঝি লজ্জায় অপমানে অধোবদন হয়ে থাকবে। নইলে অমন করে চোখে চোখ রেখে কথাই বা কেমন করে বলতে পারছেন এই রাণীসাহেবা !

মামুলি বিদায় অভিনন্দনের পর চলে আসছিলাম।

দরজার বাইরে পা বাড়াতেই কানে এল—আর একবার শুনুন—

ফিরে দাঁড়ালাম। হাসি-হাসি মুখ ! হাসি দেখে কেমন যেন খট্‌কা লাগলো। হাসি তো কখনও দেখিনি ওঁর মুখে।

বললেন—একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করতুম—

—বলুন না কী কথা ?

—আপনি একদিন আমার মেয়ের নাম রাখতে চেয়েছিলেন শকুন্তলা—আমি রেখেছি মৃণালিনী। আপনার দেওয়া নামে আমার আপত্তি ছিল, কেন জানেন ?

—না, কেন ?

—আপনি আগে বলুন, কী মনে করে আপনি ওর নাম শকুন্তলা রেখে-ছিলেন ?

—আমি কিছু মনে করে ও-নাম রাখিনি কিন্তু—আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না।

—আপনি সত্যিকথা বলছেন ?— রাণীসাহেবা হঠাৎ যেন বড় ঋজু হয়ে দাঁড়ালেন।

আমি হঠাৎ এই প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে কেমন বিমূঢ় হয়ে গেলাম। তাঁর চোখের দিকে তাকালাম। ভয় হলো—ধরা পড়ে গেলাম নাকি ! ওকি হাসি নয়, তবে—ভ্রূকুটি !

তারপর আমার দিকে তেমনিভাবে চেয়েই রাণীসাহেবা বললেন—আমার স্বামীকে আপনি ঘনিষ্ঠভাবেই জানতেন, আমাদের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে কোথাও কোন ফাঁক ছিল না—যদি এতদিনের পরিচয়েও সেটা না-বুঝে থাকেন তো···

বলতে বলতে থেমে গেলেন রাণীসাহেবা।

তারপর একসময়ে আশেপাশে চেয়ে নিয়ে বললেন—আজ আমি স্বাধীন। উনিও নেই, মিনুও জন্মের মতো পর হয়ে গেল, আজ আর বলতে দোষ নেই—কেন আপনি শকুন্তলা নাম রেখেছিলেন তা আর কেউ না বুঝুক, আমি বুঝেছিলাম।

—আমায় ক্ষমা করবেন, আমায় ক্ষমা করবেন আপনি—

—কিন্তু আপনি যে ক্ষমার যোগ্যও নন, শকুন্তলার জন্ম-বৃত্তান্ত আমাদের দেশের একটা সাত বছরের মেয়েও জানে— বলতে বলতে বিদায় সম্ভাষণ না করেই চলে গেলেন দরজার পর্দার আড়ালে। আর আমি খানিকক্ষণ হতবাকের মতন দাঁড়িয়ে থেকে আস্তে আস্তে বাইরে চলে এলাম।

···ট্রেনে আসতে আসতে ভেবেছি কত কথা। ভেবেছি—অল্প বয়েসের ত্রুটির জন্যে যাঁকে সারাটা জীবন প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছে, সমস্ত বিলাসব্যসন, শহর, সভ্যতা ছেড়ে যিনি আত্মবিবরে মুখ লুকিয়ে মুহ্যমান মৃতকল্প হয়ে আছেন, আজ রাণীসাহেবার সেই পরিপূর্ণ রূপটাই যেন দেখবার সৌভাগ্য হলো। গোকুল অবশ্য ছিল হতভাগ্য, কিন্তু এই রাণীসাহেবাকে দেখলাম আজ তার চেয়ে আরো শতগুণ হতভাগ্য !

মনে মনে সংকল্প করলাম রাণীসাহেবাকে নিয়ে এখন গল্প লিখব না। ওই মৃণালিনী যখন শ্বশুরবাড়িতে অত্যাচারে আত্মধিক্কারে উন্মাদ হয়ে আত্মহত্যা করবে—তখনই রাণীসাহেবাকে নিয়ে গল্প লেখার উপযুক্ত সময় হবে।

সেই আমার রাণীসাহেবার সঙ্গে শেষ দেখা। এর পর আর দেখা হয়নি।

শেষ দেখা বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ দেখা নয়। এর পর যে ছোট ঘটনাটি ঘটলো সেটি না ঘটলে রাণীসাহেবাকে নিয়ে গল্প লেখবার কোনও সার্থকতাই থাকে না।

এতদিনের সমস্ত দেখা একটি মুহূর্তে যেন ভুল-দেখায় পরিণত হলো। সেই ঘটনাটা বলি।

এক সুগার-মিলের শেয়ার বিক্রি করতে এক ভদ্রলোক একদিন আমার কাছে এসে হাজির।

সকালবেলা। লোকটি কিন্তু বড় স্মার্ট!

বললে—শেয়ার আপনাকে আমি এখনি কিনতে বলছি না, কিন্তু আমাদের প্রস্‌পেক্‌টাসখানা একবার পড়তে অনুরোধ করি—ম্যাক্‌সুইনি ব্রাদার্স লিমিটেডের সমস্ত কনসার্ন আমাদের বি. কে. গুপ্ত এন্ড কোং কিনে নিয়েছেন—ম্যানেজিং এজেন্টস্‌ নতুন হলেও ফার্ম বহুদিনের, প্রেফারেন্‌শিয়াল শেয়ারে ডিভিডেন্ড্‌ এইট পারসেন্ট আর অর্ডিনারী শেয়ার হলো···

উল্টেপাল্টে দেখলাম। 'নরবটিয়াগঞ্জ সুগার ম্যানুফ্যাক্‌চারিং এন্ড ট্রেডিং কনসার্ন—ম্যানেজিং এজেন্টস্‌—বি. কে. গুপ্ত এন্ড কোং'—। সাদা এ্যান্টিক পেপারে রয়্যাল আট-পেজি বুকলেট। শেষের পাতায় ব্যালান্স শীট।

ছোকরাটি বললে—আপনি হয়তো ভাববেন নতুন ম্যানেজিং এজেন্টস্‌—কিন্তু বি. কে. গুপ্তকে যাঁরা জানেন তাঁদের যদি একবার জিজ্ঞেস করে দেখেন···মিস্টার গুপ্ত আমেরিকা আর জাপানে কুড়ি বছর ধরে এই সুগার টেক্‌নোলজি নিয়ে জীবনপাত করেছেন। এতদিন পরে ইন্ডিয়াতে ফিরে এসে আজ ক'বছর হলো এইটে হাতে নিয়েছেন। অদ্ভুত ব্রিলিয়ান্ট কেরিয়ার মশাই। ছোটবেলায় একজন নিজের পয়সা খরচা করে ওঁকে জাপানে পাঠায়, অত্যন্ত গরীবের ছেলে ছিলেন কিনা—

খানিক পরে ছোকরাটি বললে—আর একটা ভেতরের কথা তা হলে আপনাকে বলি—বেহারের রাণীসাহেবার নাম শুনেছেন?

চম্‌কে উঠলাম।

—তিনি নিজে এর পেছনে আছেন। তিনি একাই পঞ্চাশ লক্ষ টাকার শেয়ার কিনেছেন এরি মধ্যে, আবার দরকার হলে আরো লক্ষ লক্ষ টাকার···

বললাম—রাণীসাহেবা?

আমার চোখে মুখে বোধ হয় বিস্ময় ফুটে উঠেছিল।

—আজ্ঞে হ্যাঁ, বেহারের রাণীসাহেবা বলতে ওই একজনকেই তো বোঝায়। আপনি চেনেন নাকি? তা সেই রাণীসাহেবাই কুড়ি বছর ধরে ওঁর আমেরিকায় জাপানে পড়বার খরচ চালিয়ে এসেছেন। ফরেন্‌ কোন ডিগ্রী আর বাকি নেই। দেশে ফেরবার আর ইচ্ছেই ছিল না, রাণীসাহেবাই ওঁকে ডেকে এনে ওইতে নামিয়েছেন। আসলে কোম্পানীটা রাণীসাহেবারই বলতে পারেন। অথচ দেখুন মিস্টার গুপ্ত ছোটবেলায় কী গরীবই ছিলেন! জামসেদপুরে পরের বাড়িতে ছেলে পড়িয়ে পর্যন্ত লেখাপড়া চালিয়েছেন।

—কী নাম বললেন? আমি শিরদাঁড়া সোজা করে চেয়ারে উঠে বসলাম।
—আজ্ঞে আমাদের ম্যানেজিং এজেন্টস্-এর নাম? মিস্টার গুপ্ত।
—পুরো নাম?
—মিস্টার বি. কে. গুপ্ত।
—না না, ইনিশিয়াল নয়, পুরো নামটা কী?
—বিকাশ গুপ্ত।

ঘরন্তী

এ-গল্পটা হয়তো না লিখতে হলেই আমি খুশী হতাম। কিন্তু লেখক জীবনের শুরু থেকেই ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধে নিয়ে-ভাবা ছেড়ে দিয়েছি। তা ছাড়া নিজের সুখ-অসুখের প্রশ্ন তো এখানে ওঠেই না, কারণ মিসেস্ চৌধুরী বিশেষ অনুরোধেই এটা লেখা। তবু তিনি গল্পটা আমাকে যেভাবে শেষ করতে বলেছিলেন সেভাবে শেষ আমি করতে পারবো না বলে দুঃখিত। তিনি যেখানেই থাকুন, এ গল্প যদি পড়েন, যেন আমায় ক্ষমা করেন।

সত্যি, সেদিনের সেই ঘটনার পর মিসেস্ চৌধুরী যে কোথায় চলে গেলেন কেউ জানে না। জানি না এই বই তাঁর হাতে পড়বে কিনা। তবু যদিই তাঁর নজরে পড়ে, তাঁর অবগতির জন্যে জানিয়ে রাখি—লাবণ্য ভালো আছে, লাবণ্যর একটি ছেলে হয়েছে, লাবণ্য ছেলের নাম রেখেছে···

কিন্তু সে-কথা এখন থাক।

মিসেস্ চৌধুরীর হয়তো মনে নেই সে-সব কথা। কিন্তু আমার আছে।

রাত তখন প্রায় বারোটা। লাবণ্যর বাড়ি থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সিতে অনেকক্ষণ রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে শেষে আমার বাড়িতে এসে হাজির হয়েছিলেন। বুদ্ধা না হোন, মিসেস্ চৌধুরীকে যুবতী বলা চলে না। তবু ঘরে ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গে উগ্র সেন্টের গন্ধে ঘর ভরে গিয়েছিল। রুজ-মাখা গাল আর লিপস্টিক-মাখা ঠোঁটের ওপর যেন কে হঠাৎ কালি লেপে দিয়েছে।

বললেন—একটা ভীষণ বিপদে পড়ে তোমার কাছে এসেছি। তোমাকে একটা গল্প লিখতে হবে বিমল—

বললাম—ব্যাপার কী? কী হলো?

—তুমি কথা দাও লিখবে? তুমি অনেককে নিয়ে লিখেছ, এ-ও তোমার সাবজেক্ট।

—খুলে বলুন, কী ব্যাপার?

মিসেস্ চৌধুরী বললেন—লাবণ্যকে নিয়ে তোমায় একটা গল্প লিখতেই হবে।

—লাবণ্য কে?

—বলবো তোমাকে সব, কিন্তু আগে কথা দাও—লিখবে?

অগত্যা কথা দিতেই হলো।

মিসেস্ চৌধুরী বললেন—যত বদনাম শুধু আমাদেরই বেলায়, কিন্তু তবে তোমাকে বলি, আমাদের আর যা-ই দোষ থাক, আমরা চরিত্রহীনা নই। আমার বাড়িতে যারা আসে, কিংবা আমি যাদের কাছে যাই—তারা কেউ আমাকে সতী

সাবিত্রী বলে না জানুক, আমাকে শ্রদ্ধা করে সবাই। অন্তত সমাজকে আমি ঠকিয়েছি এ-কথা কেউ বলবে না। আমার কাছে সরল সোজা কথা। ফেলো কড়ি মাখো তেল। কেউ বলতে পারবে না আমার ঘরে এসে কাউকে পুলিশের হেফাজতে পড়তে হয়েছে। কিন্তু পুলিশ কি কিছু জানেনা? জানে বৈকি। সব জানে। আমার কিসের কারবার, আমার পেট চলে কিসে, সবই জানে। কিন্তু তবু বলেনা কেন? তুমি তো দেখেছ আমার বাড়ির পাশেই পুলিশের থানা। তাদের নাকের ওপরই তো আমার কারবার চলছে, তবু কিছু বলেনা কেন?

এ-প্রশ্নের উত্তর মিসেস চৌধুরী অবশ্য আশা করেন না। তাই, আমিও চুপ করে রইলাম।

কথা বলতে বলতে মিসেস্ চৌধুরীর আধাপাকা চুলের খোঁপা খুলে পড়লো। দু হাতে সেটাকে সামলে নিয়ে আবার বললেন—এই রাত্তির বেলা তোমার ঘরে বসেই বলছি, আমায় কেউ কুলত্যাগিনী বলে জানে, কেউবা বলে আমার স্বামী আমায় ত্যাগ করেছে। আমি সব জানি সব স্বীকার করি, তোমাদের কাছেও আমি নিজেকে সতী-সাবিত্রী বলে বড়াই করি না, আমি যা আমি তা-ই। আমার সুটকেস-এর মধ্যে যেদিন মিস্টার চৌধুরী এক প্রেমপত্র আবিষ্কার করলেন, সেদিনও আমি মিথ্যে কথা বলে আত্মরক্ষা করবার চেষ্টা করিনি। তা ছাড়া তোমরা তো জানো, একগ্লাস বিয়ার খেলে কী-রকম ভুল বকতে শুরু করি।

কথা বলতে বলতে যেন হাঁপাতে লাগলেন।

বললেন—তুমি হয়তো বিশ্বাস করবে না, বরাবর জানো নিশ্চয়ই সন্ধ্যে বেলা তিন কাপ চা খেয়ে তবে আমার নেশা কাটে, আজ সত্যি বলছি তোমায়, এক-কাপ চাও জোটেনি কপালে।

তারপর লজ্জা ত্যাগ করে বললেন—তোমার চাকরকে একবার জাগাও, চা করুক।

সত্যি মনে হলো মিসেস্ চৌধুরী এক নিদারুণ আঘাত পেয়েছেন যেন। সে-আঘাতে নেশার খোরাক খেতেও ভুলে গেছেন তিনি—এমনি কঠোর তাঁর যন্ত্রণা। নইলে মিসেস্ চৌধুরীর মত মেয়েমানুষ এই রাত্রে নিজের ব্যবসা ছেড়ে আমার বাড়িতেই বা আসবেন কেন! অথচ সে-আঘাত প্রতিরোধ করবার ক্ষমতাও যেন তাঁর নেই। দুর্বল অক্ষম আক্রোশে তিনি যেন ক্ষতবিক্ষত হচ্ছেন। শেষ পর্যন্ত উপায়ান্তর না দেখে আমার কাছে এসে হাজির হয়েছেন। আমিই বুঝি এখন তাঁর একমাত্র অস্ত্র। গল্প লিখে যেন আমিই একমাত্র তার প্রতিকার করতে পারি।

জিজ্ঞেস করলাম—কিন্তু লাবণ্য কে আপনার?

চায়ের কাপে চুমুক দিতে গিয়ে থেমে গেলেন মিসেস্ চৌধুরী। বললেন—আমার কেউ না। আসলে আমার নিজের বলতে কে আর আছে বলো! আরো যেমন দশজন ছেলেমেয়ে আসে আমার বাড়িতে—লাবণ্যও তেমনি। এদের সংগে আমার কিসের সম্পর্ক! কত মারোয়াড়ী, ভাটিয়া, গুজরাটি, বাংগালী আসে—মেয়ে সংগে করে নিয়ে আসে, কেউ এক ঘণ্টা, কেউ দু ঘণ্টা, কেউ তিন ঘণ্টা, কেউবা সারা রাত ঘর ভাড়া করে। তিনখানা ফারনিশ্ড ঘর আমার, ভাড়া নেয়—আবার কাজ ফুরোলে চলে যায়। লাবণ্যও ওদের মত একজন, আমার সংগে ওর সম্পর্ক কিসের?

লাবণ্যর সঙ্গে যদি কোনও সম্পর্ক নেই, তবে তাকে নিয়ে এত মাথাব্যথা, তাকে নিয়ে এই গল্প লেখানোর প্রচেষ্টা কেন, বোঝা গেল না।

মিসেস্ চৌধুরী বললেন—কিন্তু তা বলে কি তোমরা আমায় অর্থপিশাচ বলবে? এই যে তোমরা আমার ঘরে যাও, নিজের পয়সা খরচ করে খাও-দাও ফুর্তি করো, কখনও ঘর-ভাড়া চেয়েছি? ছোটবেলায় এককালে কবিতা লিখেছি, তাই তোমাদের সঙ্গে মিশি, কিন্তু এ-লাইনে এসে আর ওসব হলো না। না হোক, সকলের সব জিনিস হয় না, ওই বাড়ি-ভাড়া থেকে যে-ক'টা টাকা আসে, তাইতেই আমার শেষজীবনটা একরকম করে কাটিয়ে দেব—

মিসেস্ চৌধুরীকে যারা জানে তারা বুঝতে পারবে এ তাঁর বিনয়ের কথা। যেমন-তেমন করে কাটিয়ে দেবার মতো জীবন তাঁর নয়। এ ক'বছরে অনেক টাকা তিনি কামিয়েছেন।

একটু থেমে বললেন—ফুলচাঁদকে তুমি দেখেছ?

বললাম—দেখেছি।

—তার মতন অত বড়লোক, যে এক কথায় দশ হাজার টাকা বার করে দিতে পারে, সে-ও যখন প্রথমে ওই লাবণ্যর জন্যে আটশো টাকা খরচ করবে বলেছিল, আমি রাজী হইনি। আমি যত বড় ব্যবসাদার মেয়েমানুষই হইনা কেন, এককালে তো আমিও ঘরের বউ ছিলাম, রোজ সকালে স্নান করে তুলসীতলায় জল দিয়ে আমিও তো প্রণাম করেছি—আমিও তো ছেলেমেয়ের মা ছিলাম। আজ না-হয় তোমরা আমায় দেখছো অন্যরকম, এখন পাকা চুলে কলপ মাখি, তোবড়ানো গালে রুজ মাখি—

হঠাৎ মিসেস্ চৌধুরীর মুখে এ-কথা শুনে কেমন যেন অবাক লাগলো!

বললেন—যাক গে এ-সব কথা। আমার ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে, তুমি আমার ওখানে চলো—সব গল্পটা তোমায় বলবো।

—এখন? এত রাত্রে?

—তাতে কী হয়েছে?

শেষ পর্যন্ত সে-রাত্রে আমি অবশ্য মিসেস্ চৌধুরীর বাড়ি যাইনি। অনেক

রাত পর্যন্ত মিসেস্ চৌধুরীই সমস্ত গল্পটা আমায় বলেছিলেন। গল্প যখন শেষ হলো তখন রাত প্রায় তিনটে!

চলে যাবার সময় আমার হাত-দুটো ধরে বলেছিলেন—লক্ষ্মীটি, এটা তোমায় লিখতেই হবে। তবে, ওই শেষকালটা শুধু বদলে দিয়ো। যেমনভাবে বললাম ওইভাবে শেষ কোরো—কেমন?

তার পর ট্যাক্সিতে ওঠবার আগে বলেছিলেন—তা হলে কাল বিকেলবেলা আমার ওখানে যাচ্ছো তো?

পরের দিন ঠিক সময়ে গিয়েছিলাম মিসেস্ চৌধুরীর বাড়ি। কিন্তু দেখা তাঁর পাইনি। দরজায় তালা-দেওয়া। শুনেছিলাম, মিসেস্ চৌধুরী বাড়ি ছেড়ে দিয়ে চলে গেছেন কোথায়, কেউ জানে না।

তাঁর সঙ্গে সে-ই আমার শেষ দেখা।

শেষ দেখা বটে, কিন্তু সম্পর্ক সেখানেই শেষ হয়নি। অনেক গল্পের রচনায় যখন কী নিয়ে লিখবো ভেবেছি, তখন মিসেস্ চৌধুরীর গল্পটার কথাও মনে হয়েছে বারবার। মনে হয়েছে নিরঞ্জন আর লাবণ্যর গল্পটা লিখেই ফেলি। যেমনভাবে শেষ করতে বলেছিলেন তেমনি করেই না-হয় শেষ করি। মিসেস্ চৌধুরী যেখানেই থাকুন, এ গল্প তাঁর হাতে পড়তেও পারে। একদিন আমাকে স্নেহ করতেন, ভালবাসতেন—সে-স্নেহ সে-ভালবাসার কিছুটা অন্তত তা হলে পরিশোধ হয়। কিন্তু মন সায় দেয়নি।

ট্রামে বাসে সিনেমায় সংসারে সর্বত্র লাবণ্যকে খুঁজে ফিরেছে আমার মন। সন্ধ্যেবেলা চৌরঙ্গীর ধারে গালে সস্তা পাউডার আর আলতা মাখা ঠোঁট দেখে অনেকবার চমকে উঠেছি। ভেবেছি—এই-ই বোধহয় মিসেস্ চৌধুরীর লাবণ্য! লাবণ্যর জীবন হয়তো এইখানে এসেই থেমেছে। আবার কখনও কোনও নতুন পরিচিত পরিবারের শান্ত সান্ধ্য পরিবেষ্টনীতে—পুত্র-কন্যার আনন্দ পরিবেশে—গৃহিণীর দিকে চেয়ে চোখ আমার অপলক হয়ে গেছে। এই-ই কি লাবণ্য? হয়তো নিরঞ্জনের উদার প্রেমের প্রাচুর্যে সে-লাবণ্য এখন মহীয়সী হয়ে উঠেছে। কিন্তু তবু আমার অনুসন্ধিৎসু মনের ক্ষুধা মেটেনি কোথাও। মিসেস্ চৌধুরীর কল্পিত পরিণতির সঙ্গে, লাবণ্যের বাস্তব জীবনের পরিণতির যেন কোথাও অসঙ্গতি ছিল। আমার উদ্ভাবনী শক্তি দিয়ে কোনদিন তার কোনও সমাধান খুঁজে পাইনি।

তা নিরঞ্জনের মতো পুরুষকে তো আজও দেখি সকালবেলা বাসে চড়ে অফিসে যেতে। টেনেবুনে একশো টাকাই না-হয় মাইনে পাক। টুইলের শার্ট আর মিলের কাপড়। এক কথায় মোটা ভাত আর মোটা কাপড়। একটা পেট একশো টাকায় একরকম চলে যায় বৈকি! আর লাবণ্য!

মিসেস্ চৌধুরী বলেছিলেন—লাবণ্যও ছিল ওই নিরঞ্জনের মতো সাদাসিধে—

পঞ্চান্ন টাকা মাইনে আর পঞ্চাশ টাকা ডিয়ারনেস্—

তা সত্যি। আমিও ভাবি, ও-মাইনেতে ওর চেয়ে বিলাসিতা কী করে করা যায়! বিশেষ করে মেসের খরচ, বাস-ভাড়া, টিফিন। তার পর দু'-একদিন কি সিনেমাতেও যেত না?

কেমন করে ওদের আলাপ হলো কে জানে! গ্রহচক্রের কোন্ ষড়যন্ত্রের ফলে কক্ষভ্রষ্ট হয়ে দু'জনে দু'জনের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছিলো একদিন। তারপর ওদের আর ছাড়াছাড়ি হলোনা কেন, তাই বা কে জানে? ওদের নিয়ে একদিন গল্প লেখাতে হবে এ-ধারণা থাকলে মিসেস্ চৌধুরী সে কথা নিশ্চয়ই জেনে রাখতেন। কিন্তু আর যা-ই হোক পছন্দের বাহবা দিতে হবে বটে নিরঞ্জনের।

মিসেস্ চৌধুরী বলেন—লাবণ্য রোগা হলে কী হবে, ওর গালের তিলটার জন্যে সকলেরই ওকে খুব পছন্দ হতো।

তা লাবণ্যকে আমিও কল্পনা করে নিতে পারি বৈকি! মিসেস্ চৌধুরীর বর্ণনার সঙ্গে অনেকসময় বাসের ট্রামের মেয়েদের মিলিয়েও নিই। যেন মনে হয়—এক লাবণ্য আজ একশো লাবণ্য হয়ে সারা কলকাতায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর লিন্ডসে স্ট্রীটের মোড়ের ওপর একটি ছেলে আর একটি মেয়ে একসঙ্গে যেতে দেখলে কেমন যেন মনে হয় ওরা সেই নিরঞ্জন আর লাবণ্য। অফিসের ছুটির পর ওরা আজ চলেছে মিসেস্ চৌধুরীর ফ্রী স্কুল স্ট্রীটের বাড়িটার দিকে! মাসের প্রথম দিক। পাঁচ টাকা দিয়ে একঘণ্টার জন্যে একটা ঘর ভাড়া করে ওরা পরস্পরের মুখোমুখি হয়ে বসে ঘনিষ্ঠ হবে—একান্ত হবে—।

এক এক দিন পেছন পেছন অনুসরণও করেছি ওদের। তবে কি মিসেস চৌধুরী আবার ব্যবসা সুরু করেছেন! সেই আগের মতন : সাহেব, মেম, মোটর দোকান-পত্তর পেরিয়ে সামনে নিরঞ্জন আর লাবণ্য পাশাপাশি চলেছে। গায়ে টুইলের শার্ট। পায়ে মোটা কাবুলি জুতো। পাশে গিয়ে দেখা যায়—নিখুঁত করে দাড়ি কামিয়েছে আজ। আর তারই পাশে লাবণ্য। নতুন কেনা স্কার্ট শাড়িটা পরেছে আজ। কানের একটা দুল কেনবার পয়সাও নেই ওর। গলায় পরেছে ঝুটো মুক্তোর নেকলেস। একটু তাড়াতাড়ি সরে গিয়ে পাশ থেকে ভালো করে দেখতে লাগলাম। রাস্তায় জনস্রোতের মধ্যে আমাকে দেখতে পাবেনা ওরা। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম। ওদের নিয়ে গল্প লিখতে হবে, ভালো করে দেখা চাই! মিসেস্ চৌধুরীর বর্ণনার সঙ্গে আজও এদের কোনও অমিল নেই যেন। লাবণ্যের পায়ের চটিটার পর্যন্ত যেন কোনও পরিবর্তন হয়নি। এত বছর পরেও কি সেই চটিটাই পরছে! নিরঞ্জনও কি দশ বছর আগের সেই টুইলের শার্টটাও বদলায়নি আজ পর্যন্ত। সেই বিকেলের আলো-ছায়ার মধ্যে জনবহুল রাস্তার স্রোতে মিসেস্ চৌধুরীর কাছে শোনা নিরঞ্জন আর লাবণ্য যেন আবার রক্ত মাংসের শরীর নিয়ে হাজির হলো আমার সামনে।

নিরঞ্জন বলছে—এ শাড়িটা পরে তোমায় খুব ভালো দেখাচ্ছে কিন্তু—

—কত দাম নিলে এর ?

আরো পাশে গিয়ে ঘনিষ্ঠ হয়ে শুনতে লাগলাম ওদের কথা।

নিরঞ্জন বলছে—দাম এখনও দিইনি, চেনা-শোনা দোকান—মাসে মাসে দু'টাকা করে দিলেই চলবে।

লাবণ্য বললে—কিন্তু কেন কিনতে গেলে শাড়িটা, তোমার জুতোটা তো বহুদিন ধরে ছিঁড়ে গেছে, জুতো একজোড়া কিনলে হতো তোমার।

নিরঞ্জন বলে—আসছে মাসে চাকরিটা পাকা হলে কিনবো, তার আগে নয়।

লাবণ্য বলে—কিন্তু এখন থেকে কিছু টাকা তো জমানোও আমাদের দরকার। তা না হলে আর কতদিন মিসেস্ চৌধুরীর ঘর ভাড়া নিয়ে চলবে ; গত মাসে দু'দিনের ভাড়া এখনও বাকি আছে যে !

নিরঞ্জনের মুখটা দেখতে পাই এবার ভালো করে। নিম্ন মধ্যবিত্ত জীবনের ভবিষ্যৎ-হীন দিন-যাপনের ক্লান্তির ফাঁকে ফাঁকে যেন কোথাও একটুকরো আশা উঁকি মারে। লাবণ্য আর সে বাড়ি ভাড়া করবে একটা। একটা স্বাধীন দু'-ঘর-ওয়ালা ফ্ল্যাট। তিরিশ কিংবা চল্লিশ, এমনকি পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত ভাড়া দেবে। তার পর যদি ভবিষ্যতে কোনও দিন সুদিন আসে, সেদিন···

নিরঞ্জন চলতে চলতে হঠাৎ বললে—একটা ভালো বাড়ির সন্ধান পেয়েছি জানো ?

লাবণ্য চমকে ওঠে—কত ভাড়া ?

—ভাড়া বেশি নয়, পঞ্চাশ, কিন্তু—

—সেলামী চায় বুঝি ?

সেলামী ছাড়া বাড়ি পাওয়া কি সম্ভব নয় ? চেষ্টা করলে কী না পাওয়া যায় ! চেষ্টা কি আর নিরঞ্জন কম করেছে ? আজ দু'বছর ধরে চেষ্টা তো করেই চলেছে।

অনেকদিন থেকেই চেষ্টা চলেছে। একটা বাড়ি পেলেই তো সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। তা হলে এমন করে আর মিসেস্ চৌধুরীর ঘর ভাড়ার জন্যে টাকা নষ্ট করতে হয় না। মাসে 'এখানে চারদিন এলেই তো চার-পাঁচে কুড়ি টাকা চলে গেল। এক এক মাসে পাঁচদিন-ছ'দিনও এসেছে! তবে মিসেস্ চৌধুরী লোক ভালো। ব্যবহার ভালো তাঁর। হাতে নগদ টাকা না থাকলে বাকিতেও চলে। তা ছাড়া ক'ঘণ্টাই বা থাকে তারা! বাস-ট্রাম বন্ধ হবার আগেই বেরিয়ে আসতে হয়। তার পর আবার কতদিন পরে দেখা হবে! চলতে চলতে লাবণ্যের হাতটা ধরে নিরঞ্জন।

ওদের কথা শুনতে শুনতে আমিও যেন এগিয়ে চলি। হঠাৎ মানুষের ভিড়

আর দোকানপত্রের সার পেরিয়ে কখন নিরঞ্জন আর লাবণ্য কোথায় হারিয়ে যায়। একলা একলা মিসেস্ চৌধুরীর ফ্রী স্কুল স্ট্রীটের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াই। হঠাৎ যেন স্বপ্নও ভেঙে যায়! সেই পরিচিত বাড়িটার সামনের ঘরে সাহেব মেম সেজেগুজে বসে আছে, ভেতর থেকে পিয়ানোর শব্দ আসছে। মিসেস্ চৌধুরীর বাড়ির সেই নেপালী দারোয়ানটা আর সেলাম করলে না আগেকার মতো!

মিসেস্ চৌধুরী বলতেন—টালিগঞ্জ থেকে বাসন্তী আসতো, চেতলা থেকে আসতো কল্যাণী, বেহালা থেকে আসতো টগর। কিন্তু এক এক দিন এক এক জনের সঙ্গে। চৌরঙ্গীর রাস্তা থেকে যাকে পেত ধরে আনতো। কিন্তু লাবণ্য? বরাবর নিরঞ্জনকে দেখেছি সঙ্গে। নিরঞ্জনের যখন চাকরি ছিল না, ওই লাবণ্যই তিন মাস মেসের খরচ যুগিয়েছে ওর।

ঘর-ভাড়া হয়তো শহরে আরো অনেক জায়গায় পাওয়া যায়। কিন্তু সেখানে এমন রুচি আর শালীনতা পাবে না। বাইরে থেকে বোঝবার কিছু উপায় নেই। সামনে অর্কিড আর মর্নিং-গ্লোরি দিয়ে ঘেরা। পেছনের দরজা দিয়ে সোজা চলে যাও ভেতরে। কোনাকোণি তিনটে ঘর। পর্দা ঠেলে ঘরের ভিতর যেতে হবে। ঘরে একটা ইংলিশ খাট, একটা ড্রেসিং আয়না আর দুটো চেয়ার—আসবাব বলতে এই। ঘরের সঙ্গে লাগোয়া বাথরুম। ব্যবস্থা পুরোদস্তুর বিলিতি। এখানে টাকা খরচ করেও তো আরাম।

মনে আছে হঠাৎ মিসেস্ চৌধুরী তাস খেলতে খেলতে উঠে পড়লেন একদিন।

জর্জেটটা সামলে নিয়ে বললেন—দেখি, ওদিকে গোলমাল কিসের—আমায় তাস দিয়ো না ভাই।

বাইরে থেকে খানিকটা বচসার শব্দ কানে এল।

তার পর প্রচণ্ড শব্দ করে ডেকে উঠলো মিসেস্ চৌধুরীর অ্যালসেসিয়ানটা।

খানিক পরে মিসেস্ চৌধুরী ঘরে ঢুকে পাখার রেগুলেটারটা বাড়িয়ে দিলেন।

বললাম—ব্যাপার কী?

—আর বলো কেন, শেঠজী এসেছিল। ফুলচাঁদ শেঠ। মদে চুর একেবারে—একদিন বারণ করে দিয়েছি, তবু—

নির্বিকারভাবে আবার তাস খেলতে লাগলেন—নো বিড্, থ্রি ডায়মণ্ডস্—

সেদিন অনেকদিন পরে সেই ফুলচাঁদের সঙ্গে আবার দেখা হয়ে গেল, লম্বা-চওড়া একটা গাড়ি হঠাৎ সামনে এসে ব্রেক কষে দাঁড়ালো। দেখি ফুলচাঁদ। কে বলবে চল্লিশ বছর বয়েস। নিজেই ড্রাইভ করছে।

মুখ বাড়িয়ে হেসে বললে—কী খবর স্যার?

আমিও আশা করছিলাম কিছু খবর পাবো। কিন্তু ফুলচাঁদই প্রশ্ন করলে—মিসেস্ চৌধুরীর খবর কিছু জানেন স্যার ?

ফুলচাঁদ শেঠের ভাবনা নেই। হয় এ-পাড়ায় নয় ও-পাড়ায়, যেখানে হোক আড্ডা ও খুঁজে নেবেই। মিসেস্ চৌধুরী না থাক, মিসেস্ সরকার আছে। নার্সিং হোম আছে। কত কী আছে কলকাতা শহরে। ছোকরা বয়েস। দিন-দিন যেন বয়েস কমছে ফুলচাঁদের। তিনটে আসল আর দুটো ভেজাল ভেজিটেবল ঘি-এর কারবার। গাড়িটা চলে যাবার অনেকক্ষণ পর পর্যন্ত সেদিকে চেয়ে রইলাম।

কিন্তু সেদিনই সত্যি সত্যি বসলাম কলমটা নিয়ে। এবার লিখতেই হবে। মিসেস্ চৌধুরী যেমনভাবে শেষ করতে বলেছিলেন সেইভাবেই শেষ করব না-হয়।

প্রথমেই লিখলাম—নিরঞ্জন দাঁড়িয়ে আছে সাপ্লাই অফিসের একতলার সিঁড়ির সামনে। লাবণ্যের অফিসের ছুটি হয়ে গেছে। একে একে নামতে শুরু করেছে সবাই।

লাবণ্যও চমকে উঠেছে কম নয়। বললে—একি, তুমি !

নিরঞ্জন বললে—তোমার জন্যেই দাঁড়িয়ে আছি।

—আজ তো কথা ছিল না তোমার আসবার।

—তা হোক, তবু এলাম, মিসেস চৌধুরীর বাড়ি যাবো, আজ বড়ো যেতে ইচ্ছে করছে—

—কিন্তু টাকা ? টাকা এনেছো ? আমার তো হাত খালি, শুধু বাস-ভাড়াটা—

—সে একরকম বলে-কয়ে ব্যবস্থা করা যাবে, আজ যেতেই হবে তোমায়—জানো লাবণ্য, আমার চাকরিটা চলে গেছে—

—সেকী !

মিসেস্ চৌধুরী শুনেছেন সে-সব কথা। তিনি জানতেন লাবণ্যের সে কৃচ্ছ্র-সাধনের ইতিহাস। ধোপার বাড়ি কাপড় দেওয়া লাবণ্যের বন্ধ হলো সেইদিন থেকে। শুরু হলো সেকেন্ড ক্লাস ট্রামে চড়া। টিফিন বন্ধ। এক এক দিন নিজের জলখাবারটা রুমালে করে বেঁধে নিয়ে ভাগ করে খেয়েছে মিসেস্ চৌধুরীর ঘরে দরজা বন্ধ করে। চুলে তেল পড়তে লাগলো একদিন অন্তর। স্নো ফুরিয়ে গেল, আর কেনা হলো না।

মিসেস্ চৌধুরী বলেছিলেন—ওদের জন্যে দিলাম কনশেসন করে। আমার ঘরের ভাড়ার রেট পাঁচ টাকা বরাবর—ওদের জন্যে ঠিক হলো তিন টাকা। তাও সব সময় নগদ দিতে পারত না, বাকি পড়ত।

কিন্তু ওদিকে টালিগঞ্জের বাসন্তীর গায়ে তখন ঢাকাই শাড়ি উঠেছে।

চেতলার কল্যাণী নতুন একছড়া হার গড়ালো। বেহালার টগরও ব্রোঞ্জের চুড়ি ভেঙে গিনি-সোনার কংকণ গড়িয়েছে। বাজার গরম বেশ।

সে-বাজারে মিসেস্ চৌধুরীই বা ছাড়বেন কেন? ঘর-ভাড়া পাঁচ টাকা থেকে বেড়ে দশ টাকা হলো। তাতেও খালি পড়ে থাকে না। খদ্দের এসে ফিরে যায় বাইরে থেকে। মিসেস্ চৌধুরীর টেলিফোন সারা দিন-রাত এনগেজড্ থাকে!

মনে আছে একদিন খুব ভয় পেয়েছিলাম আমি।

দুপুরবেলা। খাওয়া-দাওয়া করে মিসেস্ চৌধুরীর সংগে আড্ডা দেবার উদ্দেশ্যে গিয়েছিলাম। ইচ্ছে—নতুন বইটা ওঁকে এক কপি উপহার দেবো। তার পর ওঁরই বিছানায় শুয়ে শুয়ে পড়ে শোনাব জায়গায় জায়গায়। মিসেস্ চৌধুরী সাহিত্যিক না হোন, সাহিত্য-রসিক। ওঁকে বই দিয়ে আমরা নিজেদের কৃতার্থ বোধ করতাম। কিন্তু দূর থেকে দেখি বাড়ির সামনে ভীষণ ভিড়। অনেকখানি জায়গা জুড়ে গোল হয়ে ফুটপাথের ওপর লোক জমা হয়েছে। কয়েকটা পুলিশও সেখানে দাঁড়িয়ে। মনে হলো—নিশ্চয় কোনও গোলমাল, কোনও কেলেংকারী বেধেছে। এবারে মিসেস্ চৌধুরীর আর নিস্তার নেই। আমাদের আড্ডা ভাঙলো বুঝি!

যাবো কি যাবোনা ভাবছি। শেষকালে আমরাও কি জড়িয়ে পড়বো?

কথাটা ভাবতেই কেমন লজ্জা হলো। ছি-ছি। আমরা কি বিপদের দিনে ওঁকে এমনি করেই ফেলে পালাবো! সেইদিন সত্যি প্রথম উপলব্ধি হলো, মিসেস্ চৌধুরী কতখানি একলা। বুঝলাম পৃথিবীতে মেয়েমানুষ হয়ে জন্মাবার পর সারা জীবন একজন অভিভাবকের প্রয়োজন কেন এত অপরিহার্য হয়।

মিসেস্ চৌধুরী, আপনি যেখানেই থাকুন, আজ অকপটে স্বীকার করছি—সেদিন আপনার জন্যে আমার মায়া হয়েছিল সত্যি!

থাক্ সে-কথা। আপনার বাড়িতে গিয়েই আমি বলেছিলাম—আজ বড় ভয় পেয়েছিলাম।

আপনি তখন সালোয়ার পায়জামা পরে কৌচে ঠেস দিয়ে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। জিজ্ঞেস করেছিলেন—কেন?

কিন্তু উদ্বেগের লেশমাত্র ছায়াও আপনার মুখে ছিল না।

আমি বললাম—বাড়ির সামনে ভিড় দেখে ভাবলাম বুঝি পুলিশের হাংগাম, কিন্তু—

পুলিশের নাম শুনে আপনি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে আবার কৌচে হেলান দিয়েছিলেন।

—কিন্তু কী?

—কিন্তু দেখলাম ফুটপাথের ওপর বাঁদর-নাচ হচ্ছে।

আপনি হেসে বলেছিলেন—না, সে-সব ভয় নেই, পুলিশ আমার কিছু করবে

না। তবে ভয় ফুলচাঁদকে নিয়ে।

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম—কেন, ফুলচাঁদ আপনার কী করতে পারে?

আপনি বলেছিলেন—না, আমার আর সে কী করবে? ফুলচাঁদ আমার চেয়ে বড়লোক হতে পারে, কিন্তু আমার কাছে তার টিকি বাঁধা! কিন্তু ভয় অন্য ব্যাপারে—

—অন্য কী ব্যাপার?

—ভয় লাবণ্যর জন্যে— বলে আপনি গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলেন।

তখন আমি জিজ্ঞেস করিনি—কে লাবণ্য! কী তার পরিচয়!

আপনার হয়তো মনে নেই আপনি নিজের মনেই যেন বলেছিলেন—লাবণ্যকে ফুলচাঁদ বহুদিন থেকে চাইছে। দুশো পর্যন্ত খরচ করতে রাজী—আমিই রাজী হইনি—শেষে কোন্ দিন না—

মনে আছে এবারে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম—লাবণ্য কে?

আপনি সে-প্রশ্নের জবাব দেননি। আপনি তেমনি কোচে হেলান দিয়েই বলেছিলেন—ফুলচাঁদ যদি বাসন্তীকে চাইতো আপত্তি করতাম না, কল্যাণীকে চাইলেও চলতো, টগরের বেলাতেও কিছু বলবার ছিল না! আমি আধ ঘণ্টার মধ্যে টেলিফোনে আনিয়ে নিতাম, কিন্তু তা বলে লাবণ্য? ছি-ছি—

লাবণ্যকে আপনি কেন অতখানি সম্মান করতেন তা সেদিন কিছুটা যেন বুঝেছিলাম, আর কিছুটা যেন বুঝতে চেষ্টাই করিনি। সেদিন মিসেস্ চৌধুরীই কি জানতেন তাঁর সেই লাবণ্যকে নিয়ে গল্প লেখানোর জন্যে একদিন রাত বারোটার সময় আমার বাড়িতেই আসতে হবে!

হয়তো মিসেস্ চৌধুরী নিজের জীবনে যা হারিয়েছিলেন, তা ফিরে পেয়েছিলেন লাবণ্যের মধ্যে। হয়তো সেইজন্যেই ফুলচাঁদের হাতে লাবণ্যকে তুলে দিয়ে নিজেকেই অপমান করতে চাননি! কে জানে?

তাই ফুলচাঁদের প্রস্তাবের উত্তরে মিসেস্ চৌধুরী বলেছিলেন—দুশো কেন, পাঁচশো টাকা দিলেও লাবণ্যকে পাবে না। ওর দিকে তুমি নজর দিয়ো না ফুলচাঁদ—

কিন্তু ফুলচাঁদকে আপনি চিনতে পারেননি। ফুলচাঁদ শেঠ জাত-ব্যবসাদার, সাত পুরুষের ব্যবসাদার। কখন কিনতে হবে, কখন বেচতে হবে, তা সে জানে। সেও তাই ধাপে ধাপে উঠেছে। পাঁচশোতে রাজী না হয়, সাতশো। সাতশোতে রাজী না হয়, আটশো—আটশোতে রাজী না হয়...

আজো যেন চেষ্টা করলে দেখতে পারি। দেখতে পারি, তেতলার থেকে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে আসছে নিরঞ্জন। পাশে লাবণ্য!

লাবণ্য যেন খুশীতে উচ্ছল। বললে—দেখেছ, একটু মাটি নেই কোথাও

বাড়িটাতে।

নিরঞ্জন বুঝতে পারলো না। বললে—কেন, মাটি দিয়ে কী হবে?

—একটা তুলসীগাছ পুঁততাম। হিন্দু গেরস্থের বাড়িতে তুলসীর গাছ রাখতে হবে যে—

নিরঞ্জন বললে—তা সে একটা টবে পুঁতলেই চলবে—এই রান্নাঘরের পাশে।

—কিন্তু শোবার-ঘর কোন্‌টা করবে?

—দক্ষিণের ঘরটাই তো ভালো সবচেয়ে, জানালা খুললে আকাশ দেখা যায়।

—একটা খাট কিনতে হবে আমাদের—

নিরঞ্জন হেসে উঠলো—সবুর করো, সবে তো চাকরি হলো, আস্তে আস্তে হবে সব—আগে বাড়িটাই হোক।

বাড়ির মালিক বললেন—আমার এক কথা—ভাড়া চল্লিশ টাকা, যা সবাই দিচ্ছে আপনারাও তাই দেবেন। কিন্তু—

—কিন্তু কী?

মালিক এবার আসল কথাটা পাড়লেন। বললেন—ব্যবসায় আমার অনেক লোকসান গেছে এদানি, এখন ওই বাড়ি-ভাড়াতেই সংসার চলছে একরকম, তা সেলামী কিছু দিতে হবে আপনাদের।

নিরঞ্জন দমে গেল। লাবণ্যও ফিরে আসছিল। এমন ঘটনা প্রথম নয়। আগে জানতে পারলে—

তবু নিরঞ্জন জিজ্ঞেস করল—কত?

যেন কম-সম হলে দিতে তৈরী সে।

মালিক বললেন—বেশি না, আর সব টেনেন্ট যা দিয়েছেন, তা-ই দেবেন—তার একপয়সা বেশি নেব না। আমার কাছে সবাই সমান।

সাম্যবাদীর মতন পরম নিঃস্পৃহ ভঙ্গী করলেন তিনি।

—তবু কত?

—পুরোপুরিই দেবেন; ভাঙা-ভাঙতি ভালবাসিনা আমি।

তবু তিনি দুর্বোধ্য হচ্ছেন দেখে দয়া করে খুলে বললেন—হাজারের কম আমি নিইনে।

ফুলচাঁদ সেদিন সেই কথাই বললে—আটশোতে রাজী না হয়, হাজার—

সংখ্যাটা পুরোপুরি হলে যেন অন্যরকম শোনায়। কিন্তু নিজের কানকে আপনি বোধ হয় বিশ্বাস করতে পেরেছিলেন মিসেস্ চৌধুরী। তাই হয়তো দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করেননি। তবু কিন্তু আপনাকে ব্যস্ত হতে দেখা গেল না। আপনি তেমনি নির্বিকারভাবেই টফি চুষতে লাগলেন।

কিন্তু ঘটনাচক্রে ঠিক তখনই কি লাবণ্য আর নিরঞ্জনকে সামনে দিয়ে যেতে হয়! রাত তখন সাড়ে ন'টা। চটি ফটাস্-ফটাস্ করতে করতে চলেছে লাবণ্য।

সারাদিন অফিসের খাটুনির পর বাড়ি ফিরতে পারলে সে বাঁচে। আপনার মনে হলো—ও তো লাবণ্য নয়। আপনার ভাষাতেই বলি—আপনার মনে হলো—ও তো লাবণ্য নয়, ও যেন আপনার বিগত-জীবন, আপনার পরিশুদ্ধ আত্মা আপনাকে ব্যঙ্গ করে আপনার দিকেই পেছন ফিরে চলে যাচ্ছে। আর ফিরে আসবেনা কোনও দিন।

আপনি সেখানে বসেই নেপালী দারোয়ানকে ডাকলেন—জংগী ?

জংগী তিন লাফে এসে অ্যাটেনশনের ভংগীতে দাঁড়িয়ে স্যালিউট করার পর আপনি বললেন—লাবণ্যকে ডেকে দে তো—

লাবণ্য এল।

আপনি আপনার আত্মার মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ালেন। এবং সেই বোধ হয় প্রথম আর শেষবার।

তার পর তাকে আড়ালে নিয়ে এসে ফুলচাঁদের প্রস্তাবটা জানালেন। আপনার মনে হলো, পৃথিবীর প্রচ্ছদপটে আজ পর্যন্ত যত মানুষের পদচ্ছায়া পড়েছে, সেই কোটি কোটি সংখ্যাহীন জনসমুদ্রের তরঙ্গ যদি আবার উদ্বেলিত হয় তো হোক। নক্ষত্র-নীল আকাশের সমস্ত জ্যোতিষ্ক আবার কক্ষচ্যুত কেন্দ্রচ্যুত হয়ে যদি দিক্‌ভ্রান্ত হয় তো হোক। তবু আপনার আত্মা অচল অটল থাকবে! লাবণ্য কিন্তু সমস্ত শুনে মাথা নীচু করে রইল খানিকক্ষণ।

তারপর যেন দাঁতে দাঁত চেপে বললে—ওকে একবার জিজ্ঞেস করে আসি, মাসীমা!

মর্নিং-গ্লোরির আড়ালে অন্ধকারে একলা অপেক্ষা করছিল নিরঞ্জন। লাবণ্য সেখানে গেল। তারপর অনেকক্ষণ ধরে কী যে পরামর্শ হলো দু'জনে। দূর থেকে কিছু শোনা গেল না। তবু আভাসে বোঝা গেল—একজন বুঝি কেবল বোঝাতে চাইছে আর একজন যেন কিছুতেই বুঝতে চাইছে না।

এক সময়ে লাবণ্য এল। আপনার সামনে এসে মাথা নীচু করে বললে—আমি রাজী।

কথাটা বোধ হয় লাবণ্য একটু আস্তেই বলেছিল, কিন্তু আপনি দেখতে পেলেন—ঘরের ভেতর ফুলচাঁদ সে-কথা শুনে নতুন ধরানো সিগ্রেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সোফা ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠেছে। আর, আপনি যে আপনি, আপনারও মনে হলো বারান্দায় চেইনে-বাঁধা অ্যালসেসিয়ানটা যেন বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠলো।

বললাম—তারপর ?

মিসেস্ চৌধুরীর পাকা চুলের খোঁপাটা আবার একবার খুলে গেল। এবার সেটাকে আর সামলাবার চেষ্টা করলেন না। বললেন—তারপর ? তার পর সেই প্রথম আর সেই শেষ। আর আসেনি তারা আমার বাড়িতে। ফ্রী স্কুল স্ট্রীটের

লোকেরা আর কোনও দিন সে-রাস্তায় হাঁটতে দেখেনি নিরঞ্জন আর লাবণ্যকে।

আবার জিজ্ঞেস করলাম—তবে কোথায় গেল তারা ?

মিসেস্ চৌধুরী বলেন—আমিও তাই ভাবতুম—কোথায় গেল তারা। মনে হতো—সেও বোধ হয় অন্য মেয়েদের পর্যায়ে নেমে এসেছে। টালিগঞ্জের বাসন্তীকে জিজ্ঞেস করেছি, চেতলার কল্যাণীকে জিজ্ঞেস করেছি, বেহালার টগরকে জিজ্ঞেস করেছি—তারা এখনও আসে কিন্তু বলতে পারেনা কোথায় গেল তারা—এমনকি ফুলচাঁদও না।

আবার জিজ্ঞেস করলাম—তবে হয়তো ওই ঘটনার পর নিরঞ্জন ত্যাগ করেছে তাকে।

—তাও ভেবেছি অনেকবার। হয়তো অবিশ্বাসে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে নিরঞ্জন। আর ওদিকে আত্মধিক্কারে হয়তো আত্মহত্যা করেছে লাবণ্য। নিজের আত্মাকে আমি নিজের হাতে টুঁটি টিপে মেরে ফেলতে পেরেছি জেনে মনে মনে খুব খুশীই হয়েছিলাম—সত্যি বলছি—খুব খুশী হয়েছিলাম। মিস্টার চৌধুরী যেদিন বিয়ের পর আমার সুটকেসের মধ্যে একটা প্রেমপত্র আবিষ্কার করে আমায় ত্যাগ করেছিলেন, তারপর জীবনে এই প্রথম এমন খুশী হতে পারা—সে যে কী আনন্দ! সে-আনন্দে সেদিন বিকেলবেলা ঘুম থেকে উঠে তিন কাপের বদলে তিন-ত্রিক্কে ন'কাপ চা-ই খেয়ে ফেললাম!

মিসেস্ চৌধুরীর মুখের দিকে চেয়ে দেখি তিনি কথা বলছেন আর চোখ বেয়ে জল পড়ে তাঁর গালের রুজ ঠোঁটের লিপস্টিক চোখের সুর্মা সব ধুয়ে মুছে একাকার হয়ে যাচ্ছে। এমন অবস্থা তাঁর আগে কখনও দেখিনি। কী যে করবো বুঝতে পারলাম না।

তার পর মিসেস্ চৌধুরী হঠাৎ সপ্রতিভ হয়ে ব্যাগ খুলে একটা চিঠি বার করলেন।

আমার দিকে সেখানা এগিয়ে দিয়ে বললেন—তার পর এতদিন পরে আজ সকালবেলা এই চিঠি, চিঠি পড়ে আমি তো অবাক!

দেখলাম নিরঞ্জন আর লাবণ্যের বিয়ের নিমন্ত্রণের চিঠি। পনেরোর সি কালী সরকার রোড, তেরো নম্বর সুট। আজকের তারিখ।

আমি মিসেস্ চৌধুরীর দিকে নির্বাক দৃষ্টি দিয়ে চাইতেই তিনি বললেন—এখন সেখান থেকেই আসছি।

বললাম—কী দেখলেন ?

—দেখলাম বিয়েতে যেমন হয় তেমনই, লাবণ্য সিঁথিতে সিঁদুর পরেছে, চন্দনের ফোঁটা। নিরঞ্জনের গায়েও গরদের পাঞ্জাবি, মাথায় টোপর। হঠাৎ কোথা থেকে সব আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব এসে পড়েছে, এতদিন কোথায় ছিল তারা সব কে জানে! আজ হঠাৎ ওদের শুভাকাঙ্ক্ষীর আর আশীর্বাদকের অভাব নেই।

বাড়িটাও ভালো, রান্নাঘরের পাশে একটা টবে তুলসীগাছ প্রতিষ্ঠা, করেছে, শোবার ঘরে একটা খাট, দক্ষিণ দিকের জানালা খুললে আকাশ দেখা যায়। আয়োজনও করেছে প্রচুর—কিন্তু ভালো করে লক্ষ্য করে দেখলাম—ফুলচাঁদের স্পর্শের কলঙ্ক কোথাও নেই এতটুকু—চন্দনের ফোঁটায় সব ঢেকে গেছে। কিন্তু আমার যেন কিছু ভালো লাগলো না। আমি জলস্পর্শ না করে সোজা চলে এলাম বাইরে, তারপর একটা ট্যাক্সি ডেকে সমস্ত কলকাতাটা টো-টো করে ঘুরে এখন এই রাত বারোটার সময় তোমার এখানে।

গল্প বলতে বলতে মিসেস্ চৌধুরী যেন স্তিমিত হয়ে এলেন। মনে হলো, এখনি যেন তিনি নিভে যাবেন।

বললাম—তা হোক, তবু নিরঞ্জনের উদারতা আছে বলতে হবে।

মিসেস্ চৌধুরী দপ্ করে উঠলেন—তা থাক্‌গে উদারতা, কিন্তু গল্পে তুমি ওদের বিয়ে দিতে পারবেনা—শেষটুকু তোমায় বদলাতেই হবে।

—কেন ?

মিসেস্ চৌধুরী দম নিয়ে বলতে লাগলেন—হ্যাঁ, আগাগোড়া সব ঠিক রেখে শেষকালটাতে বদলে দেবে। বিয়ে ওদের কিছুতেই দিতে পারবেনা তোমার গল্পে—ওর আত্মায় ঘুণ ধরেছে যে—আমি মিসেস্ চৌধুরী তার সাক্ষী।

বললাম—কিন্তু আত্মা তো মরে না।

—নিশ্চয়ই মরে, আলবৎ মরে, আমার আত্মা মরেছে—লাবণ্যর মরেছে, বাসন্তী, কল্যাণী, টগর সকলের মরেছে। আর তা ছাড়া যদি বিয়ে দিতেই হয় তো দু'দিন বাদেই ওদের বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিয়ো। তারপর ধাপে ধাপে লাবণ্যকে কল্যাণী, বাসন্তী আর টগরের পর্যায়ে আনবে, আর তারপর একদিন জীবনের শেষ অঙ্কে দেখাবে লাবণ্য বাড়ি ভাড়া নিয়ে ব্যবসা শুরু করেছে আমার মতন···পারবেনা করতে ? লক্ষ্মীটি, শেষটুকু ট্র্যাজেডি করে দিয়ো।

আবার জিজ্ঞেস করলাম—কিন্তু কেন ?

—ধরে নাও আমার শখ, আর কিছু নয়। একদিন আমাকে যদি তুমি ভালবেসে থাকো, আমিও যদি তোমার কোনদিন কোনও উপকারে এসে থাকি তো আমার এ অনুরোধটা রেখো ভাই। আর তা ছাড়া 'অতি-ঘরন্তী না পায় ঘর'—এ কথাটা মানো তো ?

অতীতের সব ঘটনার পুনরাবৃত্তি করে লাভ নেই আজ। তবু বলতে পারি, দশ বছর ধরে এ-গল্প লেখবার জন্যে আমার চেষ্টার আর অন্ত ছিল না। বন্ধুবান্ধবের কাছে কতবার গল্প করেছি—কেউ বিশ্বাস করেছে, কেউ করেনি। কিন্তু মানুষের সংসারে চোখের সামনে জীবন সম্বন্ধে মূল্যবোধের এত পরিবর্তন দেখেছি—এত অভাবনীয় বিস্ময়ের পরিসমাপ্তি ঘটেছে এত সহজ স্বাভাবিকভাবে

যে, তা বলা যায় না। তবু সাহিত্যের কারবারে এসে দেখেছি আজও জীবন সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণাই থাক, সাহিত্যে আমরা আজও তো ফরমুলা মেনেই চলি। তাই সধবা কিরণময়ীকে শেষ পর্যন্ত পাগল করতে হয়, বিধবা রমাকে কাশী পাঠাতে হয় আমাদের। তাই—বিশ্বাস করুন মিসেস্ চৌধুরী—তাই আপনার অনুরোধ মতোই গল্পটা শেষ করবো ভেবেছিলাম। লাবণ্যকে অধঃ-পতনের শেষ ধাপে নামিয়ে দিতে পারলে আমিও আপনার মতোই খুশী হতাম। তাতে গল্পটা 'অতি-ঘরন্তী না পায় ঘর' এই সাধারণ প্রবাদ-বাক্যটারও একটা উদাহরণস্থল হয়ে থাকতো। জীবনে না হোক, সাহিত্যে অন্তত তাই ই ঘটে! সেইজন্যেই তো বলছিলাম যে এ-গল্পটা না লিখতে হলেই আমি খুশী হতাম।

কিন্তু আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন মিসেস্ চৌধুরী, আমি আপনার সম্পূর্ণ অনুরোধটা রাখতে পারলাম না।

কেন রাখতে পারলাম না, তার একটা কারণ আছে বৈকি।

সেই কারণটা বলি। লজ্জায় ঘৃণায় ধিক্কারে আমার মাথা নীচু হয়ে এলেও আমাকে তা বলতেই হবে!

সেদিন কলকাতার বাইরে সি.পি.-র একটা কোলিয়ারী অঞ্চলে যেতে হয়েছিল আমাকে। একটা লাইব্রেরীর উদ্বোধন উপলক্ষে সভাপতি পদের ভার নিয়ে।

সভা হলো।

সভার শেষে ভিড় পাতলা হবার পর জলযোগের ব্যবস্থা হয়েছিল ওয়েল-ফেয়ার অফিসার মিস্টার মজুমদারের বাড়ি।

স্বামী-স্ত্রী দুজনেই ভারি অতিথিপরায়ণ। ছোট্ট বাঙলো। চারিদিকে বাগান করেছেন। ঘরটাও বেশ সাজানো। বেশ বোঝা গেল—গৃহের সর্বত্র গৃহিণীর একটা সুনিপুণ কল্যাণ-হস্তের স্পর্শ লেগে আছে। চা পরিবেশন করতে লাগলেন মিসেস্ মজুমদার।

মিস্টার মজুমদার বললেন—মিসেস্ মজুমদার আপনার একজন ভক্ত, জানেন না বোধ হয়—ওই দেখুন আপনার সব-ক'টা বই-ই কিনেছেন।

মিসেস্ মজুমদার সলজ্জভাবে হাসতে লাগলেন। সত্যিই পাশের আলমারিতে অন্যান্য বই-এর সঙ্গে আমার লেখা ক'টা বই রয়েছে দেখে নিয়েছি আগেই।

মিস্টার মজুমদার আবার বললেন—এখানকার মহিলা-সমিতিটা ওঁরই তৈরী, আর আজকে যে লাইব্রেরীর উদ্বোধন হলো এ-ও ওঁরই চেষ্টায় বলতে পারেন—সভাপতি হিসেবে আপনার নাম তো উনিই প্রথম সাজেস্ট করেন।

নিজের প্রশংসায় মিসেস্ মজুমদার যেন বড় লজ্জিত হচ্ছেন বলে মনে হলো।

হয়তো তিনি কিছু বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু বাধা পড়লো। হঠাৎ চাকরের সঙ্গে ঘরে ঢুকলো একটি পাঁচ-ছ' বছরের ছেলে। সুন্দর দেহশ্রী। ছেলেটিকে চিনতে পারলাম। সভায় এই ছেলেটিই আমার গলায় মালা পরিয়েছিল। ছেলেটি

ঘরে ঢুকে মা'র কোলের কাছ ঘেঁষে দাঁড়াল। বললাম—এটি আপনার ছেলে বুঝি? কী নাম তোমার খোকা?

কাছে ডাকলাম তাকে।

ছেলেটি বিশুদ্ধ বাঙলায় বললে—নীলাব্জ মজুমদার।

—নীলাব্জ! বড় সুন্দর নাম দিয়েছেন তো?

মিস্টার মজুমদার এবারও স্ত্রীর দিকে চেয়ে নিয়ে হেসে বললেন—এ নাম ও'রই দেওয়া, ও-নাম দেওয়ার মধ্যেও একটা উদ্দেশ্য আছে জানেন, আমাদের দু'জনের নামের প্রথম দুটো অক্ষর নিয়ে ওর নাম হয়েছে নীলাব্জ।

ওঁদের দু'জনের নাম জিজ্ঞাসা করা ভদ্রতাবিরুদ্ধ হবে কিনা ভাবছি—

মিস্টার মজুমদার নিজেই আমার কৌতূহল নিবৃত্তি করে দিলেন। হাসতে হাসতে বললেন—আমার নাম নিরঞ্জন, আর ওঁর নাম লাবণ্য কিনা—তাই থেকে নীলাব্জ। কিন্তু আপনি আর একটা সিঙ্গাড়া নিন—কি আর একটা সন্দেশ···

আমি কিন্তু ততক্ষণে নির্বাক হয়ে দেখছি। দেখছি মিসেস্ মজুমদারকে। এতক্ষণে তো নজরে পড়েনি। তাঁর চিবুকের ওপরে ডান দিকে একটা কালো তিল জ্বল-জ্বল করছে।

শেষ পর্যন্ত বৈকুণ্ঠ ঠাকুরের পাত্তা পাওয়া গেল। বৈকুণ্ঠ আর বাড়ির ঠাকু দু'জনে মিলে রাঁধলে কোনও অসুবিধে হবে না। ভাঁড়ার বার করে দেবে সুরুচি, সমস্ত দিকে তদারকও করবে সুরুচি। সুরুচি থাকতে আবার ভাবনা! সমস্ত আয়োজনই সম্পূর্ণ হয়ে গেছে।

নিবারণবাবুই প্রথম দুঃসংবাদটা শোনালেন কোর্ট থেকে এসে।

—কাল শুনলাম 'মিটলেস্-ডে' নাকি, মাংসই শুনছি পাওয়া যাবেনা কাল। এখন যা ভালো বোঝ করো।

হতাশার ভঙ্গিতে কোটের গলার বোতামটা খুলে ফেললেন নিবারণবাবু।

সুরবালা যেন নিদারুণ দুঃসংবাদ শুনেছেন এমনি সুরে বললেন—তাহলে আর বৈকুণ্ঠ ঠাকুরকেই বা ডাকা কেন! মাছের কালিয়া, মাছের পোলাও রান্না করা ওসব আমাদের বাড়ির ঠাকুরই তো পারবে।

নিবারণবাবু তখন খালি-গা হয়ে পাখার তলায় আরাম করছেন। বললেন—তাহলে বারণ করে দি' বৈকুণ্ঠকে আসতে, বটু যাক তাহলে আজ রাত্রে বারণ কবে আসুক। দু'টাকা বায়না নিয়েছিল, সেই টাকা দুটোই গচ্চা গেল।

সুরবালা ঝংকার দিয়ে উঠলেন—ওম্নি রাগ হয়ে গেল, রাগের কথা কী বলেছি, মাংস যদি না পাওয়া যায় তো মাছই চার-পাঁচ রকমের করতে হবে কমলার ছেলেরা মাংস খেতে ভালবাসে তাই 'মাংস' 'মাংস' করছিলাম।

সুরুচি ঘরে এল। বললে—বাবা, মিষ্টির দোকান থেকে লোক এসেছে, বলেছি বসতে।

—বসুক— বলে নিবারণবাবু উঠলেন। তারপর কলঘরে যেতে যেতে থেমে বললেন—ক্ষীরকদম্ব বলে একরকম নতুন খাবার উঠেছে শুনছিলাম। কী জানি খেতে কেমন, দেব অর্ডার?— জিজ্ঞেস করলেন সুরবালাকে।

সুরবালা বললেন—তাহলে যে ন'রকম মিষ্টি হয়ে যায়, একটা ক্ষীরের খাবার ক্ষীরকান্তি তো রয়েছেই, আবার ক্ষীরকদম্ব! তা হোক, বছরে তো একটা দিন।

বছরে একটা দিন : সাতাশে শ্রাবণ!

এই সাতাশে শ্রাবণই সুরবালার মন্ত্র-দীক্ষা নেবার দিন। তিন বছর আগে হিমালয় থেকে গুরুদেব এসে সুরবালাকে দীক্ষা দিয়ে শিষ্যা করে আবার হিমালয়ে চলে গিয়েছিলেন। প্রতিবছর সেই তারিখটি স্মরণ করার উপলক্ষ করে তাঁর গুরুদেবকে ভক্তিশ্রদ্ধা দেখানোই সুরবালার উদ্দেশ্য। গুরুদেবের একটি ছবি টাঙানো আছে লক্ষ্মীর ঘরে। রোজ সেখানে ধূপ-ধুনো দিয়ে প্রদীপ জেলে সন্ধ্যাবেলা জপ করেন সুরবালা। প্রতি সন্ধ্যাবেলা আধ ঘণ্টা সময় ওখানেই

কাটে সুরবালার। আর সাতাশে শ্রাবণ হয় উৎসব—সেদিন গুরুদেবের ভোগ হয়—নিমন্ত্রিত অভ্যাগত আত্মীয়স্বজনরা প্রসাদ পায়। সেইদিন বিভিন্ন তিনটি দেশ থেকে সুরবালার তিনটি মেয়ে—ছেলেমেয়ে, জামাইদের সঙ্গে নিয়ে সুরবালার বাড়িতে আসে। দু'বার ভালো করে উৎসব সম্পন্ন হয়ে গেছে। এবার তৃতীয় বার্ষিকী!

সুরবালার আগেই ঘুম থেকে উঠে সুরুচি কাজে হাত লাগিয়েছে। ঝি চাকর ঠাকুরকে তুলে দিয়েছে। উনুনে আগুন দিইয়েছে। বাবার দাড়ি কামাবার গরম জল, চায়ের জল, মায়ের চোখের ওষুধ, ছোট ঘড়িটাতে দম দেওয়া, স্নান, সব-কিছু সেরে কাপড় বদলে কালকের উৎসবের আয়োজন করতে লেগে গেছে!

অতোগুলো লোক আসবে, থালা গেলাস বাটি গুনে গুনে সিন্দুক থেকে বার করলে। করে কলতলায় ফেলে দিলে। বললে—এগুলো মেজে ফেলো তো লক্ষ্মীর মা, কাজের ভিড়ে কাল আর হয়ে উঠবে না।

তারপর কত কাজ সুরুচির! তিন দিদির তিনটি ঘর সাজানো কি সোজা কথা! দরজায় পর্দা টাঙানো থেকে শুরু করে বালিশ বিছানা মশারি খাটানো। বড় জামাইবাবু শৌখিন লোক। দেয়ালে দু'চারখানা ছবি টাঙালে। জানালায় সবচেয়ে বাহারি পর্দা ঝুলিয়ে দিলে। দরজার চৌকাঠে একটা ভালো কার্পেট পেতে দিলে। বড়দি সরুচিকে খুব ভালবাসে। সেবারে যখন এসেছিল তখন তার জন্যে একটা বেনারসী সিল্কের থান এনেছিল।

সুরবালা ঘরে ঢুকে বললেন—হ্যাঁ মা, কত খাটছিস তুই, কিছু মুখে দিসনি তো?

সুরুচি বললে—চা তো খেয়েছি, মা।

—আমি গুরুদেবকে রোজ তোর জন্যে বলি, উনি তো সবই দেখতে পান, দেখবি তোর ভালো করবেন উনি। এই যে তাঁকে সেবা করছিস এতে তিনি তোর মঙ্গল করবেন!

সুরুচি বললে—তা'হলে দক্ষিণের দুটো ঘরই মেজদি আর ছোড়দিদের দিই?

—ওমা, তুই তাহলে কোথায় শুবি? উত্তরের ঘরে? ও-ঘরে পাখা নেই যে মা, গরম হবে না?

—তা হোক, ওরা দু'দিনের জন্যে এসে কেন কষ্ট করতে যাবে···মেজদির চাদরটা একটু ময়লা হলো, তা হোক গে, কী বলো মা?

সুরবালা বলেন—কাল এক স্বপ্ন দেখলুম মা, যেন গুরুদেব এসেছেন, এসে আমার চোখ-দুটো চেপে ধরলেন, চেপে ধরতেই—কী বলবো মা, যেন চারদিক আলোয় আলো হয়ে গেল, দেখলুম গুরুদেব নেই, তাঁর বদলে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম নিয়ে স্বয়ং নারায়ণ আমার দিকে চেয়ে আছেন, আমি তো মা আনন্দে প্রণাম করতেই ভুলে গেলুম! মূর্ছাই যাচ্ছিলুম, হঠাৎ গুরুদেব চোখ-দুটো ছেড়ে

দিলেন, দেখি আমার গুরুদেব আবার আমার সামনে বসে হাসছেন। বললেন—চিনলি আমাকে ?

সুরুচি বললে—মেজদিদির একটা বালিশ কম পড়ছে কিন্তু, আমার বালিশটাতেই মেজদি শোবে'খন। আর ঘরে লোক না থাকলে কি ঘরের শ্রী থাকে, কী বলো মা ? কতদিন এসব ঘরে ঢোকা হয়নি, ভূতের রাজ্য হয়ে আছে— বলে সুরুচি ঝাঁটা নিয়ে ঝুল ঝাড়তে লাগলো।

কমলার বর লখ্‌নৌর উকিল। তাদের গাড়ি আসবে সকাল ছ'টায়। বিমলার বর থাকে পাটনায়—সে ডাক্তার। তাদের গাড়ি আসবে ন'টার সময়। তারপর অমলার বর থাকে মালদ'য়—জমিদার। তারা আসবে বেলা এগারোটায়।

সুরবালার সকালের জপ শেষ হয়েছে। এবার জলযোগ করে পাঠ আরম্ভ হবে। মোহন কথক রোজ এসে ভাগবত গীতা পাঠ করেন। কোনও কোনও দিন পাড়ার দু'একজন বুড়ি এসে জড়ো হয়। কথা শুনতে শুনতে সুরবালার চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল পড়ে। যতবার এক-একটা অধ্যায় শেষ হয়, আর সুরবালা ততবার গলায় আঁচলটা দিয়ে গুরুদেবের ছবির তলায় মাটিতে মাথা ছুঁইয়ে প্রণাম করেন।

সুরুচি এসে বলে—মা, বাজারে রুই মাছ পায়নি, ইলিশ মাছ এনেছে। কী করবো ?

সুরবালা যেন বিরক্ত হন; বলেন—ওসব লক্ষ্মীর মা যা ভালো বোঝে করবে'খন। তুই একটু আয় না মা, বসে দুটো কথা শোন না, তোর কেবল সংসার আর সংসার !

সুরুচি ততক্ষণে রান্নাঘরে ঢুকে ঠাকুরকে বকতে শুরু করেছে—তোমার আক্কেলখানা কী ঠাকুর, আঁশের উনুনে তুমি নিরামিষ কড়াটা কী বলে চাপালে ? তুমি কি আজ নতুন মানুষ এলে এ-বাড়িতে ?

তারপর উঠোনের দিকে চেয়ে লক্ষ্মীর মাকে বলে—তুমি বাপু ওই কাচা কাপড়ে নর্দমা পরিষ্কার করছো, আমি কিন্তু ও-কাপড়ে তোমাকে শিল ছুঁতে দেব না। মা'র না-হয় এসব দিকে নজর নেই, কিন্তু আমি তো কানা হইনি।

সমস্ত দিকে নজর না রাখলে কী চলে ? বাবাকে খাইয়ে-দাইয়ে কোর্টে পাঠিয়ে সুরুচি বাবার ঘরটা পরিষ্কার করতে গেল।

বিছানা, টেবিল, আলনা গুছোতে গুছোতে সুরুচি পুরনো চিঠিপত্রের বাক্সটাও গুছোতে বসলো। অনেকদিনের অনেক বাজে চিঠি জমে অকারণে ভারি হয়ে উঠেছে। হঠাৎ মনে হলো কে যেন ঘরের মধ্যে ঢুকলো। ঢুকে লুকলো কোথাও। পেছন ফিরে দ্যাখে—না, তারই প্রতিবিম্ব পড়েছে আয়নাতে। সুরুচির বহুদিন আগেকার কথা মনে পড়তে ঠোঁটের কোণে একটু হাসির আভাস উঠে আবার মিলিয়ে গেল।

চেয়ারের ওপরে উঠে আলমারির মাথাটা পরিষ্কার করলে। কয়েকটা লাল রঙের চিঠি বেরুল, সুরুচির বিয়ের চিঠি। কুটি কুটি করে ছিঁড়ে ফেললো সেগুলো। যত সব বাজে জঞ্জাল!

তারপর মতিলালকে ডাকলে। বললে—বালতি করে জল নিয়ে আয়, আর ঝাঁটা নিয়ে আয়, ঘর ধুতে হবে।

দু'জনে মিলে তারপর সমস্ত ধোয়া, মোছা, ঝাড়া, সে এক কাণ্ড!

সুরবালা দেখে বলেন—এ কী কাণ্ড মা তোর? আমি গুরুদেবকে কাল তাই বলছিলাম—আমার রুচির কষ্ট আর আমি দেখতে পারিনে, বাবা। গুরুদেব বললেন—ওকেও দেব দীক্ষা। সেবার আমার সঙ্গে একসঙ্গে দীক্ষা নিলে কেমন হতো বল দিকিনি? মুখটা একেবারে শুকিয়ে গেছে—আহা মা আমার!

সুরুচি বলে—তুমি সরো দিকি এখান থেকে, আমি এত কষ্ট করে ধুচ্ছি আর তুমি কাদা-পা দিয়ে সব নোংরা করে দিচ্ছ।

সমস্ত দিন ধরে আয়োজন করেও মনে হয় কোথায় যেন কী ভুল হয়ে গেল। গুরুদেব ফুল ভালবাসেন, দশ টাকার ফুলের মালার অর্ডার দেওয়া হয়েছে। পাঠককে বলা হয়েছে তিনবার গাড়ি নিয়ে স্টেশনে যেতে হবে—একবার সকাল ছ'টায়, আর একবার নটায়, আর শেষবার এগারোটার সময়।

প্রথম দু'বার হাওড়ায়, শেষবার শিয়ালদ'য়।

অনেক রাতে সমস্ত কাজ সেরে বিছানায় শুয়েও শান্তি নেই সুরুচির। কত ভাবনা! ভাঁড়ার ঘরের তালাটা বন্ধ করে একবার টেনে দেখেছে তো? পেছন দিকে বারান্দার আলোটা নিবিয়েছে তো? ছাদের সিঁড়ির দরজা বন্ধ করা হয়েছে তো? তারপর ভোরবেলা মতিলালকে পাঠাতে হবে এক ঘড়া গঙ্গাজল আনতে, পাঠক হাওড়া স্টেশন থেকে ফেরবার পথে কলাপাতা আর ফুলের মালাগুলো নিয়ে আসবে, সুখলালের দোকানে মিঠে পানের অর্ডার দেওয়া হয়েছে—সে কি আর সকালবেলা পাওয়া যাবে! কত ভাবনা সুরুচির!

সুরুচির ডাকাডাকিতে সুরবালার ঘুম ভেঙে গেল ভোরবেলা।

আজ সত্যিই অনেক কাজ সুরবালার। এখনি স্নান করতে হবে, করে গরদের শাড়ি পরতে হবে। পরে নিজের হাতে গুরুদেবের জন্যে ভোগ রাঁধতে হবে। নিজের হাতে ভোগ রেঁধে তিনি পুজোর ঘরে ঢুকবেন, ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেবেন। সকাল থেকে শুরু করে গুরুদেবকে ভোগ দেওয়া পর্যন্ত কোনও পুরুষের মুখ দেখা নিষিদ্ধ। এমনকি নিবারণবাবুও নাকি সামনে থাকতে পারবেন না।

সুরবালার আজ কেবলই ভয়—কখন বুঝি ত্রুটি হয়ে যায়! বর্ষাকাল—ঝমঝম করে দিনরাতই বৃষ্টি লেগে আছে। তবু মুখে বলছেন—তাঁর কাজ তিনিই দেখছেন, আমি তো উপলক্ষ মাত্র।

সুরুচি ঘুরে ঘুরে একবার মাকে সাহায্য করছে, একবার ভাঁড়ার দেখছে আ, একবার সমস্ত বাড়িটার কোথায় কী হচ্ছে দেখে বেড়াচ্ছে।

বৈকুণ্ঠ ঠাকুর পাকা লোক। এসেই শুনেছিল মাংস পাওয়া যাবে না। তারপর নিজেই বেরিয়ে কোথা থেকে পাঁচ টাকা সের দরে মাংস নিয়ে এসেছে।

ভাঁড়ার ঘরে এসে বলে—খুকিদিদি, এক সের আদা চাই।

দুটো বড় বড় মাটির উনুনে রান্না হচ্ছে। বৈকুণ্ঠ ঠাকুর আরো দু'জন সহকারী নিয়ে সেখানে আগুনের তাতে বসে ঘামছে।

পাঠক স্টেশন থেকে খালি গাড়ি নিয়ে ফেরত এলো। বললে—খুকুদিদি ছ'টার গাড়িতে বড় দিদিমণিরা আসেননি।

সুরবালা রাঁধছিলেন। শুনে বললেন—তখনই জানি ওরা আসবে না, কমলাই যদি না আসবে তাহলে কার জন্যই বা এত আয়োজন, কার জন্যেই বা কী ?... যাক, আমি কে—তাঁর কাজ তিনিই দেখবেন।

সুরুচি বলে দিলে—ন'টার গাড়িতে মেজদি'মণিদের আনতে যেয়ো আবার। দেখ, আসবার সময় সুখলালের দোকান থেকে মিঠে পান আর বাজার থেকে ফুলের মালা আনতে ভুলো না।

বড় বড় রুই মাছ এসে উঠোনে পড়েছে। দু'জন জেলে-বউ বড় বড় বঁটি নিয়ে মাছ কুটছে। সুরুচিকে দেখে একজন বলে—ও খুকুদিদি, এই মাছের দাগাটুকু নিচ্ছি আমার মেয়ের জন্যে— বলে একটুকরো মাছ নিয়ে হাত বাড়িয়ে দেখালে।

মাংস রান্নার তীব্র গন্ধ এসে সুরুচির নাকে লাগলো। সেই গন্ধে সমস্ত শিরা উপশিরা তার শিথিল হয়ে এল। পেঁয়াজ রসুন বাটা হচ্ছে তাল তাল। এক একটা তরকারি রান্না হচ্ছে আর পাত্র করে তুলে এনে রাখছে ভাঁড়ারের ভেতর। একটা নিরামিষ ভাঁড়ার, একটা আঁশের, একটা মিষ্টির। ভাঁড়ারে কলাপাতা, মাটির গেলাস, কুশাসন জড়ো হয়েছে। তিনটে ভাঁড়ারের চাবি নিয়েছে সুরুচি নিজের কোমরে।

—ওমা, সুরুচি, পুজোর ঘরের দরজাটা খুলে দে মা।

একটা ভোগ রান্না হয়েছে। সুরুচি পুজোর ঘরের শেকলটা খুলে দিলে। গঙ্গাজল দিয়ে সমস্ত ঘরটা সুরবালা নিজের হাতে ধুয়েছেন। এক একটা ভোগ রান্না হবে আর এই ঘরে এনে তুলতে হবে। ঘরের ভেতর একটা পেতলের প্রদীপে ঘিয়ের বাতি জ্বলছে। ফুলের মালা এলে গুরুদেবের ছবিটা একেবারে ফুলে ফুলে ঢেকে যাবে। ধুপ-ধুনোর গন্ধ ছড়াচ্ছে চারিদিকে। একটা চন্দন কাঠের বাক্সের ভেতরে ভাগবত গীতা সাজানো আছে। কড়িকাঠে একটা ইলেকট্রিক পাখা ঝুলছে। চার দেয়ালে চারটে বড় বড় আয়না, একটা তাকে একটা লক্ষ্মীর সিঁদুর-চুবড়ি। মাথার ওপর ধানের শুকনো শিষ ঝুলছে। একপাশে জলচৌকির ওপর আলপনা দেওয়া। তাতে রুপোর পঞ্চপ্রদীপ, ধুপদানি আর দুটো রুপো

হ্যান্ডেল-দেওয়া সাদা চামর আর তারই একপাশে পঞ্চমুখী শাঁখ একটা। ফল কেটে নৈবেদ্য সাজিয়ে আগেই রাখা হয়েছে জলচৌকির সামনে। একটা পেতলের কমণ্ডলুতে গঙ্গাজল।

বৈকুণ্ঠ এসে বলে—ও খুকিদি, পোলাও-এর চাল বার করে দাও, আর আখুনির জলের মসলা আর নতুন কাপড় একটুকরো।

লোকজন এখনও এসে জড়ো হয়নি। এরি মধ্যে জলে-কাদায় প্যাচ-প্যাচে হয়ে গেল সারা বাড়ি। লক্ষ্মীর মাকে ডেকে বললে—নতুন ঝিকে দিয়ে একবার জায়গাটা মুছিয়ে নাওনা লক্ষ্মীর মা, পিছলে পড়ে গিয়ে হাড়গোড় ভাঙবে।

তারপর নতুন 'ঠিকে' লোকদের বললে—তোরা এবার চা-জলখাবার খেয়ে নে। চা চিনি দুধ দিচ্ছি, বৈকুণ্ঠ ঠাকুরের কাছে চা তৈরি করে নে; আর এক এক টুকরো কলাপাতা নিয়ে সব বোস দিকিনি, মিষ্টি দিচ্ছি।

বাইরে মোটরের শব্দ হলো। মেজ মেয়ে বিমলা, মেজ জামাই, নাতি-নাতনী এসে হাজির।

নিবারণবাবু খবর পেয়ে নিচেয় এলেন। সুরুচি এগিয়ে গিয়ে জামাইবাবুর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে। প্রণাম করা-করির পালা শেষ হলে নিবারণবাবু বললেন—চল চল, সব ওপরে চল।

বিমলা বললে—কি রে রুচি, তুই এত রোগা হয়ে গেছিস কেন!

সুরুচি বলে—তা বলে তোমার মতো মোটা হবো নাকি কেবল?

বিমলা বলে—সত্যি ভাই কী মোটাই হচ্ছি! তোর জামাইবাবু ডাক্তার হলে কী হবে। —হ্যাঁরে, তোদের এখানে আজকাল কী সিনেমা হচ্ছে রে?

—কী জানি বাপু, সিনেমার খবর রাখিনে। তা, এসেই একেবারে বায়স্কোপ যাওয়া! এতদিন পরে এলে, একটু গল্প-টল্প করো।

বিমলা বলে—না বাপু, গল্প-টল্প পরে অনেক হবে'খন। চান করে ভাত খেয়ে নিয়েই বেরুব—কতদিন বেরুতে পাইনি।

খানিক পরে ট্যাক্সি করে বড় মেয়ে কমলারা এলো।

বলে—ট্রেন ফেল করে এই দুর্গতি। কোথায় রে, বাবা কোথায়, মা কোথায়, ওমা কী রোগা হচ্ছিস তুই দিন দিন···বিমলা অমলা ওরা এসেছে?

তারপর বলে—উঃ, ট্রেনে কী ভিড় ভাই, কোমর ফেটে গেছে বসে বসে। আমি বাপু আজ কোনও কাজই করতে পারবো না। আমি কেবল বসে বসে তরকারি কুটবো।

বিমলা খবর পেয়ে এল—ওমা বড়দি, কখন এলে? আমরাও এই এলুম। রুচিকে এসেই তোমার কথা জিজ্ঞেস করেছিলুম, কানের এটা কবে করালে দিদি, বেশ হয়েছে, একটা কঙ্কণ গড়াতে দিয়েছিলুম, আসবার সময় স্যাকরা বেটা দিতেই পারলে না, ছ'গাছি করে এই বেঁকি গড়িয়েছি এবার; মেড়োর দেশে এই-ই

নতুন ডিজাইন।

পাঠক ফুলের মালা আর খিলি পান নিয়ে এসেছে। ফুলগুলো মাকে দিয়ে এলো।

সুরুচি দেখলে মা'র কোনও দিকে নজর নেই। ভোগ সব রান্না হয়ে গেছে . পুজোর ঘরে থরে থরে সাজিয়েছে। সুরবালা ফুলের মালা নিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন ; খুলবেন দুপুর বারোটার পর।

ছোড়দিরা এসে গেল সাড়ে এগারোটায়, এসেই বললে—হ্যাঁরে, বড়দি সেজদি ওরা এসেছে ?—বলেই উঠে গেল ওপরে।

দোতলায় দিদিদের ছেলেমেয়েরা ছুটোছুটি চালিয়েছে—দুপদাপ শব্দ সুরুচির কানে এলো। সমস্ত ব্যবস্থাই করে রেখেছে সুরুচি। বাথরুমে তোয়ালে, গামছা সাবান, তেল, দাঁতমাজা, সব—সব! কতদিন পরে বাপের বাড়িতে এসেছে। সমস্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সুরুচিরই তো দেখা উচিত।

তিন বোনের কত কাপ চা লাগবে হিসেব করে চা তৈরি করে দিয়ে এলো।

কমলা বললে—তোর জন্যে কী এনেছি দেখলি না রুচি ?

—আসছি বড়দি, ওদের ঘরে চা দিয়ে আসি। বলে সুরুচি মেজদির ঘরে এলো। মেজদিরা স্নান সেরে কাপড় বদলেছে। মস্ত বড় একটা ট্রাঙ্ক খুলে কাপড় চোপড় জিনিসপত্তর গুছোচ্ছে। সুরুচিকে দেখে মেজদি বললে—দ্যাখ্‌তো রুচি কোন্‌ কাপড়টা পরি। তোরা বাপু শহরে থাকিস্‌ কোন্‌টা ফ্যাশন কোন্‌টা ফ্যাশন নয় তোরাই ঠিক বলতে পারিস।

মেজদিরা সিনেমায় যাবে, তারই আয়োজন হচ্ছে। ট্রাঙ্ক ঝেড়ে একগাদা পোশাকী কাপড় বার করে দিলে মেজদি। বললে—দে ভাই, তুই একটা বেছে দে।

তারপর বললে—আর ভাই, সেবার এসে যতোগুলো ব্লাউজ তৈরি করে নিয়ে গেলাম সব ছোট হয়ে গেল, একেবারে নতুন রয়েছে, কিন্তু একটাও গায়ে হয় না।

—হ্যাঁরে, এ শাড়িখানা কেমন বল তো? আশী টাকা দিয়ে কিনেছি এবার।

মেজদির শাড়ি, ব্লাউজ, গয়না সব সুরুচিকে দেখতে হলো। তারপর এলো ছোড়দির ঘরে।

ছোড়দি বললে—হ্যাঁরে রুচি, গাড়িটা এখন একবার দিতে পারবি ভাই, আমার এক ননদ থাকে শ্যামবাজারে, একবার দেখতে যাবো ভাবছি।

তারপর সুরুচির সঙ্গে একান্তে অনেক কথা হলো ছোড়দির—আসবার সময় শাশুড়ী বললে—বৌমা যাচ্ছো, আমার তো শরীরের এই অবস্থা, কাজ হয়ে গেলেই চলে আসবে। আমি ভাই বছরের মধ্যে এই একবার যা বেরুতে পাই, তাও বেরুতে দেবে না শাশুড়ী মাগী। তুই ভাই বেশ আছিস রুচি···

তারপর আবার বললে—পর পর তিনটে মেয়ে হয়েছে, উঠতে বসতে

শাশুড়ীর কথা শুনতে হয়। বলেন—পাড়ার কত বউ-ই দেখছি, তোমার মতন এমন মেয়ে-বিউনী দেখিনি আমার জন্মে, স্বর্গ থেকে এক ফোঁটা জল পাবে না পূর্বপুরুষেরা, আমি বেঁচে থাকতে এ-ও দেখতে হবে চোখ মেলে। তুই বেশ আছিস ভাই রুচি, বেশ আছিস।

সুরুচি আবার বড়দির ঘরে এলো।

বড়দি বললে—আসবার সময় তোর জন্যে কী কী নিয়ে আসি ভেবে ভেবে অস্থির আমরা।

সুরুচি বলে—বা রে, আমার জন্যে আনতেই হবে তার কি মানে আছে? আমার তো সবই আছে।

—তা সে কত দোকানই ঘুরলাম, কেবল এনামেল-করা পানের কৌটো, জর্দার কৌটো, গয়নার বাক্স, নয়ত সিঁদুর-কৌটো—আর আছে সব খেলনা আতরদান, সুর্মাদান। তোর জামাইবাবু আর আমি বাজারে ঘুরে ঘুরে হয়রান।

সুরুচি হাসলো।

শেষকালে এই গরদের থানটা নিলুম। একটা চাদর হবে, একটা কাপড় করবি। তোর তো আবার শুদ্ধ অশুদ্ধ বিচার আছে! কেমন হয়েছে রে, পছন্দ হয়েছে তো?

সুরুচি থানটাকে বুকে তুলে নিয়ে বড়দির পায়ের ধুলো নিতে যাচ্ছিল। বড়দি ডান হাতে সুরুচির গলা জড়িয়ে ধরে নিজের কোলে টেনে নিলে—ছি ভাই, পায়ে হাত দিতে নেই। তোর কথা সেখানে বসে বসে কত যে ভাবি, তুই তার কি বুঝবি! আমরা চার বোন, চার বোন চারদিকেই তো চলে গিয়েছিলাম, বাবা-মা'র কাছে থাকবার কেউ ছিল না, হঠাৎ তুই ফিরে এলি। বাবা-মা'কে দেখবার তবু একজন লোক হলো। কিন্তু যেদিন খবরটা শুনলুম, সারাদিন কেবল হা হা করে বুকের মধ্যে হাহাকার উঠেছে।

—সুরুচি বললে—আমি উঠি বড়দি।

—কেন, কী এত কাজ, একটু বোস না, সকাল থেকে তো আজ কিছুই খাসনি, আজ সারাদিন তো তোর উপোস। মা'র উৎসব, তা তোর এ উপোস কেন বলতো রুচি?

—আমি উঠি বড়দি,···ওদিকে কী যে হচ্ছে কে জানে!— ধড়ফড় করে উঠলো সুরুচি।

যা ভেবেছে তাই। কলাপাতাগুলো আধোয়া পড়ে রয়েছে, কাক উড়ে এসে রান্নার জলে মুখ দিয়েছে, বাসন মেজে এনে জলসুদ্ধ বাসন রেখে দিয়েছে ঝি, বলবার কেউ নেই বলে মোছা হয়নি। নিজে না করলে কোনও কাজটা যদি হয়! পরের ওপর আবার ভরসা।

এখনি মা বেরুবে পুজোর ঘর থেকে। দিদিদের ছেলেমেয়েরা খেতে বসবে।

বৈকুণ্ঠ ঠাকুর রান্না মোটামুটি সব শেষ করে এনেছে।

বড়দি এলো নিচেয় ; বললে—কিছু কাজ থাকে তো দে, বসে বসে করি।

সুরুচি বললে—তুমি কেন কাজ করতে যাবে বড়দি, এসেছ একদিনের জন্যে।

—একদিনের জন্যে এসেছি বলেই তো কাজ করবো। ওরা কোথায় রে—বিমলা, অমলা—

—মেজদি সিনেমায় যাচ্ছে আর ছোড়দি যাবে শ্যামবাজারে ওর ননদের বাড়ি। বড়দি তুমি ওঠ, এখানে আমি ছেলেমেয়েদের খাবার জায়গা করি।

—ও খুকি, খুকি রে— ওপর থেকে নিবারণবাবু ডাকলেন সুরুচিকে।

ওপরে গিয়ে সুরুচি দ্যাখে—বাবা একেবারে অসহায়, কলমে কালি ফুরিয়ে গেছে। প্রকাণ্ড একটা ঘরের মধ্যে বই কাগজ খুলে নিবিষ্ট মনে লিখতে লিখতে হঠাৎ কলমের কালি ফুরিয়ে গিয়েছিল। সুরুচি না থাকলে নিবারণবাবুর কলমে কালি যে কে ভরে দিত সে একটা ভাবনার বিষয় !

—রুচি, রুচি— মা ঠাকুর ঘর থেকে বেরিয়েছেন।

—যাই মা— বলে নিচেয় নেমে এলো এক দৌড়ে।

—এইসব প্রসাদ ঘরে তোল মা, বাইরে কোনো অসুবিধে হয়নি তো···বিমলা, কমলা, অমলা এসে পড়েছে সব ? কেমন আছে সব, ভালো ? কর্তা ডাকছিলেন কেন ? বছরে একটা কাজের দিন, তা-ও একটু ফুরসুৎ নেই ; কলমে বুঝি কালি ফুরিয়েছিল ?

সুরুচি সব প্রসাদ ভাঁড়ারে তুলে চাবি-তালা দিয়ে দিলে।

বিমলা এলো। বললে—মা, আমরা এসে পড়েছি—

নিচু হয়ে তারা পায়ের ধুলো নিলে।

মা চিবুকে হাত দিয়ে চুমু খেয়ে বললেন—এই রুচিকে এখনি তোমাদের কথা জিজ্ঞেস করছিলুম। এই দ্যাখ্ মা, গুরুদেবের আশীর্বাদে সব কাজই তো নির্বিঘ্নে হচ্ছে, এখন কি জানি কী তাঁর মনে আছে। সবই তো তাঁর ইচ্ছে।

তারপর আবার বললেন—গুরুদেবকে তাই বলেছিলাম আমার কোনো সাধই তো অপূর্ণ রাখনি বাবা, একটা শুধু কষ্ট আছে মনে, আমার মা রুচির মনে সুখ দিয়ো। তা জানিস বিমলা, গুরুদেব রাজি হয়েছেন, বলেছেন ওকেও দীক্ষা দিয়ে আসবো। এখন ওর কপাল।

সুরুচি বললে—মা, এবার তুমি জল খেয়ে নাও।

সমস্ত কাজই নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হলো। সুরুচির তীক্ষ্ণ দৃষ্টি প্রত্যেকটির দিকে। কোথাও কোনও বিশৃঙ্খলা হবার উপায় নেই। কিন্তু বিকেল শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ যেন সমস্ত পণ্ড করে দেবার জন্যে আকাশে মেঘ করে এলো। তারপর ঝড় উঠলো—তারপর এলো বৃষ্টি।

সে এক প্রলয় কাণ্ড ! এমন বৃষ্টি বোধ হয় কত বছর হয়নি, আর দিন বুঝে

কিনা আজই হলো।

সুরবালা বললেন—কী হবে মা রুচি ?

আকাশ বাতাস ভেঙে যেন বৃষ্টি নামছে। বৈকুণ্ঠ ঠাকুরের উনুনের ওপর ত্রিপল ছিঁড়ে হুড়হুড় করে জল পড়তে শুরু হলো। রান্না বন্ধ। বর্ষাকালের উৎসব, যথাবিহিত চারিদিকে ঢাকা হয়েছিল মজবুত করে। কিন্তু হাওয়ার যা প্রবল ঝাপটা, বৃষ্টির যা ভীষণ বেগ, সমস্ত কোথায় ওলটপালট হয়ে গেল। বৈকুণ্ঠ ঠাকুরের দলবল আটা, ময়দা, ঘি, তেল নিয়ে একেবারে ঘরের মধ্যে এসে আশ্রয় নিলে। বৈকুণ্ঠ বললে—কাজের বাড়িতে অনেক বৃষ্টি দেখেছি খুকিদিদি, কিন্তু এমন বৃষ্টি কখনো দেখিনি।

সামনের রাস্তায় জল দাঁড়িয়ে গেল।

আটটা বাজলো। এখনি তো সব লোক আসবার সময় হয়েছে—কিন্তু বুঝি সব পণ্ড হলো।

সুরবালাই সবচেয়ে চিন্তিত হলেন। এ কি করলে গুরুদেব! আমি কী অপরাধ করেছি যে এমন করে সমস্ত পণ্ড করে দিলে ?

বৃষ্টি যে ছাড়বে কখনও, আকাশ দেখে এমন আভাস পাওয়া গেল না। মেজদি'রা দুপুরবেলাই বায়স্কোপ দেখে এসেছে। ছোড়দি'রা শ্যামবাজার থেকে বৃষ্টির জন্যে আসতে পারেনি।

বাড়ির সামনে রাস্তায় এমন জল জমেছে যে গাড়ি চলতে পারছে না।

নিবারণবাবুর কোর্টের কয়েকজন বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল, তাঁদের জন্যে তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন।

বৈকুণ্ঠ ঠাকুর এসে বললে—যেরকম বৃষ্টি, তাতে আজ ছাড়বে বলে তো মনে হচ্ছে না! রান্নাঘরের মধ্যে নতুন উনুন পাতি, কী বলো খুকিদিদি ?

ভাঁড়ার ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সুরুচি চুপ করে দেখছিল সব! সকাল থেকে এত পরিশ্রম করে, এত তদারক করে, শেষকালে কি এখন সমস্ত নষ্ট হবে ? প্রায় আড়াইশ' লোকের আয়োজন হয়েছে; মা, দিদিরা, বাবা, সবাই সুরুচির মুখের দিকে চেয়ে আছে। সমস্ত ভাবনা ও দায়িত্ব তার ওপর ফেলে দিয়ে যেন নিশ্চিন্ত তারা।

হঠাৎ কিন্তু এক আশ্চর্য কাণ্ড ঘটলো।

বৃষ্টি থেমে গেল। আর হঠাৎ একসময় সমস্ত নিস্তব্ধ হয়ে গেল। আকাশে তারা উঠলো, যেন সমস্ত এক যাদুকরের ইঙ্গিতে সুপ্রসন্ন হয়ে উঠলো। রাস্তায় জল কমে গেছে। নিবারণবাবুর বন্ধুরা এসে গেলেন। বৈকুণ্ঠ ঠাকুর আবার রান্না চাপালে। একে একে নিমন্ত্রিত অভ্যাগতরা এসে হাজির হলেন।

সুরুচি ভাঁড়ার ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে সমস্ত তদারক করছিল; কা'র ড্রাইভারের

খাবার দিতে হবে, কে শুধু মিষ্টি খাবে, কে নিরামিষ, আর ময়দা মাখতে হবে কিনা, কত লোকের খাওয়া হলো, এখনও কত লোক বাকি—

—খুকিদিদি, ময়দা আরো দু'সের দিতে হবে আর পাঁপড় সেরটাক।

—ও খুকিদিদি, বাগবাজার থেকে সতীশবাবুর বাড়ির মেয়েরা এসেছে, ওদের গাড়িভাড়াটা—

—বড় মাসিমার ছেলের জন্যে একটা মিষ্টি দাও তো খুকিদিদি, বড় কাঁদছে…

ছোড়দি'র মেয়ের দুধ গরম করা, অনেকদিন পরে ছোট পিসীমা এসেছেন, একবার ডাকছেন সুরুচিকে, তাঁকে প্রণাম করে আসা—

রাত্রি দশটা বাজলো, একটু যেন পাতলা হলো ভিড়। একে একে সব বিদায় নিচ্ছে। সুরুচি এবার সকলকে তাড়া দিতে লাগলো। রাত কি বারোটা করবে নাকি সবাই?

সুরবালা এলেন; বললেন—দেখলি মা, গুরুদেবের আশীর্বাদে কিছুই তো আটকালো না, সবই তাঁর ইচ্ছে…হ্যাঁ মা, তুই কিছু খাসনি? যা এবার শুগে যা, আমরা দেখছি সব।

কিন্তু তবু যাব বললেই যাওয়া হয়না সুরুচির। ঠাকুরদের খাবার দিয়ে ঝি-চাকরদের বসিয়ে বাড়ির সকলের খাওয়া-দাওয়া শেষ করে সুরুচি উঠলো। এবার এই প্রথমে সে নিজের ঘরে ঢুকবে। কত তার কাজ এখন। সুরুচির সমস্ত শরীরটা ঝিমঝিম করতে লাগলো। ঘরে ঢুকে সুরুচি দরজায় খিল দিয়ে দিলে।

অনেক রাত্রে বিছানায় শুয়ে আবার উঠে পড়লেন সুরবালা। চোখে ওষুধ দেওয়া হয়নি।

সুরবালার চোখের ওষুধ থাকে আলমারির ড্রয়ারে, তার চাবি থাকে সুরুচির আঁচলে। সারাদিনের পরিশ্রমের পর উঠতে আর ইচ্ছে করে না। তবু উঠতে হলো সুরবালাকে। উঠে আলো জ্বালালেন না, নিবারণবাবুর ঘুম ভেঙে যেতে পারে। বারান্দায় এসে প্রথমে পড়ে কমলার ঘর। আলো নিবে গিয়েছে সে-ঘরে। তারপর মেজ মেয়ে বিমলার ঘর। ওদের ঘরেও আলো নিবেছে। কিন্তু তখনও মেজ মেয়ের গলা শোনা যাচ্ছে, ওরা জেগে আছে এখনও। তারপর সেজ মেয়ে অমলার ঘর। সে-ঘরেও আলো জ্বলছে এখনও, কথাবার্তাও শোনা যাচ্ছে। তিন মেয়ের ঘর পেরিয়ে তিনি এলেন উত্তর দিকের ছোট মেয়ে সুরুচির ঘরে। সুরুচির ঘরের দরজা বন্ধ। আস্তে আস্তে দরজা ঠেললেন সুরবালা। সাড়া পেলেন না। হয়ত ঘুমিয়ে পড়েছে।

পশ্চিমের বারান্দা দিয়ে সুরবালা জানালার কাছে এলেন। জানালা ঠেলতেই খুলে গেল।

সুরবালা দেখলেন আলো জ্বলছে! তারপর ভেতরে চেয়ে যা দেখলেন তা'তে সুরবালা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে চমকে উঠেছেন।

সুরুচি একখানা বেনারসী শাড়ি পরেছে। সারা গায়ে পরেছে গয়না, মাথায় সিঁথি, হাতে চুড়ি, কঙ্কণ, কানে দুল আর সিঁথিতে দিয়েছে আগুনের মতো উজ্জ্বল সিঁদুর। বিয়ের সময়কার সমস্ত অঙ্গাবরণ তার গায়ে। সুরুচি যেন নববধূ সেজেছে—যেন নতুন করে তার বিয়ে হচ্ছে আজ!

সুরবালা নির্বাক বিস্ময়ে দেখতে লাগলেন।

সুরুচি তাঁর মেয়ে। তাকে যেন এতদিন চিনতেই পারেননি সুরবালা। আজ নতুন দৃষ্টি নিয়ে দেখছেন নতুন এক সুরুচিকে। সুরুচি যেন আজ তাঁর নতুন করে দৃষ্টি ফুটিয়ে দিয়েছে!

স্বামীর ছবিটা সুরুচি নিয়েছে বুকে। বুকে নিয়ে সুরুচি তার বিছানায় শুয়ে আছে। সুরবালার দু'চোখ জ্বালা করতে লাগলো। তাঁরই পেটের মেয়ে সুরুচি···সমস্ত দিনের বেলার সুরুচির সঙ্গে এ সুরুচির কত প্রভেদ!

ছবিটাকে বুকে রাখলে সুরুচি, মুখের ওপর রাখলে, তারপর বিছানা ছেড়ে উঠলো। একে একে সমস্ত গয়না খুললে। কানের দুল, হাতের চুড়ি—বেনারসী বদলে পরলে সাদা থান একটা, সিঁথির সিঁদুর ঘষে ঘষে মুছে ফেললে।

সুরবালা দেখলেন, সুরুচি সেই নিরাভরণ শরীরে স্বামীর ছবিটি সাজিয়ে রাখলে মেঝের এককোণে একটা জলচৌকির ওপর। সেখানে আলপনা দিয়েছে বিচিত্র করে, ফুল দিয়ে সাজিয়েছে, ধূপ জ্বাললে, প্রদীপ জ্বাললে। সুরুচি উঠে বসে এক দৃষ্টে চেয়ে রইল সেইদিকে, গভীর ধ্যানমৌন মূর্তি তার···সে যেন এ-জগতের সমস্ত মায়া সমস্ত আকর্ষণ থেকে দূরে গিয়ে স্বামীর সঙ্গে একীভূত হয়ে গেছে।

তারপর হঠাৎ একসময়ে যেন সম্বিৎ ফিরে পেয়ে মেঝের ওপর উপুড় হয়ে পড়লো। সুরবালার মনে হলো যেন সুরুচি মূর্ছা গেছে, আর উঠবেনা।

জোরে জোরে দরজায় ধাক্কা দিতে লাগলেন সুরবালা—ও রুচি, মা আমার!

দরজা খুললো।

মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সুরবালা আর সুরুচি—আর মাঝখানে একটি দোদুল্যমান মুহূর্ত! একটি মুহূর্তের ব্যবধান! মা'র মুখের দিকে চেয়ে সুরুচি হঠাৎ একটা অস্ফুট আর্তনাদ করে সুরবালার বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। সুরবালা দুই হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলেন তাকে।

—মা আমার, সোনা আমার— সুরবালার মুখ দিয়ে সান্ত্বনার ভাষা আর বেরুল না···সুরবালার চোখ-দুটো শুধু জ্বালা করতে লাগলো।

সুরবালার মনে ছিল না—সুরুচির হাতের নোয়া আর সিঁথির সিঁদুর ঘুচেছিল সাতাশে শ্রাবণ। তাঁর গুরুদেবের উৎসব আর সুরুচির সর্বনাশ—সে যে একই তারিখে, সে-কথা সুরবালার কেমন করে মনে থাকবে!

আশুকাকা

আশুকাকা তিনদিন আমার খোঁজে বাড়িতে এসেছিল এবং তিনদিনই আমাকে না পেয়ে ফিরে গেছে।

কথাটা শুনেছি বাড়ির লোকদের কাছ থেকে কিন্তু বিশেষ কৌতূহল প্রকাশ করিনি। আশুকাকাকে যারা জানে তারা বলতে পারে যে, আশুকাকার এই দেখা করতে আসা আমার কোনও উপকারের উদ্দেশ্য নিয়ে নয়। তবু এমন একটা চরিত্র আমাদের আশুকাকা, যার সান্নিধ্য বিশেষ পীড়াদায়কও নয়। আশুকাকার দাবী সামান্য। একটু খাতির একটু মাতব্বরি করতে দেওয়া বা বড় জোর টাকাটা সিকেটা।

আমাদের দেশে এখন জানাশোনা বলতে কেউ নেই। আশুকাকাও আর সকলের মতো একদিন চলে এসেছে সপরিবারে। খবর পেয়েছি অন্য সূত্র থেকে কোনো এক বস্তিতে আছে আশুকাকা সস্ত্রীক। সারাজীবন কোনও চাকরি বা কোনো অর্থোপার্জন করেনি আশুকাকা। দরকার হলে তিন ক্রোশ দূরের কাছারিতে গিয়ে সাক্ষী দিয়ে এসেছে, বিয়েবাড়িতে কোমর বেঁধে পাঁচশো লোক খাওয়ানোর ভার নিয়েছে, বারোয়ারিতলায় বসে সারারাত যাত্রার আসরে কলকে পুড়িয়েছে। অর্থাৎ আশুকাকা এমন একজন লোক যে বরাবর সশব্দে বেঁচে থেকেছে—চারিদিকে নিজের অস্তিত্ব ঘোষণা করে মাথা উঁচু করে ঘুরে বেড়িয়েছে।

অথচ, সেই সদম্ভ আত্মঘোষণা করবার অধিকারই যেন আছে আশুকাকার।

যতদিন গ্রামে ছিল আশুকাকা, যখন ছুটিতে দেশে গেছি, দেখছি একটা-না-একটা কাজ নিয়ে ব্যস্ত। শুধু ব্যস্ত নয়, ব্যতিব্যস্ত। হন হন করে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে আশুকাকা।

বলি—আশুকাকা, কোথায় চলেছ ?

—কে ? নবনী ? যাচ্ছি একবার ছিন্নাথপুর, ওখানে মল্লিকদের পুকুরের তলায় নাকি গাজনের শিব উঠেছে। যাই, দেরি হয়ে গেল।— বলে হন হন করে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আর একদিন ওমনি।

—কোথায় চলেছ আশুকাকা ?

ভোর তখন ছ'টা। হাঁটা দেখে মনে হবে বুঝি পাঁচ ক্রোশ দূরে মাজদে ইস্টিশনে ট্রেন ধরতে চলেছে কাকা। কিন্তু তা নয়।

—কে, নবনী ? যাবে আমার সঙ্গে ? এবার বর্ষায় গাজনার বিলে নাকি জল একেবারে থৈ থৈ করে উপচে উঠেছে। চলো-না দেখে আসি—

তার পর বারোয়ারিতলায় যাত্রার বায়না করে আসা, অটল চক্রবর্তীর বেয়াই-বাড়িতে গিয়ে জামাই-এর খোঁজখবর নিয়ে আসা, গঞ্জ থেকে হরিসভার খোল কিনে আনা ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কাজের মানুষ আশুকাকা।

সেই আশুকাকা একদিন গাঁ ছেড়ে কলকাতায় চলে এসেছে। দরিদ্র সংসারের মালপত্র যা কিছু এনেছে, তার সঙ্গে এনেছে একটা ছিপের বান্ডিল, হুঁকো-কলকে আর কাকীমাকে।

শান্ত-শিষ্ট মানুষটি এই কাকীমা।

মা'র কাছে গল্প শুনেছি, কতদিন খেতে বসে আশুকাকা দুটি-দুটি করে হাঁড়ির সমস্ত ভাত চেয়ে নিয়ে খেয়ে ফেলেছে।

—মাছের টকটা ভারি চমৎকার রেঁধেছ বড়বউ, আর দুটি ভাত দাও তো।

সতী-সাধ্বী কাকীমা নিজের ভাগের ভাত-ক'টিও স্বামীর পাতে ভক্তি সহকারে তুলে দিয়েছে। তার পর কে আবার নিজের জন্যে রাঁধে! এমনি করে কাকীমার কতদিন উপোস করে কেটেছে আশুকাকা তার খবরই রাখেনি।

আজো মনে আছে আশুকাকা সকালবেলা গাড়ু নিয়ে মাঠে যেত। ফেরবার সময় কোঁচড়ে কিছু কাঁচা লঙ্কা, পটল, গাড়ুর মুখে একটা পাকা আম বসানো। আর ডান কাঁধের ওপর একটা বিরাট মানকচু কিংবা মোচা। সকালবেলাই সারা-দিনের খাওয়ার যোগাড়টা হয়ে থাকতো। দুপুরবেলা বারোয়ারিতলায় বটগাছের ছায়ায় বাঁশের মাচার ওপর ভিজে গামছা কাছে নিয়ে দিবানিদ্রা। জীবনের পঞ্চান্নটা বছর এমনি করে নিশ্চিন্তে নির্ভাবনায় কাটিয়ে দিয়ে আশুকাকা অবস্থা-চক্রে পড়ে গ্রাম ছেড়ে হঠাৎ একদিন কলকাতায় চলে এল।

রাস্তায় একদিন কা'র মুখে যেন শুনেছিলাম আশুকাকারা এসে কলকাতার বরানগরে না টালিগঞ্জে কোথায় উঠেছে। সে অনেকদিন হলো। তারপর কতদিন কেটে গেল। এতদিন পরে আবার আশুকাকার সংবাদ পেলাম।

শুধু পেলাম নয়, সশরীরে আমার বাড়িতেই এসে গেছেন শুনলাম।

সেদিন আমার অফিসেই—

আমার অফিসের ঠিকানাটা আশুকাকার জানার কথা নয়। কিন্তু ঠিকানা যোগাড় করে দেখা করতে আসা, এ-শুধু আশুকাকার পক্ষেই সম্ভব।

চেয়ারটা নির্দেশ করে বললাম—বোসো আশুকাকা।

বসবার আগে অফিসের চারিদিকে একবার ভালো করে চেয়ে দেখে নিলে। মাথার ওপর পাখা, দেওয়ালের গায়ে ঘড়িটা, টেবিলের ওপর পেতলের 'কলিং বেল', ইস্পাতের আলমারি ইত্যাদি ইত্যাদি—

আশুকাকা চেয়ারে বসে অন্যদিকে দেখতে দেখতে বললে—বেশ জায়গায় অফিস তোমার নবনী, বেশ সাজানো অফিস, কিন্তু আসতে যেতে পেরান বেরিয়ে যায়, এক পিঠের বাস-ভাড়াই কান মুলে চোদ্দ পয়সা নিয়ে ছাড়লে।

হঠাৎ যেন কাজের কথা মনে পড়ে গেল। বললে—ভালো কথা, তিন টাকা সাড়ে বারো আনা দাও দিকিনি, তোমার জন্যে এই চারদিনে তিন টাকা সাড়ে বারো আনা পয়সা খরচ করে ফেলেছি। বাসে, ট্রামে, রিক্সায় মোট তোমার গিয়ে তিন টাকা সাড়ে বারো আনাই দিতে হচ্ছে।

কাছারিতে সাক্ষী দিতে গিয়ে যেমন জলখাবার, রাহাখরচ নেওয়া স্বভাব আশুকাকার, এও তেমনি। এ আমার জানা ঘটনা। এসব ক্ষেত্রে নির্বিবাদে টাকাটা বার করে দেওয়াই নিয়ম। আর আশুকাকা চারখানা এক টাকার নোট কোঁচার খুঁটে বেঁধে কোমরে গুঁজে রাখবে—এটাও তেমনি পরিচিত দৃশ্য। এ-নিয়ে আমার প্রশ্ন বা বিস্ময়-প্রকাশ করবার কথা নয়।

শুধু জিজ্ঞেস করলাম—বাড়ির সব খবর কী কাকা?

—বাড়ির খবর পরে শুনো, আর তা ছাড়া শুনেই বা কী করবে! সে থাক্‌গে, যে কাজের জন্যে আমি এসেছি—

এই কথাটিই আশুকাকার আসল কথা। আশুকাকার পথ বড় সোজা। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কথা বলতে জানেনা আশুকাকা। সরল কথার মানুষ। মনের আর মুখের কথার মধ্যে কোনো তফাত থাকতে নেই আশুকাকার।

বললে—অটলদা'র বাড়িতে তোমার নেমন্তন্ন হয়েছে?

বললাম—হ্যাঁ কাকা, হয়েছে তো।

ম্রিয়মাণ নয়, অভিমান নয়, লজ্জা দুঃখ কিছু নয়। আশুকাকা যেন পরের শারীরিক অসুস্থতা নিয়ে ডাক্তারের সঙ্গে কথা কইছে।

বললে—তোমারও হয়েছে?

বললাম—তোমার নেমন্তন্ন হয়নি কাকা?

স্বগতোক্তির সুরে আশুকাকা বলে যেতে লাগল—ব্যাপারটা কি-রকম হলো বলো তো? শ্যামবাজারের পেরবোধদা'র বাড়ি গিয়ে শুনলাম ওদের নেমন্তন্ন হয়েছে, টালিগঞ্জের অশ্বিনীদা'র বাড়ি গিয়ে শুনলাম ওদের নেমন্তন্ন হয়েছে, বালিগঞ্জের সিধুদা'র বাড়ি গিয়ে শুনলাম ওদেরও হয়েছে।

খানিকক্ষণ চুপচাপ।

আশুকাকা বললে—অথচ বলতে পারবেনা যে আমার ঠিকানা জানে না। সিধুদা'র ছেলেকে দিয়ে আমার বাসার ঠিকানাটাও ওদের কাছে পাঠিয়েছিলাম।

তা হলে? মহাসমস্যার কথা আশুকাকা তুলেছে!

ভেবে বললাম—আচ্ছা এমন তো হতে পারে যে, ওরা নেমন্তন্নের চিঠি পাঠিয়েছে, কিন্তু পোস্টাফিসের গোলমালে—

—সে-কথা বললে হবে না, নিজে রোজ পোস্টাফিসে গিয়ে খোঁজ নিচ্ছি, আজও গিয়েছিলাম।

আরও ভাবিয়ে তুললে আশুকাকা।

বললে—এই নিয়ে সবসুদ্ধ চারদিন হলো। তিন দিন গেছি তোমার বাড়িতে, শেষে তোমার অফিসে এসে হাজির হলাম। খবরটা শুনে পর্যন্ত রাত্তিরে নবনী, আমার ভালো ঘুম হয় না।

এই ব্যাপারে আশুকাকার মতো লোকের ঘুম না-হওয়ারই কথা।

আশুকাকা আবার বলতে লাগলো—অথচ ভাবো একবার, অটলদা তখন বেঁচে, বড় মেয়ের বিয়ের সময় কলাপাতা থেকে শুরু করে পান পর্যন্ত এই আশু ঘোষ একলা যোগাড় করেছিল।

তার পর খানিক থেমে আবার বললে—তার পর বড় ছেলের বিয়েতে যখন শেষ পর্যন্ত ছানা এসে পৌঁছল না সন্ধ্যাবেলা, মনে আছে অটলদা মুখ কালি করে আমার হাত-দুটো জাপটে ধরলে ; বললে—কী হবে আশু ?

সে-সব দিনের সুখ-স্মৃতি বোধ হয় আশুকাকাকে বিচলিত করে তোলবার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু এত সহজে মুষড়ে পড়বার লোকও আশুকাকা নয়।

বললে—যাক্‌গে নবনী, সেই খবরটা নিতেই এতদূরে তোমার কাছে আসা। পরশু বিয়ে, অথচ আজ সকাল পর্যন্ত কোনও খবরাখবর না পেয়ে··· যাক্‌গে—

যেন হতাশায় বিরক্তিতে ও-প্রসঙ্গ আর আলোচনা করবেনা এমনিভাবে মুখের কথাটাকে অসম্পূর্ণ রেখে থেমে গেল আশুকাকা।

বললাম—তোমার খাওয়া হয়েছে নাকি ? বেলা তো দুটো বাজতে চললো।

আশুকাকা সেই ভোরবেলা বেরিয়েছে অনেক তালে। সুতরাং খাওয়া আর কেমন করে হবে। এখানে এই শহরের ব্যস্ত আবহাওয়াতে এসেও আশুকাকার ব্যতিব্যস্ত ভাবটা কাটেনি।

হোটেলে যেতে যেতে বললাম—কাকীমা কেমন আছে কাকা ?

—তোমার কাকীমার কথা বোলো না নবনী, তিনি মারা গেছেন।

আমি যেন চমকে উঠলাম। নিঃসন্তান আশুকাকা বিপত্নীক হলো কবে ? কিন্তু এমন নিঃসঙ্কোচে স্ত্রীর মৃত্যু-সংবাদটা বা কে দিতে পারে এক আশুকাকা ছাড়া।

জিজ্ঞেস করলাম—কী হয়েছিল শেষকালে ?

—হবে আবার কি, একরকম না খেতে পেয়েই মারা গেল বলতে পারো। তা সে-কথা থাক্, অটলদার বাড়িতে এদানি গিছলে নাকি তুমি ?

বললাম—এই তো কালই গেছি। আমার বিয়েতে ওরাই সব করেছিল, এখন আমি না গেলে খারাপ দেখায়, তাই যাওয়া। ক'দিন ধরে প্রায়ই যাচ্ছি···যাবতীয় কেনা-কাটা—

আশুকাকা কথাটা লুফে নিলে। বললে—খাওয়া-দাওয়ার কী-রকম বন্দোবস্ত হচ্ছে দেখলে ?

যা-যা হচ্ছিল বললাম।

শুনে আশুকাকা ভীষণ দমে গেল! বললে—সব লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে। অটলদা নেই, আমাকেও নেমন্তন্ন করলে না, কী যে হবে—

আশুকাকা মাথায় হাত দিয়ে বসবার যোগাড়। বললে—কিন্তু মাছের কী হচ্ছে ?

—মাছ তো দেখলাম আমার সামনেই অর্ডার দিলে।

—ক'রকম মাছ ?

বললাম—একরকম মাছের কথাই তো শুনলাম। আমার সামনে দেড় মণ মাছেরই তো অর্ডার দেওয়া হলো।

আশুকাকা বলে উঠলো—সব পণ্ড হবে নবনী, এই তোমায় বলে রাখছি দেখো। অটলদা বেঁচে নেই, আমি নেই, কী যে করবে ছেলে ছোকরারা। বদনাম হয়ে যাবে মাঝখান থেকে, দেখে নিয়ো—

বললাম—আর দইঅলা এসেছিল, তাকেও বুঝি দই-এর অর্ডার দেওয়া হলো।

—কী দই ?

—তা জানিনে কাকা।

আশুকাকার জন্যে ভালো করে মাংসের অর্ডার দিয়েছিলাম আর পরোটা। ভেতর থেকে গন্ধ আসছিল। একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেল আশুকাকা। একজন ওয়েটার এসে যথারীতি ময়লা ন্যাতা দিয়ে টেবিলটা পরিষ্কার করে গেছে। মনে হলো আশুকাকার যেন লোভ সামলানো দায় হয়ে উঠেছে। হঠাৎ নিজের ধুতির কোঁচাটা দিয়ে পরিপাটি করে টেবিলটা সাফ করতে লাগলো আশুকাকা। বললে—বড্ড ময়লা টেবিলটায়।

মাংস এলো। পরোটা এলো।

আশুকাকা বললে—খাঁটি পাঁঠার মাংস তো নবনী ? দেখো, আমরা সেকেলে লোক।

অভয় দিতেই আশুকাকার মুখ ভর্তি হয়ে উঠলো মাংসে।

তার পর আস্তে আস্তে লক্ষ্য করতে লাগলাম। আশুকাকার খিদেও খাঁটি, আশুকাকার খাওয়ার রীতিটাও খাঁটি, কারণ আশুকাকা মানুষটাই যে খাঁটি। প্রত্যেকটি গ্রাসের সে কী ভঙ্গী, প্রত্যেকটি খাদ্যবস্তু নিয়ে সে কী কসরত! নিশ্বাসে, প্রশ্বাসে, ঝোলে, ঝালে, আঙুলে, প্লেটে, মুখে, ঠোঁটে, সবার ওপর চোখের দৃষ্টিতে সে কী সামঞ্জস্যময় মুভমেন্ট !

আমি দেখতে লাগলাম।

হঠাৎ একটা মাংসের হাড় জিভ আর দাঁত দিয়ে কায়দা করতে করতে আশুকাকা সখেদে বললে—তোমার কাকীমা না খেতে পেয়ে মরেছে, এ-কথাটা আমি ভুলতে পারিনে নবনী।

অনেকক্ষণ ধরে খেয়ে খেয়ে এক সময়ে খাওয়া শেষ হলো আশুকাকার।

হাত ধুয়ে এসে বসলো আবার। বললে—বেশ খাওয়াটা হলো আজ, অনেক দিন পরে মাংস খেলাম সত্যি। সেই আড়াই বছর আগে বারোয়ারিতলায় দুর্গোপুজোর সময়, মহাষ্টমীর দিন···

পরিতৃপ্তির একটা সশব্দ উদ্‌গার তুললো আশুকাকা। কিন্তু মনে মনে বুঝলাম আশুকাকার সমস্যার কোনও আশু সমাধান যেন হলো না।

আশুকাকা বিদায় নেবার পরেও অনেকক্ষণ ধরে ভাবলাম। আমিই গিয়ে প্রস্তাব করবো নাকি। বাড়িতে কত আত্মীয়-অনাত্মীয়-অনাহূত-রবাহূত আসবে। তাদের সঙ্গে আশুকাকার নামটা জুড়ে দিতে যদি আপত্তি না থাকে, নাম মাত্র একটা নেমন্তন্নর চিঠি—তাতেও কি আটকাবে ? নিমন্ত্রিত সম্ভ্রান্ত অভ্যাগতদের মধ্যে বিশিষ্ট একজন হতে চায় আশুকাকা। তার সেই বাসনা কি অযৌক্তিক, কিংবা একান্তই হাস্যকর ? অপরের শুধু বিপদে নয় উৎসবেও যে তার একটা অধিকার আছে। আজ অটলদা নেই বলেই কি আশুকাকার সমস্ত অধিকার লুপ্ত হবে ? নাকি আশুকাকা আজ ঠিকানাহীন বলেই এই অবজ্ঞা !

কিন্তু আমার অবাক হতে তখনও অনেক বাকি ছিল বুঝি।

বিয়ের দিন নয়, বৌভাতের দিনের ঘটনা। একটু সকাল-সকালই গিয়েছিলাম। নেহাত নিমন্ত্রণ রক্ষা করা নয়। সন্ধ্যে হবার সঙ্গে সঙ্গেই পৌঁছেছি।

গিয়ে পৌঁছুতেই প্রথমে আশুকাকা ছাড়া আর কার সঙ্গে দেখা হবে ? ফরসা একটা পাঞ্জাবি পরে খালি পায়ে এগিয়ে এল আশুকাকা। এসেই ধমকের সুরে বললে—এই গিয়ে এখন তোমার আসা হলো নবনী ! তোমরা বাড়ির লোক হয়ে যদি আসতে দেরি কর—

—দাঁড়াও আসছি— বলেই আশুকাকা বাড়ির ভেতর সোজা চলে গেল ! এবং তার একটু পরে ফিরে এল আবার।

বললে—রান্নাটা নিজে তদারক করছি কিনা, পোলাওটা নাবলো, একটু চেখে এলাম। আজ রান্নাটা খেয়ে দেখো যদি ফার্স্ট কেলাস না হয়তো আমি কান মুলতে মুলতে না খেয়ে চলে যাবো এ বাড়ি থেকে।

আরো কয়েকখানা গাড়ি এসে পড়লো। আশুকাকা দৌড়ে গেল ওদিকে অভ্যর্থনা করতে।

বড় ছেলে ছবি। ছোট ছেলে রবি। রবির বিয়ে। কর্তাব্যক্তির মধ্যে ছবিই একলা। অভ্যর্থনা আয়োজন চূড়ান্ত হয়েছে। আলো, লোকজন, গাড়ি, ফুলের মালা—কোনও ত্রুটি নেই। চাকর-বাকর, কর্মচারী, লোক-লস্কর কিছুরই শেষ নেই। কিন্তু সকলের ওপরে আছে আশুকাকা। আশুকাকার নজর সবদিকে।

আশুকাকা একবার দৌড়ে ভেতরে যায়, আবার বাইরে আসে !

—ওরে অসোময়, মাটির গেলাসগুলো ধুয়ে সাজিয়ে রাখ বাবা।

—হ্যাঁ রে নেবুগুলো কাটবো কি আমি ?

—ঠাকুর, লুচির কড়া চড়িয়ে দাও, সাতটা বেজে গেছে।

—এই যে আসুন, আসুন। বড় আনন্দ হলো, অটল দাদা আজ নেই, তিনি থাকলে দেখে যেতে পারতেন তাঁর ছেলের বিয়েতে কোনও ত্রুটি আমরা হতে দিইনি।

সমাগত অভ্যাগতদের মধ্যে বসে বসে ভাবছিলাম কেমন করে কী হলো। কোনও খুঁতই নেই কোথাও। আশুকাকাও তো ঠিক শেষ পর্যন্ত এসে পড়েছেন। তবে কি তাঁকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল নাকি ? আশুকাকার আচরণ দেখে তো মনে হচ্ছে এখানে তাঁর বহুদিন যাতায়াত। অন্দরমহলেও অবাধ গতি। কিন্তু তিনদিন আগেও তো টের পাইনি।

আশুকাকা হঠাৎ ইঙ্গিতে আড়ালে ডাকলে। কোমরে একটা তোয়ালে জড়িয়েছে। হাতে চায়ের কাপ। এরই মধ্যে তিন-চার কাপ খেয়ে শেষ করতে দেখলাম।

কানের কাছে মুখ এনে আশুকাকা বললে—তুমি বলছিলে শুধু রুই মাছের কালিয়ার কথা, ভেটকি মাছের ফ্রাইটাও করিয়েছি। কারিগর ভালো, খেয়ে দেখো মন্দ করেনি। এই লুচির কড়া নামলেই পাতা সাজিয়ে দেবো।

—আর একটা কথা—

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললে—মাংস হবার কথা ছিল না, আমিই ছবিকে বলে করালাম। বললাম, কতই বা খরচ তোমার, মাংসটা করা চাই, অটলদা খেতে ভালবাসতেন।

আবার চায়ে চুমুক দিলে।

একটু থেমে বললে—নতুন বিলিতি বেগুনের একটা চাট্‌নিও করিয়েছি দেখো, একটু ঝাল-ঝাল। কিছু ভাবনা নেই, আমি তোমার পাশেই বসবো'খন, কোন্‌টার পর কী কতটা খেতে হবে—সব বলে দেব'খন—কিছু ভাবনা নেই তোমার নবনী।

আশুকাকা যেন আমার পরম উপকার করলে, এমনি একটা বিশ্বাস আশুকাকার বক্তব্যের পেছনে। আশুকাকা অন্তরে অন্তরে বিশ্বাস করে নেমন্তন্ন-বাড়িতে কাউকে অগ্রিম খাওয়ার তালিকা জানিয়ে দেওয়া একটা পরম উপকারের সামিল।

কিন্তু যে-প্রশ্নটা আমার মনের মধ্যে খচ্‌ খচ্‌ করে বিঁধছে সেটা আর উত্থাপন করবার ফুরসত পেলাম না।

হঠাৎ আশুকাকা বৈঠকখানায় ঢুকলো দু'হাত জোড় করে।

—তা হলে এবার উঠতে আজ্ঞে হোক—

—ঠাকুরমশাই উঠুন, বিধুদা ওঠো ওঠো। ও হরিদাস, গা তোল ভাই,

অশ্বিনীদা বসে রইলে যে ; ওঠ, তোমাকে সেই আবার টালিগঞ্জে যেতে হবে—

—ওই যে, সামনের বারান্দায় ঢুকেই ডানদিকে ওপরে ওঠবার সিঁড়ি, বরাবর উঠে পড়ুন। ও অসোময়, মাটির খুরি গেলাসগুলো ওপরে নিয়ে এসো। আর ঠাকুরকে বলো ভাঁড়ার থেকে আরো সের পাঁচেক ময়দা নিয়ে যাক। আমি ভাঁড়ারে বলে দিয়েছি।

—ও খোকা, তোমার নাম কি ভাই—বেশ বেশ—যেমনি বসবে সবাই, একজন গরম লুচির ঝুড়ি নিয়ে এদিক থেকে ঘুরে যাবে, আর ওদিক থেকে আর একজন পেতলের বালতি নিয়ে নিরামিষ ঘি-ভাত দিতে থাকবে। তার পর—

তেতলার ছাদে সবাই বসে গেছি। আশুকাকা নিজে এসে বসিয়ে দিয়ে গেছে তার নির্দিষ্ট আসনে। আমার পাশের কুশাসনে নিজের তোয়ালেটা রেখে দিয়েছে। অর্থাৎ আশুকাকার জন্য আসন সংরক্ষিত রইল।

সবাই বসে গেছে। ডাইনে বাঁয়ে দুই সারি নিমন্ত্রিতের মধ্যে আশুকাকা একলা তদারক করতে বেরিয়েছেন। প্রধান সেনাপতির সৈন্যদের কুচকাওয়াজ পরিদর্শনের মতো।

—ও অসোময়, হাঁ করে কি দেখছো ওখানে দাঁড়িয়ে, কারুর গেলাসে যে জল নেই, দেখতে পাচ্ছো না ?

—ওহে তোমার নাম কি—শোন ইদিকে—এর পরে মাংসের পোলাওটা নিয়ে আসবে তুমি, আর বসন্তকে বলবে তার আগে নিরামিষ মুগের ডালটা গামলায় যেন ঠিক করে রেডি রাখে। তারপর ছোলার ডালের মুড়িঘণ্ট—

—সিধুদা তুমি মোটে কিছু খাচেছা না—গরম দুখানা লুচি দিক—তুমি তো বরাবর মাংসের পোলাওটা খেতে ভালবাসতে—ফেলে রাখলে যে—

—ও হরিদাস খাও খাও—তোমাদেরই তো খাবার বয়েস—তোমাদের বয়েসে আমরা এক একটা আস্ত পাঁঠা একলা খেয়ে হজম করেছি।

—অশ্বিনীদা'কে ভাল করে পরিবেশন করা হচেছ না, এ কী খাওয়া হচ্ছে—যে দিকে দেখবো না, সেইদিকেই বে-বন্দোবস্তো।

—ওহে—এবার মাছ নিয়ে এস—কালিয়াটা—ফ্রাইটা কেমন হয়েছে ঠাকুর মশাই ? নিজে তদারক করে করিয়েছি—আমার হাতের কারিগর পেলে অবিশ্যি আরো ভালো হতো।

এবার আশুকাকা সোজা এসে তোয়ালে তুলে কুশাসনে বসে পড়লো। বললে—পরের ব্যাচে বসলেও চলতো, কিন্তু থাকি অনেক দূরে।

বলে ভাজা দিয়ে লুচি মুখে পুরে বললে—কী করছো নবনী, শাক-ভাজা কুমড়োর ঘাঁট দিয়েই পেট ভরিয়ে ফেললে, ওদিকে ভালো ভালো জিনিসগুলো যে এখনও বাকি রয়ে গেছে !

বাড়ির আসল কর্তা ছবি। কিন্তু আশুকাকার কাছে যেন তারা ম্রিয়মাণ হ

গেছে। ছাদের এক কোণে দাঁড়িয়ে তদারক করছে, কিন্তু কার্যকর তদারক হচ্ছেনা যেন।

খেতে বসেও আশুকাকার শান্তি নেই।

—ও অসোময় গেলাসগুলো একবার দেখো—কার জল চাই, না-চাই—

—এইবার মাংসের পোলাওটা দিয়ে মাংসের কালিয়াটা নিয়ে এস চট্ করে।

আশুকাকা মুখ দিয়ে খায়, কিন্তু তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রয়েছে চারদিকে! কিসের পরে কী কী পরিবেশন করতে হবে, কার পাতে কী নেই—কে খাচ্ছে কে খাচ্ছে না—সমস্ত।

—ওহে বসন্ত, মাংসের কালিয়াটা এই রো'তে আর একবার দেখিয়ে নিয়ে যাও তো! খাও নবনী, বেশ মাংস দেখে দেখে গোটা চার-পাঁচ দাও দিকি এ-পাতে—খাও, খেয়ে কেমন রান্না হয়েছে বলতে হবে।

ওজর আপত্তি শুনলে না। আমার পাতেও ঢালালে, নিজেও নিলে অনেক-খানি আশুকাকা। আশুকাকা খাইয়ে মানুষ।

ছবি একবার সরু রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমার সামনে এল। একবার চেয়ে দেখল আমার পাতের দিকে। কিছু হয়তো বলতে যাচ্ছিল, আশুকাকা বাধা দিলে।

বললে—অটলদা, বুঝলে ছবি, অটলদা আর আমি দুজনেই মাংস খেতে ভাল-বাসতাম। একবার কাছারির কাজ শেষ করে অটলদা বললে, আশু, চল আজ একটা খাসী কাটা যাক। অটলদা'র যে-কথা সে-কাজ, খাসী কাটতে হবে। গেলাম মোছলমান পাড়ায়, গিয়ে দেখি···

গিয়ে আশুকাকা কী দেখলে বলা হলো না। রসময়ের পা লেগে আশু-কাকার জলশুদ্ধ গেলাসটা উল্টে গেল।

তারপর সে এক হৈ-হৈ কাণ্ড।

জলে, পাতায়, কুশাসনে, এঁটোয় একেবারে একাকার।

আশুকাকা ফেটে পড়লো—দেখলে নবনী, কাণ্ডটা দেখলে!

কিন্তু তা হোক্। আশুকাকার খাওয়া তা বলে নষ্ট হলো না। তখন সবে মাংসের কালিয়া পড়েছিল, তারপরও অনেক কিছু বাকি।

একে একে টোম্যাটোর চাট্নি, পাঁপড়ভাজা, দই, মিষ্টি সব এল। আশুকাকা সকলকে খাওয়ালে এবং নিজেও খেলে কম নয়।

হাত ধুয়ে মুখ মুছে পান চিবোচ্ছিলাম। এবার যাবার বন্দোবস্ত করতে হবে।

আশুকাকা হন্তদন্ত হয়ে এসে বললে—নবনী, তুমি যেন চলে যেও না, একটু দাঁড়াও, তোমার গাড়িতে যাবো যে।

—অসোময়, একটা চাঙারীতে বেশ করে সবরকম খাবার সাজিয়ে দাও তো—

না, ওর দ্বারা হবে না—দাঁড়াও নবনী, নিজেই গিয়ে দেখে-শুনে আনতে হবে।

জিজ্ঞেস করলাম—কী আনবে কাকা ?

আশুকাকা চলতে চলতে বললে—তোমার কাকিমার জন্যে কিছু খাবার নেবো বেঁধে, দেখি।

ঊর্ধ্বশ্বাসে আশুকাকা দৌড়ে ওধারে চলে গেল।

আমি দাঁড়িয়ে আছি। ছবি এসে দাঁড়াল পাশে। বললে—কে ও ভদ্রলোক, নবনী ?

আমি প্রশ্ন শুনে অবাক, কিন্তু আমার উত্তর দেওয়াও হলো না। আশুকাকা সেই মুহূর্তেই এসে পড়েছে। হাতে গামছায় বাঁধা বিরাট এক পোঁটলা। বললে—চল নবনী।

উঠে বসলো আশুকাকা।

গাড়ি স্টার্ট দিলাম।

আশুকাকার নির্দেশ অনুযায়ী গাড়ি চলেছে।

গাড়ি চলেছে, আর আশুকাকা পোঁটলাটা দুইহাতে ধরে বসে আছে।

বললে—সব নিয়েছি নবনী, নেবুর কুচিটাও বাদ দিইনি, থরে থরে খুরিতে মাটির গেলাসে সাজিয়েছি, মালশায় নিয়েছি পোলাও, আর···

নিস্তব্ধ রাত। আর একটু পরে নিবৃতি হয়ে যাবে সব। গাড়ির ঘূর্ণ্যমান দুটো রবারের চাকার শোঁ-শোঁ শব্দ ছাড়া আর কোনও শব্দ কানে আসে না। জ্বলন্ত হেডলাইট সামনের অন্ধকারের পাথরে উজ্জ্বল লিপি খোদাই করতে করতে চলেছে।

হঠাৎ প্রশ্ন করলাম—আচ্ছা কাকা, শেষ পর্যন্ত রবিরা তোমাকে নেমন্তন্ন করেছিল তা হলে ?

কাকা চমকে উঠলো—কই না, করেনি তো! কখন করলে ?

—করেনি ?

আমি যেন নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে পারলাম না।

ততোধিক দৃঢ়তার সঙ্গে আশুকাকা বললে—না, করেনি তো।

কী জানি কেন, হঠাৎ আশুকাকা নিজের মনেই বলে উঠলো—না করলেই বা—

অন্ধকারের মধ্যেই আশুকাকার মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম। পরিতৃপ্তির সঙ্গে পান চিবোচ্ছে। সঙ্কোচ, লজ্জা, কিছু নেই ও-মুখে।

বললে—না করলেই বা নবনী, ওরা কি আমায় চেনে ?—অটলদা চিনতো, অটলদা বেঁচে থাকলে আমাকে নেমন্তন্ন করতে ভুলতো না। তা যাক, ওরা না-হয় ছেলেমানুষ, তা বলে আমি তো আর ছেলেমানুষ হয়ে রাগ করে দূরে থাকতে পারিনে।

থামলো আশুকাকা।

গাড়ি মোড় ঘুরছিল। সোজা রাস্তায় পড়ে আশুকাকা আবার আরম্ভ করলে —অনেক ভাবলাম, বুঝলে নবনী, সেদিন তোমার অফিস থেকে ফিরে গিয়ে অনেক ভাবলাম। বুঝলাম ছবির তো দোষ নেই, ওরা ছেলেমানুষ, ওরা আমায় চেনে না, কিন্তু আমি যদি ছেলেমানুষী করে নেমন্তন্ন করেনি বলে না যাই তা হলে সব পণ্ড হয়ে যাবে যে, সব লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে। সগ্যে থেকে অটলদা সব তো দেখছেন—বলবেন, আমার মায়ের পেটের ভাই না-হয় না হলো কিন্তু মায়ের পেটের ভাই-এর চেয়ে কম ছিল কিসে? অনেক ভাবলাম, জানো নবনী, শেষে বৌভাতের দিন ভোরবেলাতেই গিয়ে হাজির। নিজের পরিচয় দিলাম নিজেই, কী করবো বলো?

আশুকাকা যা বলে, তা সত্যিই বিশ্বাস করে।

—এবার কোন্ দিকে যাবো কাকা?

আশুকাকার উত্তর দেবার আগেই মোড়ের মাথায় হঠাৎ ব্রেক কষতে হলো। ওদিক থেকে আর একখানি গাড়ি অজান্তে সামনে এসে পড়েছে।

কিন্তু সেই হঠাৎ ব্রেক কষার আকস্মিকতায় আশুকাকার হাত থেকে পোঁটলা গেছে খুলে, আর মাথাটা গিয়ে ঠোকর খেয়েছে সামনের কাঁচের সঙ্গে।

তার পর সে এক কাণ্ড। ডালে-ভাতে, দই-চাটনিতে, মাছ-মাংসে অত সাজানো চাঙারি হঠাৎ উল্টে পড়েছে গাড়ির মেঝেতে। ছত্রাকার খাদ্যসামগ্রী জুতোর ধুলোর ওপর মাখামাখি।

—এ কী হলো নবনী?

গাড়ির ভেতরের আলোটা জেবলে নেমে দাঁড়ালাম। আশুকাকার চোখে কখনও জল দেখিনি। এবারও জল নেই, কিন্তু এর চেয়ে বুঝি জল বেরুনো ভালো ছিল।

—এ কী হলো নবনী?

তারপর আশুকাকা নিজের হাতে সেই দই, সেই পোলাও, মাংস, মাছ, লুচি, ডাল, যাবতীয় জিনিস আবার ধুলো থেকে আলগোছে তুলতে লাগলো। আর আমি নির্বাক সেই দৃশ্য দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম। তার পর প্রত্যেকটি ভাত যখন খুঁটে নেওয়া শেষ হলো, আশুকাকা বললে—নবনী, তুমি তাহলে এসো অনেক রাত হয়ে গেছে। আমি এটুকু বেশ হেঁটে যেতে পারবো।

আশুকাকা পুঁটলি নিয়ে সোজা উঠে দাঁড়িয়ে চলতে লাগলো।

গাড়িটা পাশের গলির ভেতর ঢুকিয়ে মোড় ঘুরিয়ে নেব। ছোট গলি। অতিকষ্টে গাড়িটা ঘোরালাম।

মনে মনে ভাবছিলাম। আশুকাকা বলেছিল, কাকিমা মারা গেছে, না খেতে পেয়ে মারা গেছে। তবে এ কোন্ কাকিমার খাবার বেঁধে নিয়ে গেল কাকা।

মিথ্যে কথা বলবার লোক তো নয় আশুকাকা। তবে কি কাল সকালে উঠে নিজেই খাবে? কিংবা হয়তো সে-কাকিমার মৃত্যুর পর আবার এক কাকিমার আবির্ভাব হয়েছে? আশুকাকা হয়তো বিয়ে করেছে দ্বিতীয়-পক্ষে। হয়তো মাথার দিব্যি দিয়ে বিয়ে করতে বলে গিয়েছিল কাকিমা মরবার সময়। হয়তো অরক্ষণীয়া শ্যালিকাই দ্বিতীয়-পক্ষের স্ত্রী হয়ে এসেছে। কী জানি!

গলি থেকে বেরিয়েই ডানদিকে বড় রাস্তা একটা।

সেইখানে সেই রাত্রির দ্বিপ্রহরে আমি যেন ভূত দেখলাম।

একটা ডাস্টবিনের ধারে বসে আশুকাকা পুঁটলি বাঁধছে। থরে থরে মাছ, মাংস, রসগোল্লা, সন্দেশ, দই, সাজিয়ে রাখছে চাঙারিতে। আশুকাকার দ্বিতীয়-পক্ষের স্ত্রীর জন্যেই হয়তো। গাড়িটা থামিয়ে দেখলাম। দেখতে লাগলাম। আশুকাকাই তো। কোনও সন্দেহ নাই।

—আশুকাকা— ডাকলাম!

আশুকাকা আমার দিকে চাইলে। বড় কাতর সে চাউনি।

—কে? নবনী?— বেশ স্পষ্ট মনে আছে আশুকাকার গলা।

—হ্যাঁ, কিন্তু তুমি এখানে?

গাড়ির দরজা বন্ধ করে নামলাম। কৌতূহলের সীমা ছিল না আমার।

কিন্তু কাছে যেতেই একটা ধবধবে সাদা লোমওয়ালা কুকুর আমাকে দেখে ভয়ে ওদিকে পালিয়ে গেল।

চোখের কানের কী মর্মান্তিক ভুল। আশুকাকা নয়, ছিঃ ছিঃ ছিঃ—লজ্জায় আমার মাথা কাটা গেল।

নিমন্ত্রিত ইন্দ্রনাথ

আজ রবিবার। শুক্রবারে পাওয়া নেমন্তন্ন খেতে ইন্দ্রনাথ সেই সন্ধ্যেবেলা বেরিয়ে গেছে। এখন রাত সাড়ে ন'টা হতে চললো। এখনও দেখা নেই ইন্দ্রনাথের।

কুমুদ বেশ আলগা করে শাড়িটা পরেছে। এলিয়ে দিয়েছে পা জোড়া। হেলান দিয়েছে দেয়ালে। ইন্দ্রনাথের একখানা মাত্র দিশি কাপড়, সেখানাকে সেলাই করতে বসেছে। তা বলে সেলাই করাটা কুমুদের একটা ছুতোই বলতে হবে। কুমুদ সেলাই করতে করতেই হাসলে। চারখানা কাপড়ে যাকে বছর চালাতে হয়, তার কাপড় সেলাই করা ছাড়া উপায় কি? ডাকলে—বাবলু, ঘুমুলি নাকি—

মুখ তুলে চেয়ে দেখলে কুমুদ। খোকা বই পড়ছে উপুড় হয়ে শুয়ে।

বাবলু যেন হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে প্রশ্ন করলে—নেমন্তন্ন খেতে বাবার এত দেরি হচ্ছে কেন মা?

একটা ঘরের মধ্যেই তিনটি প্রাণীর এই সংসার কলকাতার এক অতি-অখ্যাত গলির শেষ প্রান্তে মন্থরগতিতে গড়িয়ে চলে। প্রতিদিনকার অতি পরিচিত সূর্য বস্তির ওপাশে তেতলা বাড়িটার ছাদের ওপরে উঠে আসে। তারপর চাকা ঘুরতে থাকে। ইন্দ্রনাথের অফিস যাওয়ার আগের মুহূর্তের ব্যস্ততা, কুমুদের তাড়াতাড়ি গরম ভাতের ওপর গরম ঝোল ঢেলে দেওয়া, তারপর এক ফাঁকে এঁটো হাত ধুয়ে নিয়ে পান সেজে বোঁটার আগায় চুন লাগিয়ে দেওয়া। তারপর বাবলুকে স্নান করানো, তাকে খাওয়ানো, নানান কাজ। বাঁধা পথের আয়েস বা অনায়াসগতি যতটুকু তার একঘেয়েমিও ঠিক ততটাই। উদয়াস্ত একটানা পরিশ্রমের ফাঁকে যখন কুমুদ একটু ভাবতে বসে, কেবল তখনই একঘেয়েমিটা ধরা পড়ে। তাছাড়া এ একরকম অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে কুমুদের। ঠিক ভোর চারটেয় ঘুম ভেঙে যায় তার। যেন ঘড়ির কাঁটাও এমন নিয়ম মেনে চলে না। যখন ঝোল ভাত রান্না শেষ হয়ে গেছে কুমুদের, সেই তখন সূর্যটা ওঠে আকাশে, তখন দিন হয়, তখন পৃথিবীর লোকের কাজকর্ম শুরু হবার কথা।

ইন্দ্রনাথের ছাপাখানার চাকরি।

আটটার সময় হাজিরা। চেতলার এই বস্তিটা থেকে ইন্দ্রনাথের ছাপাখানা কোন্ না মাইল সাতেক রাস্তা হবে। হেঁটে যেতে দু'ঘন্টা সময় লাগে বটে কিন্তু সেকেন্ড ক্লাস ট্রামের ছ'টা পয়সা তেমনি যে বাঁচে! সেই ছ'টা পয়সাই কি কম! একটু শীত পড়লে ছ'পয়সায় এক কাপ চা খেতে পারে, না হলো তো চার-ছয় চব্বিশ পয়সায় এক সের রেশনের চাল হবে। যুদ্ধে যাদের আয় বাড়েনি, তাদের

অত বেহিসেবি হলে চলবে কেন ?

সুতরাং···

সুতরাং ইন্দ্রনাথকে ভোর ছ'টার সময় বেরিয়ে আটটার সময় ছাপাখানায় হাজরে দিতে হয়।

বাবলু বই থেকে মুখ তুলে আবার বললে—বাবার আসতে এত দেরি হচ্ছে কেন মা ?

হয়তো প্রথম ব্যাচে বসতে পারেনি ইন্দ্রনাথ। লাজুক মানুষ তো আসলে। না ডাকলেও যে উঠে পড়ে দলে ভিড়ে গিয়ে পড়তে হয়, সে-কথা কে শেখাবে ইন্দ্রনাথকে ! যাকে কাল ভোরবেলাই আবার ছ'টার সময় ঝোল ভাত মুখে গুঁজে অফিসে বেরুতে হবে, তার অত শখ করে এত রাত্তির পর্যন্ত আড্ডা দেওয়া কি উচিত ! হয়তো দেখা হয়ে গেছে পুরোন বন্ধুর সঙ্গে ! বসে-বসে আড্ডাই দিচ্ছে সত্যি সত্যি। বাড়ির মানুষদের কথা একেবারে ভুলে গেছে।

কুমুদ সেলাই করতে করতে বাইরের দিকে চেয়ে রাতটা একবার আন্দাজ করলে।

আজকের এই দিনটা, এই রবিবারটা—কত বছর পরে যেন একটা বিরাট ব্যতিক্রম। এমন করে সমস্ত বিকেলটা সমস্ত সন্ধ্যেটা পা ছড়িয়ে দেয়ালে হেলান দিয়ে কখনও তো কাটায়নি কুমুদ।

আজ কেমন নিশ্চিন্তে কাটিয়েছে সমস্ত বিকেলটা। রান্নাটা সকালবেলাই সেরে নিয়েছে। দু'বেলার রান্না একবেলা সেরে রাখলে কত সুবিধে। ইন্দ্রনাথ এবেলা আজ খাবেনা বাড়িতে। শুক্রবারে বিকেলবেলাই, নেমন্তন্ন করে রেখেছেন ইন্দ্রনাথের পুরোন ছাপাখানার মনিব ধরণীবাবু। মাঝখানে একটা দিন শুধু শনিবার। শনিবারে আধরোজের ছুটিতে সাবান কিনে আনা, জুতোর কালিটা ফুরিয়ে এসেছিল, সেটা কেনা, তারপর···

তারপর সবটাই করেছিল কুমুদ। সোডা আর সাবান দিয়ে গরম জলে ইন্দ্রনাথের পাঞ্জাবি আর একটা ধুতি কলতলায় আছাড় দিয়ে কাচা, ভাতের মাড় দিয়ে, নীল দিয়ে বিছানার তলায় পাট করে রেখে 'ইস্ত্রি' করে দেওয়াটা পর্যন্ত।

ইন্দ্রনাথ এবেলা বাড়িতে খাবে না, সুতরাং কাজই বা কি কুমুদের। অন্যান্য দিনের মতো গা ধোয়া আর চুল বাঁধার সময় না পাওয়ার ব্যাপার নয়। শাড়িতে হলুদে, এঁটোতে, কাঁটাতে একাকার। বলতে পারো, ভারি তো দুটি প্রাণীর সংসার, তার আবার ভাবনা কিসের। কিন্তু ওই তো ইন্দ্রনাথের নব্বুইটি টাকার ওপর ভরসা। ওই ক'টি টাকার মধ্যে তো সব করতে হবে। একটু টেনেটুনে সবদিক সামলে না চললে হবে কেন ? দুধ তো বাবলু ভালোই বাসে। একটু দুধ ওকে দিতে না পারলে কুমুদের বুকের ভেতরটা হু-হু করে ওঠে। পাশের মাঠটাতে বিকেলে যখন বাবলু খেলা করে, তখন অনেকদিন কুমুদ জানালা দিয়ে

চেয়ে দেখেছে। অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে খেলতে খেলতে বাবলু যেন একটুতেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে। দুই হাঁটুর ওপরে ভর দিয়ে দম নেয় অনেকক্ষণ ধরে।

আর ইন্দ্রনাথ! কতদিন পরে যে আবার তার কপালে এই নেমন্তন্ন খাওয়া, কে হিসেব রেখেছে। যদি হয়ে থাকে তো সে যুদ্ধের আগে। যখন সাধারণ গেরস্থ বাড়িতেই তিন-চারশো লোকের খাওয়ার আয়োজন হতো। তখন টেক্কা দিয়ে তিন হাঁড়ি দই, পঞ্চাশটা ল্যাংড়া আম আর তার সঙ্গে তিন কুড়ি 'লেডিগেনি' খাওয়ার যুগ। সে-যুগে কুমুদ নিজেও কতবার নেমন্তন্ন খেয়েছে।

অবশ্য ইন্দ্রনাথের নিজের বিয়ের বৌভাতটাই হলো না। মানে সবই হলো, শুধু খাওয়া-দাওয়া উৎসবটাই বন্ধ রইল। তারও কারণ ছিল। সে অনেক কথা। কিন্তু কুমুদের বাপের বাড়িতে খাওয়ানো-দাওয়ানোর রেওয়াজ ছিল। জ্ঞাতি-গোষ্ঠী নিয়ে অনেক বড় পরিবার। আজ এ-বাড়িতে অন্নপ্রাশন, কাল ও-বাড়িতে বৌভাত, শ্রাদ্ধ, জ্ঞাতি-ভোজন। নিজের বাড়িতে কুমুদ কতবার ভোজ খেয়েছে। বিয়ে হবার সাত দিন আগে থেকে জুটতো এসে আত্মীয়-কুটুম্বরা। তারপর কোথা দিয়ে কাটতো দিন আর রাতগুলো। ভিয়েন ঘর, বাসর ঘর, আর ছাদনাতলা। এখনও একলা ভাবতে ভাবতে কুমুদের মনে হয় যেন লুচি-ভাজার তীব্র একটা গন্ধ নাকে এসে লাগছে। শানাই বাজছে, বর এসে গেছে—দানের সামগ্রী সাজানো রয়েছে আর তারই পাশে হচ্ছে সম্প্রদান, কনের বাপ গরদের জোড় পরে খালি গায়ে মন্ত্র পড়ছে—ওদিকে বেগুন-ভাজা পড়ে রয়েছে কলাপাতার ওপর। লোক বসে গেছে ছাদে, গরম গরম লুচি ঝুড়ি ভর্তি নিয়ে এসে দু-চারখানা করে ঝপা-ঝপ দিয়ে যাওয়া। কুমুদ তখন ছোট। ছেলেদের মধ্যেই বসে পড়েছে খেতে। শাক ভাজা, বেগুন ভাজা, তারপর আসত নিরামিষ একটা তরকারি। হয় বাঁধা-কপি নয়তো কুমড়োর ছক্কা। তারপর একটা ছ্যাঁচড়া। চমৎকার খেতে সেটা। তারপর মাছের কালিয়া। চিংড়ি মাছের মালাই কারি। তারপর একে একে দু'রকম চাটনি, পাঁপড় ভাজা, দই, সন্দেশ, পান্তুয়া দরবেশ···শেষকালে বাঁ হাতে পান, আর দু'চারখানা লাল গোলাপী কাগজে ছাপানো পদ্য—রুমাল পদ্য···

ভাবতে ভাবতে কুমুদ পনেরো বছর আগে পেছিয়ে গেল স্মৃতির উজান ঠেলে···

···সেই একবাড়ি লোক, আলো, হাসি, ফুলের মালা, বর কনে, আর সকলের ওপর লুচিভাজার গন্ধ, হোক নিজের বাড়ি, না হয় হোক পরের বাড়ি—তবু ওই পরিবেশ, ওই স্মৃতি, কুমুদের সারা মনকে উদাস করে দেয়। আজ সেই রাতে ইন্দ্রনাথের পুরোন দিশি কাপড় সেলাই করতে করতে হঠাৎ কুমুদের কী যে হলো। তার মনে হলো ইন্দ্রনাথ এত দেরিই বা করছে কেন অকারণে! পেট ভরে খেয়েছে ইন্দ্রনাথ অনেকদিন পরে। হয়তো একটা পান চিবোচ্ছে। তারপর হেঁটেই

আসছে ট্রাম রাস্তা ধরে। কেন মিছিমিছি পয়সা খরচ করবে ট্রামে চড়ে। বাবলুও জেগে রয়েছে। সে-ও বুঝি বাবার কাছে বিয়ে-বাড়ির গল্প শুনবে বলে উদ্গ্রীব হয়ে আছে।

ইন্দ্রনাথের তিনকুলে কেউ নেই, তাই একটা নেমন্তন্ন হয়না কুমুদের। তা একপক্ষে ভালো। প'রে যাবার মতো একটা ভালো শাড়ি বা ভালো গয়না তা-ই কি কুমুদের আছে নাকি। ইন্দ্রনাথকেই বা কী করে দোষ দেওয়া যায়। যুদ্ধের দৌলতে এত লোকের মাইনে বাড়লো, এত লোক অবস্থা ফিরিয়ে ফেললে, বেচারী ইন্দ্রনাথের আগেও যা ছিল, এখনও তাই। নব্বুই টাকা মাইনে। নব্বুই টাকার হিসেব করতে গেলে ভয় করে কুমুদের। এত বড় যুদ্ধটা যেন ইন্দ্রনাথকে স্পর্শই করলে না। ইন্দ্রনাথ অপাঙ্ক্তেয় রয়ে গেল যেন এই যুদ্ধে। তবু ইন্দ্রনাথ খেতে পারে। ভালো খাওয়া খেতে ভালবাসে। মিষ্টি চাট্নি হলে থালা চেটে চেটে খায়। সেই ইন্দ্রনাথ এতগুলো বছরের পর বিয়ে-বাড়ি যাবার নেমন্তন্ন পেয়েছে। সকাল থেকে ইন্দ্রনাথের তাই ব্যস্ততার অন্ত ছিল না। বেশি রাত পর্যন্ত জাগতে হতে পারে, তাই দুপুরবেলা একটু ঘুমিয়ে নিয়েছে। বাবলুকে অন্তত সঙ্গে নিয়ে গেলে ভালো হতো। অনেকদিন ভালো-মন্দ কিছু খায়নি, আজ খেয়ে আসতো। কিন্তু ধরণীবাবু কি ভাববেন!

তা ধরণীবাবু লোকটি ভালো। ধরণীবাবুর ছাপাখানাতেই তার প্রথম চাকরি। তিনিই একরকম মানুষ করে দিয়েছেন ইন্দ্রনাথকে। এই যে আজ ইন্দ্রনাথ 'এরিয়ান প্রেসে' নব্বুই টাকা মাইনে পাচ্ছে, এ ওই ধরণীবাবুরই শিক্ষার গুণে। ধরণীবাবুর ওখানেই ছ'মাস বিনা-মাইনেয় কাজ করে সাত মাস থেকে পনেরো টাকা করে পেতে শুরু করে।

সেই ধরণীবাবুর সঙ্গে হাজরা রোড়ের মোড়ে সেদিন হঠাৎ দেখা।

ধরণীবাবু মোটরে করে আসছিলেন, আর ইন্দ্রনাথ রাস্তা পার হচ্ছিল।

ধরণীবাবুর ডাকে ইন্দ্রনাথ থমকে দাঁড়াল। গাড়িটা ততক্ষণে দশ হাত দূরে গিয়ে থেমেছে। ইন্দ্রনাথ দৌড়ে সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই ধরণীবাবু বলেছিলেন—পুলিনের—মানে আমার বড় ছেলের বিয়ে আজ, রোববারে বৌভাত, যেয়ো ইন্দ্রনাথ—ভুলো না—

তারপর···

—কেমন আছো, কোথায় কাজ করছো আজকাল···ইত্যাদি ইত্যাদি।

ধরণীবাবু মোটরে ব'সে আর ইন্দ্রনাথ দাঁড়িয়ে।

শব্দ করে ধোঁয়া উড়িয়ে ধরণীবাবু মোটর হাঁকিয়ে চলে গেলেন, কিন্তু তখনও ইন্দ্রনাথ সেইখানে দাঁড়িয়ে আছে। এ তার হলো কি। কাল রাত্রে স্বপ্নেও তো ভাবেনি কেউ তাকে নেমন্তন্ন করবে। বহুদিন পরে সুযোগ পাওয়া যাবে ভালো-মন্দ খাওয়ার।

এই হলো নেমন্তন্নর ইতিহাস।

এমন ঘটনা সচরাচর ঘটে না। ক্বচিৎ কদাচিৎ। সেই শুক্রবার থেকে শুরু হয়েছে ইন্দ্রনাথের আয়োজন। একটা ফরসা ধোপদুরস্ত ধুতি, একটা পাঞ্জাবি আর জুতোর কালির। হলোই-বা ধরণীবাবুর পুরোন প্রুফ-রীডার। সে-যুগের পনেরো টাকার প্রুফ-রীডারের ছাপ তো আর গায়ে লেগে নেই। আর দশজন ভদ্রলোকের সঙ্গে যেন এক হয়ে একাকার হয়ে যাওয়া যায়। একসঙ্গে খেতে বসলে তো তার পাতায় একটা সন্দেশ কম পড়বে না তা বলে।

কুমুদ সেলাই করতে করতে আর একবার জানালার বাইরের দিকে চেয়ে রাতটা আন্দাজ করলে।

কিন্তু এত রাতই বা কেন হচ্ছে মানুষটার। বাবলু একমনে পড়ে চলেছে। বাবার জন্যে সে-ও জেগে রয়েছে এত রাত পর্যন্ত। বড় রাস্তার খাবারের দোকানের রেডিওটা এখন বন্ধ হয়ে গেল। রাত গভীর হচ্ছে।

হঠাৎ দরজার কড়া নড়ে উঠলো—খটাখট্—খটাখট্—

—খোকা।

ইন্দ্রনাথের গলা। ইন্দ্রনাথের গলা যেন কেমন আড়ষ্ট আড়ষ্ট। একমুখ পান খেয়ে ডাকলে যেমন হয়।

বাবলু উঠে পড়েছে বিছানা ছেড়ে।

কুমুদ কাপড়টা পাশে সরিয়ে উঠে দরজা খুলে দিয়েছে তাড়াতাড়ি।

ইন্দ্রনাথ ঢুকলো।

কুমুদ দেখলে, যা ভেবেছে সে তাই, সত্যি একমুখ পান। কালো ঠোঁট জুড়ে পানের লালিমা। পান চিবুচ্ছে ইন্দ্রনাথ। নড়তে পারছে না সে। পেট ভরে খেয়ে অনেকখানি রাস্তা হেঁটে এলে যেমন হয়। ইন্দ্রনাথ যেন ক্লান্ত। ভরপেট খাওয়ার ক্লান্তি।

বিছানার ওপর বসে পড়ে ইন্দ্রনাথ বললে—ঘুমোওনি তোমরা এখনও ?

তারপর বাবলুর দিকে ফিরে বললে—তুমি এখনও জেগে আছ বাবা ?

বলে খোকার মাথায় হাত বুলোতে লাগলো।

—এই তোমার কাপড়টা সেলাই করছিলাম— কাপড়টা কুঁচিয়ে তুলতে তুলতে বললে কুমুদ।

—কী রকম খাওয়ালে বাবুরা—জিজ্ঞেস করলে কুমুদ।

ইন্দ্রনাথ হাই তুলছিল আরাম করে। হাই-তোলা শেষ করে বললে—বেশ খাওয়ালে, রান্নাবান্না বেশ হয়েছিল।

বাবলু জিজ্ঞেস করলে—পদ্য আনোনি বাবা ?

—পদ্য ? আজকাল কি পদ্য হয় রে বোকা ছেলে— ইন্দ্রনাথ আদর করলে একটু অনুকম্পার সুরে।

কুমুদ তখন পাশে বসে পড়েছে। বললে—বাড়িটা খুঁজতে কষ্ট হয়নি তো? নতুন বাড়িতেই বিয়ে হলো তো?

—না, কষ্ট হবে কেন— ইন্দ্রনাথ বললে—বিয়ে বাড়ি খুঁজতে কি কষ্ট হয়, আধ মাইল দূর থেকেই লুচি-ভাজার গন্ধ আসে নাকি।

—লুচি গরম ছিল?— কুমুদ জিজ্ঞেস করলে হঠাৎ।

ইন্দ্রনাথ বললে—প্রথম যে ক'খানা পাতে দিল সেগুলো ঠাণ্ডা, পরে গরম এল; দু'চারখানা করে গরম গরম দিয়ে যেতে লাগলো—পরে পোলাও দিয়ে গেল—সরু বাঁকতুলসী চালের পোলাও—চপ্ চপে ঘি—

শুধু লুচি নয়, পোলাও হয়েছিল। তা ধরণীবাবু শৌখীন বড়লোক, খাওয়াবেন বৈকি! তা'তে আবার বড় ছেলের বিয়ে। পোলাওটা না করলেই বরং অস্বাভাবিক হতো।

ইন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করলে—তোমাদের খাওয়া হয়ে গিয়েছে?

—কখন— কুমুদ উত্তর দিলে। —কোন্ সকালে খেয়েদেয়ে বাসন মেজে মায়ে পোয়ে জেগে বসে আছি।

—কেন জাগতে গেলে আমার জন্যে—আমার তো খাওয়ার হাঙ্গামা নেই, কাল থেকে তো আবার সেই রাত চারটের সময় ওঠা।

কুমুদ কিছু বললে না। চুপ করে বসে রইল।

ইন্দ্রনাথ বললে—এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল দাও তো, পোলাওতে খুব ঘি দিয়েছিল কিনা, কেবল জল টানছে।

জল এনে দিলে কুমুদ। জিজ্ঞেস করলে—কী কী খাওয়ালে ওরা?

—সবাই যেমন খাওয়ায়, বেগুন-ভাজা থেকে শুরু করে দই রাবড়ী।

—গোড়া থেকে বলো না গো, একেবারে প্রথম থেকে—কলাপাতা থেকে আরম্ভ কর।

ইন্দ্রনাথ বললে—কলাপাতা তো পাতাই ছিল, তার ওপর একখানা করে বেগুন-ভাজা, একমুঠো শাক-ভাজা আর খানকয়েক ঠাণ্ডা-লুচি—একটু নুন, আর একটুকরো লেবু।

—তারপর?

—সবাই গিয়ে বসলুম। বসবার পর এক ভদ্রলোক বললেন—এবার তবে আরম্ভ করা যাক্—যেমন বলা আর দেরি নয়, সঙ্গে সঙ্গে লুচি ছেঁড়ার শব্দ—বেগুন-ভাজাটিকে নুন দিয়ে মেখে···

ইন্দ্রনাথ থামলো।

—থামলে কেন, বল— বললে কুমুদ।

—তারপর একজন ঝুড়িভর্তি গরম লুচি নিয়ে জিজ্ঞেস করে করে ঘুরে

গেল। তার ওদিক থেকে ডালের গামলা নিয়ে পাতে ডাল দিতে দিতে চললো আর একজন।

—নিরামিষ না মুড়িঘণ্ট ?

—দু'রকমই, নিরামিষটা মুগের আর মুড়িঘণ্ট ছোলার ডালের—দুটোই খেলাম।

কুমুদ হঠাৎ কথার মাঝখানেই বললে—মুড়িঘণ্ট ফেলে কেউ নিরামিষ খায়! আমি হলে ভো···তা যাক্, তারপর ?

—তারপর আর কি—এল একটা বাঁধাকপির তরকারি, কড়াইশুঁটি দিয়ে।

—চোতমাসে বাঁধাকপি ?— কুমুদ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলে—এখন তো বাধাকপি আর ঘাস সমান, কুমড়োর ছক্কা তো বাপু করা উচিত ছিল, বেশ ছোলা দিয়ে—ঝাল-ঝাল তেজপাতা ফোড়ন দিয়ে—যেমন টুনিদি'র বিয়েতে খেয়েছিলাম, এখনও মুখে লেগে আছে যেন।

বিয়ের নেমন্তন্নয় কুমড়োর ছক্কা না হওয়াতে কুমুদ যেন মুষড়ে পড়লো।

—যাক্, থামলে কেন, বল—

ইন্দ্রনাথের উৎসাহ যেন কমে এসেছে। বললে—তারপর মাছ···

—শুধু মাছ বললেই হলো, কি মাছ, নাম নেই ? কালিয়া না কোর্মা···আমার ন'দা নেমন্তন্ন খেয়ে এসে এমন চমৎকার গল্প করতো, আমরা জেগে বসে থাকতুম ন'দার খাওয়ার গল্প শুনবো বলে। তুমি যেমন খেতেও জানো না খাওয়ার গল্পও করতে পারো না।

ইন্দ্রনাথ আরম্ভ করলে—কালিয়া আর কোর্মা, দুই-ই রুই মাছের।

—কেমন রেঁধেছিল কোর্মাটা ? কোর্মার রঙ হয়েছিল ?

—হয়েছিল, কিন্তু চিংড়ির মালাই-কারিটা ভালো হয়নি— ইন্দ্রনাথ ঢেকুর তুললে একটা।

—এঃ, আসল জিনিসটাই খারাপ করলে ? কেন, নুন বেশী হয়েছিল বুঝি ? কুমুদ এবার রীতিমতো মুষড়ে পড়লো। যেন এ তার নিজের বাড়ির কাজ।

—কেন জানিনে— ইন্দ্রনাথ বললে—কিন্তু মুখে ভালো লাগলো না, এক-টুকরো কামড়ে আর খেতে পারলুম না।

চিংড়ির মালাই-কারি ইন্দ্রনাথ একটুকরো কামড়ে আর খেতে পারেনি, এ দুঃখ যেন ইন্দ্রনাথের নয়, কুমুদের। যেন কুমুদই অভুক্ত থেকে চলে এসেছে। বললে—আর সবাই ? আর সবাই খেলে ?

—কেউ না, কেউ খেতে পারলো না— ইন্দ্রনাথ গম্ভীর গলায় বললে।

দু'জনেই খানিকক্ষণ চুপ।

নিস্তব্ধতা ভাঙলো কুমুদ। বলে—তারপর ?

—তারপর চাটনি, পাঁপড়-ভাজা, দই।

কুমুদ জিজ্ঞেস করবার আগেই ইন্দ্রনাথ বললে—দু'রকম চাটনি, একটা আলুবখরার আর একটা আদার।

অবাক হয়ে গেছে কুমুদ। বললে—কি বললে ? আদার ?

—হ্যাঁ, আদার চাটনি—এক নতুন ধরনের। তারপর এল মিষ্টি···ছ'রকমের।

—ছ'রকম ? কুমুদের গলার স্বরে এবার অদম্য বিস্ময়।

—হ্যাঁ গুনেছি আমি, ছ'রকম। তিন রকমের সন্দেশ, একটা কড়াপাক, একটা কাঁচাগোল্লা, আর একটা জয়-হিন্দ্ সন্দেশ, আর মিহিদানা, লেডিগেনি আর শেষে হলো দরবেশ···যে যতো পারে—

কুমুদ স্তম্ভিত। মুখে আর কথা নেই। চোখ-দুটো পলকহীন করে চেয়ে রইল স্বামীর দিকে। এ-ও কি সম্ভব ! সার্থক ধরণীবাবু আর সার্থক তার ছেলের বিয়ে।

অনেকক্ষণ পরে কুমুদের মুখে কথা বেরুল।

—ক'টা খেলে তুমি ?

ইন্দ্রনাথ টপ্ করে জবাব দিতে পারলে না। একটু থেমেই রইল। তারপর প্রশান্ত গলায় বললে—একটাও না।

একটাও না। কুমুদের দয়া হলো স্বামীর ওপর।

—গোড়াতেই ছাইভস্ম দিয়ে বুঝি বোকার মতন পেট ভরিয়ে ফেলেছিলে ?

—না।— ইন্দ্রনাথ গম্ভীরভাবে বললে।

—তবে ?

ইন্দ্রনাথ পকেটে হাত দিলে। পকেট থেকে বার করলে ছোট একটা পুঁটলি। রুমালে বাঁধা জিনিসটা কুমুদের বিস্মিত দৃষ্টির সামনে খুলে দিয়ে লজ্জায় অধোবদন হয়ে গেল। বললে—লুকিয়ে লুকিয়ে সবগুলো পকেটে পুরেছিলুম।

বাবলু এতক্ষণ পরে উৎসাহিত হয়ে উঠেছে। রূপকথার পক্ষিরাজ ঘোড়া যেন সশরীরে একেবারে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। বললে—মা, দেখি।

কুমুদ দুই হাতের আঙুল দিয়ে রুমালের গেরোগুলো খুললে। কিন্তু সব মিষ্টিগুলো পকেটের চাপে পড়ে এক বৃহৎ পিণ্ডে পারণত হয়েছে। সন্দেশ, লেডিগেনি, মিহিদানা, দরবেশ মিলে একাকার। তা হোক, মিষ্টি তাতে বিশেষ খারাপ হয় না। কুমুদ দেখলে, বাবলুকে দেখালে, অনেকক্ষণ ধরে। তারপর নাকের কাছে রুমালসুদ্ধ উঁচু করে ধরে নামিয়ে নিয়ে বললে—বিয়ে-বাড়ির মিষ্টির গন্ধই আলাদা, দেখেছো ?

বিয়ে-বাড়ির মিষ্টির গন্ধ সত্যিই আলাদা কিনা ইন্দ্রনাথও একবার শুঁকে দেখলে।

তারপর বাবলুকে বললে—খোকন, একটা সন্দেশ খাবি ?

রাত তখন দেড়টা কি দুটো। ইন্দ্রনাথ বিছানা ছেড়ে উঠলো। চারিদিক নিঝুতি।

অত্যন্ত সন্তর্পণে মশারি তুলে বাইরে এল। ছোট জানালা দিয়ে চাঁদের আলো এসে ঘরের বিছানায় পড়েছে। কুমুদ অঘোরে ঘুমোচ্ছে। ক্লান্ত সে! ভোর চারটের সময় উঠে আবার তাকে উনুনে আগুন দিয়ে ভাত রেঁধে দিতে হবে। খোকা ঘুমোচ্ছে। মাথার বালিশের কাছে কাঁসার-বাটি ঢাকা দেওয়া তার সন্দেশ রয়েছে। রাত্রে সে খায়নি। বোধ হয় সকালবেলা সদর-দরজায় বসে পাড়ার ছেলেদের দেখিয়ে চেটে চেটে খাবে।

ইন্দ্রনাথ আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে ঘরের পুব কোণে চলে এল। একটা গেলাস নিয়ে কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে খেলে। গেলাসটা সম্পূর্ণ উপুড় করে শেষ ফোঁটা পর্যন্ত খেলে। কিন্তু তবু যেন পেটটা ভরলো না, তার মনে হলো। আবার এক গ্লাস জল গড়ালো। কুমুদ না জেগে উঠে আবার দেখে ফেলে তাকে। দ্বিতীয় গ্লাসটা সম্পূর্ণ শেষ করলে। তবু যেন পেটটা ভরলো না মনে হলো।

তৃতীয় গ্লাস জলটা খেয়ে যেন শান্ত হলো হুতাশন।

মশারি তুলে বিছানার ঢুকতে যাচ্ছিল, একটু শব্দ হওয়াতে কুমুদ চমকে জেগে উঠেছে।

—কে, কে—কে?

—আমি। তেষ্টা পেয়েছিল, জল খেলাম উঠে।

—এত জল-তেষ্টা, এইতো জল খেয়ে শুলে!

ইন্দ্রনাথ বললে—পোলাওটা বেশী খেয়ে ফেলেছি, খুব ঘি দিয়েছিল কিনা তাই জল টানছে।

কুমুদ ঘুমের ঘোরে ইন্দ্রনাথের উত্তরটা বোধ হয় আর শুনতে পেলো না!

তবু পরদিন সকালেও সত্যিকথাটা বলতে বাধলো ইন্দ্রনাথের। ধরণীবাবু তার পুরোনো মনিব, বিরাট বড়লোক। শেষকালে তাঁর বড় ছেলের বউভাতে কিনা, এক গ্লাস করে ডাবের জল আর পান সিগারেট খাইয়ে ছেড়ে দিলেন। পকেটে ভাগ্যিস দুটো টাকা ছিল তাইতো সে দোকান থেকে মিষ্টি কিনে আনতে পেরেছে।

আমীর ও উর্বশী

জীবনরাম কুণ্ডু এণ্ড কোং-এর জীবনরাম বললেন—কিছু খেয়ে নিলে হোত না হরিপদ ?

হরিপদ তৈরীই ছিল। বললে—এই—রোখ্‌কে, রোখ্‌কে—

ফিটন গাড়িটা থেমে গেলো।

—তাহলে এই দোকানেই ঢোকা যাক, কী বলেন, বেশ নিরিবিলি আর মাংসটা আপনার গিয়ে খুব ভালো করে এরা।

হরিপদ সম্মতির অপেক্ষা করতে লাগলো।

তা জীবনরামের আপত্তি নেই। হরিপদ যখন বলছে, তখন আর তাঁর আপত্তি করবার কী আছে। কলকাতা শহর সম্বন্ধে হরিপদর চেয়ে কে আর বেশী জানে ? এখানে এই শহরে হরিপদই তো জীবনরামের ভরসা। হরিপদর হাতেই জীবনরাম নিজের ভালো-মন্দের ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত।

—নেমে আসুন স্যার— হরিপদ গাড়ির দরজা খুলে দিয়ে দাঁড়ালো।

—দেখবেন স্যার, খুব সাবধান।

জীবনরামকে একরকম হাত ধরেই নামিয়ে নিলে হরিপদ।

জীবনরাম বললেন—ওগুলো নিলে না ?

—কিছু ভাববেন না স্যার, আমি যতক্ষণ আছি আপনি কিছু ভাববেন না—বলে হরিপদ গাড়ির ভেতর থেকে গোটা তিন-চার বোতল জামার পকেটে আর বগলে তুলে নিলে। বললে—আসুন স্যার, আমার পেছনে পেছনে আসুন।

নিরিবিলি একটা ঘেরা ঘরের মধ্যে ঢুকে হরিপদ বললে—বসুন এখানে আরাম করে আপনি।

তারপর বাইরে গিয়ে একজন 'বয়'কে সঙ্গে নিয়ে এসে বললে—সেলাম কর বাবুকে, সেলাম কর বেটা, কোটিপতি বাবু, বুঝলি, চক্ষু সার্থক করে নে। তোদের এই দোকানের মতো দশটা দোকান কিনে নিতে পারেন। আজ বেটা তোর ভাগ্যি ভালো, মোটা বকশিশ পাবি—সেলাম কর।

জীবনরাম বিব্রত বোধ করলেন—থাক্ হরিপদ, থাক্।

—না, থাকবে কেন মশাই, করলেই বা সেলাম, পুণ্যি হবে বেটার, ক'টা কোটিপতি দেখেছে মশাই ও! সত্যিকথাই বলবো মশাই, আমিই বা ক'টা কোটিপতি দেখেছি ? এ আমার বাপের ভাগ্যি যে, আপনার সঙ্গে এক টেবিলে বসে খাই—নইলে আমরা কি আপনার পায়ের ধুলোরই যুগ্যি ?

জীবনরাম প্রশান্ত মুখে হাসতে হাসতে বললেন—কী যে তুমি বল হরিপদ !

হরিপদ জীবনরামকে বললে—না, এ খুব বিশ্বাসী লোক, বুঝলেন ? আমি

এখানে যখন আসি, এর হাতে ছাড়া খাইনে···এখন কী খাবেন বলুন তো···এখানে আপনার সব পাওয়া যাবে।

জীবনরাম কিছু বলতে যাচ্ছিলেন···

তার আগেই হরিপদ বললে—তুই-ই একটু বুদ্ধি খরচ করে নিয়ে আয় দিকিন, বেশ ঝাল-ঝাল মিঠে-মিঠে—যা খেলে শরীরটা চাঙ্গা হয়ে ওঠে···কী বলেন স্যার ?

হরিপদ দেখলে, জীবনরাম যেন উসখুস করছেন ! পাখাটা জোরে ঘুরছে··· আদ্দির পাঞ্জাবির হাতা-দুটো মিহি গিলে করা। মিনে-করা হীরের বোতাম চারটে ঝিকমিক্ করছে, আর গলার বোতামটা খোলা, তারই উল্টো পিঠে বেগুনি মিনেতে লেখা 'জে· কে·' অর্থাৎ ডিমুচেরালির সুবিখ্যাত চাউল ব্যবসায়ী 'জীবনরাম কুণ্ডু এণ্ড কোং'-এর মালিক জীবনরাম কুণ্ডু। খাঁটি কালো গায়ের রং। হরিপদর উপরোধে আজ মুখে স্নো আর পাউডার মেখেছেন।

হরিপদ বললে—আর একটু ঢালবো নাকি স্যার ? এখনি ঝিমিয়ে পড়লে চলবে কেন ?

জীবনরাম বললেন—শেষকালে ডোজ বেশী হয়ে যাবে না তো হরিপদ ?

—বলেন কি স্যার, আমি যতক্ষণ আছি, আপনি কিচ্ছু ভাববেন না, চলুন না, এই যাবার মুখে মাথুরামের বেনারসী পানের দোকানে মৃগনাভি দেওয়া খিলি খাইয়ে দেবো, দেখবেন শরীর একেবারে চাঙ্গা হয়ে উঠেছে, ঠিক পঁচিশ বছরের ছোকরার মতন, আমি তো আছি। আপনার ভয় কিসের।

তা বটে। আজ সকাল থেকেই জীবনরাম যেন নতুন মানুষ হয়ে উঠেছেন। বহু অভাব দুঃখ কষ্ট গেছে জীবনরামের জীবনে। এককালে ঢাকায় খবরের কাগজ ফেরি করতে হয়েছে, স্টেশনের প্ল্যাটফরমে কত রাত কাটাতে হয়েছে। কত বিনিদ্র রাত কেটেছে জীবনরামের উপোস করে। তখন অবশ্য আগুন লাগেনি ভাতের, কিন্তু দেশের সেই সুদিনেও তাঁর কতদিন ভাত জোটেনি। কিন্তু একনিষ্ঠা আর অধ্যবসায়, ওরই জোরে 'জীবনরাম কুণ্ডু কোং'-এর একদিন প্রতিষ্ঠা হলো।

হরিপদ গ্লাসটা এগিয়ে ধরলে। বললে—বেশ অল্প করে সোডা দিয়ে দিয়েছি, চোঁ চোঁ করে ঢালুন তো গলায়—তারপরেই সিগ্রেটে টান দিন, ওই সিগ্রেটটা টানতে যেন দেরি করবেন না স্যার, তাহলেই সব ফুর্তি একেবারে মাটি।

জীবনরাম বললেন—কিন্তু ওদিকে দেরি হয়ে যাচ্ছে না তো হরিপদ ?

—আজ্ঞে, দেরি কোথায়, হরিপদর ঠিক হিসেব আছে, আটটার সময় যাবার কথা, এখন বেজেছে ছ'টা—দু'ঘণ্টা এখন মাঞ্জা-দিয়ে শরীরটাকে চনচনে করে তুলুন না।

হরিপদ জীবনরামের দিকে চোখ টিপে একটা অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত করলে।

সরু দেরাদুন চালের ভাত আর ফাউল-কারী।

জীবনরাম মুরগীর ঠ্যাংটা নিয়ে আর সামলাতে পারছেন না। ঝোলে-ঝালে জীবনরামের হাত আর মুখ একাকার হয়ে গেছে। হরিপদ দেখতে লাগলো। দেখতে লাগলো আর ভাবতে লাগলো। তেরোশ' পঞ্চাশের শ্রাবণ মাস সেটা। ঝম্-ঝম্ বৃষ্টি···সারা গাঁয়ে এককণা চাল নেই কারু কাছে। আগের বোশেখে মেজো ছেলেটা মারা গেছে পেটে ঘা হয়ে, তারপর পড়ল ছোট মেয়েটা জ্বরে। জ্বর থেকে উঠে পথ্য করবার চাল নেই। জীবনরাম বলেছিল—একটু বেশী রাত করে এস হরিপদ, চাল দেবো তোমাকে।

রাত করেই হরিপদ গেলো। দরজার বাইরে টোকা দিতেই কয়াল এসে দরজা খুলে দিলে।

জীবনরাম অত রাত পর্যন্ত টাকা-পয়সার হিসেব নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। হরিপদকে দেখে বললেন—মুকুন্দ, ধুচুনীতে ভালো চাল একপো রাখা আছে, দাও তো এনে হরিপদকে, সস্তা দরেই তোমাকে দিলাম হরিপদ, আঁশি টাকার দরে তুমি চাল পাবে না এ তল্লাটে।

হরিপদ বলেছিল—একপো চালে আমার কী হবে, অন্তত সের দশেক—

জীবনরাম হেসে উঠেছিলেন হো হো করে—নিজের খাবার চাল থেকে দিলাম কিনা, ছোট মেয়ে পথ্য করবে বললে—বলে সোনা চাইলে সোনা দিতে পারি, চাল কোথায় ?

কিন্তু কতদিন স্টেশনে যাবার পথে ডিমুচেরালির ঘাটে গিয়ে দেখেছে হরিপদ 'জীবনরাম কুণ্ডু এন্ড কোং'-এর গুদাম থেকে দু'মনি বস্তা পাচার হচ্ছে বজরা নৌকোয়। নৌকো ভর্তি হয়ে সে-চাল কোথায় যেত কে জানে। চাটগাঁ, কলকাতা, দিনাজপুর না যশোর কে জানে। রাত দুটো-তিনটে পর্যন্ত লম্প জেবলে কাজ হতো। 'জীবনরাম কুণ্ডু এন্ড কোং'-এর নতুন গুদাম তৈরী হলো, পনেরোখানা বজরা তৈরী হলো। আর গাঁয়ের লোক উচ্ছন্ন হয়ে গেলো না-খেতে পেয়ে। সে-সব তেরোশ' পঞ্চাশ সনের কথা। কতদিন হয়ে গেলো—তারপরে জীবনরাম কুণ্ডুর কলকাতায় চারখানা বাড়ি, দেশে চারটে গ্রামের পত্তনি, অনেক কাণ্ড ঘটে গেছে।

জীবনরাম বললেন—দেরাদুন রাইস দিয়েছে হে হরিপদ ; আহা বেশ গন্ধ, এই চাল, এর জন্যে কী কাণ্ডটাই না হয়েছে, কি বল হরিপদ।

হরিপদ বললে—তা যা বলেছেন স্যার, মরেছে যতো হতভাগারা, পাপ করেছিল আর-জন্মে, তার ফল ভোগ করলে, তা মা-লক্ষ্মীর কৃপায় আপনার তো চালের অভাব হয়নি।

জীবনরাম মুরগীর হাড় চুষতে চুষতে বললেন—আমি আর কী করেছি হরিপদ, দেখগে যাও নাড়াজোলের রায়েদের। মনে করলাম আর দর বাড়বে না, যাট টাকার দরে ছেড়ে দিলাম, নইলে সেই দু'শো বস্তায় আমারও বেকসুর দু'লক্ষ

টাকা আসতো। দর যখন বাড়লো, তখন নাড়াজোলের রায়েরা ধুলোমুঠোকে সোনামুঠো করছে আর আমি বুড়ো-আঙুল চুষছি ; এখন ভাবি, আর কপাল চাপড়াতে ইচ্ছে করে।

ভাত আর ফাউলকারীর শেষে এল চিকেন রোস্ট।

হরিপদ বললে—এইটে খুব চুষে চুষে খান স্যার, এটা খেলে একেবারে খাঁটি রক্ত করে ছেড়ে দেবে, খাওয়ার পর মৃগনাভি-দেওয়া একখিলি পান খাইয়ে দেবো, দেখবেন শরীরটা কেমন চাঙ্গা হয়ে ওঠে।

জীবনরাম বললেন—সেদিন সন্ধ্যায় পানটা খেয়ে খুব ভালো ফল দিয়েছিল হরিপদ।

হরিপদ বললে—আজ্ঞে ওটা পানের গুণ নয়, যা আপনাকে দেখিয়ে দিয়েছি ও আপনার গিয়ে কোটিতে একটা পাবেন কিনা সন্দেহ, এই রাত্রে যাচ্ছেন তো, গেলেই টের পাবেন !

জীবনরাম যেন বিগলিত হয়ে গেছেন ; বললেন—চোখ-দুটো ওর ভারি মন-মাতানো কিন্তু হরিপদ।

হরিপদ বললে—কোন্‌টা মন-মাতানো নয়, বলুন তো স্যার, আপনি তো সকালে দু'ঘণ্টা কথা বললেন, চুলটা কেমন বলুন দিকি, ঠোঁঠ দুটো, গাল, নাক আর গায়ের রং—ইহুদী মেয়েকে হার মানিয়ে দেবে মশাই।

জীবনরাম বললেন—বাড়িতে কে কে আছে ওদের ?

—ওই তো বুড়ো মা, বড় ভাই আর ছোট একটা বোন। বড় ভাইটা কি মানুষ ? মানুষ নয় স্যার, কোনও দিন বাড়ি আসে, কোনও দিন আসে না, এদের চলে কি করে বলুন তো ? ওই মেয়েটা কলেজে পড়ে, কিন্তু পয়সা নেই, আমি ভিক্ষে-টিক্ষে করে টাকার যোগাড় করে দেই, তাই চলে। আমাকেই ও-বাড়ির একরকম অভিভাবক বলতে পারেন।

জীবনরাম বললেন—বাড়িটা বড় ঘুপ্‌সির মধ্যে হরিপদ, পাড়াটাও ভালো নয়।

হরিপদ বললে—ওই বাড়িরই ভাড়া আজ্ঞে পঞ্চাশ টাকা, আপনার যদি কৃপা হয়, তবে বাড়ি বদলাতে কতক্ষণ ? কলেজের মাইনে দু'মাসের বাকি পড়েছে, ছোট বোনটার অসুখ, ডাক্তারের খরচ দিতে পারে না। বড় ভাইটা কেবল রেস্ আর তাস খেলে বেড়ায়, আজকালকার বাজারে বাড়িভাড়া দিয়ে কলকাতা শহরে থাকতে কতো খরচ আপনি বলুন তো—

জীবনরাম বললেন—সকালবেলা দু'জন মোটরে করে কারা এসেছিল হরিপদ ? ওই যে খুব বিরাট একটা গাড়ি, দু'জন ভদ্রলোক—খুব বড়লোক বোধ হয়, হাতে ফুলের তোড়া।

ঠোঁট দিয়ে একটা অদ্ভুত শব্দ করে হরিপদ বললে—আরে রামো, বড়লোক

না হাতি, আপনার পায়ের যুগ্যি নয় ওরা স্যার, আপনাকে চিনতে পারলে ভয়েই পালিয়ে যেত, আমি তো দেখতে লাগলুম ওদের কাণ্ড—ফুল নিয়ে দিলে, দিনরাত এই সবই করছে, চকোলেট আনে, গয়না আনে, শাড়ি দেয়, কত জিনিস কিনে দেয়, ওরা সব দালাল স্যার···দালাল লেগেছে পেছনে। বুঝেছে যে বাড়িতে কোনোও পুরুষমানুষ নেই।

জীবনরাম বুঝতে পারলেন না।

—দালাল ? কিসের দালাল হরিপদ ?

—আজ্ঞে, সিনেমা কোম্পানির রেকর্ড কোম্পানির দালাল সব। হাজার টাকা মাইনে দিতে চায়, বলে—গাড়ি করে বাড়ি থেকে নিয়ে যাবো, দিয়ে যাবো। যেখানে যাবে, মা সঙ্গে থাকবে, ছ'টার পর ছুটি দেবো ; কত লোভ দেখায় ! আহা, ছোট মেয়ে তো, কতই বা বয়েস, এই শ্রাবণে আঠারোয় পড়েছে। লোভও হয়, একদিন হয়েছে কি জানেন, এক বায়োস্কোপ কোম্পানীর যে খোদ মালিক, সে-ই এসেছে গাড়ি করে, এসে বলে—অনিতা আমার মেয়ের মতো, ওর ভালো মন্দ আমারও ভালো-মন্দ—বলে মাকে তো রাজী করিয়েছে।

জীবনরাম যেন নিজের ব্যবসার একটা লোকসানের সংবাদ শুনে ভীষণ বিচলিত হয়ে উঠেছেন। বললেন—বল কি হরিপদ, রাজী করিয়েছে···সর্বনাশ করেছে, খবরদার খবরদার, ভদ্রলোকের গেরস্থ ঘরের মেয়ে—শেষকালে কি বায়োস্কোপে নাচবে নাকি ! ছি, ছি, তুমি থাকতে হরিপদ, ভদ্রলোকের মেয়ের এই গতি হবে, আর আমরা চোখ মেলে দেখবো !

হরিপদ বললে—ও তো তবু ভালো মশাই, আর একদিন হয়েছিলো কি জানেন না, ওদের কলেজের একটা চ্যারিটি শো-তে নাচতে গেছে, নাচ হচ্ছে স্টেজে, সোনাগড়ের কুমারবাহাদুর নাচ দেখে একেবারে পাগল—একেবারে পাগল মশাই। কী চেহারা ! রাজার ছেলে, হবে না কেন, যেমন রং তেমন গড়ন আর তেমনি মুখের কথা, একটা সোনার মেডেল দিলে অনিতাকে ; তারপর গাড়ি করে বাড়ি পৌঁছে দিলে।

জীবনরাম বললেন—বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে গেলো !

—তবে আর মজাটা হলো কি। শুনুন না বলি, ড্রাইভারকে দিয়ে খাবার কিনে আনালে, তারপর সবাই মিলে খাওয়া হলো, তার পরদিন এলো, আবার তার পরদিন এলো, এইরকম রোজ আসে। রাজার ছেলে, এরাও কিছু বলতে পারে না, শেষে একদিন দারোয়ান দিয়ে চুপ চুপি অনিতার নামে একটা পাঁচশো টাকার চেক পাঠিয়ে দিয়েছে···

জীবনরাম এবার সত্যিই বিরক্ত হয়ে উঠলেন। বললেন—বলা নেই কওয়া নেই, একেবারে পাঁচশো টাকার চেক ? খুব বড়লোক নাকি ?

—আরে রাম, ওকে বলেন আপনি বড়লোক, স্টেট তো উল্টে যেতো, কোর্ট-

অব-ওয়ার্ডে চলে গেছে। এখন রিসিভারের কাছ থেকে এক এক ছেলে মাসোহারা পায় দু'হাজার করে, কিন্তু চরিত্রহীন যারা, তাদের আপনার দু'হাজার টাকায় কি হবে বলুন স্যার ?

জীবনরাম উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলেন।

—তারপর সেই পাঁচশো টাকার চেকটা ?

—আজ্ঞে, চেকটা তো অনিতা নিলে, কিন্তু আমাকে না জানিয়ে তো কিছু করবে না, আমার ভারি রাগ হয়ে গেল স্যার, আমি ওর মাকে বললুম—এসব কী কাণ্ড ! গেরস্থ ঘরের মেয়ের নামে একেবারে টাকা পাঠানো, এ তো ভালো কথা নয়, এরপর কত কী হবে, হ্যাঁ বুঝতাম, দিতো এসে নিজে মা'র হাতে তুলে—যে তোমাদের অভাব, আমি কিছু সাহায্য করছি ইত্যাদি, সে এক আলাদা জিনিস।

জীবনরাম বললেন—এসব লোকদের বাড়িতে ঢুকতে দেওয়াই অন্যায় হয়েছে হরিপদ।

—না, এই যে সকালে আপনি আমাকে হাজার টাকা দিয়েছেন, আপনি তো অনিতার হাতেই দিতে পারতেন। তা না দিয়ে আমাকে দিলেন কেন ? আমি সেই টাকা নিয়ে সোজা অনিতার মাকে গিয়ে দিলাম ; বললাম—ভগবান কুণ্ডু-বাবুকে যেমন টাকা উপায় করবার মাথা দিয়েছেন, তেমনি দান করবার হৃদয়টুকুও দিয়েছেন। দুর্ভিক্ষের সময় পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ করে খিচুড়িখানা করেছিলেন, পরের জন্যে আপনি ফতুর—সত্যকথাই সব বললাম স্যার, বললাম —নাও, এই হাজার টাকাতে যতদিন চলে চালাও। তারপর কুণ্ডুবাবুর কাছে হাত পেতে কখনও কেউ হতাশ হয়নি।

জীবনরাম বললেন—আরো যদি টাকার দরকার থাকে তো আমাকে বলো হরিপদ।…তা ওদের সঙ্গে তোমার আলাপ হলো কেমন করে ?

—সে এক ইতিহাস স্যার, বেনেটোলা লেনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি—হঠাৎ দেখি, একটা চলন্ত ঘোড়ার গাড়ি থেকে একটা মেয়ে লাফিয়ে পড়লো, লাফিয়েই আমাকে দেখে আমার দিকে এসে আমাকে একেবারে জড়িয়ে ধরলো। অমন সুন্দর চেহারা, ভাবলুম—এ কি রে বাবা ! চেয়ে দেখি, গাড়ি থেকে আরো দু'জন লোক নেমে পড়লো ওর পেছন পেছন। কিন্তু আমাকে দেখে আর কাছে এগুলো না। আমি বললাম—কী হয়েছে ? মেয়েটা বললে—একলা বেরিয়েছিল, ওরা পেছন নিয়েছিল। তারপর নিরিবিলি দেখে এক সময়ে এক গলির মধ্যে জোর করে ওই গাড়িতে তুলে নিয়ে আসছিল, এইখানে সুযোগ পেয়ে মেয়েটা লাফিয়ে নেমে পড়েছে, তারপর বাড়িতে নিয়ে এলুম। আমার তো জানেন বউ নেই, ছেলেপিলে নেই—

জীবনরাম বললেন—চাকর সঙ্গে না নিয়ে বেরুনোই অন্যায়।

—আমার তো চাকর রাখবার সামর্থ্য নেই স্যার। আপনি আছেন, আপনি দেখুন, আপনার কৃপা হলে চাকর, দারোয়ান, গাড়ি, ঘোড়া সব হবে অনিতার।

সেইসব কথাই আজ বললাম অনিতাকে।

জীবনরাম প্রীত হলেন। বললেন—বললে নাকি হরিপদ?

—বললাম বৈকি স্যার, সবই বললাম অনিতাকে—বললাম কুণ্ডুবাবুর আর কে আছে, আপন বলতে তো কেউ নেই। বউ, ছেলে, মেয়ে সে তো সবারই থাকে কিন্তু সারা জীবন ব্যবসা নিয়েই মত্ত। অফুরন্ত টাকা দিয়েছে ভগবান, ভোগ করবার লোক নেই। তা একটু স্নেহ-ভালবাসা, একটু আদরযত্ন—এর জন্যেই কুণ্ডুবাবু আকুল।

জীবনরাম বললেন—তা ঠিকই বলেছো হরিপদ; ছোটবেলায় যেমন দুঃখ-কষ্ট পেয়েছিলাম বড় হয়ে তেমনি টাকার অভাব হয়নি, দু'হাতে টাকা উপায় করেছি। কোথা দিয়ে কী হচ্ছে বুঝতেই পারিনি, নজর ছিল কেবল কেমন করে ব্যবসা আরো বড় হবে। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত গদির উপর কাটিয়ে রাত্রে বাড়ি গিয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমিয়েছি, আবার সকাল হলেই উঠে গদিতে গিয়ে বসেছি, যেন এক ঘুমেই যৌবনটা কাটিয়ে দিয়েছি। এখন ঘুম ভেঙে গিয়ে দেখি, এ এক বিচিত্র জগৎ, কখন বয়েস হয়ে গিয়েছে টের পাইনি, এখন দেখছি কিছুই ভোগ করা হলো না, শুধু চিনির বলদের মতো টাকা উপায় করেই গেলাম। রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে কত জিনিসই নজরে পড়ে, মনে হয় কিছুই পাইনি। দু'একটা চুল পেকেছে মাথায়, কপালে খাঁজ পড়েছে, দাঁত নড়তে শুরু করেছে—তাই হঠাৎ বায়োস্কোপে গিয়ে থিয়েটারে গিয়ে সামলাতে পারি না। মনে হয়—আমার সব গেছে, আমি বাতিল হয়ে গেছি।

হরিপদ বললে—কী আর আপনার বয়েস হয়েছে স্যার এমন, এখনও দুটো বিয়ে করা চলে ও-বয়সে, অনিতা আপনার বয়েসের কথা জিজ্ঞেস করছিল সকালবেলা···

—তাই নাকি? তুমি কী বললে হরিপদ?— জীবনরাম প্রশ্ন করলেন।

—সত্যিকথাই বললাম স্যার, বললাম—আটত্রিশ পেরিয়ে উনচল্লিশে পড়বে এবার; তা পুরুষমানুষের আবার বয়েস, পয়সার জোরই আসল জোর, পয়সার জোর থাকলে পঞ্চাশ বছরেও ছোকরার মতো শক্তি থাকে।

পঞ্চাশ বছর বয়সের জীবনরাম কুণ্ডুকে চল্লিশ বছর বয়সের যুবকে পরিণত করাতে জীবনরামের মুখটা কেমন আনন্দে বিগলিত হয়েছে তাই দেখতে লাগলো হরিপদ। জীবনরামের কালো মুখের উপর ততোধিক কালো বসন্তের দাগগুলো যেন কুৎসিত ব্যাধির দাগের মতো দেখাচ্ছে। হরিপদ নিজের চোখের ক্রূরদৃষ্টিকে মোলায়েম করে জীবনরামকে দেখতে লাগলো।

সরলার শেষসময়ের কথাগুলো মনে পড়লো হরিপদর। মরবার আগে হরিপদ গিয়েছিল সরলাকে দেখতে।

সরলা বলেছিল—ওগো ওরা আমাকে একমুঠো চাল দেয়নি, আমার ছেলেটা

না খেতে পেয়ে মরলো, কত খোসামোদ করেছি—ওদের ভগবান শাস্তি দেবে না ?

সেই কথাটা ভাবতে ভাবতে মাথুরামের বেনারসী পানের দোকান থেকে মৃগনাভি-দেওয়া খিলি আনলে হরিপদ।

বললে—এই খিলিটা খান, দেখবেন, কেমন তাজা বোধ করছেন।

জীবনরাম বললেন—বোতলগুলো শেষ হয়ে গেছে, না আছে কিছু ?

—আজ্ঞে, আর খাবেন না, নইলে মুখ দিয়ে গন্ধ বেরুবে, মদটা অনিতা পছন্দ করেনা কিনা।

গাড়িটা ধর্মতলা স্ট্রীটের পাশ দিয়ে একটা গলির মধ্যে ঢুকলো। বাইরে সবে অন্ধকার হয়েছে। রাস্তায় লোকের ভিড়। চলমান জনতা। জীবনরাম উসখুস করছেন। হরিপদ চেয়ে দেখলে। ওষুধেব ফল হয়েছে।

উজ্জ্বল ফর্সা-রং একটি মেয়ে। চোখে মুখে ঠোঁটে এক অপূর্ব চাঞ্চল্য। দেহের চলাফেরাতে এক অদ্ভুত মাদকতা এনে দেয়—জীবনরাম কল্পনায় অনিতাকে দেখতে লাগলেন। সকালবেলায় একটু আলাপ করে এসেছেন। তার-পব রাত আটটায় যাবার কথা। অর্থ—প্রচুর অর্থ নিয়ে জীবনরাম করবেন কি—সব ব্যর্থ, যদি ভোগই না হলো। নির্জীব প্রাণহীন দেহ আর ভোগহীন জীবন—জীবনরামের কাছে যেন দুর্বহ হয়ে উঠেছে। 'জীবনরাম কুণ্ডু এণ্ড কোং'-এর গদিতে বসে যৌবন চলে গেছে অজ্ঞাতে, আজ লুপ্ত যৌবনকে আবার বুঝি ফিরে পেয়েছেন। কান-দুটো তাঁর গরম হয়ে এলো, চোখ-দুটো জ্বালা করে, সমস্ত শরীরে শিরায় শিরায় আজ লাল রক্ত চলাচল যেন নতুন করে আবার শুরু হয়েছে। জীবনরাম জোরে জোরে পান চিবুতে লাগলেন।

হরিপদর মুখটা উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো।

জীবনরাম বললেন—গাড়িটা বড় আস্তে আস্তে চলছে হে হরিপদ, একটু জোরে চালাতে বলো না।

হরিপদ জোরে হাঁকাবার হুকুম দিলে।

দুটো-তিনটে গলি পেরিয়ে গাড়িটা অন্ধকার একটা সরু গলির সামনে এসে দাঁড়ালো। অন্ধকার হয়েছে চারদিকে। গলির ভেতর গাড়ি ঢোকে না। গাড়ি থেকে নেমে হেঁটে যেতে হবে ভেতরে।

হরিপদ গাড়ি থেকে নেমে পড়লো। বললে—আপনি গাড়িতে বসুন স্যার, আমি আগে গিয়ে দেখে আসি।

হরিপদ নেমে গেলো। জীবনরাম দেখলেন, অন্ধকারের ভেতর হরিপদর চেহারা মিলিয়ে গেলো।

তারপর গাড়িতে হেলান দিয়ে একটা সিগ্রেট ধরালেন। অন্ধকারে সিগ্রেটের আগুনটা জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। বাইরে কোনো বাড়িতে কারা বুঝি উনুনে আগুন দিয়েছে···ধোঁয়ায় চোখ জ্বালা করছে। উত্তেজনায় জীবনরাম উন্মাদ হয়ে

উঠলেন।

কিন্তু হরিপদ আর আসে না! জীবনরাম আর একটা সিগ্রেট ধরালেন। ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখা যায় না, কিন্তু জীবনরামের মনে হলো—ধোঁয়ার কুণ্ডলী যেন পাকে পাকে অন্ধকারকে আঁকড়ে ধরেছে। সমস্ত ইন্দ্রিয় যেন তার দ্বিগুণ ক্ষমতা নিয়ে আজ সজাগ হয়ে উঠেছে। ইন্দ্রিয়গুলোর অনুভূতি আজ তীব্রতর হয়ে তাঁকে পীড়ন করতে লাগলো। জীবনরাম সেই অন্ধকার পরিবেশে গাড়িতে বসে বসে প্রতীক্ষার আলস্যে অসহ্য হয়ে উঠলেন। মনে হলো যেন মুহূর্তগুলো ধীর পদক্ষেপে তাঁর কাছে এসে অস্ত্রধারী মুমূর্ষু সৈনিকের মতো নিশ্চল হয়ে এলো। সময়ের পাখা যেন অপ্রত্যাশিত ব্যাধের আক্রমণে হঠাৎ থেমে গেছে। তাঁর মনে হলো যেন হরিপদ আর আসবে না।

কিন্তু হরিপদ খানিক পরেই এল।

বললে—মুশকিল হয়েছে স্যার, ওর এক দূর সম্পর্কের কাকা হঠাৎ এসেছে বাড়িতে।

যেন পাহাড়ের চূড়োয় উঠিয়ে কে তাঁকে সেখান থেকে ঠেলে নিচেয় ফেলে দিলো। বললেন—তা হলে দেখা হবে না?

—দেখা হবেনা কি মশাই! হরিপদ যখন আছে তখন আপনি কিছু ভাববেন না।

হরিপদ অভয় দিলে।

—কিন্তু একটা অসুবিধে হয়ে গেছে স্যার! কথা বলতে পারবেন না, চুপি-চুপি সব সারতে হবে, আর আলোও জ্বালাতে পারবেন না— বলে হরিপদ জীবনরামের মুখের দিকে উৎসুক হয়ে তাকালে।

—তা হোক, অন্ধকারই ভালো, কথা নাই-বা বললাম— জীবনরাম বললেন। জীবনরাম উত্তেজনায় তখন অস্থির হয়ে উঠেছেন।

—তাহলে চলে আসুন, আপনাকে চুপি-চুপি অন্ধকারে ঢুকিয়ে দেবো, অনিতা ওই ঘরেই আছে— বলে হরিপদ সামনের দিকে চলতে লাগলো। জীবনরাম পেছন পেছন গেলেন।

অন্ধকার গলি এঁকেবেঁকে গিয়েছে। জীবনরাম হরিপদর ছায়া অনুসরণ করে চললেন। এক জায়গায় এসে হরিপদ বললে—এই যে দরজা, এই ঘরে ঢুকুন। আলো জ্বালবেন না, তাহলে ওর কাকা টের পাবে, আমি বাইরে আছি···ডাকলেই সাড়া দেবো।

জীবনরাম অন্ধকার ঘরে ঢুকতেই কে যেন বাহুবেষ্টন করে তাঁকে আলিঙ্গন করলে···

অনেকক্ষণ পরে ঘর থেকে বেরুবার সময় জীবনরাম একটা সিগ্রেট ধরালেন।

দেশলাই-এর কাঠিটা জ্বালাতেই তার আলোয় হঠাৎ যেন সামনে ভূত দেখে চমকে উঠলেন তিনি। এ কে? কে এ? এতক্ষণ তবে···কিন্তু এ তো আনিতা নয়! মুখখানার সামনে আর একটা কাঠি জ্বালালেন। ভয়ে আঁতকে উঠলেন জীবনরাম। মুখখানা বিকৃত, নাকের ওপর ফুটো হয়েছে, মাংস গলে পচে ঝুলছে, চুল উঠে গেছে আধে'ক···কুষ্ঠ, কুষ্ঠব্যাধি! এতক্ষণ কুষ্ঠরোগীর বাহুবেষ্টনে তাঁর সময় কেটেছে নাকি! জীবনরামের ঠোঁটে মুখে সমস্ত শরীরে কৃমির মতন যেন কতকগুলো পোকা কিলবিল করতে লাগলো। জীবনরাম নিরুপায় হয়ে আর্তনাদের মতো চীৎকার করে ডাকলেন—হরিপদ, হরিপদ······

জীবনরামের কণ্ঠস্বর সেই অপরিসর ঘর আর সংকীর্ণ গলির দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে এলো শুধু······

হোলি ওয়াটার

টিপলার সাহেবের গল্পটা মহারাজগঞ্জে গিয়ে শুনেছিলাম। কিন্তু আজো, যখন চলতে চলতে কোথাও থামি, ক্লান্ত হয়ে কোথাও বসি দু'দণ্ড, আড্ডা দিতে দিতে কখনও মাত্রা ছাড়িয়ে যাই, তখনই টিপলার সাহেব আর শনিচরিয়ার গল্পটা মনে পড়ে যায়। আর সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে আঁতকে উঠি। মনে হয় টিপলার সাহেবের মতো আমিও পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে বেরিয়ে বুঝি 'হোলি ওয়াটার' খেয়ে লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হয়ে পড়লাম। শনিচরিয়ার মতো একদিনের চাকরি করতে এসে মন-প্রাণ বিকিয়ে দিয়ে ফেললাম, একেবারে সর্বস্বান্ত হয়ে গেলাম। মনে হয় টিপলার সাহেবের মতোই বুঝি সোজা রাস্তায় চলতে চলতে পথ ভুলে আমিও মহারাজ-গঞ্জে এসে তলিয়ে গেলাম।

কিন্তু তখনকার মহারাজগঞ্জ এমন ছিল না। এখন তো একত্রিশটা সাইকেল-রিকশা, পাঁচখানা ট্যাক্সি, তিপ্পান্নটা দোতলা-বাড়ি, হাসপাতাল, বিড়ি-ফ্যাক্টরি কত কি হয়েছে। রাস্তায় ইলেকট্রিক লাইট, পানের দোকানে রেডিও বাজে। সিনেমা আর সার্কাস কোম্পানী তাঁবু ফেলে কয়েকদিন খুব মাতিয়ে দিয়ে যায়। দোকানে গিয়ে দাড়ি কামাবার ব্লেড, টর্চের ব্যাটারি—কী পাবেন না? হোটেলও একটা হয়েছে। আগে থেকে খবর দিলে গাধার দুধ পর্যন্ত যোগাড় করে দেয় হোটেলওয়ালা।

ম্যানেজার বটুক চাটুজ্যে বলেছিলেন—আপনি শুধু মুখের কথাটি খসান না মশাই, দেখবেন মাল একেবারে আপনার ঘরের ভেতরে এসে হাজির।

অথচ যেদিন প্রথম মহারাজগঞ্জে গেলাম, হোটেলের খাতায় নাম লেখালাম, সেদিন তেমন আমলই দেননি। খদ্দের না খদ্দের! বোর্ডার না বোর্ডার! অমন বোর্ডার হামেশা আসছে মশাই এখানে। সবে-ধন-নীলমণি এই হোটেল—এখানে না উঠে যাবে কোথায়! আসতেই হবে এখানে। খাতায় নাম লেখাতে হবে সবিস্তারে। শুধু নাম নয়, ধাম, নিবাস, পিতার নাম, উদ্দেশ্য, পেশা—

ওই পেশাতে এসেই আটকে গেলেন বটুক চাটুজ্যে।

বললেন—মশাই-এর কী করা হয়?

বললাম—কিছু না।

বটুক চাটুজ্যে অবাক হয়ে এতক্ষণে আমার দিকে চাইলেন।

বললেন—বলেন কি মশাই, কিছুই করেন না? চলে কী করে?

এবার চুপ করে রইলাম।

বটুক চাটুজ্যে নিজে থেকেই বললেন—কিছু করেন না অথচ বেড়াতে এসেছেন—পৈতৃক জমিদারী আছে বুঝি?

বললাম—না।

আমার উত্তর শুনে আরো অবাক হয়ে গেলেন বটুক চাটুজ্যে। তাঁর মুখ দিয়ে কোনও কথা বেরোলো না। একবার আমার চেহারার দিকে চেয়ে আমার পোশাক-পরিচ্ছদ থেকে পেশাটা অনুমান করতেও চেষ্টা করলেন। আমার মালপত্রগুলোর দিকে চেয়েও বিশেষ কিছু বুঝতে পারলেন না। শেষে কি জানি খাতায় কী লিখলেন! তা নিয়ে আমার আর মাথা ঘামাতে হয়নি।

কিন্তু ক'দিন পরে হাওয়া একেবারে উল্টে গেল।

একদিন সকালবেলা লিখতে বসেছি নিজের ঘরে। টেবিলে, চেয়ারে, বিছানায়, চারিদিকে বই ছড়ানো। হঠাৎ দরজা দিয়ে উঁকি দিলেন বটুক চাটুজ্যে।

বললেন—আসতে পারি স্যার?

বললাম—আসুন।

বটুক চাটুজ্যে ঘরে ঢুকলেন। কিন্তু এ-চেহারা যেন অন্যরকম। চলা-বলায় হাব-ভাবে যেন হর্ষ-বিনয়-কৌতূহল।

বললেন—আপনি যে গপ্পো লেখেন তা তো আগে বলেননি মশাই!

বটুক চাটুজ্যের মুখ বিনয়ের হাসিতে ভরে উঠলো; বললেন—অবিশ্যি আপনার এই বই-এর গাঁদা দেখেই তা আন্দাজ করেছিলাম, আর তা ছাড়া লেখক-দের কখনও তো চোখে দেখিনি কিনা—

তার পর বললেন—তা একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করতাম। করবো? আপনি কিছু মনে করবেন না তো?

বললাম—মনে করবো কেন—বলুন না—

বটুক চাটুজ্যে বললেন—মানে, চোখে লেখকদের না দেখলেও, আপনাদের হালের লেখা গপ্পোর বই তো কিছু কিছু পড়েছি মশাই—তা একটা কথা আমার জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হচ্ছে ভারি—

আবার অভয় দিলাম।

বললাম—বলুন না আপনি।

বটুক চাটুজ্যে বললেন—আচ্ছা, মানে, আপনারা এই যে গপ্পো লেখেন সব—এসব কি বই দেখে দেখে লেখেন?

এ-কথার কোনও জবাব দিতে পারলাম না। তবু বললাম—এ ধারণা আপনার হলো কেমন করে?

বটুক চাটুজ্যে বললেন—হালের গপ্পোর বইগুলো পড়ে আমার তাই তো মনে হয় মশাই—বই দেখে দেখে না লিখলে গপ্পোগুলো এমন হবে কেন? সংসারে যা দেখি, সংসারে যা ঘটে, তার সঙ্গে কোথাও মেলেনা কেন তার—

সত্যিই, কথাটা ভাববার মতো!

তারপর একটু থেমে বললেন—এই দেখুন না, আজ ছ'বচ্ছর ম্যানেজারি-

করছি এই হোটেলে, কতরকম ঘটনা ঘটতে দেখলুম, কত ঘটনা ঘটতে শুনলুম, বয়েসও কম হলোনা মশাই, কিন্তু তেমন ঘটনা তো বই-এর গপ্পোতে ঘটে না। গোড়াটা আরম্ভ হয় ঠিকই—কিন্তু…এই মহারাজগঞ্জের টিপলার সাহেবের গপ্পোর মতো গপ্পোও তো কই পড়িনি—তেমন ঘটনা নিয়েও তো আপনারা কেউ লেখেন না।

বললাম—টিপলার! টিপলার সাহেব কে?

বটুক চাটুজ্যে এবার জুৎ করে নড়ে বসলেন চেয়ারে। বললেন—আহা, সাহেবের মতো সাহেব ছিল বটে মশাই টিপলার সাহেব! টিপলার সাহেব বলতো—চাটুজ্যে, ও লন্ডনই বলো আর প্যারিসই বলো, মিউনিক, বার্লিন, আর তোমাদের কাশ্মীরই বলো, এই মহারাজগঞ্জের তুল্য দেশ কোথাও নেই—এ একেবারে প্যারাডাইস যাকে বলে,— (প্যারাডাইস মানে স্বর্গ—বুঝলেন তো!)—

তা টিপলার সাহেবের গপ্পটা গোড়া থেকে সবটা বলি শুনুন। তখন তো আর মহারাজগঞ্জ এইরকম ছিল না। মাছি ভন্‌ভন্ করতো চারিদিকে। রাস্তার দু'পাশে এঁদোপড়া নর্দমা। মোষের আর গরুর গাড়ি চলে চলে রাস্তার দফা একেবারে রফা। হাঁটে কার সাধ্যি! সাইকেল চালাই আর মাঝে মাঝে সাইকেল কাঁধে করে নিয়ে হাঁটতে হয়। বাজারে তখন মাত্র দু'খানা টিনের চালা। একটা আবগারির দোকান আর একটা দিশী ভাঁটিখানা। তা এইরকম যখন অবস্থা তখন একদিন টিপলার সাহেব এই মহারাজগঞ্জে এসে হাজির।

তখন সন্ধ্যে হবো-হবো। আমরা তিন বন্ধু—আমি, কেদার আর তারক আবগারির দোকানের পৈঁঠেতে বসে বসে জটলা করছি। রোববার দিন কোথায় মাছ ধরতে যাওয়া যায় তাই ভাবছি। সময় তো কাটাতে হবে মশাই। আমাদের তখন হাতে তো অফুরন্ত সময়।

তারক বললে—ভুলুবাবুর বাগানে চল্—ইয়া বড় বড় মাছ পুকুরে দেখেছি ঘাই দেয়—

ভুলুবাবু জনকপুরের জমিদার। নীলকুঠির প্ল্যাস্টার বুচার সাহেব যখন সব সম্পত্তি-টম্পত্তি বেচে বিলেত চলে গেল তখন ভুলুবাবু সস্তা দরে বাগানটা কিনে নিয়েছিলেন। সেই থেকে পড়েই আছে। তারকের কাছে চাবি থাকে বাগানের। পেয়ারা পাকলে পেড়ে খাই। মাছ ধরবার ইচ্ছে হলে ধরি। আর অন্য কোনও দরকার হলেও তারক চাবি খুলে দেয়।

কথাটা বলেই তারক বললে—দে, তবে আর একটা বিড়ি দে।

কেদার বললে—তা হলে শনিচরিকে বলতে হবে চার বানাতে—

দেহাতী মেয়ে শনিচরি ছিল বড় চালাক-চতুর মেয়ে। ভুলুবাবুর বাগানের আশপাশ থেকে তাল, বেল, পেয়ারা কুড়িয়ে এনে আবার আমাদেরই বেচতো। বলতো—চার আনা পয়সা দিতে হবে কিন্তু বাবু—

পয়সার যম ছিল মাগী। পয়সা ছাড়া কথা নেই মুখে। কেউ যদি জিজ্ঞেস করতো—বেরিলিগঞ্জের রাস্তাটা কোন্ দিকে বলতে পারিস ছোকরি ?

শনিচারি বলতো—আগে পয়সা দে, তবে বলবো—

তা পয়সাও আমরা দেবো না শনিচরিকে, অথচ মাছ ধরবার চারও পাওয়া চাই—কী করলে তা সম্ভব, তাই আমরা আবগারির দোকানের পৈঁঠেতে বসে ভাবছিলাম। হঠাৎ ফট্ ফট্ শব্দ করতে করতে সেই ভর্-সন্ধ্যেবেলা মশাই একটা মটর-সাইকেল চড়ে টিপলার সাহেব এই মহারাজগঞ্জে এসে হাজির।

আমরা তো সাহেব দেখে অবাক।

সাহেবটা তড়াক করে সাইকেল থেকে নেমে আমাদের কাছে এসে বললে—এখানে রেস্ট-হাউসটা কোন্ দিকে বাবু ?

রেস্ট-হাউস ! বলে কী সাহেবটা ! একটা আড্ডা দেবার মতো চায়ের দোকান নেই এখানে, তায় আবার রেস্ট-হাউস ! তখন আমাদের আস্তানার অভাবে মাঠে ঘাটে আড্ডা দিয়ে বেড়াতে হয়। গাছতলাই আমাদের আড্ডাস্থল। এ হোটেল তখন কোথায় ! আর বেহারীরা তখন চা-ই খেতে শেখেনি। গোবিনপুরের ভূষণ ঠাকুর একটা চায়ের দোকান করবার চেষ্টা করেছিল বাজারের মধ্যে। স্টার্টও করে দিয়েছিল। কিন্তু দু'মাস যেতে না-যেতেই উঠে গেল আমাদের আড্ডা। সব বাকির খদ্দের কিনা !

তা তারক একটু ইংরিজী জানতো। সে-ই এগিয়ে গেল সাহেবের সামনে।

বললে—এখানে মহারাজগঞ্জে রেস্ট-হাউস পাবে কোথায় সাহেব—রেস্ট-হাউস আছে বেরিলীগঞ্জে—

বেরিলীগঞ্জ ! মোটাসোটা বুট পায়ে, গায়ে মোটা গেঞ্জি, পরনে হাফ্-প্যান্ট—মাথায় টুপি, চোখে গগলস্ ! আবার কাঁধে ঝুলছে ক্যামেরা। সাহেব ব্যাগ থেকে ম্যাপ্ বার করে দেখতে লাগলো কোথায় বেরিলীগঞ্জ ! এখান থেকে কত দূরে।

কেদার সাহস পেয়ে ততক্ষণে সামনে এগিয়ে গেল। আমিও গেলাম।

তারক বললে—বেরিলীগঞ্জ এখান থেকে দেড়শো মাইল দূর—রাস্তা খারাপ, সেখানে পৌঁছতে তোমার রাত তিনটে বাজবে সাহেব—

কথাটা শুনে টিপলার সাহেব কী যেন ভাবতে লাগলো।

তারক আবার বললে—আর পথে বুনো শুয়োর আছে—ফট্-ফটিয়ার আওয়াজ পেলে তোমার পেট দু'ফালা করে ছেড়ে দেবে সাহেব !

শুনে সাহেব আরো চিন্তিত হলো।

তারক বললে—কোত্থেকে তুমি আসছো সাহেব ?

টিপলার সাহেব বললে—ডেনমার্ক।

ডেনমার্ক ! সে আবার কোথায় ! আমি তারকের মুখের দিকে তাকালাম।

তারক ইংরিজী জানে।

জিজ্ঞেস করলাম, সে কোথায় রে তারক ?

তারক বললে—চুপ কর না, শুনছিস বিলেত থেকে আসছে।

কেদার বললে—তারক, একটু তোয়াজ-টোয়াজ কর মাইরি, খাঁটি সাহেব-বাচ্ছা, চাকরি করে দিতে পারে আমাদের।

টিপলার সাহেব আবার বললে—আমি ওয়ার্ল্ড ট্যুরিস্ট—পৃথিবী ঘুরতে বেরিয়েছি—

তারক জিজ্ঞেস করলে—কোথায় কোথায় ঘুরেছ ?

সাহেব বললে—চার বছর আগে ডেনমার্ক থেকে বেরিয়েছি, য়ুরোপ ঘুরে, আফ্রিকায় গিয়েছিলাম—তারপর ডাবলিন থেকে জাহাজে চড়ে ওখা পোর্টে নেবে ওয়েস্ট ইন্ডিয়া, নর্থ ইন্ডিয়া, সেন্ট্রাল ইন্ডিয়া ঘুরে এবার সাউথে যাবো—

তারকের মুখে-চোখে গদ-গদ ভাব। তাড়াতাড়ি রুমাল দিয়ে পৈঁঠেটা ঝেড়ে দিয়ে বললে—এখানে একটু বোসো সাহেব—

টিপলার সাহেব পকেট থেকে সিগারেট বার করে আমাদের দিলে। তার পর নিজেও একটা ধরালে।

তারক বললে—তা পৃথিবী ঘুরতে বেরিয়েছ সাহেব, কিন্তু এত দেশ থাকতে মহারাজগঞ্জে এসে পড়লে কী করে ? মহারাজগঞ্জ তো পৃথিবীর বাইরে।

টিপলার সাহেবও হাসলে।

বললে—পথ ভুলে এসে পড়েছি বাবু—স্রেফ পথ ভুলে। পথে খুব ঝড়-বৃষ্টি হলো—ধুলোর ঝড় উঠলো আর কিচ্ছু দেখতে পেলুম না চোখে—

কেদার বললে—তারক, এইবার চাকরির কথাটা বল মাইরি।

টিপলার সাহেব বললে—তা এখানে কোন য়ুরোপীয়ান নেই ? কোনও প্ল্যান্টার—শুনেছিলাম বেহারে অনেক প্ল্যান্টার্স থাকে—আমাদের স্বজাতি—

তারক বললে—ছিল এখানে একজন সাহেব, তা সে বুচার-সাহেব তো জমি-জমা বাগানবাড়ি বিক্রী করে দিয়ে কবে পাততাড়ি গুটিয়েছে—তার নীলের কুঠি ছিল, সে-ও ভুলুবাবু কিনে নিয়েছে—এখন সেখানে দুব্বো-ঘাস গজায় কেবল।

টিপলার সাহেব বললে—তা যে-কোনও একটা ঘর হলেই চলবে—একটা তো রাত শুধু থাকবো—তার পর কাল চলে যাবো পাটনায়।

তার পর একটু থেমে বললে—তার পর পাটনা থেকে বেঙ্গল আসাম দেখে চলে যাবো স্ট্রেট্ সাউথে।

কেদার বললে—তারক, আর দেরি করিসনি মাইরি, চাকরির কথাটা বল, অন্তত একটা ক্যারেকটার সার্টিফিকেট—সাহেবদের সার্টিফিকেটের দাম আছে ভাই।

তারক বললে—দিতে পারি ঘর তোমাকে সাহেব—কিন্তু পাঁচটাকা ভাড়া

লাগবে একদিনের জন্যে—

টিপলার সাহেব বললে—ভেরি গুড্—

ভুলুবাবুর বাগানবাড়িটা তো পড়েই আছে এমনিতে। শুধু দুব্বো-ঘাস গজাচ্ছে। কোনও কাজে লাগে না। না হোমে না যজ্ঞে। ভুলুবাবুও টাকার ক্রোকোডাইল।

তারক আমাদের বললে—পাঁচটা টাকাই তো আমাদের লাভ—অনেকদিন তো ও-সব ইয়ে খাইনি—

কেদার বললে—কেন মাইরি তারক তুই টাকা চাইতে গেলি, শেষকালে হয়তো ক্যারেকটার সার্টিফিকেট দিতে চাইবে না—

তারক বললে—তুই থাম তো, ভ্যাজর-ভ্যাজর করিস্‌নি, সাহেব দেখলেই তোর জিব দিয়ে নাল পড়ে—দ্যাখ্-না কী করি—

টিপলার সাহেব বললে—আর, একটা সারভেন্ট যোগাড় করে দিতে পারো বাবু,—টাকা দেবো, আমার মোজা-গেঞ্জি-রুমাল সব ময়লা হয়ে গিয়েছে—একটু সাবান দিয়ে কেচে দেবে—খানা বানিয়ে দেবে—

তারক বললে—কত টাকা দেবে ?

টিপলার সাহেব বললে—যা চায়—

তারক বললে—মেড-সারভেন্ট হলে চলবে ? মানে, ঝি—

টিপলার সাহেব বললে—যা হয় তাই সই—

তা তাই হলো। থাকবার ব্যবস্থা হলো ভুলুবাবুর বাগানবাড়িতে। একটা রাত শুধু থাকবে সাহেব। বুচার সাহেবের খাট বিছানা চেয়ার টেবিল আয়না সবই আছে। শুধু ধুলো জমে খারাপ হয়ে আছে। আমরা গিয়ে সব পরিষ্কার করে দিলাম। একটা রাত তো শুধু থাকা। কাল সকালবেলা খাওয়া-দাওয়া সেরে বিকেলের দিকে রওনা দেবে সাহেব। জীবনে আর দেখা পাওয়া যাবেনা তার।

সাহেব বললে—ইণ্ডিয়া দেখে চলে যাবো চায়না, চায়না থেকে জাপান, তার পর জাপান থেকে আমেরিকা—তার পর নিজের বাড়ি—

কেদার বললে—তা হলে সার্টিফিকেটটা আজই নিয়ে নে তারক—

তারক বললে—তুই থাম তো—বড় তাড়াহুড়ো করিস—এসব কাজে তাড়াহুড়ো করলে চলে না—

সাহেব বললে—একটা দিন শুধু মিছিমিছি এই মহারাজগঞ্জে পথ ভুলে এসে নষ্ট হয়ে গেল—

যে টিপলার সাহেব একদিন একটা দিন নষ্ট হয়ে গেল বলে হা-হুতাশ করেছিল, আশ্চর্য, সেই টিপলার সাহেবই শেষকালে……

তা সে কথা এখন থাক মশাই। ভুলুবাবুর বাগানবাড়িতে সাহেবের তো

থাকবার ব্যবস্থা হয়ে গেল। খাবার সাহেবের সঙ্গেই ছিল। পাঁউরুটি আর শুকনো মাংস। সেই খেয়েই রাতটা কাটালো।

কিন্তু কথাটা শনিচরিকে বলতেই শনিচরি বললে—টাকা আমার আগাম চাই কিন্তু—

তারক বললে—তা সাহেব কি তোকে টাকা না দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে ছুঁড়ি?

সাহেব শুনে বললে—টাকাটা আগামই দিয়ে দাও না—এই নাও টাকা— বলে একটা দশটাকার নোট এগিয়ে দিলে শনিচরির হাতে।

শনিচরি তবুও খুশী নয়। বললে—কিন্তু এই সাবান কাচা আর ঘর ঝাঁট দেওয়া, আর সকালবেলার রান্না ছাড়া আর কিচ্ছু করবো না—তা বলে রাখছি—

কেদার বললে—খাঁটি বিলিতি সাহেব, তাকে চটাচ্ছিস, তুই কি ভাবছিস তোর ভালো হবে এতে?

শনিচরি বললে—আমার ভালো আমি বুঝবো—তোদের কী!

তারক বললে—টাকাটাই তোর কাছে সব হলো রে, আর একটা অতিথি এখেনে এসে যে অনাথ হয়ে পড়লো, তার জন্যে তোর একটা দয়া-মায়া নেই—এমন পিশাচ তুই শনিচরি।

শনিচরি বললে—গতর আছে বলেই তো আমার এত খাতির, যখন গতর থাকবে না, তোরা খেতে দিবি?

তার পর শনিচরি বললে—কিন্তু একটা কথা বলে রাখছি—সাহেবের এঁটো আমি ছোঁব না।

তারক বললে—সে কি রে, তা হলে সাহেবের বাটি থালা গেলাস কে মাজবে?

শনিচরি বললে—যে মাজে সে মাজবে—আমি পারবো না—

—তা হলে কে মাজবে বল? ও তো আর কাঁসার থালা নয়, চিনেমাটির ডিস্—সাবান ঘষে শুধু পরিষ্কার করে দিবি—

শনিচরি বললে—না বাবু, জাত আমি দিতে পারবো না টাকার জন্যে। টাকার জন্যে আর সব দিতে পারি, জাত দিতে পারবো না—হাজার টাকা দিলেও না।

তাই এখনও ভাবি মশাই। কোথায় থাকে জাতের বড়াই, কোথায় থাকে টাকার গরম আর কোথায় থাকে গতরের ঠ্যাকার! শনিচরিকে এখনও বাজারের দিন দেখতে পাই কিনা। কাঁঠাল গাছের তলায় করলা উচ্ছে শিম নিয়ে বেচে। বুড়ি থুত্থুড়ি হয়ে গেছে। মাথায় পাকা চুলে তেলও পড়ে না আজকাল। দেহাতী মাগীদের সঙ্গে আকাশ ফাটিয়ে ঝগড়াও করে, আবার এখানকার সুগার-মিলের সাহেবদের সঙ্গে গড়-গড় করে ইংরিজিও বলে…

তা সে-কথা পরে বলবো অখন।

আমরা তো টিপলার সাহেবের থাকা-খাওয়ার সব বন্দোবস্ত করে যে-যার

বাড়ি ফিরে এলাম। আসবার সময় টিপলার সাহেব অনেক থ্যাঙ্কস দিলে। ধন্য-বাদ দিয়ে আমাদের একেবারে ভাসিয়ে দিলে।

বললে—বাবুরা, কালকে এখানে তোমাদের লাঞ্চের নেমন্তন্ন রইল সব—ঠিক বারোটার সময় আসবে সবাই—ঠিক আসবে—ভুলো না যেন।

কেদার বললে—তারক তুই দেখছি, সব গুবলেট্ করে দিবি—কালকে কি আর সময় হবে অত—খেয়ে উঠেই তো চলে যাবে সাহেব।

তারক বললে—তা কাল তোর ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট পেলেই তো হলো?

কেদার বললে—ওই সার্টিফিকেটটার জন্যেই আমার সুগার-মিলের চাকরিটা আটকে যাচ্ছে ভাই—

ভগবানের পৃথিবীতে মশাই কার ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট কে দেয় কে জানে! দিন-দুনিয়ার মালিক ছাড়া কিছু দেনেওয়ালা তো কাউকে দেখলাম না। তবে আপনারা লেখক মানুষ আমার চেয়ে বেশি জানেন। তা তখন আমাদের হাতে পাঁচটা টাকা এসে গেছে।

তারক পাঁচটা টাকা বাজাতে বাজাতে বললে—মুফত পাঁচটা টাকা তো রোজগার হলো—চল বাজারে—

বাজারে মানে···। তবে আপনাকে খুলেই বলি মশাই, সেই বয়েসেই আমরা একটু বে-এক্তিয়ার হয়ে পড়তুম মাঝে মাঝে। সোমলতা চেনেন? সোমলতার নাম শুনেছেন? যার থেকে সোমরস হয়? আমরা ছোটবেলায় বাঙলা দেশেই ছিলুম। আমার কাকা ছিল মস্ত কবিরাজ। সংস্কৃত জ্ঞান ছিল খুব। কাকার কাছে শুনেছি—সোমকে নাকি ওষধিপতি বলা হয় শাস্ত্রে। শাস্ত্র-টাস্ত্র তো জীবনে পড়িনি মশাই। শুধু শুনেই এসেছি কাকার মুখে। দেবতারা নাকি সোমরস পান করতেন। সোম খেয়ে দেবরাজ ইন্দ্রের গায়ে এমন জোর হলো যে তিনি নাকি বৃত্রকে শুধু হারিয়ে দিয়েছিলেন তা-ই নয়—বধও করেছিলেন। ঋষিরাও সোম খেতেন। বেদে নাকি লেখা আছে সোমরস খেলে অমর হওয়া যায়। অমরতা দিতে পারে বলেই সোম-যজ্ঞের এত মাহাত্ম্য। তাই সোমেরই আর এক নাম অমৃত। ঋষি কাশ্যপ এই সোমকেই উদ্দেশ্য করে স্তোত্র লিখেছিলেন—যত্রানু-কামং চরণং···সব মনে নেই মশাই—অর্থাৎ মোদ্দা কথা এই যে, সেই তৃতীয় দ্যু-লোকে যেখানে যথাকাম মুক্তভাবে বিচরণ করা যায়, যেখানে লোকসকল জ্যোতি-ষ্মান সেইখানে হে সোম, তুমি আমাকে অমৃতপদ দাও—

তা আমি মশাই ও-সব সোমলতা-টতা বলে কিছু দেখিনি, সোমরসও খাই-নি,—আমাদের এখানে এই মহারাজগঞ্জে মহুয়া বলে একরকম জিনিস পাওয়া যায় তা থেকে একরকম মদ হয়, আমবা তা খেতাম মশাই। খেলে অমর হওয়া যায় বলে কখনও শুনিনি। তবে খেতে ভালো লাগে বলে খেতাম। আমরা দেবতাও নই ঋষিও নই—শুধু বেকার বখাটে ছেলে তখন। চাকরি-বাকরি নেই, কাজ

পেলুম তো বেঁচে গেলুম। এমনি অবস্থা।

সেদিন তো আমাদের তিনজনের সেই পাঁচ টাকাতে মন্দ কাটলো না।

পরদিন বেলা বারোটার সময় ভুলুবাবুর বাগানে গেলাম তিনজনে। টিপলার সাহেব দাড়ি কামিয়ে মুখ চুনকাম করে ফরসা কোটপ্যান্ট পরে তো আমাদের অভ্যর্থনা করলে।

সাহেব বললে—আজ শনিচরিকে তোমাদের ইন্ডিয়ান খানা তৈরি করতে বলেছি বাবু—কিন্তু একটা মুশকিল হয়েছে—

দেখলাম টিপলার সাহেবকে অপরূপ সুন্দর দেখাচ্ছে। চব্বিশ-পঁচিশ বছর বয়েস। সুন্দর স্বাস্থ্য, টক্ টক্ করছে ফরসা গায়ের রঙ।

শনিচরি তখন রাঁধছিল। মাংস রান্নার গন্ধ বেরুচ্ছে। পোলাও রান্না হয়েছে। পেঁয়াজ রসুন, মশলার গন্ধ।

শনিচরি বললে—আমি রান্না-টান্না করে দিলাম, কিন্তু বাসন-কোসন ধোবার জন্যে যেন আমায় বলিসনি তোরা—

বললাম—কেন, তুই-ও তো মাংস পোলাও খাবি শনিচরি—

শনিচরি রেগে গেল। বললে—আমি ও-সব খাই ?

—খাসনি তো আজ খা। খেলে আর ভুলতে পারবি না জীবনে।

শনিচরি আবার মনে করিয়ে দিলে আমাদের—আমি কিন্তু বিকেল হবার সঙ্গে সঙ্গে চলে যাবো—তা বলে রাখছি এইবেলা।

সবাই খেতে বসলাম। সাহেব বললে—তোমরা আমার অতিথি—কিন্তু তোমাদের আমি ভালো করে অতিথি-সৎকার করতে পারলুম না বাবু—আমি দুঃখিত—আমার সঙ্গে ব্রান্ডি যা ছিল সব ফুরিয়ে গেছে—কিন্তু ড্রিংক বাদ দিয়ে তো লাঞ্চ হয় না—

কি আর করা যাবে।

টিপলার সাহেব আবার কী যেন একটু ভেবে নিয়ে বললে—আচ্ছা, তোমাদের এখানে ও-সব কিছু পাওয়া যায় না ?

তারক না-বোঝবার ভান করলে।

বললে—কী ?

টিপলার সাহেব বললে—ড্রিংকস !

তারক মুচকি হেসে আমার দিকে চাইলে।

কেদার বললে—এইবার সেই ক্যারেকটার…

তারক বললে—তুই থাম, ড্রিঙ্ক খেয়ে যদি ক্যারেকটার ঠিক থাকে তো তখন দেখা যাবে।

তারপর টিপলার সাহেবের দিকে চেয়ে বললে—ড্রিংক আছে সাহেব, কিন্তু সে-সব দিশী মাল, তোমার কি চলবে ?

টিপলার সাহেব বললে—আমার না-চলে না-চলবে—তোমরা আমার অতিথি, তোমাদের চললেই হলো—জিনিসটা কী ? কাশ্মিরি ?

তারক বললে—হ্যাঁ সাহেব, একেবারে খাঁটি কাশ্মিরি, মহুয়া। মহুয়ার থেকে তৈরি—

অগত্যা যেন উপায় না পেয়েই টিপলার সাহেব বললে—তা তাই আনো।

শনিচরিকে টাকা দিলে টিপলার সাহেব। এসে গেল মহুয়া।

তারক বললে—তুমি এ খাবে না সাহেব ?

টিপলার সাহেব বললে—আমার কাশ্মিরিটা সহ্য হয় না বাবু—তবে একটু ছোঁব সামান্য—নইলে তোমরা হয়তো কী মনে করবে—

আমরা সবাই নিলাম। কালকে রাত্তিরেও বেশ হয়েছে। আজকেও হলো। পর-পর দুদিনই ফোকোটে। পরের পয়সায়।

টিপলার সাহেব জিজ্ঞেস করলে—কেমন লাগছে ?

তারকের মুখ দিয়ে শুধু একটা আওয়াজ বেরোল—আঃ—

তারক বললে—তোমাকে একটু দেবো সাহেব ? একটু চেখে দেখবে ?

টিপলার সাহেব বললে—না না আমাকে দিও না, তোমরাই খাও—তোমাদের জন্যেই এনেছি বাবু—শেষকালে আমি এক ফোঁটা নেব অখন—

টিপলার সাহেব মাংস খেতে খেতে বললে—ড্রিঙ্ক আমি বেশি করি না বাবু, আমার বাবা মদ খেয়ে খেয়ে মরে গেছে, এত মদ খেত যে লিভার পচে গিয়েছিল, তাই মা আমাকে সাবধান করে দিয়েছিল, যেন বেশি না খাই —

তার পর বললে—আফ্রিকায় গিয়ে অনেক জায়গায় ব্রান্ডি হুইস্কির অভাবে দিশী খেতে হয়েছে কিন্তু ও-খেলেই আমার বড্ড মাথা ধরে, ও আমার পেটে সহ্য হয় না—

তারক বললে—তবু একটুখানি নাও সাহেব! এক যাত্রায় পৃথক ফল কেন হবে আর— বলে টিপলার সাহেবের গেলাসে ঢেলে দিতে যাচ্ছিল।

টিপলার সাহেব হাঁ হাঁ করে উঠলো—অতো না, অতো না—সামান্য দাও বাবু—এক ফোঁটা—

তা এক ফোঁটা কি আর সত্যি সত্যি দেওয়া যায়।

টিপলার সাহেব বললে—বড় বেশি দিয়ে ফেললে—নষ্ট হবে, আমার মাথা ধরবে—

তার পর অত্যন্ত সংকোচে টিপলার সাহেব গেলাসে একটু চুমুক দিলে। যেন নাক মুখ বুঁজে তেতো ওষুধ খাচ্ছে। কিন্তু দেখলাম মশাই, আস্তে আস্তে মুখ-চোখের ভাব বদলে গেল। মুখে হাসি বেরোল যেন। আবার চুমুক দিলে। আবার। আবার!

টিপলার সাহেব বললে—আরে, এ যে হোলি ওয়াটার—আর একটু দাও

বাবু— বলে টিপলার সাহেব হেসে উঠলো।

তারক আরো ঢেলে দিলে। বললে—আর দেবো?

টিপলার সাহেব বললে—দাও—গ্লাস ভর্তি করে দাও—

তার পর টিপলার-সাহেব আরো এক গ্লাস খেলে।

বললে—আরো দাও বাবু, একেবারে পিওর হোল ওয়াটার—আমি ব্রান্ডি খেয়েছি, জিন্ খেয়েছি, হুইস্কি খেয়েছি, শেরি শ্যাম্পেন ভড্‌কা খেয়েছি—কিন্তু তোমাদের এই হোলি ওয়াটারের আর তুলনা নেই—একেবারে তুলনাহীন! আরো দাও বাবু—

খেতে খেতে কী যে হলো মশাই সাহেবের। শেষকালে টিপলার সাহেবকে নিয়ে প্রাণান্ত! বন্ধ করা দায়। যত খায়, তত চায়।

তারক বলে—সাহেব, অত খেলে মটর সাইকেল-চালাতে পারবে না আজ—

শেষে মহুয়া ফুরিয়ে গেল। শনিচরিকে আবার পাঠাতে হলো বাজারে। গজ্ গজ্ করতে করতে আনতে গেল সে। দশ টাকায় তাকে অনেক খাটানো হয়েছে। আর খাটতে চাইছে না শনিচরি।

যাবার সময় শনিচরি বললে—বিকেল হলে আর এক দণ্ডও থাকবো না কিন্তু বাবু—তোদের কথার খেলাপ যেন না হয়—

এবার সাহেবের আরো উৎসাহ। আরও খাওয়া চলতে লাগলো, আরো উত্তেজনা। আরো আনন্দ। বলে—পিওর হোলি ওয়াটার—আর একবার দাও—

শেষকালে সেবারও ফুরিয়ে গেল মহুয়া!

টিপলার সাহেবের প্রায় অজ্ঞান অবস্থা। বেসামাল। বিছানায় শুইয়ে দিলাম।

বললাম—চারটে যে বাজে—আজ পাটনায় যাবে না সাহেব?

টিপলার সাহেব জড়িয়ে জড়িয়ে বললে—কাল যাবো, আজকে বড় টায়ার্ড—কাল যাবো ঠিক।

কিন্তু শনিচরিকে নিয়েই হলো বিপদ। আর এক মিনিটও থাকতে চায় না।

বলে—অন্য লোক দ্যাখ্ তোরা—আমি পারবো না—

তারক বুঝিয়ে বললে—দেখছিস তো সাহেবের অবস্থা, এ সময়ে কি ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত—ভিনদেশি মানুষ, তুই যদি এরকম অবুঝ হোস তো কাকে বোঝাবো—কী করে চলবে—কে দেখবে সাহেবকে?

শনিচরি বললে—সাহেবকে কে দেখবে তার আমি কী জানি! সাহেব আমার কে? সাহেব মোলো কি বাঁচলো আমার দেখার কী দরকার? টাকা নিয়ে আমার ফুরিয়ে গেল কাজ—আর টাকা দেবে আমায় কে?

তারক বললে—দেবে, দেবে, দেখছিস না সাহেব কত ভালো লোক, কত খরচ করলে সকাল থেকে! সাহেবকে যদি সেবা করে খুশী করতে পারিস তো তোরই

ট্যাঁক ভর্তি হয়ে যাবে—

শনিচরি যেন রেগে গেল—তা তোরাই তো মহুয়া খাইয়ে সাহেবকে মজালি—

তারক বললে—তুই তো বুঝিস শনিচরি, যে মজে সে এমনিই মজে—মজবার জিনিস না পেলেও মজে—আমরা যে এতদিন খাচ্ছি, মজেছি ? না তুই মজেছিস ?

শনিচরি ঘাড় বেঁকিয়ে বললে—আমি মজবার লোকই বটে !

তা পরদিন সকালবেলা আবার আমরা টিপলার সাহেবকে দেখতে গেলাম। বেশ খাসা দিব্যি তাজা হয়ে উঠেছে আবার। দাড়ি কামিয়ে আবার স্বাভাবিক মানুষ।

আমাদের অভ্যর্থনা করে বসালে।

বললে—মেনি থ্যাঙ্কস্ তোমাদের বাবু—তোমরা কাল খুব কষ্ট পেয়েছ—

তারক জিজ্ঞেস করলে—রাত্তিরে কেমন ছিলে সাহেব ?

টিপলার সাহেব বললে—খুব ভালো—খুব ভালো—তোমাদের মেড-সারভেন্টটা আমার খুব সেবা করেছে—

তারক বললে—আজ যাচ্ছ তো সাহেব ?

টিপলার সাহেব বললে—হ্যাঁ আজই যাবো—

কেদার বললে—তারক, এইবার ক্যারেকটার সার্টিফিকেটের কথাটা বল-না তুই।

টিপলার সাহেব বললে—আজকে শেষবারের মতো তোমাদের হোলি ওয়াটার খেয়ে নেওয়া যাক—কী বলো—আনবো ?

তা আমাদের আবার কিসের আপত্তি ! আবার মহুয়া এলো। সেদিনও সাহেব পেট ভরে খেলে। তার পর যখন সেদিনও অজ্ঞান হয়ে যাবার মতো অবস্থা তখন সাহেব বললে—আজ আর যাবো না বাবু, কাল বিকেলে যাবো—

বললাম—তার পর ?

বটুক চাটুজ্যে বললেন—তারপর মশাই সেই টিপলার সাহেবের 'কাল যাবো' 'কাল যাবো' করে আর তার যাওয়া হলো না। একদিন পৃথিবী ঘুরতে বেরিয়েছিল জোয়ান বয়েসে, কত দেশ, কত জনপদ পেরিয়ে, পাহাড় সমুদ্র মরুভূমি অতিক্রম করে শেষকালে পথ ভুলে সেই যে মহারাজগঞ্জে এসে আটকে গেল, সে আর নড়লো না। ভুলুবাবুর বাগানবাড়িটা তো এমনিতে পড়েই ছিল, সেটা ভাড়া নিয়ে নিলে সাহেব। কুকুর পুষলে, বেড়াল পুষলে—

বললে—তারক, তোমাদের মহারাজগঞ্জ প্যারাডাইস্—একেবারে প্যারাডাইস্ অন্ আর্থ—

ওদিকে মটর-সাইকেলটা পড়ে পড়ে মরচে ধরতে লাগলো। তাতে আর

চড়েনা সাহেব। বিক্রি করে দিলেও চলতো। নতুন অবস্থায় বেচলে কিছু অন্তত দামও আসতো। শেষে একদিন সেই টিপলার সাহেব আমাদের মতো ধুতি পায়জামা পরতে শিখলে। চুলে সরষের তেল মাখতে শিখলে, খিস্তি করতে শিখলে, বাঙলা গান শিখলে, তবলা বাজাতে শিখলে, দুগ্যা ঠাকুর দেখলে পেন্নাম করতো, সত্যনারায়ণের সিন্নি খেতো, আর একেবারে, বলবো কি মশাই, আমাদের জাতভাই হয়ে গেল।

—আর শনিচরি ?

বটুক চাটুজ্যে বললেন—আর শনিচরির গায়েও তখন ফরসা সেমিজ, ফরসা শাড়ি, পায়ে আলতা পরে, ইংরিজি বলে—সাহেবের কাছে থেকে থেকে ইংরিজি শিখে গেছে তখন।

জিজ্ঞেস করলাম—শনিচরি জাত দিলে শেষ পর্যন্ত ?

বটুক চাটুজ্যে বললেন—জাত দেবার কথা কী বলছেন মশাই ? আমরা যখন দেখলাম সাহেব পটকে গেছে তখন ভাবলাম শনিচরিকে যদি ভাগিয়ে দিই তো টিপলার সাহেব বোধ হয় আবার ভালো হয়ে যেতে পারে—

শনিচরিকে গিয়ে তারক বললে—তুই বেরো এখান থেকে শনিচরি—তোর জন্যেই তো সাহেবের এই দুর্গতি—

শনিচরির তখন ঠেকার কত! বললে—আমার জন্যে না তোদের জন্যে ? তোরাই তো আমার সাহেবকে মহুয়া খেতে শেখালি—আমার সাহেবকে তোরাই তো খারাপ করলি—

দেখতাম টিপলার সাহেবের যখন অসুখ-টসুখ হতো শনিচরি মাথায় বরফ লাগিয়ে দিচ্ছে। স্নান করিয়ে দিচ্ছে, খাইয়ে দিচ্ছে। সাহেবের কী খেতে ভালো লাগে, কী পরতে ভালো লাগে, কী চায় সাহেব—সব দিকে নজর শনিচরির।

কতদিন টিপলার সাহেবের জন্যে বাজারের ভাঁটিখানা থেকে মহুয়ার মদ নিয়ে এসে দিয়েছে। রান্না করে খাইয়ে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে অনেক রাতে সাহেবের এঁটো বাসন মেজেছে পুকুরঘাটে বসে বসে।

স্বজাতিরা কেউ কেউ বলেছে—হ্যাঁ রে, তা বলে টাকার জন্যে তুই জাত-ধম্ম দিলি ?

শনিচরি পুকুরঘাটে দাঁড়িয়ে চীৎকার করেছে—শতেকখোয়ারীরা আমাকে জাত দেখাচ্ছে—তোদের জাতের মাথায় আমি······

এর পর তার মুখের ভাষা আর শোনা যেত না মশাই। কানে আঙুল দিতে হতো। কিন্তু টিপলার সাহেবের ব্যাপার দেখে আমরাও অবাক হয়ে গেলাম। ও-সাহেব যে কেন বাড়ি-ঘর ছেড়ে পৃথিবী ঘুরতে বেরিয়েছিল কে জানে। পথ ভুলে গেলেই বা, তা বলে মানুষ অমন করে সব ভুলে যায়! প্রথম প্রথম দেড়শো মাইল দূরের এক গির্জায় যেত রবিবার দিনগুলো। শেষে তাও গেল। গির্জা-

টির্জা মাথায় উঠলো সাহেবের। কেবল ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে আনতো আর মহুয়া খেত।

যেদিন রাস্তাতেই নর্দমার ধারে অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকতো সাহেব, খবর পেয়ে শনিচরি সেই দশাসই মানুষটাকে ধরে তুলে নিয়ে আসতো। আপাদ-মস্তক বালতি বালতি জল ঢেলে ধুয়ে দিত সর্বাঙ্গ। জামা-কাপড় পরিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিত। তার পর যখন আস্তে আস্তে টাকা ফুরিয়ে এলো সাহেবের, শনিচরি ঘুঁটে দিয়ে পাড়ায় বিক্রি করতো, গরুর দুধ বিক্রি করতো, হাঁসের ডিম, মুরগীর ডিম বিক্রি করতো।

বলতো—পাড়ার বখাটে ছোঁড়ারাই আমার সাহেবকে খারাপ করে দিলে—

বলতো—যারা আমার সর্বনাশ করেছে—তাদের ভালো হবে না, তাদের তিনকুলে বাতি দেবার কেউ থাকবে না—তাদেরও সর্বনাশ হবে—মরলে মুর্দভরাসেও তাদের ছোঁবে না—এই বলে রাখলুম—

শনিচরি আপন-মনে কেবল চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গাল দিত আর বাসন মাজতো।

কিন্তু একদিন অবস্থা আরও খারাপ হয়ে এলো টিপলার সাহেবের। শোচনীয় অবস্থা হয়ে উঠলো। রাস্তায় টিপলার সাহেবকে দেখলে আমরাই ভয়ে পালাতুম মশাই।

সাহেব আমাদের দেখলে বলতো—এই তারক, হোলি ওয়াটার খাওয়া দোস্ত্—

আমাকে একলা দেখতে পেলে বলতো—চাটুজ্যে, হোলি ওয়াটার খাওয়াবি একটু?

কিন্তু আমাদের সঙ্গে মিশতে দেখতে পেলেই শনিচরি রেগে চীৎকার করে বলতো—ওই বদমাইশদের সঙ্গে আবার মিশছো তুমি? আবার ওদের কাছে মদ চাইছো?

টিপলার সাহেব বলতো—আমার হাতে যে আর পয়সা নেই—

শনিচরি বলতো—তোমার পয়সা নেই তাতে কি হয়েছে—আমার পয়সা আছে। আমি কিনে দেবো—আমি মদ খাওয়াবো তোমাকে—

শেষকালে আস্তে আস্তে যখন সবাই ত্যাগ করলো টিপলার সাহেবকে, দোকানদার সিগারেট দেয় না, মুদি তেল নুন বেচে না, রুটি দেয় না, তখন শনিচরিই রইলো টিপলার সাহেবের সঙ্গে। সেবা করতে লাগলো সাহেবের। যেমন করে হিন্দুঘরের বউয়েরা সোয়ামীর সেবা করে তেমনি করেই সেবা করতে লাগলো।

সেই টিপলার সাহেবকে নিয়ে আমরা কত মজা করেছি মশাই। আমাদের সঙ্গে হোলির দিন আবীর মেখে হুল্লোড় করেছে। শালপাতা চেটে চেটে সত্যনারায়ণের সিন্নি খেয়েছে। সিগারেট ছেড়ে বিড়ি ধরেছে। একদিন টিপলার

সাহেবের পয়সায় আমরা কত ফুর্তি করেছি, আর পরে সাহেবের অবস্থা খারাপ হবার সঙ্গে সঙ্গে সরে এসেছি। কিন্তু সাহেবের শেষদিন পর্যন্ত যে সেবা করেছে, সাহেবের ময়লা সাফ করেছে, সে ওই শনিচরি। টাকা না ফেললে যে কুটোটি সরাতো না, সেই শনিচরি নিজে পরের বাড়ি গতর খেটে সাহেবকে খাইয়েছে, পরিয়েছে।

আমরা মজা করবার জন্যে যখন বলতাম—এই টিপলার, সাংহাই যাবি না? টোকিও যাবি না? বার্লিন যাবি না?

কথাগুলো শুনতে শুনতে কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে যেত টিপলার সাহেব। আস্তে আস্তে আমাদের সঙ্গ ছেড়ে উঠে চলে যেত নিজের বাড়ি।

বলতো—মাথা ধরেছে বড্ড—বাড়ি যাই—

কিংবা কখনও গল্প করতে করতে যখন হঠাৎ তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে যেত—জানিস যখন ডেনমার্কে ছিলাম—

বলতে গিয়েই যেন কথা আটকে যেত তার মুখে। চোখ-দুটোর দৃষ্টি কোথায় উধাও হয়ে যেত। বরফ-ঢাকা দেশের মাটির মতো টিপলার সাহেবের চোখেও বুঝি বরফ জমে আসতো। খোলা চোখ দিয়ে স্বপ্ন দেখতো কোন্ দেশের কোন্ সার্টিনের গাউন পরা ষোড়শীকে। তারা বুঝি তাকে ডাকতো হাতছানি দিয়ে। অনেক দূরের পপ্‌লার আর পাইন গাছের মর্মর শব্দ যেন কান পেতে শুনতে পেত টিপলার সাহেব। তার পর আড্ডার মাঝপথেই উঠে চলে যেত বাড়ি। গিয়ে দরজায় খিল দিয়ে ঘরের মধ্যে না-খেয়ে না-দেয়ে শুয়ে পড়ে থাকতো কতদিন। তার পর শনিচরির পীড়াপীড়িতে উঠতো একদিন। শেষে আবার ফাঁক পেলেই দৌড়ে আসতো আড্ডায়। এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বলতো—দে ভাই একটু হোল ওয়াটার দে—অনেকদিন খাইনি—

আমরা দিতাম।

কিন্তু শনিচরি টের পেলেই আমাদের গালাগালি দিতে দিতে সাহেবের গলা ধরে হিড় হিড় করে টানতে টানতে বাড়ি নিয়ে যেত।

টিপলার সাহেবের অবস্থা দেখে আমাদের কান্না পেত মশাই। কাকার কাছে শুনেছি—এক এক রাজা এক-এক দিকের অধিপতি। কে জানে মশাই—শাস্ত্র-টাস্ত্র তো পড়িনি। রাজা ইন্দ্র হলো পূর্বদিকের, রাজা যম হলো দক্ষিণদিকের, আর রাজা বরুণ হলো পশ্চিমদিকের। সোমদেবতা ভূলোকেও থাকে না, গোলোকেও থাকে না—থাকে দ্যুলোকে। তা শেষকালে আমাদের টিপলার সাহেবও পুরোপুরি সেই দ্যুলোকের বাসিন্দেই হয়ে গেল। লাজ-লজ্জা-ভয়-সঙ্কোচ-ঘেন্না আর কিছু রইল না। এক এক বার মনে হতো কেন এমন হলো! আমরাও তো খাই। খেয়ে তো এমন পরিণতি হয়নি আমাদের। যে টিপলার সাহেবের কাছে ক্যারেকটার সার্টিফিকেট পাবার জন্যে কেদার অত লাফিয়েছিল

সেই সাহেবের ক্যারেকটার দেখে কেদারই বলেছিল—মাইরি, টিপলার সাহেব নিজেরই ক্যারেকটারটা নষ্ট করলে শেষকালে—

কিন্তু আপনি হয়তো জিজ্ঞেস করবেন, কেন এমন হলো! আমরাও তো সেই কথাই জিজ্ঞেস করেছি—কেন এমন হলো! সে কি মহুয়া! সে কি তুচ্ছ মহুয়ার মদ! সে তো আমরাও খাই! তবে কি শনিচরিয়া! সেই ময়লা নোংরা কাপড় পরা চুলে তেল না দেওয়া কালো দেহাতী মেয়ে!

বললাম—তার পর?

বটুক চাটুজ্যে চেয়ার থেকে উঠে পড়েছিলেন। আবার বসলেন।

—তার পর কী করলুম জানেন মশাই—

বটুক চাটুজ্যে একটু থেমে আবার বললেন—তার পর কি করলুম জানেন মশাই—একদিন তিনজনে মিলে পরামর্শ করলুম টিপলার সাহেবকে বাঁচাতে হবে—টিপলার সাহেবকে একদিন বললাম—চলো সাহেব, বেরিলীগঞ্জে বেড়িয়ে আসি—

টিপলার সাহেব বললে—কেন?

তারক বললে—তোমাকে হোলি ওয়াটার খাওয়াবো—চলো—

টিপলার সাহেবের মহা ফুর্তি। সাহেবকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে তো টাঙ্গায় তুললুম। অনেকদিন পরে আবার খেতে পাবে!

ভোরবেলা বেরিয়েছি। বেরিলীগঞ্জে পৌঁছলুম যখন, তখন পরের দিন ভোর হয়ে আসছে।

বেরিলীগঞ্জে তখনও কয়েকটা প্ল্যাণ্টার সাহেব আছে। জমি জমা ক্ষেত খামার করে দু-একটা সাহেব তখনও আছে। দেশে ফিরে যাবো-যাবো করছে।

টিপলার সাহেবকে নিয়ে গিয়ে তুললাম তাদের বাড়ি।

টিপলার সাহেবকে দেখে ডি'সুজা সাহেব সামনে এগিয়ে এলো। ডি'সুজা সাহেবের মেমও এগিয়ে এলো। পেছন-পেছন ছেলে-মেয়েরাও এগিয়ে এলো। আমাদের সংগে টিপলার সাহেবকে দেখে তারাও অবাক হয়ে গেছে।

ডি'সুজা সাহেব হাত বাড়িয়ে দিলে টিপলার সাহেবের দিকে। টিপলার সাহেবের মুখেও হাসি ফুটলো যেন। গুড-মর্নিং হলো। হ্যান্ড-শেক্ হলো। কোথা থেকে আসছো! কী নাম, ধাম, কোথায় নিবাস, কোন্ গোত্র,—কুলপঞ্জী। সবই আদান-প্রদান হলো। কত বছর পরে আবার স্বদেশের লোক পেয়েছে—একেবারে আহ্লাদে আটখানা। আমাদের দিকে আর কেউ ফিরে চায় না। শেষে যেই ওরা চা খেতে ঘরে ঢুকলো আমরাও টুপ করে সরে পড়লাম সেখান থেকে।

ভাবলাম এবার যাহোক একটা হিল্লে হয়ে যাবে সাহেবের। ফিরতি টাঙ্গাতে সোজা চলে এলাম—চলে এলাম একেবারে মহারাজগঞ্জে।

শনিচরি আমাদের এসে ধরে। বলে—সাহেবের কী হলো রে? সাহেব-

কোথায় গেল ?

তারক বললে—আমরা কী জানি—

কিন্তু ও মশাই, ভবি ভোলবার নয়। একদিন পরেই দেখি দৌড়তে দৌড়তে টিপলার সাহেব এসে হাজির। আমরাও অবাক হয়ে গেলাম।

বললাম—কী রে ? ফিরে এলি যে ?

টিপলার সাহেব বললে—দূর, ওখানে কখনও মন টেঁকে! ভারি মন কেমন করতে লাগলো ভাই তোদের জন্যে—চলে এলাম।

বললাম—তার পর ?

বটুক চাটুজ্যে বললেন—তার পর আর কি! এমনি করে চোদ্দ বছর এইভাবে কাটিয়ে টিপলার সাহেবের একদিন শরীর ভেঙে পড়লো। হঠাৎ পাটনা থেকে একদিন জোনাথান সাহেব এখানে কাজে এসেছিল—ম্যাজিস্ট্রেট। নতুন বিলেত থেকে এসেছে। এসে সব শুনে দিল্লীর কনসাল অফিসে একটা চিঠি লিখে দিলে। কিন্তু তখন বড় দেরি হয়ে গেছে। টিপলার সাহেব তখন অজ্ঞান অচৈতন্য—আর শনিচরি দিনের পর দিন রাতের পর রাত পাশে বসে না-খেয়ে না-ঘুমিয়ে একনাগাড়ে সেবা করে যাচ্ছে।

আমরা ভাবলাম এবার এ-যাত্রায় বুঝি টিপলার সাহেব বেঁচে গেল।

একদিন সকালবেলায় হঠাৎ কয়েকটা মটরগাড়ি মহারাজগঞ্জে এসে হাজির। নতুন মুখ সব। দিল্লীর কনসাল অফিসের পরোয়ানা এসে গেছে এতদিনে। এবার বিনা খরচে টিপলার সাহেবকে জাহাজে করে সরকার নিজের দেশে পাঠিয়ে দেবে।

কিন্তু হলে কি হবে মশাই— বলে বটুক চাটুজ্যে এবার নতুন ধরনের হাসি হেসে উঠলেন।

বললেন—টিপলার সাহেব তার আগের দিনই মারা গেছে।

বললাম—মারা গেছে ?

বটুক চাটুজ্যে বললেন—হ্যাঁ,—মারা গেছে—মরে একেবারে সত্যিকারের দ্যুলোকবাসী হয়ে গেছে।

বললাম—আর শনিচরি ?

বটুক চাটুজ্যে বললেন—শনিচরি আর যাবে কোথায়। এখানেই আছে। আরো বুড়ি থুত্থুড়ি হয়ে গেছে। বাজারে গেলে দেখতে পাবেন কাঁঠাল গাছের ছায়ায় বসে এখন করলা উচ্ছে শিম বেগুন বিক্রি করে। কিন্তু এখনও বড় তেল মশাই—ইংরিজি পেটে গিয়েছে কিনা—আমাদের দেখলে জ্বলে যায়—যেন টিপলার সাহেবের আমরাই সব্বনাশ করেছি—তা আমাদের কী দোষ বলুন—সাহেব ওয়ার্লড টুর করতে বেরিয়ে পথ না ভুললে তো আর এমন হতো না—

ভার পথ ভুলে আসবি তো আয় একেবারে এই মহারাজগঞ্জে—

আমি চুপ করে রইলাম।

বটুক চাটুজ্যে বললেন—তাই তো আপনাকে বলছিলাম মশাই, হালের গপ্পোগুলো তো সব পড়ি, কিন্তু মনে হয় যেন সব বই দেখে দেখে লেখা—আপনি টিপলার সাহেবের গপ্পো শুনলেন তো, আরম্ভটা ঠিক বইয়ে লেখা গপ্পোর মতো—কিন্তু শেষকালটাই গোলমাল হয়ে যায়—শেষটাই কারো হয় না—শেষে গিয়েই আপনাদের গপ্পো একেবারে গুলিয়ে যায়—জীবনের সঙ্গে কিচ্ছু মেলে না তার—

বটুক চাটুজ্যে আরো সব কা যেন বলতে লাগলেন। কিন্তু আমি তখনও টিপলার সাহেবর কথাই ভাবছি। মনে হলো—আমরা সবাই-ই যেন এক এক জন টিপলার সাহেব। একদিন ওয়ার্ল্ড টুর করতেই বেরিয়েছিলাম সবাই—তার পর ছোট ছোট মহারাজগঞ্জে' এসে সব আটকে গিয়েছি চিরকালের মতো। আর যাওয়া হয়ে ওঠেনি আমাদের। আর যাওয়া হবেও না।

বউ

সাধু দেখতে পেলাম আবু পাহাড়ে। নানারকম সাধু। তিনশো বছর বয়েস কারো। উলঙ্গভাবে ভোলা মহেশ্বর হয়ে গুহায় ধ্যান করছেন। আবার দেখলাম কেউ তানপুরা নিয়ে ধ্রুপদ ধরেছেন একমনে। পাশে এক শিষ্য পাখোয়াজ বাজাচ্ছে। আবার কোথাও দেখলাম গুহার ভেতর ইলেকট্রিক আলো, রেফ্রিজারেটার। হাতের দশ আঙুলে দশটা হীরে-পান্না-মুক্তোর আঙটি, সিল্কের গেরুয়া কাপড় গায়ে, প্লেটে করে আঙুর খাচ্ছেন। পাশে বসে সিন্ধি এক মহিলা শিষ্যা পাখার বাতাস করছেন।

দেখবার জিনিসের অভাব নেই আবু পাহাড়ে। তবু সাধু দেখে দেখে সত্যিই আর আশ মেটে না আমার।

গাইডকে জিজ্ঞেস করি—আর কোনও সাধু-সন্নিসী নেই এখানে?

আমার গাইড এমন যাত্রী আগে কখনও দেখেনি। বড় বড় জার্মান, ইংরেজ, ফরাসী টুরিস্টের সার্টিফিকেট আছে তার কাছে। তারা সবাই দিলওয়ারা মন্দির, সানসেট পয়েন্ট, অচ্ছল-মহাদেবের মন্দির দেখে বেড়িয়েছে। আমি শুধু দেখে বেড়াই সাধু-সন্নিসী। ও কী করে জানবে কেন আমার অত আগ্রহ সাধুদের দেখবার জন্যে।

কিন্তু যোগানন্দ স্বামীর দেখা আমি আজও পাইনি। হরিদ্বার, বৃন্দাবন, কুম্ভমেলা, পুষ্করতীর্থ, কেদারনাথ, গোমুখী কিছু আর বাকি রাখিনি। তবু যোগানন্দ স্বামীকে আমার পাওয়া চাই-ই। আমি যে কথা দিয়েছি নিরু বউদিকে।

আজ নয়। আজ থেকে বহু বছর আগে কোথাকার কোন্ বোয়ালমুড়ি গ্রামের একটি বউয়ের গল্প। এঁদো-পড়া গ্রাম। না আছে একটা পোস্টাপিস, না আছে একটা ইস্টিশান। রেলস্টেশন থেকে নেমে বাইশ মাইল গরুর গাড়িতে গিয়ে তবে পৌঁছতে হয় সে-গ্রামে। গ্রামও তেমনি। সকাল হতে-না-হতে দুপুর গড়িয়ে আসে, আর বিকেল হতে-না-হতে সন্ধ্যে ঘনিয়ে আসে। বাঁশঝাড় আর বাদুড়ের রাজ্য। মানুষ-জন আছে বৈকি। বাঁশের লাঠি হাতে দু-একটা লোক রাস্তা দিয়ে হেঁটে যায়। তাও কচিৎ-কদাচিৎ। কাশির শব্দ পেলে তবেই বোঝা যায় মানুষ-জন আছে কোথাও কাছাকাছি।

গরমের ছুটি হয়েছিল।

বিধবা পিসিমার জমি-জমা যা কিছু সব ওই বোয়ালমুড়িতে। খাজনা-পত্তর দিয়ে যদি পাঁচটা টাকাও আসে ঘরে তো তা-ও লাভ। বছর-বছর গিয়ে সময়মতো আদায়পত্র করলে বিধবার হাতে তবু কিছু আসে। কিন্তু আসলে যাওয়ার

লোকেরই অভাব।

সেবার আমিই গেলাম। গিয়ে উঠলাম পিসিমার আমলের কাছারি-বাড়িতে।

রাঙা জ্যাঠাইমা বুড়ো হয়ে গেছে। চোখে দেখতে পায় না। অন্ধ মানুষ উঠোনে রোদে বসে ছিল। বললে—থাক্ থাক্ বাছা, পায়ে হাত দিতে হবে না—

তারপর চিৎকার করে উঠল, অ বউমা, বউমা, কোথায় গেলে, দেখ যতীনের ছেলে এসেছে—

কিন্তু বউমাকে আশেপাশে কোথাও দেখা গেল না।

গোটাকতক ছোট ছেলেমেয়ে কোথা থেকে এসে হাজির হলো সামনে।

বললাম, ফটিকদা কোথায় ?

জ্যাঠাইমা বললে, কাঁকুড়গাছিতে গেছে চোত-কিস্তির সময়, বাবুদের বাড়ির কাজে তার খাবার-নাইবার সময় নেই এখন। গেল শনিবারে বাড়িই আসতে পারেনি।

তারপর একটু থেমে আবার বললে, বউমা, অ বউমা—কোথায় গেলে—যতীনের ছেলে এসেছে দেখ—অ বউমা—

ছোট মেয়েটা এতক্ষণ দাঁড়িয়ে হাঁ করে দেখছিল আমাকে। তাকে কোলে তুলে আদর করতেই সে ভ্যাঁ করে কাঁদতে শুরু করেছে। সভয়ে নামিয়ে দিয়ে আবার নিজের কাছারি-বাড়িতে চলে আসছি। উঠোনের আতা গাছের কাছে আসতেই কে যেন ডাকলে—ঠাকুরপো—

পেছন ফিরতেই দেখি দরজার একপাশে মস্ত একগলা ঘোমটা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে নিরু বউদি। হাসি-হাসি মুখ।

বললে, আমাদের চণ্ডীমণ্ডপটা খালি পড়ে আছে, ওখানেই থাকবেন আপনি—

বললাম, কেন, কাছারি-বাড়িতেই তো ভালো—

নিরু বউদি বললে, ওখানে মানুষ-জন থাকে নাকি ! সাপখোপ আছে।··· আপনি চা খান তো ?

আধ ঘণ্টা বাদে একটা ছোট ছেলে এসে ফালিতে বাঁধা একটা চাবি দিয়ে গেল ; বললে, আপনি হাত মুখ ধুয়ে নিন—চা পাঠিয়ে দিচ্ছে মা।

প্রথম দু-একদিন প্রজাদের খবরাখবর দিতেই কেটে গেল। মালোপাড়া, মুসলমানপাড়া, পশ্চিমপাড়া, কৈবর্তপাড়া—সকলকে জানাতে হলো আমি এসেছি। যার কাছে যা আদায় যেন দিয়ে যায় রায়বাড়ির চণ্ডীমণ্ডপে এসে। সারা গাঁয়ের লোক জ্বরে ধুঁকছে। নজর দিয়ে দেখাও করে গেল কেউ-কেউ।

সবাই বললে, এবার মা-ঠাকরুনকে এই নিয়েই রেহাই দিতে বলবেন হুজুর ; জ্বর-জারির জন্যে এবার আমরা ক্ষেত-খামার দেখতেই পারিনি, বিলের কলমিশাক খেয়েই বেঁচে আছি শুধু, হাতে কিছু নেই হুজুর—

রাঙা জ্যাঠাইমা শুধু একজায়গায় বসে থাকে দিনরাত।

চণ্ডীমণ্ডপ থেকে শুনতে পাই বুড়ি চিৎকার করে বলছে, অ বউমা, বউমা, বলি গেলে কোথায়—আমাকে ঘরে তুলে দাও—রোদে পিঠ পুড়ে গেল যে—

মণি এসে ডাকে, কাকাবাবু, খেতে আসুন—মা ভাত দিয়েছে—

খেতে বসে রাঙা জ্যাঠাইমা দূর থেকে বলে—কী দিয়েই বা খাবে বাবা তুমি। দুধ নেই, মাছ নেই, পোড়া দেশে আকাল পড়েছে একেবারে। আমার চোখ গিয়ে সংসার একেবারে নয়-ছয় হয়ে গেল বাবা, কেবল অপ্‌চো-নষ্ট হচ্ছে সব—

তারপর আবার বলে, ফটিক বলে, মা তুমি চুপ করে বসে থাকো একজায়গায়, তোমার কিচ্ছু করতে হবে না। তা কি পারি বাবা—আমরা সে-কালের মানুষ একা হাতে ক্ষার কেচেছি, ধান সেদ্ধ করেছি, মুড়ি ভেজেছি, শ্বশুর-শাশুড়ীকে খাইয়েছি, হাঁড়ি ঠেলেছি, আর ওইসব আজকালকার বউ ধিন্ ধিন্ করে সারাদিন কেবল নেচে বেড়ায়—এই যে তুমি এসেছ, কী খাবে না-খাবে, তারপর আমি একটা অন্ধ মানুষ, কোনও কিছু চোখে দেখি না, শুধু ধেই ধেই করে নাচলেই হলো! তা আর দুটো ভাত নেবে বাবা?

তারপর হঠাৎ চীৎকার করে ওঠে। বলে, অ বউমা, বউমা, কোথায় গেলে—বলি অ···

সারা দিনরাত রাঙা জ্যাঠাইমা বউমাকে ডাকে।

অন্ধ শাশুড়ী, তিন-চারটে ছেলেমেয়েদের তদারক। তারপর রান্না করা, ঘর দোর উঠোন ঝাঁট দেওয়া, ধান সেদ্ধ, মুড়ি ভাজা, বাসন মাজা, সারাদিন নিরু বউদির কাজের আর শেষ নেই। অনেকদিন রাত্রে পুকুরঘাটে লম্ফ জ্বলতে দেখেছি একটা। আর লম্ফর সামনেই ঘোমটা-দেওয়া ঝাপসা একটি মূর্তি। ঘস্ ঘস্ করে বাসন মাজার শব্দ শুনতে পাই অনেক রাত পর্যন্ত।

সেদিন খেয়ে আসবার সময় আতা গাছটার পাশে আসতেই দরজার কাছ থেকে আবার ডাক এলো, ঠাকুরপো।

পেছন ফিরতেই দেখি একগলা ঘোমটা দিয়ে নিরু বউদি দাঁড়িয়ে। হাসি-হাসি মুখ। বাঁ হাত দিয়ে ঘোমটাটা আরো একটু টেনে বললে, আমার একটা কাজ করে দেবেন ভাই ঠাকুরপো?

একটু অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।

বললাম, কী কাজ বলুন বউদি—নিশ্চয় করে দেবো—

তেমনি ঘোমটা টেনে হাসতে হাসতেই বললে, এখন না ভাই—রাত্তিরে—আপনার সময় হবে তো?

পাঁচ নয়, দশ নয়—প্রায় পনেরো বছর আগেকার কথা। আমারও সেই কম বয়েস। এখনও মাঝে মাঝে নানান কাজ-কর্মের ভিড়ে নিরু বউদির কথা মনে পড়ে। নিতান্ত আটপৌরে সংসার—কোথাও সচ্ছলতার কোনও নিদর্শন নেই।

একটা শাড়িকে ক্ষার কেচে শুকিয়ে পরতে হত। বাসী কাপড় ছেড়ে কাচা কাপড়ে বিধবা শাশুড়ীর রান্না সারতে হত সকাল-সকাল। তারপর ঘুম থেকে উঠতে-না-উঠতে ছোট একপাল ছেলেমেয়ের তাম্বির তদারক। ভাসুর কাজ করত বিদেশে জমিদারী সেরেস্তায়। সপ্তাহে কখনও একবার আসত বাড়িতে। মাসকাবারী গুড়, তেল, নুন, হলুদ, মশলা এনে ফেলত। আবার কখনও এক মাসের ধাক্কা। কোনও খবরই নেই। কোথায় আছে, বেঁচে আছে কি না, তা-ও জানবার উপায় নেই। রাত-দুপুরের সময় হয়ত পুকুর-ঘাটে বাসন মাজতে বসেছে খাওয়া-দাওয়া সেরে, ছেলেমেয়েগুলোকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে ঘুম পাড়িয়ে নিজেও খেয়ে নিয়েছে। এমন সময় গোলাম মোল্লার গাড়িতে মাল বোঝাই নিয়ে এসে হাজির ফটিকদা। মা জেগে উঠেছে। উঠেই কান্না।

বলে, দরকার নেই মা অমন চাকরীতে, একটা কাকের মুখে একবার খবরটা পর্যন্ত নিসনে আমি মলুম কি বাঁচলুম।

ফটিকদা মাতৃভক্ত ছেলে। মার জন্যে পান-সুপুরি, খই, আখের গুড় এনেছে সঙ্গে করে। সব একে একে নামিয়ে বলে, কেমন আছ মা আজকাল ?

বুড়ী তখন আর কান্না রাখতে পারে না, বলে—এবার কোনদিন এসে দেখবি মরে গেছি, কৈবর্তপাড়ার ছেলেরা কাঁধে করে গাঙের ঘাটে নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে ফেলেছে, তখন আমাকে দেখতে পাবি না—

ফটিকদা গাড়ু নিয়ে হাত-পা ধুতে ধুতে বলে, কেন ? আবার তোমার কী হল ?

—হবে আবার কী ? আমার মরণ হলেই তো বাঁচি—

এ-কথার পর ফটিকদার আর কিছু বলার থাকে না। নিজের মনেই একবার জিজ্ঞেস করে, মালোপাড়ার কেদার সর্দার কেমন আছে মা ? সেবার বাতের অসুখে মর-মর দেখেছিলাম—

তারপর একটু থেমে বলে, পশ্চিমপাড়ার উমেশ ঢালীর ছেলেটার সান্নি-পাতিক জ্বর হয়েছিল, কেমন আছে শুনেছ নাকি কিছু ?

মা বলে, আমি মরছি নিজের জ্বালায়, কার খবর রাখি বল্‌। আমার কে আছে যে খবর নেয়। ক'টা ছেলে ক'টা বউ আছে শুনি ? তুই পড়ে রইলি বিদেশ-বিভুঁইয়ে, আর আমার অমন সোনার বউ, সে-ও রইল না। আর একটা ছিল ছেলে, তাও চলে গেল বিবাগী হয়ে ওই অলুক্ষুনে বউয়ের জ্বালায়—

তারপর চোখের জল মুছে কান্না থামিয়ে বলে, যিনি আছেন তিনি তো পটের বিবিটি। আমার সাহস কি ওঁকে হুকুম করি। রেঁধে দেয় বলে তাই কত খোঁটা—

ফটিকদা বলে, তা ছোটবউমা তো তোমার সেবা করে মা—

কানে কথাটা যেতেই শাশুড়ী লাফিয়ে ওঠে। যেন সাপ দেখে আঁতকে ওঠার

মতন। বলে, সেবা করবে আমাকে, তবেই হয়েছে। পেয়েছে আমার মতো শাশুড়ী তাই, নইলে—

নইলে যে কী তা আর বলা হল না। ছোটবউ একগলা ঘোমটা দিয়ে সামনে গরম তেলের বাটিটা নিয়ে হাজির হল। বললে, আপনার মালিশের তেলটা এনেছিলুম মা, একটু মালিশ করে দেব ?

তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল রাঙা জ্যাঠাইমা।

বললে, দেখ্, এই তোকে দেখে এখন শাশুড়ীর সোহাগ হচ্ছে। রোজ এই বললে বিশ্বেস করবিনে ফটিক, চোপর দিন হা-তেল হা-তেল করে মরেছি—বলি কথা বলতে কষ্ট হয়, একটু মালিশ করলে যদি সারে তবু—তেলটা গরম করে দিলে আমি নিজেই মালিশ করে নিতে পারি—তাও পাইনে, এখন তোকে দেখেছে আর আমায় সোহাগ করতে এসেছে—

ছোটবউ ঘোমটার ভেতর থেকেই বলে, সন্ধ্যেবেলা যে আমাকে আপনি বললেন শোবার আগে তেলটা মালিশ করে দিতে—তাই তো—

—চোপরা কোরো না মা, শাশুড়ীর সঙ্গে চোপরা করতে নেই। শাশুড়ী গুরুজন হয় ; চোপরা করলে আমার আর কী মা, তোমারই জিভ খসে যাবে। আমি তোমার ভালোর জন্যেই বলি—

তারপর আবার খানিকটা কেঁদে নিয়ে বললে, কপালই মন্দ আমার, নইলে—জিজ্ঞেস করো ওই ফটিককে, ও সাক্ষী আছে, সোনার বউ ছিল আমার, মুখের কথা খসতে না খসতে সব কিছু হাজির করত সে। আমারই কপাল, নইলে নিজের পেটের ছেলে কি-না বিবাগী হয়ে যায়। কিসের দুঃখ্যু ছিল তার বলো—অনেক পাপ করেছিলুম মা—

ছোটবউ শাশুড়ীকে চেনে। তবু গরম তেলটা নিয়ে শাশুড়ীর বুকে মালিশ করতে গেল। কিন্তু তার আগেই শাশুড়ী তেলের বাটিটা ছুঁড়ে ফেলে দিলে উঠোনের মধ্যিখানে।

বলে, আমার মালিশটাই কিনা বড় হল এখন। দেখছিস-রে ফটিক দ্যাখ্, তুই তো বিদেশে থাকিস, আমি কী সুখে ঘর করি দ্যাখ্ তুই। আমার ছেলে বিদেশে থেকে খেটে-খুটে এল, খিদেয় বাছার প্রাণ আইঢাই করছে, তার ভাতটা আগে চড়িয়ে দেবে, না, আমার মালিশ। ছেলে তো আর পেটে ধরলে না, নাড়ীর টান বুঝবে কেমন করে মা—

বউ বলে, ভাত নামিয়েছি, এবার ঝোলটা চড়ালুম মা—

ফটিক হয়ত সব শুনছিল। বললে, না না, আমার জন্যে রাঁধতে হবে না মা, আমি তো খেয়ে এসেছি কেষ্টগঞ্জ থেকে। শশী বিশ্বাসের সঙ্গে দেখা হল, না খাইয়ে ছাড়লে না তারা, বলতেই ভুলে গেছি—

মা আরো কেঁদে উঠল।

—তা তো খেয়ে আসবেই বাছা, জানে তো বাড়িতে কেউ নেই। আমার চোখ থাকলে কি আজ সংসারের এই দশা হয় বাছা। মরুক ঝরুক, সব ভেসে যাক, গোল্লায় যাক। ছোট ছেলেটা গেছে, এবার তুইও বিবাগী হয়ে যা। আমি আর ক'টা দিনই-বা, তারপর ওই রাক্ষুসী···বলি অ বৌমা, বলি শুনছ, অ বৌমা, অ—

এমনি প্রত্যহ।

খেতে বসে মণি এক এক দিন জিজ্ঞেস করেছে, কাকাবাবু, আর দুটো ভাত নেবেন? মা জিজ্ঞেস করছে—

রান্নাঘরের দিকে তাকিয়ে দেখি সেই হাসিমুখ। ঘোমটায় মুখ ঢেকে অন্তরালে দাঁড়িয়ে দেখছে।

কোন দিন মণি বলে, জানেন কাকাবাবু, আজ মা পড়ে গেছল -

—পড়ে গেছল? কী সর্বনাশ! কোথায়?

—পুকুরঘাটে। খুব রক্ত পড়েছিল মাথা থেকে।

শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

—কে ওষুধ দিলে? খুব লেগেছে?

—না না, মার কি লাগে, মা কি ছোটছেলে নাকি! মা কি কাঁদে খুকুর মতন, শুধু হাসতে লাগল। মা বললে, ঠাকুমাকে বলিসনি কিছু। আমি ঠাকুমাকে কিছু বলিনি, শুধু গাঁদা ফুলের পাতা এনে দিলুম মল্লিকদের বাগান থেকে, মা থেঁতো করে টিপে লাগিয়ে দিলে কপালে—

ক'দিন আর ছিলাম বোয়ালমুড়িতে। সেখানে সেই আমার প্রথম আর শেষ যাওয়া। সেই বাঁশঝাড় আর বাদুড়ের রাজ্যে। বাত আর সান্নিপাতিকের পীঠ-স্থান, দারিদ্র আর লাঞ্ছনার কেন্দ্রভূমি। কিন্তু বোয়ালমুড়ি গ্রামের রায়বাড়ির সেই চরিত্রটির কথা আজো ভুলতে পারিনি। নিরু বউদি আমাকে আজীবন অনুসরণ করে চলেছে। চোখ বুজলেই সেই হাসি যেন কানে শুনতে পাই।

জ্যাঠাইমা বলত, মুখপুড়ীর হাসি দ্যাখো-না, হাসি শুনলে গা জ্বলে যায়। জোয়ান মেয়ের এত হাসি কেন লা। তবু যদি সোয়ামী ঘরে থাকত, কোলে ছেলে দিত ভগমান—

রাত তখন প্রায় বারোটা। একলা-একলা বিছানায় শুয়ে বই পড়ছিলাম।

হঠাৎ যেন বাইরে কার পায়ের শব্দ হল।

নিরু বউদির গলা শোনা গেল, ঠাকুরপো কি ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি?

শশব্যস্তে উঠে দরজা খুলে দিলাম!

বললাম, আসুন আসুন বউদি। এত রাত হল, আমি তো ভাবলাম আর এলেন না বুঝি—

নিরু বউদি বললে, এই তো এখন ছাড়া পেলাম ভাই। বাসন মেজে ঘষে

মুছে, রান্নাঘর ধুয়ে, খুকুর কাঁথা বদলে, শাশুড়ীর মাথার কাছে জলের ঘটি রেখে তবে আসছি। কাজ কি কম ভাই—

বলে হাসতে লাগল নিরু বউদি। দেখলাম—লালপাড় শাড়িটা গায়ে বেশ করে জড়িয়ে ঘরে ঢুকেছে। আস্তে আস্তে একহাতে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে নিরু বউদি বিছানার এক কোণে আলগোছে বসল।

বললাম, আপনি বরং ভালো করে বিছানায় পা তুলে বসুন বউদি, আমি এই চেয়ারটায় বসছি।

নিরু বউদি বললে, তবেই হয়েছে, এত খাতির আর করে না আমাকে। ভারী তো দুটো দিনের জন্যে এসেছেন, শেষে ফিরে গিয়ে বলবেন, এমন দেশে গিছলুম খাতির যত্ন কিছু জানে না—জংলী মানুষ সব। বাড়ি গিয়ে বোয়ালমুড়ির নিন্দে করবেন তো খুব— ?

—তা বলে আপনার নিন্দে কিন্তু কেউ করতে পারবে না, তা আমি বলে দিচ্ছি বউদি—

নিরু বউদি বললে, আপনাদের তো মুখের কথা! আপনাদের খুব চেনা আছে। কলকাতার লোক কি কম নাকি!

—কলকাতার লোকেরা বুঝি খুব খারাপ বউদি ?

নিরু বউদি গালে হাত দিয়ে হাসতে লাগল, ওমা, আমি কি তাই বললুম নাকি ? আমি আবার কখন খারাপ বললুম আপনাকে ? আমিই বলে কত ভাবছি আপনার হয়ত খেয়ে পেট ভরছে না, কী দিয়ে যে রোজ ভাত দিই তাই-ই ভেবে পাইনা বলে—

এক মুহূর্তে মুখের ভাব বদলে গেল নিরু বউদির। দূরে বাঁশঝাড়ের আড়াল থেকে একটা শেয়াল ডেকে উঠল। তারপর একসঙ্গে অনেকগুলো শেয়ালের সমবেত কণ্ঠ। চকিতে যেন নিরু বউদির সম্বিৎ ফিরে এল।

বললাম, কই, আপনার কাজের কথাটা তো বললেন না—

নিরু বউদি বললে, আপনাকে একটু কষ্ট দোব ভাই—কিছু মনে করবেন না যেন—

—না না, কষ্ট কিসের, আপনি বলুন না কী কাজ!

নিরু বউদি যেন তবু দ্বিধা করতে লাগল।

বললে, সত্যি বলছেন, কিছু মনে করবেন না আপনি ? সত্যি বলুন, তিন সত্যি করুন—

—আগে বলুনই তো কী কাজ।

নিরু বউদি বললে, না ভাই, কাউকে আমি কষ্ট দিতে চাই না। কষ্ট দিলে তো আমারই লোকসান। বলুন, পরকে কষ্ট দিলে তো পরের জন্মে আমাকেই কষ্ট পেতে হবে। আর কেউ না-জানুক চিত্রগুপ্তের খাতায় তো সব হিসেব লেখা

থাকবে—

আমি কিছু বললাম না। শুধু বললাম, আপনাকে যে সবাই কষ্ট দেয়!

নিরু বউদি যেন অবাক হয়ে গেল। বললে, কই, কে কষ্ট দেয়?

বললাম, কেউ কষ্ট দেয়না আপনাকে?

—দিক্‌গে কষ্ট, আমি তো কষ্ট বলে মনে করি না ভাই। এ-জন্মে যে কষ্ট দেবে, পরের জন্মে সে-ই ভুগবে। আমিও হয়ত আগের জন্মে পরকে কষ্ট দিয়েছিলুম···কিন্তু ভগবান তো সব দেখছেন মাথার ওপর থেকে, বলুন, দেখছেন না ঠাকুরপো— ?

সেদিন ভগবানের অস্তিত্ব নিয়ে হয়ত তর্ক করতে পারতাম। কিন্তু নিরু বউদির সামনে বসে আমার সমস্ত বিশ্বাস, অবিশ্বাস, সন্দেহ, দ্বিধা কোথায় যেন অন্তর্ধান করে গেল একনিমেষে। সেই মধ্যরাত্রির অন্ধকার পরিবেশে চারদিকের বাঁশঝাড় আর বাদুড়ের পীঠস্থানে এক স্বল্প-আলোকিত চণ্ডীমণ্ডপের ভেতরে বসে নিরু বউদির সঙ্গে তর্ক করবার দুষ্প্রবৃত্তি আমার হল না কেন—তার কারণ হয়ত ভু ভারতে কেবল আমি-ই জানি।

হঠাৎ নিরু বউদি বললে, যাক, কাজের কথাটা বলি ভাই এবার—

বলেই সেমিজের ভিতর থেকে একটা তিনপয়সা দামের জোড়া পোস্টকার্ড বার করলে নিরু বউদি। বললে, রাধুর মাকে দিয়ে এই পোস্টকার্ডখানা কিনে এনেছিলুম, কিন্তু লেখার অভাবে এতদিন পড়ে আছে শুধু, এতে একটা চিঠি লিখে দেবেন ভাই?

পোস্টকার্ডখানার চেহারা দেখে আরো অবাক হয়ে গেলাম। বহুদিন অব্যবহৃত থাকায় ধুলো ময়লা পড়ে কালো হয়ে গেছে। এখন লিখতে গেলে কালি চুপসে যাবে!

বললাম, কবেকার কেনা এটা? ক'বছর আগে?

নিরু বউদি বললে, ক'বছর তা কি মনে আছে! আমি যদি লেখাপড়াই জানব তো তাহলে আমার ভাবনা!

পোস্টকার্ডখানাকে টিপে টেনে সোজা করে নিয়ে বললাম, কাকে লিখতে হবে?

—আমার মাকে।

—ঠিকানা কী?

—লিখুন আমার ভাইয়ের নাম, শ্রীযুক্ত মাখনলাল ভটচাযিয—আর ওপরে লিখুন মায়ের নাম—

—কোন্ পোস্টাপিস?

—বড়মাতলা, নেবুতলা বাড়ি পেঁৗছে, ওই লিখলেই চিঠি যাবে। আমার নিজের হাতে পোঁতা নেবুগাছ কিনা, এই এত বড় বড় নেবু হয় দেখুন—এই এত

বড় বড়। জানেন ঠাকুরপো, পান্তাভাত দিয়ে কচলে খেলে কী সু-তার হয় কী বলব ভাই। মাখন বলত, ওটা ওর নেবুগাছ, আমি বলতুম আমার। তাই নিয়ে ঝগড়া বেঁধে যেত শেষকালে—

তারপর একটু থেমে নিরু বউদি বললে, আচ্ছা আপনিই বলুন তো ঠাকুরপো, হারানী ওদের বাগান থেকে নেবুগাছের চারাটা দিলে আমাকে, আমি আমাদের বাগানে পুঁতলুম আর উনি কেবল বাগানে জল দিয়েছেন, তাতেই গাছটা ও'র হয়ে গেল, বলুন তো ? আপনিই বিচার করুন তো ঠাকুরপো—

বললাম—চারা যখন আপনি পুঁতেছেন, তখন গাছও আপনার বৈকি—

নিরু বউদি বললে, তা মাখন কি সে-কথা শুনবে ? ওর গায়ে জোর বেশী, আমাকে ঢিপ ঢিপ করে কিল মারত কেবল। তাই না দেখে মা'র কাছে আমিই বকুনি খেতাম। মা আমাকে বলত, তোরই তো দোষ রাক্ষুসী, তোর দু'দিন বাদে বিয়ে হবে, শ্বশুরঘর করবি, সোয়ামী হবে, ছেলেপুলে হবে, কোন্ লজ্জায় বেটাছেলের সঙ্গে ঝগড়া করিস ? শুনলেন মা'র কথা, বিচারটা একেবার দেখলেন তো ঠাকুরপো ?

বললাম, তা তো বটেই—

নিরু বউদি বললে, তারপর আমার বিয়ের দিন ! আমার তো সবে তখন দশ বছর বয়েস,—বাইরে বর এসেছে, হারানীরা এসেছে বর দেখতে, আমি চুপি চুপি হারানীকে জিজ্ঞেস করলুম, আমার বরকে কী রকম দেখতে রে ? খুব ছোট তো তখন, কাকে বলে বর, কাকে বলে বউ, কিছুই জানি না। মা'র কানে গেছে কথাটা ; সে কী বকুনি ঠাকুরপো, বললে, মুখপুড়ীর লজ্জা শরম নেই, এখন থেকেই বর-বর শিখেছে, শ্বশুরবাড়ি গিয়ে খাবেন লাথি ঝাঁটা, শাশুড়ী যখন চুলের মুঠি ধরে মারবে, যখন কেঁদে কূল পাবেন না, তখন আমার কথা মিষ্টি লাগবে—ও মেয়ে আমাকে না মেরে ছাড়বে না।…এই সব—

তারপর একটু থেমে বললে, আপনিই বলুন তো ঠাকুরপো, দশ বছর বয়েসে অত বুদ্ধি হয় কারো, বলুন। এখন না-হয় বুঝেছি মা আমার ভালোর জন্যেই বলত সব, আমাকে যাতে শ্বশুরবাড়িতে সবাই ভালবাসে তাই এত শেখাত। তখন কি অত সব বুঝতুম ! এখন বুদ্ধি হয়েছে, এখন সব শিখেছি, তাই তো মা'র জন্যে কেবল মন-কেমন করে। মা বলে কথা, মা'র তুল্য আছে নাকি কেউ সংসারে, বলুন ঠাকুরপো—

বললাম, তা তো বটেই—

নিরু বউদি হঠাৎ আবার সচকিত হয়ে উঠল যেন।

বললে, যাক গে, সে-সব বাজে কথা, আপনি লিখতে আরম্ভ করুন।

বললাম, কী লিখব ?

—লিখুন, তোমার জন্যে আমার খুব মন-কেমন করে, আমি তোমার কথা

কেবল ভাবি, তোমাকে দেখতে ইচ্ছে করে কেবল, এই সব লিখুন—

লিখলাম। বললাম, তারপর?

নিরু বউদি বললে, কী লিখলেন পড়ুন তো একবার—

পড়লাম।

নিরু বউদি বললে, ঠিক হয়েছে, এইবার লিখুন হারানীর কথা। হারানী কোথায়, শ্বশুরবাড়িতে না বাপের বাড়িতে, বাপের বাড়িতে আসে কিনা—হারানীর ছেলেপুলে ক'টা। আর লিখুন, মাখনকে পাঠিয়ে আমাকে একবার নিয়ে যাও, আমার বাপের বাড়ি যেতে বড় ইচ্ছে করে, খরচপত্তরের জন্যে ভাবনা নেই, আমার হাতের রুলিটা বাঁধা রেখে আমি গাড়ি-ভাড়া যোগাড় করব, তোমার জন্যে একজোড়া থান কিনে রেখেছি, আর মাখনের বউয়ের জন্যে বেগুনফুলি শাড়ি একখানা। এখান থেকে যাবার সময় মাখনের ছেলেমেয়েদের জন্যে বোয়ালমুড়ির চিনির পাকের মুড়কি-বাতাসা দু'হাঁড়ি নিয়ে যাব, আর বেশীদিন তো এই সংসারে থাকতেও পারবো না।

তারপর একটু থেমে ঝুঁকে বললে, কী লিখলেন পড়ুন তো ঠাকুরপো—

ক্রমে অনেক রাত হয়ে এল। আর একবার শেয়ালের দল বাঁশঝাড়ের অন্ধকারে চিৎকার করে আর-এক প্রহর রাত ঘোষণা করতে লাগল। বললাম, আর কী লিখব বলুন—

নিরু বউদি বললে, আর লিখুন···

বলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেল নিরু বউদি। কী যেন কান পেতে শুনছে।

বললে, এখুনি আসছি ঠাকুরপো, খুকু উঠেছে, যাই আবার, নইলে বিছানা ভাসিয়ে দেবে—

বলেই হুড়মুড় করে উঠে পালিয়ে গেল।

বোয়ালমুড়ি গ্রামে প্রথম যেদিন গিয়েছিলাম, তখন তার বাইরে থেকে কেবল ডোবা, মশা, বাত, সান্নিপাতিক, লাঠি, কাশি, বাঁশঝাড় আর বাদুড়ই দেখেছি। কিন্তু সেই মুহূর্তে সেই মধ্যরাত্রের অন্ধকারে রায়বাড়ির চণ্ডীমণ্ডপে বসে মনে হল, বোয়ালমুড়ি গ্রাম যেন বড় সুন্দর, বড় মধুর। একটিমাত্র মানুষের জন্যে বোয়ালমুড়ি গ্রামের সব-কিছু যেন আজ সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে উঠল। আমি শহরের মানুষ, সিনেমা-রেডিও ট্রাম-বাস অধ্যুষিত অঞ্চলের অধিবাসী, কিন্তু তবু সেই মুহূর্তের জন্যে কলকাতা শহরকেও যেন বোয়ালমুড়ির চেয়ে ছোট মনে হল, সংকীর্ণ মনে হল, অপরিসর, অনুদার মনে হল।

হঠাৎ বউদি আবার ঘরে ঢুকেছে।

বললে, ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি ঠাকুরপো?

বললাম, যদি আপনার কষ্ট হয় তো থাক্-না বউদি, আমি তো আরো দু'দিন আছি, আপনার এ-চিঠি আমি শেষ করে তবে যাব।

—না ভাই, চিঠি আজকে অনেকদিন পরে লিখছি। অনেকদিন মা'র কোনও খবর পাইনি কিনা, বড্ড মনটা কেমন করছে। তা মাখনও তো একটা চিঠি দিতে পারে। বলুন, তুই তিনটে পয়সা খরচ করে দু'ছত্তোর লিখতে পারিস না ? মেয়েমানুষ তো নয়, বুঝবে কি ? আর বুঝলুম না-হয় যে, তোর অবস্থা ভালো নয়, আমাকে নিয়ে গিয়ে খাওয়াবার পয়সা তোর নেই, ধারধোর করে, যজমানদের কাছ থেকে ভিক্ষে করে অতগুলো ছেলেপুলের সংসার চালাতে হয়, কিন্তু তিনটে পয়সার তো মামলা, আর সে-তিনটে পয়সা না-হয় আমিই দিয়ে দিতুম—

বলতে বলতে নিরু বউদি থেমে গেল খানিকক্ষণ।

তারপর খুব খানিকটা হেসে নিলে। বললে, আসলে তা নয়, আসলে কী জানেন ঠাকুরপো ?

বললাম, আসলে কী ?

—আসলে অভিমান হয়েছে আমার ওপর।

—আপনার ওপর অভিমান ?

—হ্যাঁ, আসলে অভিমান ছাড়া আর কিছু নয়। আমার শ্বশুরবাড়ির অবস্থা ভালো, ভাসুর জমিদারী সেরেস্তাতে কাজ করেন, আমার হাতে সংসার-খরচের টাকা, জানে তো সব তারা, আমি কেন পাঠাইনা কিছু তাদের সংসারে, এই হয়েছে আসল ব্যাপার, জানেন। তা আপনি তো দেখছেন ঠাকুরপো রায়বাড়ির অবস্থা। যখন বোল-বোলা অবস্থা ছিল, তখনকার কথাই ছিল আলাদা, কিন্তু এখন তো দেখছেন—কী দিয়ে আপনাকে ভাত দিই তার ভাবনাতেই অস্থির আমি। গুড় মুড়ি দিয়ে ছেলেমেয়েদের না-হয় ভোলালুম কিন্তু ওই বুড়ো মানুষ শাশুড়ী, ওঁকে কি করে বোঝাই বলুন তো ? উনি তো কিছু বুঝবেন না—আর আমার নিজের সংসার বলতে তো কিছু নেই—বলুন, আছে ?

বললাম, কেন, নেই কেন বলছেন বউদি, আপনার ভাসুরের ছেলে-মেয়েরাই তো আপনার নিজের ছেলেমেয়ের মতন, তারা তো আপনাকেই মা বলে ডাকে।

—তা হোক, হাজার হলেও পেটের ছেলে আর পরের ছেলে সে তো আর এক জিনিস নয়। আমার জা যখন ছিল, বলত, তুই বেশ আছিস ঝাড়া-ঝাপটা, কোনও ঝামেলা নেই। কিন্তু সেই জা-ই বা এখন কোথায় গেল, আর আমিই বা কোথায় ? ওদের নিয়েই তো আমার সংসার এখন। আমার ভাসুর তো শুধু এসে দেখে যান মাসে মাসে আর টাকা পাঠিয়ে দেন কিন্তু ঝামেলা তো আমাকেই পোয়াতে হয় সব। তা সে জায়ের ছেলেই হোক আর নিজের ছেলেই হোক—

বললাম, কিন্তু মা'র কাছে যে যাবেন বলছেন, এদেরও কি নিয়ে যাবেন সঙ্গে ? না হলে ওদের দেখবে কে ?

নিরু বউদি কেমন যেন ম্রিয়মাণ হয়ে এল। বললে, তাও ভাবি এক এক বার ঠাকুরপো, বলি তো যাব বাপের বাড়ি কিন্তু আমি গেলে ওদের দেখবে কে ?

আমি যদি এমনিতেই একটু সামনে না থাকি তো অস্থির, কে ওদের জামা পরিয়ে দেবে, কে খাইয়ে দেবে, কে নাইয়ে দেবে—

তারপর একটু থেমে নিরু বউদি বললে, বয়ে গেল আমার, কে ওদের কথা ভাবে। দেখছেন তো ঠাকুরপো এই সংসারের অবস্থা, যার-যার তার-তার, ওরা যখন বড় হবে তখন তো বুঝবে আমি ওদের কে, কেউ-ই নই বলতে গেলে—

বলতে বলতে হঠাৎ থেমে বউদি বললে, খুকু কাঁদছে না ?

আমিও কান পাতলাম। বললাম, কই ? কেউ তো কাঁদছে না ?

—ওই দেখুন, ওইরকম কেবল হয় আমার। মনে হয় ঘুমোতে ঘুমোতে যদি খুকু খাট থেকে পড়ে যায়। রাত্তিরে ঘুম নেই, দিনে শান্তি নেই, আমার জা মরে গিয়ে আমায় একেবারে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখে দিয়ে গেছে ভাই। আমি এ-সংসার থেকে পালাতে পারলে বেঁচে যাই। মনে হয় যেখানে দু'চোখ যায়—যাই পালিয়ে। কিন্তু ওই ছেলেরা, ওই অন্ধ মানুষ বুড়ী শাশুড়ী—সামনে তো দেখছেন আমাকে কত বকুনি, একটু চোখের আড়াল হলেই ডাকবেন বউমা বউমা, অ বউমা, অ···। ও'র মুখে বুড়ো বয়েসে একটা ভগবানের নাম পর্যন্ত নেই, রাধা-কেষ্টর নাম নেই, কেবল হা বউমা আর যো বউমা······বউমা যেন হয়েছে ও'র জপতপ—

হঠাৎ নিরু বউদি বললে, যাকগে বাজে কথা, দু'দিনের জন্যে আপনি এসেছেন আর আপনাকে নিজের কথা শুনিয়ে যত কষ্ট দেওয়া, ছি ছি, আপনারও ঘুম হল না—

বললাম, আমার আর কী এমন কষ্ট—আপনাকে তো সেই ভোর রাত্তিরে উঠতে হবে আবার—

নিরু বউদি তেমনি হাসতে হাসতে বললে, আমার কথা ছেড়ে দিন ভাই ঠাকুরপো, আমি তো পুকুরঘাট, গোবর-নিকোনো আর রান্নাঘর এইসব নিয়েই ভূতের বেগার খেটে মরব সারা জীবন। অথচ কার যে সংসার আর কে যে খেটে মরে তারই কোন হিসেব-নিকেশ হলনা আজ পর্যন্ত। তা যাক, চিঠিখানা একবার সমস্তটা পড়ুন তো—কী লিখলেন শুনি—

সমস্তটাই পড়লাম।

নিরু বউদি ঝুঁকে পড়ে মন দিয়ে সমস্তটা শুনলে। তারপর চিঠিখানা নিয়ে উঠল। উঠে ঘোমটাটা ভালো করে টেনে দিলে মাথায়। বললে, অনেক রাত করে দিলুম আপনার, মনে মনে গালাগালি দিচ্ছেন তো খুব—

—ছি ছি, আপনার মতো একজন বউদি পেলাম, লাভ তো আমারই—

—লাভ যা বুঝতে পারছি, একদিন মনের মতো করে ঠাকুরপোকে খাওয়াব সেই ক্ষমতাই ভগবান দিলেন না। কী আর বলব। ক'টা বাজল দেখুন তো আপনার ঘড়িতে ?

ঘড়ি দেখে বললাম, দুটো বাজতে…

—উঃ কত অপরাধই যে করছি—আমার পাপের আর শেষ নেই সত্যি।… আচ্ছা আসি ভাই—

বলে নিরু বউদি ঘরের বাইরেই চলে যাচ্ছিল।

হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, মণি বলছিল আপনি নাকি আসছে মঙ্গলবার চলে যাচ্ছেন ?

—হ্যাঁ, আর কতদিন আপনাকে কষ্ট দেব ?

—ইস্‌, ভারী কষ্ট দিচ্ছেন, এমনি কষ্ট মাঝে মাঝে দিলে তবু তো বাঁচি। তারপর যখন বিয়ে-থা করবেন তখন তো বোয়ালমুড়ির কথা একেবারে ভুলেই যাবেন—

কী জানি কী হল আমার। বললাম, না বউদি, কত দেশেই তো ঘুরি। হরিদ্বার মথুরা, বৃন্দাবন, কাশী, গয়া। কিন্তু বোয়ালমুড়িতে এসে যা লাভ হল তা কোথাও হয়নি বউদি—

নিরু বউদি বোধ হয় হাসতেই যাচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ হাসি থামিয়ে বললে, আচ্ছা ঠাকুরপো, একটা কথা বলি। আপনি তো অনেক জায়গায় ঘুরেছেন, না ভাই—অনেক তীর্থস্থান ?

বললাম, হ্যাঁ পিসীমাকে নিয়ে অনেক জায়গায় তো ঘুরতে হয়েছে—

নিরু বউদি বললে, মথুরা গেছেন ? কাশী ? বৃন্দাবন ? জগন্নাথক্ষেত্তর ?

বললাম, হ্যাঁ—

—ওখানে অনেক সাধু-সন্নিসী আছেন, না ?

—তা আছে হয়ত। কেন বলুন তো ?

নিরু বউদি যেন একটু থতমত খেয়ে গেল। বললে, না, এমনি বলছিলুম—তীর্থক্ষেত্রেই তো সাধু-সন্নিসীদের ভিড় হয়…

হঠাৎ নিরু বউদির চোখের দিকে চেয়ে যেন কেমন অবাক হয়ে গেলাম। মুখের সেই হাসি যেন কোথায় মিলিয়ে গেছে। নিরু বউদির এ-চেহারা যেন আমার অচেনা। নিরু বউদি যেন এখন আর মেয়ে নয়, মা নয়, গৃহিণী নয়, এমন-কি বউদিও নয়। হঠাৎ যেন নিরু বউদিই একনিমেষে এক নারীতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। আর শুধু নারীও নয় যেন—বধূ। বউ। কোন এক বিবাগীর বউ ! এতদিনের মধ্যে এমন রূপ যেন আজ প্রথম দেখলাম।

একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলাম। কখন নিরু বউদি ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল দেখতে পাইনি। দেখতে পেলাম যখন একটু পরেই আবার ফিরল।

হাসতে হাসতে বললে, এই দেখুন ভাই ঠাকুরপো, আমার মাথার ঠিক নেই—আমি আর এ-চিঠি কাকে দিয়ে ডাকে ফেলব, বরং এটা আপনার কাছেই থাক্‌, আপনি যখন সকালবেলা পোস্টাপিসের দিকে যাবেন, এ-চিঠিখানা ডাকবাক্সে

ফেলে দেবেন। চললুম ভাই, ঘরে আবার শাশুড়ীর গলা পাচ্ছি—

বলতে গেলে জীবনে সেই আমার নিরু বউদির সঙ্গে প্রথম এবং শেষ সাক্ষাৎ। আজ নিরু বউদি বেঁচে আছেন কিনা তাও বলতে পারব না। ফটিকদা, ফটিকদার অন্ধ মা—নিরু বউদির সেই দজ্জাল শাশুড়ী—তিনিও বেঁচে আছেন কিনা তা-ও বলতে পারব না। কারণ বোয়ালমুড়ির সঙ্গে আমার সমস্ত সম্পর্ক শেষ হয়ে গেছে পিসীমা মারা যাবার সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু নিরু বউদির সঙ্গে তার মায়ের যে আর দেখা হয়নি তা আমি আজো সঠিকভাবেই বলে দিতে পারি। আসলে সেদিনকার সেই অত রাত জেগে লেখা চিঠিটা আমি শেষ পর্যন্ত ডাকবাক্সেই ফেলিনি! কারণ ফেলতে আমার মানা ছিল। ফটিকদাই মানা করেছিল আমাকে।

আজ সেই ঘটনাটি বলি।

পরদিন ভোরবেলা, তখনও ভালো করে জাগিনি। একটা গরুর গাড়ি এসে দাঁড়াল রায়বাড়ির চণ্ডীমণ্ডপের সামনে। দরজা খুলে দেখি ফটিকদা। জমিদারী সেরেস্তার কাজ সেরে প্রচুর মালপত্র নিয়ে রাত থাকতেই এসে পড়েছে। জামাটা গায়ে দিয়ে সকাল-সকাল চিঠিটা ডাকে দেব বলে বেরিয়েই পড়ছিলাম।

ফটিকদা বললে—ভায়া যে—

বললাম, এখন এলেন ?

গুড়ের নাগড়ি, কুলো-ডালা, মানকচু, নারকেল-কাঁদি, নানা রকমের জিনিস বোঝাই। তারই তদারক করতে ব্যস্ত ফটিকদা। তবু বললে, কেমন আদায়পত্তর হচ্ছে ভায়া ?

তারপর একটু থেমে বললে, প্রাতঃভ্রমণ করতে চললে বুঝি ?

বললাম, না, নিরু বউদির একটা চিঠি ছিল, ডাকবাক্সে ফেলতে যাচ্ছি, খুব জরুরী—

—চিঠি ! কার বললে ? ছোটবউমার ?

ফটিকদার মুখের ভাব হঠাৎ যেন আমূল বদলে গেল একেবারে।

বললে, বড়মাতলায় মা'কে লেখা ?

বললাম, হ্যাঁ—কিন্তু···

বললে, দেখি—

চিঠিটা দিলাম হাতে। দু'এক লাইন পড়েই কী হল ফটিকদার, টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললে দুই হাতে। বললে, এ-চিঠি পাঠিয়ে কোনও কাজ হবেনা ভাই, কিছু মনে কোরো না—

তবু অবাক হওয়া আমার আরো বেড়ে গেল।

ফটিকদা বললে, ছোটবউমারই কপালের ভোগ। নইলে কোলে একটা ছেলেপুলেও নেই, আর স্বামীও গেল বিবাগী হয়ে—তার ওপর নিজের মা, তা-সে গরীবই হোক আর যা-ই হোক, মা তো, তা সেই মা-ও···

কী যেন বলতে গিয়ে থেমে গেল ফটিকদা।

তারপর বললে, তা সেই মা-ও আর বেঁচে নেই। ছোটবউমাকে খবরটা শোনাব কেমন করে তাই মনে মনে ভাবছিলাম—বড়মাতলায় গিয়েছিলাম প্রজাবিলির কাজে, সেখানেই শুনলাম খবরটা। এমন পাষণ্ড ভাই, একবার আমাদের জানায়ওনি। একেই নানা অশান্তি ছোটবউমার মনে, এর ওপর যদি আবার মায়ের মৃত্যুর খবরটা দিই তো…

জানিনা পরে কোনও দিন নিরু বউদিকে খবরটা শেষ পর্যন্ত জানানো হয়েছে কিনা। জানার পর মুখের সেই হাসিও বন্ধ হয়ে গেছে কিনা চিরকালের মতো। কিছুই জানি না।

বোয়ালমুড়ি থেকে চলে আসবার দিন ইচ্ছে হয়েছিল নিরু বউদির সঙ্গে একবার দেখা করে আসব। অনেকবার সুযোগও খুঁজেছিলাম। কিন্তু ভাসুর বাড়িতে থাকায় সে-সুযোগ আর হয়নি। শুধু কানে এসেছিল শাশুড়ীর সেই গলা, অ বউমা, বলি শুনতে পাচ্ছ, অ বউমা, বউমা, অ…

শুধু বেরোবার সময় ফটিকদা বলেছিল, তোমাকে তো পিসীমাকে নিয়ে অনেক তীর্থস্থানে ঘুরতে হয় ভায়া—একটা কাজ করবে?

বললাম, বলুন?

ফটিকদা বললে, আমার তো সময়ও হয় না, আর সামর্থ্যও নেই আগেকার মতো, তবে আমাদের বাবুরা গিয়েছিল এবার কামাখ্যেয়, জানো, বলছিল নাকি আমার ভাইয়ের মতো এক সাধুকে ঘুরে বেড়াতে দেখেছে ওখানে। কে জানে—

তারপর একটু থেমে আবার বললে, শুধু ওঁরাই নয়, বারুইপুরের কৈলাস আচার্যও গেল-বছর শ্রীক্ষেত্রে গিয়েছিলেন, বলছিলেন, অবিকল তোমার ভাইয়ের মতো চেহারা ফটিক, দাড়ি গোঁফ ঢাকা, ধরতে পারলুম না, ফসকে গেল—

—তা তুমি যদি এদিক ওদিক যাও তো খুঁজে দেখো-না ভায়া—আমার জন্যে নয়, ওই ছোটবউমার কথা ভেবেই কষ্ট হয়। হাজার হোক, মেয়েমানুষ তো…

তারপর মথুরা, বৃন্দাবন, কাশী, কামাখ্যা, হরিদ্বার, প্রয়াগ, পুষ্কর আবার গিয়েছি। একবার নয়, অনেকবার। পিসীমা যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন তাঁকে নিয়ে তো গিয়েছিই, এখন একলাই যাই। ও মন্দির, ঠাকুর, পুজো-পার্বণ ও-সব দেখি আর না-দেখি, সাধু-সন্নিসী দেখা বাদ দিই না! সাধু দেখলেই পরিচয় করি। হাত দেখাবার নাম করে, কোষ্ঠী-গণনার ছুতোয়, কখনও বা ভোজন করিয়ে আলাপ করবার চেষ্টা করি। ভাব জমাই। কোনও সূত্রে যদি কোথাও বোয়ালমুড়ি গ্রামের ফটিকচন্দ্র রায়ের ভাই নিরু বউদির স্বামীর সন্ধান পেয়ে যাই।

আজ আবু পাহাড়ে এসেও অনেক সাধু দেখলাম। গুহায় ভর্তি পাহাড়। পদে পদে গুহা। সাধুর শেষ নেই। তিনশো বছরের উলঙ্গ সাধু, কেউ আবার

তানপুরা নিয়ে ধ্রুপদ গেয়ে চলেছেন আপন-মনে, শিষ্য পাশে বসে পাখোয়াজ বাজাচ্ছেন। আর কোথাও বা গুহার ভেতর ইলেকট্রিক আলো, রেফ্রিজারেটর। দশ আঙুলে দশটা আঙটি-পরা ডবল এম-এ পাস সিল্কের গেরুয়া-পরা এক সাধু প্লেটে করে আঙুর খাচ্ছেন, আর পাশে বসে সিন্ধী শিষ্যা পাখার বাতাস করে চলেছে পরম ভক্তিভরে।

এত বিচিত্র পৃথিবী, এত বিচিত্র এর মানুষ আর মানুষের মিছিল, এর মধ্যেও বোয়ালমুড়ি গ্রামের সেই পাড়াগেঁয়ে বউটির কথা কিছুতেই আর মন থেকে তাড়াতে পারি না।

গল্প-লেখকের গল্প

আমি সম্প্রতি বাড়ি বদলেছি। এতে আমার নিজের সুবিধে বা অসুবিধে যা-ই হোক, অসুবিধে সবচেয়ে বেশি হয়েছে মনোহরের।

ক'দিন থেকে মনোহরের অভাব বড় তীব্রভাবে অনুভব করছিলাম! চাষের পক্ষে যেমন লাঙল, বাগানের পক্ষে যেমন মালী, পানের পক্ষে যেমন চুন, আমার মতন গল্প-লেখকের পক্ষেও তেমনি মনোহরের প্রয়োজন অপরিহার্য।

শ্যামবাজারের রাস্তায় হঠাৎ একদিন মনোহরের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

বললে—আপনি বাড়ি বদলেছেন স্যার, আমায় তো বলেননি?

বললাম—আমিও তোমায় খুঁজছি ক'দিন থেকে, তোমার সঙ্গে আমার বিশেষ দরকার—

মনোহর এসব ক্ষেত্রে বুঝতে পারে। বললে—গল্প চাই বুঝি?

বললাম—গল্প তো চাই—কিন্তু খুব ছোট গল্প—এই ধরো দশ মিনিটের মতন।

মনোহর বুঝতে পারলে। পাকা লোক। অনেকদিন এ-লাইনে আছে। ছোট গল্পের কারবারে নিজে না থাকলেও যারা গল্প লেখে তাদের কাছে যাতায়াত আছে। হঠাৎ গল্পের ফরমায়েস হলে চট করে প্লট দেওয়ার কাজ করে আসছে আজ বহুদিন। কত মাপের গল্প ফেনিয়ে কত বড় করলে ক'ফর্মা কাগজ লাগে তারও হিসেব মনোহরের মুখস্থ। দুনিয়ার খবর, দুনিয়ার চরিত্র নিয়ে হামেশা ঘাঁটাঘাঁটি করছে, তেমন লাগসই কিছু গল্প পেলে দৌড়ে এসে হাজির হয় আমার কাছে। গল্প-পিছু পাঁচ টাকা রেট করে দিয়েছি আমি। বড় গল্প হলে কখনও কখনও পনেরো-কুড়ি টাকার কমে ছাড়ে না। আর ছোট ফর্মা-আটেক-এর উপন্যাসের মাল-মশলা হলে তিরিশ-চল্লিশ টাকাও সময়ে সময়ে দিয়ে থাকি। এ-খবর শুধু মনোহর জানে আর আমি জানি। খবরের কাগজের অফিসে চাকরি। প্রতি রবিবারে স্বনামে, বেনামে, ছদ্মনামে একটা করে গল্প লিখতে হয়। মনোহর না থাকলে চাকরি থাকাই দায় হয়ে উঠতো। তা ছাড়া রেডিও আছে, সিনেমা আছে, সাপ্তাহিক, মাসিক, নানা রকমের আবদার উৎপাত আছে। সুতরাং মনোহর ছাড়া আমার গতিই নেই বলতে গেলে।

আবার বললাম—খুব ছোট্ট গল্প, বেশি বড় যেন না হয়—

মনোহর জিজ্ঞেস করলে—খবরের কাগজের ক'কলম চাই বলুন না—

বললাম—এবার কলমের হিসেব নয়, দশ মিনিট সময়, তার মধ্যে শেষ করতেই হবে।

মনোহর বললে—বুঝেছি, রেডিও*—

বললাম—রেডিও-ই হোক আর যা-ই হোক, তোমার অত ভাববার দরকার নেই—তুমি মিনিট পাঁচেকের মতো মশলা দাও, আমি তাকে ফেনিয়ে দশ মিনিট করে নেব—

মনোহর হেসে বললে—তা কত দেবে ওরা ?

বললাম—তোমার ওই বড় দোষ, তোমার পাঁচটা টাকা পেলেই তো হলো, ছোট গল্প বলে তো তোমাকে আর কম দিচ্ছি না, তোমাকে যা বরাবর দিই তাই-ই দেব—তা কবে আসছো বলো ?

মনোহর বললে—তা হলে কালই যাবো, সকালের দিকে—

বললাম—ঠিক যেয়ো কিন্তু—

মনোহর বললে—আগে বেশ কাছাকাছি ছিলেন—হুট করে চলে যেতাম—এখন কোথায় শ্যামবাজার আর কোথায় চেতলা—তা এদিকে আর বাড়ি পেলেন না ?

মনোহরের ওই বড় দোষ ! বড় বাজে কথা বলে। কথার ভিড় সরিয়ে আসল গল্পটি আমাকে বার করে নিতে হয়। টাকার যখন দরকার থাকে, তখন ঘন-ঘন হাজির দেয়। হঠাৎ হয়ত একদিন সন্ধ্যেবেলাই এসে হাজির। দৌড়তে দৌড়তে এসে হয়ত হাঁফাচ্ছে তখন।

বলি—কী ব্যাপার ! এমন অসময়ে যে ?

মনোহর বলে—একটা ভালো জুৎসই গল্প পেয়ে গেলাম স্যার—

বললাম—শরীরটা খারাপ, এখন গল্প দরকার নেই—

মনোহর বলে—খুব ভালো গল্প ছিল স্যার, একেবারে টাটকা চোখে দেখা, খুব নাম হয়ে যেত আপনার—

বললাম—না, থাক্, এখন দরকার নেই—

মনোহর তবু পীড়াপীড়ি করে—এখন দরকার না থাক্, নোটবুকে লিখে রাখতেন—তবে খুব জুৎসই গল্প বলেই আপনার কাছে আসা, আপনার হাতে খুলতো ভালো ! একটু ফেনিয়ে লিখতে পারলে বারো কিস্তির একটা ছোট উপন্যাস হয়ে যেত আপনার। তা আপনি যখন চাইছেন না বলছেন, তখন থাক্, অন্য লোক দেখিগে—

মনোহর এইরকম। এমন ঘটনা ঘটলে বুঝতে হবে মনোহরের টাকার প্রয়োজন অনিবার্য হয়ে উঠেছে। এসব ক্ষেত্রে দরকার না থাকলেও টাকাটা সিকেটা দিয়ে হাতে রাখতে হয় মনোহরকে।

মনোহর বলে—লেখাপড়াটা হলো না তাই, নইলে আপনাদের খোসামোদ করি ? তা হলে দেখতেন আমি নিজেই লিখতাম। ও রবিঠাকুর, শরৎ চাটুজ্যের লেখাও পড়ে দেখেছি, এমন কিছু আহা-মরি নয়— ! ছোটবেলায় বাবা পই-পই করে বানান মুখস্থ করতে বলতেন, তাঁর কথা শুনলে আজ আমার এই দশা হয় !

দশা যে মনোহরের খারাপ, সে-সম্বন্ধে কারো কোনো সংশয় নেই। নইলে মনোহরদের অবস্থা এককালে আমিই দেখেছি। বিরাট দু'মহলা বাড়ি। দাদা মস্ত বড় ডাক্তার। পাড়ায় দত্তদের নাম-ডাক ছিল প্রচুর। বাবা মারা গেল মা মারা গেল। শেষে দাদাও মারা গেল। পৈতৃক বাড়ি বিক্রি হয়ে গেল। লেখাপড়া শেখেনি মনোহর। বউ ছেলে মেয়ে নিয়ে পাড়াতেই একটা এককুঠুরি ঘর ভাড়া করলে। তারপর রোয়াকে বসে আড্ডা দিতে লাগলো।

পাড়ায় সরস্বতীপুজো দুর্গাপুজোর সময় প্রধান কর্মী মনোহর। সকাল থেকে উদয়-অস্ত খাটছে। পুজো-প্যান্ডেলে সবাই যখন রাত্তিরবেলা ঘুমোচ্ছে, মনোহর একা-একা জেগে ঠাকুর সাজাচ্ছে। বলে—ছেলে-ছোকরাদের দিয়ে কি পুজো হয়?

বহুদিন পরে হয়ত হঠাৎ রাস্তায় দেখা।

বললাম—কোথায় ছিলে অ্যাদ্দিন, দেখিনি যে?

মনোহর বললে—আর আমাকে দেখতে পাবেন না দাদা, আমি কাজে নেমে পড়ছি—

বললাম—কী কাজ?

মনোহর বললে—এই টাকা উপায়ের কাজ, একটা শুভদিন দেখে আরম্ভ করে দেব, সাগরে গিয়েছিলাম, সব ব্যবস্থা করে এসেছি। হাজার দুয়েক টাকা যোগাড় করতে পারলে আর কথা নেই—

কিছুদিন পরে আবার দেখা।

বললাম—তোমার কাজ কেমন চলছে মনোহর?

মনোহর পকেট থেকে একটা ভাঁজ-করা কাগজ বার করে বললে—এই দেখুন, সব তৈরি—এবার কয়লা ধরবো ঠিক করেছি, টেন-পার্সেন্ট লাভ আমার কেউ আটকাতে পারবে না—তখন আপনারাই বলবেন—হ্যাঁ, মনোহর কাজের ছেলে বটে—

শুধু কয়লা নয়। যখনি দেখা হয়েছে তখনি হয় কয়লা নয় বিড়িপাতা, নয়তো দুধ, নয়তো দালালী—একটা কিছু টাকা উপায়ের ফিরিস্তি দেখিয়েছে। টাকাই যে সব, টাকা না হলে যে দুনিয়ায় কিছুই নয়—এই তত্ত্বটি সার বুঝেছিল মনোহর।

বলতো—আপনি ফেলুন না স্যার টাকা, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি মাসে হাজার টাকা উপায় করা কাকে বলে—

রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে মনোহরের গলা শুনতে পেয়েছি কতদিন! পাড়ার রোয়াকে বসে আসর গুলজার করে পাড়া কাঁপিয়ে চীৎকার করছে। হাজার টাকা, লাখ টাকা ওড়াচ্ছে!

বলছে—দে-না তুই আমাকে লাখখানেক টাকা, আমি দেখিয়ে দিই কাকে বলে

ব্যবসা করা, তখন এই একা মনোহর দত্ত সব ব্যাটাকে মাথায় চাঁটি মেরে উড়িয়ে দেবে।

আবার একদিন হয়ত বিচিত্র পোশাকে দেখা যায় মনোহর দত্তকে। গায়ে লম্বা ঝুল পাঞ্জাবি, বাহারে তেড়ি, আঙুলে আঙটি, গায়ে এসেন্সের গন্ধ, আর হাতে কুকুর-মুখো ছড়ি—কুকুরের কানে আতর-মাখানো তুলো গোঁজা।

বলতাম—একি ব্যাপার, মনোহর?

মনোহর বলে—সেকি, আপনি জানেন না?

বললাম—কী জানবো?

মনোহর বললে—আমি তো রকবাজি ছেড়ে দিয়েছি স্যার! রোয়াকে বসে বখাটেদের মতন খালি আড্ডা, আমাদের বংশে ওটা মানায় না, কী বলুন—ভেবে দেখলাম, তাতে যে সময়টা নষ্ট হয় তাতে কাজ করলে বরং কিছু টাকা আসে—

বললাম—তা এ তো ভালো কথা—

মনোহর বললে—না স্যার, ভেবে দেখলাম টাকা যখন উপায় করতে জানি, চুপচাপ আড্ডা মারা কোনও কাজের কথা নয়,—ওতে শুধু কাজের ক্ষতি হয়—তাই এখন কাজ নিয়ে আছি, এতে বেশি খিদে হচ্ছে, দু'সের ওজন বেড়ে গেছে—

বললাম—খুব ভালো কথা, খুব সুখের কথা মনোহর—তোমার যে কাজে মন লেগেছে এতেই খুশী হয়েছি।

মনোহর বললে—এই দেখুন না, এবার থেকে ফরসা জামা-কাপড় পরবো ঠিক করেছি, কাজের লোকের সঙ্গে মিশতে গেলে এসব দরকারী—কি বলেন! এতে খরচ অবশ্য বাড়ে। তা বাড়ুক—টাকা যদি আসে তো খরচ বাড়লে ক্ষতি কী!

বললাম—কিন্তু কাজটা কী?

মনোহর বললে—এখন আমার কাছে স্যার বিজ্‌নেস্ ইজ্ বিজ্‌নেস্—ফ্যালো কড়ি মাখো তেল—এই পলিসি ধরেছি, আর মুফতের কারবার নয়—এখন আমারও ছেলেপুলের সংসার, মাস গেলে গয়লা, মুদি সবই তো আছে—না কি বলুন—?

তবু বুঝতে পারলাম না—কীসের কারবার মনোহরের।

জিজ্ঞেস করলাম—দালালী করছো বুঝি?

মনোহর বললে—না স্যার, দালালী বড় খোসামুদে কাজ, ওতে প্রেস্টিজ্ থাকে না—দশজনের বাড়িতে গিয়ে কেবল খোসামোদ করো, পায়ে তেল দাও—

বললাম—চালানী কারবার?

মনোহর বললে—না স্যার, ও-ও আমি করে দেখেছি, ওতে নানান ল্যাঠা, বড় হিসেবের ঝঞ্ঝাট, অফিসের বড়বাবুদের ঘুষ দাও, বড়সাহেবদের ঘুষ দাও, চাপরাশিদের ঘুষ দাও—ও ঘুষের কারবারে আমি আর নেই—!

বললাম—তবে কীসের কারবার তোমার ?

মনোহর বললে—আমি স্যার তবলা বাজাই। বাড়িতে এসে খোসামোদ করে নিয়ে যায়—মাইফেল হয়, চা-পান-সিগ্রেট লুচি মাংস খাওয়া হয়—পকেটে আসেও দু'পয়সা।

কিন্তু তবলাই যদি বেশিদিন চালাতে পারবে, তবে মনোহর দত্ত মনোহর হয়েছে কেন !

হঠাৎ একদিন শুনি মনোহরকে পুলিসে ধরে নিয়ে গেছে।

তা এই মনোহরকে আমি বহুদিন ধরেই দেখে আসছি। আমি যেমন মনোহরের কাছে পুরোনো, মনোহরও তেমনি আমার কাছে পুরোনো হয়ে গিয়েছিল। সব পাড়াতেই এরকম দু'চারজন থাকে, যারা পাড়ার গৌরবও বটে, অগৌরবও বটে। তাদের না হলে বারোয়ারী পুজো যেমন চলে না, আবার তেমনি গুণ্ডা-বদমায়েসরাও তাদের হাতে সায়েস্তা থাকে। ঘরে থেকেও তারা বাইরের জীব, আবার বাইরে থেকেও তারা গৃহী।

সুতরাং আমি তেমন আমল দিইনি মনোহরকে। এসেছে, গেছে, কখনও তার জীবিকা নিয়ে মাথা ঘামাইনি। বরং একটা বনেদী বংশের নষ্ট সন্তান বলেই গণ্য করে এসেছি মনোহরকে বরাবর। এমন অনেক আছে। যে বংশের কোনও মানুষ কোনওদিন রাস্তায় পায়ে হেঁটে বেড়ায়নি, তাদের বংশের কুলতিলককে রাস্তায় আড্ডা দিয়ে বেড়াতে দেখেছি। মনোহর তাদেরই মতো একজন। হঠাৎ হয়ত একদিন এক ঠোঙা খাবার নিয়ে এসে পায়ের কাছে রেখে দিয়ে গেছে।

জিজ্ঞেস করেছি—এসব আবার কী মনোহর ?

মনোহর বলেছে—আজ্ঞে পেসাদ—

—কীসের প্রসাদ ?

মনোহর বললে—এবার কারবারে কিছু লাভ হলো, তাই···

—কীসের কারবার ?

মনোহর বললে—এই মাইফেলে গিয়ে কিছু উটকো টাকা পেয়ে গেলাম, প্রায় পঞ্চাশ টাকার মতন, তাই ইয়ার-বন্ধুরা ধরলে খাওয়াবার জন্যে—বাড়িতে মাংস পোলাও করে খাইয়ে দিলাম, তা আপনাকে তো আর খেতে বলতে পারি না তাদের সঙ্গে। তাই কিছু মিষ্টি দিয়ে গেলাম—

মনে পড়ে গেল। বললাম—শুনলাম জেলে গিয়েছিলে তুমি ?

মনোহর বললে—সে আর বলবেন না দাদা, ওঃ, জায়গা বটে, দেশ স্বাধীন হলো না ছাই হলো, জেলখানা সেই একই রকম আছে দাদা—কোন পরিবর্তন হয়নি— ! আপনারা লেখক মানুষ, লিখতে পারেন না ঠেসে ?

তারপর লম্বা ফিরিস্তি দিলে মনোহর। জেলখানায় যা-যা ভুগতে হয়েছে তারই ফিরিস্তি। সেখানে না আছে একটা ব্যবস্থা, না আছে বন্দোবস্ত। কেউ

কাজ করে না। ফাঁকিবাজ সব। সব বসে বসে মাইনে গুনছে। কয়েদীদের পাওনা-গণ্ডা দ্যাখেনা কেউ। ডিউটি দিতে ভুল করে! আমি একদিন ধরিয়ে দিলুম। বললুম—খবরের কাগজে এ-সম্বন্ধে লিখতে হবে দাদাকে বলে! আপনি খবরের কাগজে আছেন—এই নিয়ে লিখুন-না একটা, ভদ্রলোকের ছেলে আমরা, না-হয় জেলেই গেছি, কিন্তু তা বলে ফাঁকি দেবে সবাই!

তা সেই হলো সূত্রপাত! কোন্ বাগানবাড়িতে কোথায় মাইফেল করতে গিয়ে খুন-জখমের মামলায় জড়িয়ে পড়ে মনোহর। তারই ফলে ছ'মাসের কয়েদ। সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করলাম। বহুদিন জেলখানার কয়েদী নিয়ে গল্প লেখবার ইচ্ছে ছিল—যা জানতাম না, জেনে নিলাম মনোহরের কাছে। গল্প লেখার পর পাঁচটি টাকা মনোহরকে দিয়েছিলাম। বলেছিলাম—এই নাও মনোহর—পাঁচটি টাকা তুমি নাও—

মনোহর অবাক হয়ে গিয়েছিল প্রথমে। বলেছিল—কীসেব টাকা দাদা?

বললাম—সেই-যে তুমি আমাকে জেলখানার গল্প বলেছিলে—তার দক্ষিণে—

টাকাটা ট্যাঁকে গুঁজতে গুঁজতে মনোহর বললে—তা স্যার, আপনাকে আমি আরো গল্প দিতে পারি—

—তা দিয়ো, গল্প পিছু পাঁচ টাকা করে তুমি পাবে।

তারপর থেকে সময়ে-অসময়ে বহু গল্প আমাকে যুগিয়েছে মনোহর। তার কতক ব্যবহার করেছি, কতক করিনি। অনেক গল্প গল্পই নয়। বাড়িয়ে, বদলে, কমিয়ে কিছুতেই কিছু হয়না তার। সে-গল্প বিক্রী করে আমি হাজার-হাজার টাকা উপায় করেছি। লোকে আমায় বাহবা দিয়েছে! আমার সুনাম হয়েছে দেশে। সভাপতিত্ব করে এসেছি আমি নানা দেশের নানা সভায়। আমার গভীর অন্তর্দৃষ্টিতে সবাই অভিভূত হয়েছে, আমার লোক-চরিত্র-জ্ঞানে সবাই মুগ্ধ হয়েছে। কিন্তু আসলে আমার কিছু নয়—সব কৃতিত্ব মনোহরের। মনোহর আমায় মাল-মশলা যুগিয়েছে, তাই আমি লেখক হতে পেরেছি। তাই তো বলছিলাম,—চাষের পক্ষে যেমন লাঙল, বাগানের পক্ষে যেমন মালী, পানের পক্ষে যেমন চুণ—আমার মতন গল্প-লেখকের পক্ষেও মনোহর তেমনি অপরিহার্য!

তা সেই মনোহর কাছে না থাকাতে ক'দিন যেন অসহায় বোধ করছিলাম।

নতুন বাড়িতে এসে পর্যন্ত মনোহরকে খবর দেওয়া হয়নি। এতদিন পরে দেখা হওয়াতে যেন নিশ্চিন্ত হলাম।

বললাম—ঠিক যেয়ো কিন্তু—

মনোহর জিজ্ঞাসা করলে—আপনার ঠিকানাটা?

বললাম—উনত্রিশের একের এক, চেতলা সেন্ট্রাল রোড—

মনোহরের মুখের দিকে চেয়ে দেখি কেমন যেন অন্যমনস্ক ভাব।

বললাম—উনত্রিশের একের এক, মনে থাকবে তো?

মনোহর তবু যেন কী ভাবছিল।

বললে—উনত্রিশের একের এক ! আচ্ছা, দাঁড়ান—

হঠাৎ যেন কী হলো মনোহরের। সামান্য ঠিকানা, সামান্য একটা বাড়ির নম্বর নিয়ে এত মাথা ঘামাবার যে কী আছে বুঝতে পারলাম না। সারা কলকাতা যে চষে বেড়ায়, সারা কলকাতার রাস্তা যার মুখস্থ, সেই মনোহর কিনা আমার বাড়ির নতুন ঠিকানা শুনে অবাক হয়ে গেছে।

খানিক পরে মনোহর বললে—মাফ করবেন দাদা, আপনার বাড়িতে আমি যেতে পারবো না—

অবাক হয়ে গেলাম। বললাম—কেন ?

কেন-র জবাব মনোহর চট করে দিতে পারলে না। কী যেন ভাবতে লাগলো আপন-মনে। আমিও কিছু ঠিক করতে পারলাম না। টাকার লোভ মনোহর ত্যাগ করতে পারবে এমন তো নয়। রাতারাতি কি মনোহর এমন অবস্থা ফিরিয়ে ফেললে যে, আমার সাহায্যের প্রত্যাশীই সে নয় !

বললাম—টাকার বুঝি আর তোমার দরকার নেই মনোহর ?

মনোহর সঙ্কুচিত হয়ে বললে—টাকার দরকার নেই আমার ! কী বলেন আপনি ! টাকা আমায় দিন-না যত দেবেন ! আমার অভাবের শেষ নেই স্যার ! অভাব কি একটা ! বাড়িতে তিনটে ছেলের একসঙ্গে টাইফয়েড, তা জানেন !

বললাম—তা হলে বাস ভাড়ার জন্যে ভাবছ তো ? সে যাতায়াতের ভাড়া তোমার আমি দেব মনোহর, তুমি চিন্তা কোরো না—

তবু যেন মনোহর কেমন চিন্তাগ্রস্ত হয়ে রইল।

খানিক পরে বললে—আচ্ছা, আটাশ নম্বরের বাড়িতে যাঁরা থাকেন, তাঁদের চেনেন ?

আটাশ নম্বর ! আমার পাশের বাড়ি আটাশ নম্বর ! আটাশ নম্বরে থাকেন এক উকিল ভদ্রলোক। বেশ বনেদী বংশ। বহু কালের বাস। তিন পুরুষ ধরে ওই বাড়িতেই বংশের শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে তাঁরা তাঁদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছেন। ছেলেরা লেখাপড়া শিখেছে, ডিগ্রী নিয়েছে। কেউ কেউ বিদেশ গিয়েছে। মেয়েরা লেখাপড়া শিখে বিয়ের পর চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। কেউ জব্বলপুরে, কেউ বোম্বাইতে, কেউ দিল্লী, কেউ বা হায়দরাবাদে। এক ডাকে সারা ভারতবর্ষের নাড়িতে টান পড়ে।

বললাম—তোমার কেউ হয় নাকি ওরা ?

মনোহর কেমন যেন লজ্জায় করুণ হয়ে উঠলো।

বললে—হবে আবার কে ? কেউ-ই হয় না—

—তবে ?

মনোহর আমার প্রশ্নটা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করলে।

বললে—সে আপনার শুনে কাজ নেই, মানে, সে অনেকদিন আগের ঘটনা কি-না, প্রায় একত্রিশ বছর আগের—

একত্রিশ বছর আগের কী এমন ঘটনা যার জন্যে মনোহর সে-পাড়াতেই যাবে না! কী এমন অপরাধ! কী এমন অন্যায়!

বললাম—তুমি বুঝি ওদের চিনতে?

মনোহর তবু যেন দ্বিধা করতে লাগলো। বললে—সে-সব এখন না তোলাই ভালো স্যার, সে কি আজকের কথা, তখন আমার বয়েস প্রায় ন'বছর। আর তা ছাড়া আমাদের অবস্থাও তখন ভালো ছিল—বাবা বেঁচে, মাও বেঁচে আর তখন আমাদের বংশেরও নামডাক ছিল। এখন আর কী আছে বলুন—এখন নাম বললে হয়ত চিনতেই পারবে না তারা—

বললাম—তোমাদের কি চেনাশোনা ছিল খুব ওদের সঙ্গে?

মনোহর যেন কেমন মুস্কিলে পড়লো। তারপর কী যেন ভেবে একটু হাসলো আপন-মনে। বললে—সে যে কী চেনা ছিল আপনি ভাবতেও পারবেন না স্যার। বাইরের লোকের সঙ্গে অত চেনাশোনাও হয়না কারো। একেবারে গলায়-গলায় ভাব ছিল কিনা পুতুলের সঙ্গে আমার—

বললাম—পুতুল? পুতুল কে?

মনোহর বললে—পুতুল হচ্ছে গিয়ে আপনার পদ্ম-মাসীমা'র মেজ মেয়ে—

পদ্ম-মাসীমাই বা কে আর পুতুলই বা কে—আমি কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। কেমন যেন সমস্ত জিনিসটা একটা রহস্য বলে মনে হচ্ছিল। মনোহরের মতো লোকের পেছনে যে এত রহস্য থাকতে পারে, এ কথা ভেবে কেমন যেন কৌতুক বোধ করছিলাম। কিন্তু তখনও আমার অনেক বাকী।

মনোহর বললে—সে আপনি সব বুঝবেন না স্যার—ও আপনার শুনে কাজ নেই—

বলে চলে যাবারই উদ্যোগ করছিল মনোহর!

বললাম—বলো তো তোমার ওই গল্পটাই লিখে দিই মনোহর—

মনোহর হঠাৎ ভূত-দেখার মতো চমকে উঠলো। বললে—না স্যার, আপনার পায়ে পড়ি, এ আপনি লিখতে পারবেন না—ওরা জানতে পারলে কী ভাববে বলুন তো! ছি ছি—তার চেয়ে আপনাকে আমি আর একটা ভালো গল্প দেব—

বললাম—তা হলে তুমি আমার বাড়ি আসছো তো?

মনোহর বললে—মাপ করবেন স্যার, আমি আপনার বাড়ি যেতে পারবো না, আমার ভারি লজ্জা করবে! একদিন দু'দিন তো নয়—একত্রিশ বছর পরে হঠাৎ যদি ওরা দেখে ফ্যালে, কী ভাববে বলুন তো—

বুঝতে পারলাম না। বললাম—কে দেখে ফেলবে?

মনোহর বললে—পদ্ম-মাসীমা দেখে ফেলতে পারে, পুতুলও দেখে ফেলতে পারে, তা ছাড়া সবাই-ই আমাকে চিনতো কিনা! আর শুধু কি চেনা! দিন-রাত তো ওদের বাড়িতেই আমার কাটতো, একদিন না গেলে মাসীমা ডেকে পাঠাতো, বলতো—হ্যাঁরে, আজকে আসিসনি কেন রে মনোহর?

একমুহূর্তে মনোহর দত্ত যেন আমার চোখের সামনে আবার মনোহর হয়ে উঠলো।

আমি যেন চোখের সামনে দেখতে পেলাম। একেবারে চোখের সামনে। স্পষ্ট প্রত্যক্ষ। কোন বাধা, কোনও অন্তরাল নেই আর।

মনোহর বলেছিল—আমারা তখন পুজোর ছুটিতে দু'ভাই বাবা-মা'র সঙ্গে মধুপুরে বেড়াতে গিয়েছিলাম, ওরাও গিয়েছিল,—

আমি দেখতে পেলাম—পাশাপাশি বাড়ি। একটাতে থাকে মনোহররা আর একটাতে পদ্মমাসীমা আর তার ছেলেমেয়েরা। ছোট্ট ন'বছরের একটি ছেলে। ফরসা ফুটফুটে। বাড়ির লাগোয়া বাগান পেরিয়ে একএক দিন রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। এ-বাড়ির বল খেলা করতে-করতে ও-বাড়িতে গিয়ে পড়ে।

পুতুল বলে—আমাদের বাড়ি ঢুকেছে—ও আমাদের বল—আমি দেব না মা—

পদ্মমাসীমা বলে—ছি, ওদের বল দিয়ে দাও, না বলে পরের জিনিস নিলে চুরি করা হয়, জানো না?

যাবার সময় পদ্মমাসীমা জিজ্ঞেস করে—তোমার নাম কি খোকন?

তারপর বলে—তুমি রোজ আসবে মনোহর, জানো, লজ্জা কোরো না—পুতুলের সঙ্গে আমাদের বাগানে বল খেলবে।

দুপুরবেলা—টা-টা করছে রোদ। সবাই ঘরের মধ্যে বিশ্রাম করছে! লাল বলটা নিয়ে আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসে মনোহর। কেউ যেন টের না পায়। কেউ যেন না পায়ের শব্দ পায়। কুয়োর পাড়ে বাগানের মালী বসে বসে সাবান কাচছে। দূরে জবা-গাছটা ছেয়ে রাঙা-জবা ফুটেছে। একটা চড়াই-পাখি বাতাবী নেবু গাছের পাতার আড়ালে কিচ্-কিচ্ শব্দ করে। আর বাগানের কালো-হাঁড়ি মাথায় দেওয়া কাকতাড়ুয়াটা কুমড়ো-ক্ষেতের মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে বাতাস লেগে একটু দুলে ওঠে। একটা টিকটিকিরও পায়ের শব্দ কান পাতলে শোনা যায়। সেই সময়গুলোতে কিছুতে ঘরে মন বসতো না মনোহরের। আস্তে আস্তে পদ্ম-মাসীমাদের বাগানের গেট খুলে ভেতরে ঢুকে পড়তো। চুপি চুপি পুতুলের শোবার ঘরে গিয়ে ডাকতো—পুতুল, এই পুতুল—খেলবি?

পদ্মমাসীমা বলতো—দিদি, তোমার মনোহরের সঙ্গে আমার পুতুলের কী যে ভাব, কী বলবো—দুটির বিয়ে হলে বেশ হয়!

মা বলতো—ওর দুষ্টুমি তো দ্যাখোনি ভাই—দু'চোখ যদি একটু এক-

করেছি তো ওমনি বাড়ির বাইরে চলে যাবে। ওকে জামাই করে দ্যাখ না, ও বউকে জ্বালাবে, শাশুড়ীকেও জ্বালিয়ে খাবে।

সকালবেলা দশটার সময় লোক পাঠিয়েছে পদ্মমাসীমা।

চাকর এসে খবর দিত—মাঈজী ডাকছে খোকাবাবুকে।

মা বলতো—কেন রে?

পদ্মমাসীমা বলতো—কী জানি দিদি। মনোহর সকালবেলা না এলে কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগে—সকালবেলা সবাই জলখাবার খাচ্ছে, মনে হলো—মনোহরকে বোধ হয় তার মা আসতে দেয়নি আজ—

মা বলতো—তুমিই ওকে আদর দিয়ে দিয়ে মাথায় তুলে দিচ্ছ ভাই।

পুতুল বলতো—নেব না আমি তোমার বল। না-বলে পরের জিনিস নিলে তো চুরি করা হয়—মা বলেছে যে!

মনোহর বলতো—আহা, আমি বুঝি পর?

পুতুল বলতো—পর না তো কী,—পর বলেই তো তুমি আলাদা বাড়িতে থাকো। আমার মা কি তোমার মা? তবে যে বলছো?

মনোহর বলতো—আমার বলটা নিয়ে তুই খেল্—তাহলে তোকে একটা পয়সা দেব।

পুতুল বলতো—মা যদি বকে?

মনোহর বলতো—মাসীমা বকলে বলবি আমি তোকে দিয়েছি। আমার একটা কাঠের ঘোড়া সেটাও দেব, আমার একটা বন্দুক আছে, তা-ও তোকে দেব।

সব দিয়ে দিয়ে ফতুর হয়ে যেতে ইচ্ছা করতো মনোহরের। ছোট্ট মেয়ে পুতুল। কত আর বয়েস। ছয় কি সাত। আর মনোহরের তখন ন'বছর।

তারপর একদিন পুজোর ছুটি ফুরিয়ে গেল। বাঁধা-ছাঁদা আরম্ভ হলো ও-বাড়িতে। পদ্মমাসীমা বাক্স-বিছানা বাসন-কোসন গুছিয়ে তৈরি হয়ে নিলে। ছেলেমেয়েরাও তৈরি হয়ে নিলে। প্যান্ট শার্ট ফ্রক রিবন প'রে তৈরি।

মনোহর দৌড়তে দৌড়তে এসে হাজির। প্যান্ট শার্ট জুতো মোজা প'রে ফেলেছে।

বললে—আমিও তোদের সঙ্গে ট্রেনে চড়ে যাব রে!

মা বলেছিল—তোমরা তো যাচ্ছ ভাই, আমার দুই ছেলেও তোমাদের সঙ্গে যাচ্ছে, একটু দেখো—এক কামরায় উঠবে তারপর হাওড়ায় নেমে ওরা শ্যামবাজার চলে যাবে।

ট্রেনে উঠে পুতুল বলেছিল—এই নাও, তোমার বল নাও, কাঠের ঘোড়া নাও—বন্দুক নাও—তোমার জিনিস তোমায় দিয়ে দিলাম।

মনোহর বলেছিল—ওগুলো তো আমি তোকে দিয়ে দিয়েছি।

পুতুল বললে—ও আমি আর নেব না ভাই! পরের জিনিস নিলে মা

বকবে—তুমি তো পর—

মনোহর বললে—বা রে, পর হতে যাবো কেন, মাসীমা বলেছে তোর সঙ্গে আমার বিয়ে হবে।

হাওড়া স্টেশনে এসে পদ্মমাসীমা বলেছিল—এবেলা তাহলে তোমরা আমাদের বাড়িতেই চলো, খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে বিকেলবেলা তোমাদের বাড়ি চলে যেয়ো—

দাদা বলেছিল—কিন্তু পিসেমশায়কে সে বাড়িতে চিঠি লিখে দেওয়া হয়েছে—না গেলে সবাই যে ভাববে!

একমাস পুজোর ছুটি, তারপর একসঙ্গে ট্রেনে চড়ে সমস্ত রাত এক কামরায় কাটানো। কেমন যেন কান্না পাচ্ছিল মনোহরের।

দাদা বললে—তার চেয়ে বরং সকালবেলা খেয়ে-দেয়ে বিশ্রাম করে আপনাদের বাড়ি যাবো।

পদ্মমাসীমা বলেছিল—ঠিক যেও কিন্তু বাবা, তোমরা ওখানে গিয়ে রাত্তিরে খাবে, কেমন!

মনোহরের সেদিন যেন কেমন সমস্ত ফাঁকা-ফাঁকা মনে হয়েছিল। মনে হয়েছিল—একটা ঘণ্টাও যেন পুতুলদের ছেড়ে থাকা যাবে না। তা হোক! হাওড়া স্টেশনে ট্রেন এসে পৌঁছুল সকাল আটটার সময়। তারপর খাওয়া-দাওয়া সেরে তিনটের সময় বেরোলেই চলবে।

পদ্মমাসীমা বলেছিল—আমাদের বাড়ির ঠিকানা জানো তো, আটাশ নম্বর, সেন্ট্রাল রোড, বাস থেকে নেমে পুব-মুখো গিয়ে বাঁদিকে লাল রঙের বাড়িখানা, মনে থাকবে তো?

মনোহর থামলো।

বললাম—তারপর? তারপর বিকেলবেলা গেলে তো দেখা করতে?

মনোহর বললে—বিকেলবেলা যাবো কী করে স্যার! আর যাবো বললেই কি যাওয়া হয়। আমরা তো যাবার জন্য ছটফট করছি। কিন্তু দুপুর দুটোর সময় এমন বিষ্টি এল বেরোয় কার সাধ্য! সেই বিষ্টি যখন থামলো, তখন রাত ন'টা!

বললাম—তারপর?

মনোহর বললে—তারপর দাদা বললে—পরদিন সকালবেলা যাওয়া যাবে। তা রাত্তিরবেলা তো ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লাম। ভোর হতে-না-হতে উঠতে হবে। কোথায় শ্যামবাজার আর কোথায় চেতলা! রাত আর কাটতে চায় না। সকালবেলা যাবার তোড়জোড় করছি—এমন সময় বোম্বাই থেকে ছোট জামাইবাবু এসে হাজির!

বললাম—তারপর? যাওয়া হলো না?

—কী করে আর হয় বলুন—কতদিন পরে ছোট জামাইবাবু এল বাড়িতে আর আমরা কিনা বেড়াতে যাবো। দাদা বললে—সন্ধ্যেবেলা যাবো তোকে নিয়ে। কিন্তু সন্ধ্যেবেলাও যাওয়া হলো না। ছোট জামাইবাবু একেবারে সকলের থিয়েটারের টিকিট কিনে এনে হাজির—স্টার থিয়েটারে কর্ণার্জুন পালা হবে তারই টিকিট—

বললাম—তারপর ?

মনোহর বললে—তার পরদিন যাওয়ার সব ঠিকঠাক, বিকেলবেলা হঠাৎ কেমন গা-গরম-গরম মনে হলো—আর তারপর একেবারে পাঁচ ডিগ্রী উঠলো সেই জ্বর, সাত দিন সাত রাত্তির একেবারে বেহুঁশ অচৈতন্য—কোনও দিকে জ্ঞান নেই।

বললাম—কিন্তু যখন জ্বর ছাড়লো ?

—যখন জ্বর ছাড়লো, তখন খুব দুর্বল শরীর। নড়বার-চড়বার ক্ষমতা নেই। আর যখন গায়ে জোর পেলাম, তখন তো দেরি হয়ে গিয়েছে। ইস্কুলও খুলে গিয়েছে। ভাবলাম এত দেরি করে গেলে কী ভাববে ওরা! তা ভাবলাম বড়দিনের ছুটিতে যাবো'খন। কিন্তু বড়দিনে ছুটিতে সবাই গেলাম মামার বাড়ি। শেষকালে অনেক দেরি হয়ে গেল। ওদিকে যাবার জন্যে কতবার ট্রামে উঠে বসেছি কিন্তু ধর্মতলা পর্যন্ত গিয়ে আর যেতে পারিনি। বাড়ি ফিরে এসেছি লজ্জায়। সত্যিই তো এত দেরি করে কি যাওয়া যায়! গেলে কী বলবে!

বললাম—তা বলে আর দেখাই করলে না কখনও ?

মনোহর বললে—দেখা করলাম না বলি কী করে, দেখা হয়ে উঠলো কই! আমি তো দেখা করতেই চেয়েছিলাম স্যার, কপালে না থাকলে আর কী হবে! আর তারপর আমার বাবা মারা গেল হঠাৎ, মা-ও মারা গেল, কাকা-জ্যাঠারা সব আলাদা হয়ে গেল, আর ভরসা ছিল এক দাদা। দাদার নাম বললে সারা কলকাতার লোক তবু চিনতে পারতো, অত বড় ডাক্তার! সে-ও হঠাৎ মারা গেল একদিন। পৈতৃক বাড়িটাও বিক্রী হয়ে গেল—যদি যাই-ই কোনদিন দেখা করতে তো কী পরিচয় দেব! কা'র পরিচয় দেব! পরিচয় দেবার মতো কী-বা আছে বলুন স্যার আমার!

সান্ত্বনা দিয়ে বললাম—তাতে কী হয়েছে মনোহর! পৃথিবীতে সবাই কি সব হয়! গেলে আর এমন কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে—চোখের দেখা তো মাত্র!

মনোহর বললে—না স্যার, গিয়ে কাজ নেই, হয়ত চিনতেই পারবে না, হয়ত পুতুলের বিয়েই হয়ে গেছে! হয়ত কেন, নিশ্চয়ই। হয়ত ভালো ঘরে ভালো বরেই হয়েছে, আমার মতো রকবাজ নয় জামাই—পিসীমাসীমাও হয়ত আর তেমন করে কথা বলবেনা আগেকার মতো!—কি হবে গিয়ে, দরকার নেই—

বললাম—তোমার আবার এত লজ্জা হলো কবে থেকে মনোহর? গেলে দোষ কি! যাবে আর একটু কথা বলে চলে আসবে—

মনোহর তবু দ্বিধা করতে লাগলো—

বললে—না স্যার, আমায় আপনি যেতে বলবেন না—

বললাম—গেলে কি হয়েছে শুনি ?

মনোহর বললে—আর তা ছাড়া, সে-চেহারাই নেই স্যার আমার, তখনকার চেহারা আর এখনকার চেহারা একেবারে আকাশ-পাতাল ফারাক—

নিজের চেহারার দৈন্যে মনোহর নিজেই হেসে উঠলো হ্যা হ্যা করে।

বললাম—তা হোক মনোহর, তুমি যাবে। কাল সকালবেলা আমি তোমার জন্যে বসে থাকবো—আর আমি নিজে তোমাকে নিয়ে যাবো ও-বাড়িতে, ওদের সঙ্গে তুমি দেখা-শোনা করে আসবে—

মনোহর কী যেন ভাবলে। একবার যেন একটু লোভও হলো, বললে—যাবো ?

বললাম—নিশ্চয়ই যাবে, আমি বলছি, কিছু মনে করবেনা তারা !

মনোহর বললে—আপনি তা হলে যেতে বলছেন ?

বললাম—হ্যাঁ, আমি নিজে তোমায় সঙ্গে করে নিয়ে যাবো—আর একটা কথা, গল্প পিছু তোমায় পাঁচ টাকা তো দিতাম বরাবর, এবার দশ টাকা করেই পাবে—

মনোহর বললে—আচ্ছা, ঠিক যাবো—

পরদিন আমি যথারীতি সকালে বাড়িতে ছিলাম। মনোহর এল না। ভেবেছিলাম তার পরদিন বুঝি আসবে, কিন্তু সেদিনও আসেনি। তার পরদিনও আসেনি। তার পরদিনও না। আমি বুঝলাম মনোহর আর আসবে না। দশ টাকা কেন, দু'শো টাকা দিলেও মনোহর এ-পাড়ায় আর আসবে না। এতদিনের জমানো সম্পদ, একত্রিশ বছর ধরে যখের মতন যা আগলে বসে আছে, তার সম্বন্ধে কি এই ঝুঁকি নেওয়া চলে ! যদি খোয়া যায় ! যদি ভেঙে যায় ! যদি হারিয়ে যায় !

ভেবেছিলাম মনোহর বুঝি শুধু অর্থেরই কাঙাল। কিন্তু সে যে পরমার্থেরও কাঙাল তা এতদিনে বুঝলাম।

পুরুষমানুষ

নিত্যানন্দ বললে, তোমার গল্প পড়েছি ভাই, কিন্তু সবারই ওই এক কথা। এবার পুরুষমানুষ নিয়ে লেখা না-কেন, পুরুষমানুষের মধ্যে কি রস নেই, পুরুষমানুষের কি সৌন্দর্য নেই! আর আমাদের সৃষ্টিকর্তার কথা ভাব না, তিনিও তো পুরুষ হে—

খানিক থেমে নিত্যানন্দ বললে, লেখ না আমাদের সত্যসুন্দর চক্রবর্তীকে নিয়ে, না-হয় আমাদের বাড়ির চাকর গোবিন্দকে নিয়ে, কিংবা, ভালো কথা, ওঁকে নিয়ে লেখ না, ওই যে—ওই যে বসে আছেন—

নিত্যানন্দ জানালার ফাঁক দিয়ে আঙুল দিয়ে দেখালে।

রাস্তার এপার-ওপার। বাদামতলা এখান থেকেই শুরু। বাদামতলায় ঢুকতে গেলে, বাদামতলার ভদ্রপাড়ায় যেতে গেলে এই কাঠের গোলা, এই বস্তির চালাঘরের এলাকা পেরোতে হবে। কালীঘাটের জেলখানা আর গঙ্গার পুল পেরিয়ে প্রথমে আসতে হবে এই পাড়ায়। সার সার পানের দোকান, চাল-ছোলা ভাজা আর দু'পাশে যতদূর চাও কেবল কাঠের গোলা। টিনের চালার তলায় ছোট গদিবাড়ি। সব গোলাতেই ছোট মাপের একটু কুঠুরি। তাতে নিচু একটি তক্তপোশ। দু'চারটে তাকিয়া। ফরসা চাদর পাতা। কোথাও কোথাও মাদুর। তার সামনে কাঠের পাহাড়। গাছের গুঁড়ি কেটে চিরে ফালি-ফালি করা। কড়ি-বরগার কাঠ চাই, তাও আ্যাছে। জানলা-দরজার কাঠ চাই, তাও আছে। নৌকো বানাবে, তার কাঠও আছে!

নিত্যানন্দ বলে, ওঁকে নিয়ে লেখ না, ওই আমাদের হরসুন্দরবাবুকে নিয়ে— ?

দেখলাম, রাস্তার ওপারে নিত্যানন্দের কাঠের গোলার মতোই আর একটা গোলা। ছোট একটু গদিবাড়ি। সামনে মাদুরপাতা তক্তপোশের ওপর একটা কাঠের ক্যাশবাক্স নিয়ে কাজ করে চলেছেন হরসুন্দরবাবু। গলায় কণ্ঠি, কপালে বুকে চন্দনের ফোঁটা। খালি গা। বাবু হয়ে বসে একমনে কাঠের ফর্দের হিসেব করছেন হয়তো। গোলার সামনে বড় সাইনবোর্ড। তাতে দোকানের নাম লেখা। নীচে লেখা রয়েছে—মালিক শ্রীহরসুন্দর ভট্টাচার্য।

নিত্যানন্দ বললে, ডাকব ওঁকে ? দেখবে ?

তা পুরুষমানুষের মতো চেহারাই বটে। যাকে বলে পুরুষমানুষ! ফরসা শরীর। বুকে অল্প অল্প লোম। মাথার চুল কদম-ছাঁট। অল্প অল্প পেকেছে।

নিত্যানন্দের কারবার আর কতদিনেরই বা! কিন্তু যখন এই বাদামতলায় ইলেকট্রিক আলো আর কলের জলও আসেনি তখন এ বাদামতলা এমন ছিল না।

কালীঘাটের মন্দির দেখেছেন—যাত্রীরা আসত ওপারে পুজো দিতে। ওপারে জ্বলত ইলেকট্রিক আলো। সানাই-ঢাক-ঢোল বাজিয়ে মাড়োয়ারীদের বউ-ঝি'রা আসত ঠাকুর দর্শন করতে, ওপার জম-জমাট। আর এপারে টিম-টিম করে জ্বলত তেলের বাতি। এপারে গঙ্গার ধার ঘেঁষে কেবল খড়ের চালা। খড়ের চালার পাশ দিয়ে গঙ্গাস্নানের রাস্তা। ভোরবেলা স্নান করা অভ্যেস হরসুন্দর-বাবুর। ওখানটা দিয়ে যাবার সময় চোখ বুজে যেতে হতো। ওই অত ভোরেও আবাগীদের বাড়ির সামনে দিয়ে যেতে ঘেন্না করত। মনে হতো যেন মদের গন্ধ আসছে। রাত্তিরবেলার যা উৎপাত তা তো আছেই; ওই পশ্চিমের গঙ্গার পাড় ধরে বরাবর কালীঘাটের পুল পর্যন্ত আর এদিকে বাদামতলা রোড বরাবর আবাগীদের আড্ডা। এ ওদের কতকালের ব্যবসা তার ঠিক নেই। শিবনাথ শাস্ত্রী মশায়ের বইতেও লেখা আছে এসব ইতিহাস। তা কারবার করতে হলে তো আর বাছ বিচার করলে চলবে না। কাঠের খদ্দের ঘুরে ফিরে এখানেই আসবে। কাঠ কিনে ডোঙা বোঝাই করে চলে যাবে কত দূর-দূর দেশে। উত্তরে নিমতলা আর দক্ষিণে এই বাদামতলা। তখন ওই বালিগঞ্জ হয়নি, গড়িয়াহাট হয়নি। ভবানীপুরের পর গঞ্জ বলো, শহর বলো, সবই এই বাদামতলা। বাদামতলার তখন রবরবা কত! আলিপুরের দেওয়ানী আর ফৌজদারী আদালতে মুহুরী-উকিলের ভিড়, দক্ষিণের ডায়মন্ডহারবার, কাকদ্বীপ, সুন্দরবনের জমিজমা খুনখারাপী মামলার তদারক তদ্বির শুনানী সব এই এখানেই, এই বাদামতলার কাছারিতে। আর কাছারি-আদালতের ব্যাপার, এক ঘণ্টার ব্যাপার নয়। এক-একটা মামলা-মকদ্দমা চলছে তো চলছেই। একেবারে জেরবার করে ছাড়ে সকলকে। উকিল-মুহুরীদের সঙ্গে পরামর্শ করতে থাকতে হয় বাদামতলার হাটে। সেই সূত্রেই কারবার জমে ওঠে আবাগীদের। মরতে আর জায়গা পায় না, এসেছে গঙ্গার ধারে। একেবারে তীর্থস্থানের ধারে। ছোট ছোট খড়ের চালা বানিয়ে দিয়েছে এ-দিগর থেকে ও-দিগর পর্যন্ত জমিদার কুণ্ডুবাবুরা। খাজনা-করা জমি। মালিকানা স্বত্ব আবাগীদের নয়। এক এক জন বুড়ী গোছের মানুষ। হরিনামের কণ্ঠি, তেলক কাটে এখন, গঙ্গার ঘাটে বসে জপ-আহ্নিক করে। তেলক কেটে পাপ-ক্ষয় করে। আর পুজো দিয়ে আসে কালীঘাটের মন্দিরে গিয়ে পালা-পার্বণের দিনে।

হরসুন্দরবাবু চোখ পড়তেই মুখ ঘুরিয়ে নেন। বলেন, দূর, দূর, দূর হ—সকালবেলাই অযাত্রা—

অথচ পাশাপাশি বাস না করেও উপায় নেই।

সকালবেলা নিত্যানন্দ এসে বসে ছিল। হরসুন্দরবাবু হন হন করে একেবারে ঢুকে পড়েছেন।

বললেন, এর একটা বিহিত করুন নেত্যবাবু, আজই এর বিহিত করতে হবে আপনাকে—

নিত্যানন্দ বলে, কিসের বিহিত ?

হরসুন্দরবাবু বলেন, এত বড় যুদ্ধ গেল মশাই, কী বালিগঞ্জ ছিল আর কী হয়ে গেল, তামাম কলকাতা শহরের ভোল পালটে গেল, আর আমাদের বাদামতলা—

নিত্যানন্দ বলে, কী হলো হরসুন্দরবাবু ? হলোটা কী ?

—হলো আবার কী বলছেন ! আজ চল্লিশ বছর ধরেই হচ্ছে, আপনার আর কী। আমার ফ্যামিলি নিয়ে বাস করতে হয়, ভাইপো ভাইঝিরা রয়েছে, তাদেরও তো এখন বয়েস হচ্ছে, আবাগীদের জ্বালায় তো দেখছি আর ব্যবসা করা চলবে না এখানে। হয় ওরা উঠে যাক, নয়তো আমরাই উঠি—নইলে এর একটা বিহিত করুন আজই—

নিত্যানন্দ বলে, তা এ তো চিরকালের সমস্যা হরসুন্দরবাবু, এ আর নতুন কথা কী ?

হরসুন্দরবাবু বললেন, কিন্তু এদানি যেন বেড়েছে মশাই, কাল কতকগুলো মাতাল একেবারে আমারই দরজায় এসে ধাক্কা দিচ্ছে—

নিত্যানন্দ বলে, তা ওরা কী করে বুঝবে বলুন, বরং দরজার পাল্লায় আলকাতরা দিয়ে লিখে দিন—ইহা ভদ্রলোকের বাড়ি। চুকে যাবে ল্যাঠা।

—আপনি রসিকতা করছেন, আর আমার যে এদিকে প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে মশাই। ভাবছেন, তা আমি লিখিনি ?

হরসুন্দরবাবু বলেন, এ জ্বালা কি আজ ভুগছি মশাই, চল্লিশ বছর হয়ে গেল আমার এই পাড়ায়, ব্যবসা কি আমার আজকের ?

হরসুন্দরবাবুর ব্যবসা যে আজকের নয় তা বাদামতলা কেন, নিমতলার কারবারীরাও জানে। ধার্মিক লোক বলে সমাজে খাতিরও আছে হরসুন্দরবাবুর। শুধু ধার্মিক নয়, সৎ সত্যবাদী নিষ্ঠাবান বলেও সুনাম আছে। একপয়সা এদিক-ওদিক হবার উপায় নেই ওঁর কাছে। মিস্ত্রিরা বলে, পাঁচশো টাকার কাঠ কিনলাম, আমাদের পাওনা থোওনা কিছু নেই ?

হরসুন্দরবাবু ক্ষেপে ওঠেন : তবে তোমাকে বলেই রাখি মিস্ত্রি, ওসব উঞ্ছ কারবার আমরা করিনে, ওসব দালালি পেতে হলে ওই গুজরাটীদের কাছে যাও, আমার এখানে হবে না। পাঁচশো কেন, হাজার টাকার কাঠ কিনলেও হবে না—

কুণ্ডুবাবুদের ছোট শরিক কার্তিক কুণ্ডু এসে আসর জাঁকিয়ে বসেন।

হরসুন্দরবাবু বলেন, এই নিন, পান খান।

শুধু পান নয়, সঙ্গে সিগারেটও আসে।

বলেন, চা খাবেন নাকি ?

কুণ্ডুবাবু বলেন, চা ? তা আপনি খেলে খেতে পারি।

—আমি ?— হরসুন্দরবাবু হাসেন।

বলেন, যখন ছেড়ে দিয়েছি ওটা তখন ওটা আর ধরব না আজ্ঞে। আপনাদের বাপ-মায়ের আশীর্বাদে বেশ আছি, প্রার্থনা করুন যেন নেশা-ভাঙ না করতে হয় জীবনে—

কুণ্ডুবাবু হেসে বলেন, তা চা কি একটা নেশার সামিল ?

—তা নেশা নয় ? নেশা নয় তো কী বলেন। ও চা, পান, সিগারেট, বিড়ি তামুক সবই নেশা। শুধু মদ আর গাঁজাই কি নেশা ! নেশা আপনাদের পোষায় ছোটবাবু, আমরা কাঠের ব্যবসায়ী—

নিত্যানন্দের দোকানে এসে বসেন মাঝে মাঝে হরসুন্দরবাবু। বলেন, এমন করে কি আর ব্যবসা চলে নেত্যবাবু, ওই ফরসা আদ্দির পাঞ্জাবি আপনাকে ছাড়তে হবে মশাই, আর ওই ফিনফিনে ধুতি, ওই ফুটফুটে গেঞ্জিও আপনার চলবে না। খালি গায়ে না থাকতে পারেন, ফতুয়া পরুন বাবু, আমার মতো এই মোটা খেটে ধুতি পরুন আর পায়ে চটি দিন—

নিত্যানন্দ বলত, ব্যবসার সঙ্গে পোশাকের কী সম্পর্ক ?

—সম্পর্ক নেই ? বলেন কী ? ব্যবসা হলো গিয়ে মালক্ষ্মী। লক্ষ্মীপুজো কী আপনার যা-তা কাপড়ে, যেমন-তেমন করে করলেই হয় ! শুদ্ধ-অশুদ্ধ বিচার নেই ! বাসী কাপড়ে পুজো হয় ? তা ব্যবসাও তাই। ভারি পবিত্র হয়ে ভক্তিভরে না করলেই ওই ঈশ্বরদাস গুলজারিপ্রসাদের মতো গণেশ ওল্টাতে হবে—

নিত্যানন্দ বললে, এই দ্যাখ না, আমার দোকান তো সাত বছর হলো হয়েছে, আমি তো কতদিন কামাই করেছি, খদ্দের এসে ফিরে গেছে কতদিন। আর হরসুন্দরবাবু ! একটা দিন কামাই নেই, একটা নেশা করা নেই। সকালবেলা গঙ্গায় ডুব দিয়ে এসে বুকে গলায় তিলক কেটে সেই-যে বসেন আর ওঠেন সেই বিকেল চারটে-পাঁচটা নাগাদ। তখন ছাতাটা নিয়ে গায়ে ফতুয়া প'রে বেরুবেন !

বললাম, কোথায় ?

নিত্যানন্দ বললে, কে জানে !

বললাম, কোনও ইয়ে-টিয়ে আছে নাকি ?

নিত্যানন্দ বললে, তা তো ভাই বিশ্বাস হয় না। মেয়েমানুষের মুখদর্শন করতে যিনি ভয় পান, নেশা-ভাঙ কিছু যিনি করেননি, ফরসা কাপড় পরতে যাঁর আপত্তি, তাঁর যে অমন মতিভ্রম হবে, তা তো বিশ্বাস হয় না। ভারি কড়া মানুষ ও-সব বিষয়ে। আমাকেই এসে উপদেশ দিয়ে দিয়ে মাথা খারাপ করে দেন।

চটিটা পায়ে দিয়ে এক এক দিন রাস্তা পেরিয়ে এসে পড়েন।

বলেন, কী নেত্যবাবু, কখন এলেন ?

নিত্যানন্দ বলে, এই তো, এখুনি।

হরসুন্দরবাবু বলেন, এই ন'টার সময় কারবার শুরু করলেন ! কাল সারাদিন

আসেননি, আপনার সব বাঁধা খন্দেররা এসে ফিরে গেল। জিজ্ঞেস করছিল—নেত্যবাবু কোথায় ? আমি বললাম, কী জানি বাপু অসুখ-টসুখ করল বোধ হয়। আপনার দারোয়ানকে জিজ্ঞেস করলাম, সে-ও জানে না। বড় ভাবনা হয়েছিল মশাই আপনার জন্যে। তা কোথায় গিয়েছিলেন শুনি ?

নিত্যানন্দ বললে, কাল সকাল থেকে তাসের আড্ডায় জমে গিয়েছিলুম, আর উঠতে পারিনি।

কথাটা শুনে হরসুন্দরবাবু এমন চমকে উঠলেন যেন সামনে কেউটে সাপ দেখেছেন। খানিকক্ষণ মুখ দিয়ে কোনও কথাই বেরুল না তাঁর।

আবার বলেন, সত্যি বলছেন তাস ?

নিত্যানন্দ বললে, হ্যাঁ, তাস।

হরসুন্দরবাবু যেন আকাশ থেকে পড়েন। বলেন, তাস খেলতে খেলতে দোকান খুলতেই ভুলে গেলেন ?

নিত্যানন্দ বলে, তাস খেলতে গিয়ে কিছু কি আর খেয়াল থাকে ?

হরসুন্দরবাবু বলেন, আমি আপনার ভালোর জন্যেই বলি নেত্যবাবু। ব্যবসা আমিও করি, ব্যবসা আমারও লক্ষ্মী, কার জন্যে আর করি বলুন, আমার কে আছে ? ছেলেও নেই, বউও নেই, ভাইপো-ভাইঝিরাই সব পাবে। কিন্তু ব্যবসার জন্যে আমি, না, আমার জন্যে ব্যবসা, বলুন তো ?

নিত্যানন্দ বললে, আপনার জন্যেই তো আপনার ব্যবসা।

হরসুন্দরবাবু বললেন, ভুল কথা নেত্যবাবু, ভুল কথা। ব্যবসার জন্যেই আমি, আর শুধু আমি কেন, আমার ব্যবসার জন্যেই আমার ভাইপো, ভাইঝি, আমার বিধবা ভাই-বউ, সব।

এই এমনি করেই একদিন সামান্যভাবে একলা কাঠের পটিতে দোকান আরম্ভ করেছিলেন হরসুন্দরবাবু। সে অনেকদিন আগে। তখন এমন ইলেকট্রিক আলো ছিল না, রাস্তায় গ্যাসের বাতি ছিল না। কালীমন্দিরে তখন এমন যাত্রীর ভিড়ও ছিল না। সাত-তিন কাঠের ফুট ছিল তিন পয়সা। পাঁচ-আড়াই কাঠের দাম ছিল দেড় পয়সা। সস্তাগণ্ডার বাজার। তবু হলে কি হবে ? অল্প বয়েস। উদয়াস্ত খাটতে হয়েছে হরসুন্দরবাবুকে। ওই বিরাট অশত্থগাছটার তলায়, এখন যেখানে ভুলুবাবুর ভাতের পাইস-হোটেল হয়েছে, ওইখানে তিনখানা গদিবাড়ির জায়গা নিয়ে ছিল সাহাবাবুদের গোলা। তখন লোহা আর কেরাসিন কাঠের ব্যবসা নয়। শুধু শাল আর সেগুন। সাত-তিনের দর তিন পয়সা আর পাঁচ-আড়াইয়ের দর দেড় পয়সা। সাহাবাবুর পৈতৃক দোকান। তেমন মায়া-দয়া ছিল না কারবারে। দিনের শেষে শুধু ক্যাশবাক্সের পয়সা হাতিয়ে চলে যেতেন। গদিবাবু ছিল তারক সরকার। ক্যাশবাক্সে তেল-সিঁদুর লাগিয়ে সকাল-সকাল, গদিতে এসে বসত। বেচা-কেনা, ক্যাশ সামলানো, মাল কেনা, মাল ছাড়ানো

রেলের বাবুদের কাছে গিয়ে তাম্বর-তদারক, সব নিজে। লোকে বলত, গদিবাবু। গদির মালিকের দেখা-সাক্ষাৎ তো কালেভদ্রে। খদ্দেররা চিনত গদিবাবুকে। গদিবাবুই মালিক আবার গদিবাবুই কর্মচারী। একাধারে সব। দারোয়ান, মুটে, ঠেলাগাড়িওয়ালা সবাই গদিবাবুকেই এসে সেলাম করত।

সাহাবাবু বেলায় এসে একবার গদিতে বসতেন। বলতেন, বিক্রী-পাটা কেমন তারক?

গদিবাবু বলত, আজ্ঞে, বাজার বড় বেঁকা—

সাহাবাবু সিগারেট টানতে টানতে বলতেন, সোজা করে দাও তারক, সোজা না করলে আর চলা শক্ত! বড় টানাটানি পড়েছে—

গদিবাবু সবিনয়ে বলত, আজ্ঞে, মালিক হলেন আপনি, সোজা করলে আপনিই সোজা করতে পারেন—

সাহাবাবু বলতেন, কী করলে সোজা হয় বলো তুমি?

গদিবাবু বলত, আজ্ঞে, টেনে টেনে—

সাহাবাবু বলতেন, এ কি রবার যে টেনে টেনে সোজা করব?

—আজ্ঞে, সে-টান নয়, রাশ-টান—

সাহাবাবু তবু বুঝতে পারতেন না। বলতেন, কিসের রাশ?

গদিবাবু ঘুঘু লোক। সোজা কথা বলতে জানে না। বলত, টালিগঞ্জে মোড়লদের বাড়ি রাস দেখেছেন?

রাসলীলা কে না দেখেছে! বিশেষ করে সাহাবাবু তো দেখেছেনই। রাসের ক'দিন সাহাবাবু গদিতেই আসতেন না। বাঁধা আড্ডা ছিল সাহাবাবুর সেখানে। সেই রাসের সময়েই এক কাণ্ড ঘটে। হরসুন্দরবাবু তখন ছোট। পাঁচ টাকা মাইনের ছোকরা। গদিবাবুর সঙ্গে গজ-ফিতে নিয়ে ঘোরে। লোহাকাঠ মাপে, আর কাঠের আঁশ চেনে। সুতো ধরে খড়ির দাগ দেয়। খদ্দের এলে বসিয়ে রাখে। আর দরকার হলে পানটা-সিগারেটটাও কিনে আনে। তখন সবে দেশ থেকে এসেছেন। তখন তাঁর কাছে কলকাতাও যা বাদামতলাও তাই। ওই আবাগীদের তখনও আড্ডা ছিল ওখানে। শুধু ওখানে কেন, সব জায়গাতেই। কালীঘাটের পুল থেকে তীর্থযাত্রী কি কাছারির মক্কেলদের সন্ধ্যেবেলা হেঁটে আসবার উপায় ছিল না। ওই পানের দোকানটা যেখানে, ওইখানে এলেই ছেঁকে ধরত সব আবাগীরা। এ বলে—আমার ঘরে এস, ও বলে—আমার ঘরে এস। ভদ্রলোকদের বিপদের একশেষ। শেষে টাকা-কড়ি খুইয়ে শুধুহাতে দেশে ছুটন। এখন তো দেখছেন পুলিস-পেয়াদার যা-হোক কিছু চোখ-রাঙানি আছে। তখন তাও ছিল না।' বাদামতলার এইদিকটা দিয়ে হাঁটে কার সাধ্যি! কিন্তু কাঠের গোলার কারবারীদের ও-রাস্তা ছাড়া গতি নেই। তাগাদা সেরে টাকা-কড়ি নিয়ে যেদিন ফিরতে সন্ধ্যে হয়েছে সেদিন কী ভয়!

অথচ রাত্রে হাঁটা আমার তখন অভ্যেস আছে। আমাদের গাঁয়ে কতদিন আড্ডা দিয়ে অনেক রাত করে বাড়ি ফিরেছি। কিন্তু সে আলাদা। সে তো আর বাদামতলার রাত্তিরের মতো নয়। এখানে তো জানেন মাঝ-রাত্তিরেই এক এক দিন হৈ-হল্লা বেধে যায়। যত মাতাল আর যত আবাগীদের মরণ এই বাদামতলায় মশাই। অমন গঙ্গার ধার, বেশ খোলা হাওয়া, বসে বসে দেখুন না সিনারি! বড় বড় গাছ, সেই গাছের তলায় দুপুরবেলাও যেন স্বর্গ মশাই। গরমের দিনে যখন সারা দুনিয়া পুড়ে ছারখার তখন বাদামতলার ওই গঙ্গার ধারটিতে বসলে মনে হবে যেন কাশ্মীরে বসে আছি—এমনি আরাম! তা আরাম কি করতে দেবে আবাগীরা! তখন হয়তো ওখানেই চুল খুলে রোদ পোয়াচ্ছে, বিকেলবেলা তো কথাই নেই। ওদিক মাড়ায় কার সাধ্যি! দেখছেন তো টিনের ঘর, ওই ঘরের মধ্যে মানুষের চামড়া যেন সেদ্ধ হয়ে আসে। আপনার কি মশাই, আপনার তো ফ্যামিলি বাইরে, আমরা যে ছাড়তে পারিনে। আর আমার আরামের জন্যে তো ব্যবসা নয়! ব্যবসার আরামের জন্যেই তো আমরা।

তা ব্যবসা বলে কি নিজের আরাম বলতে কিছু নেই?

হরসুন্দরবাবু বলতেন, না মশাই, ব্যবসার কাছে আরাম-টারাম সব হারাম হ্যায়! আপনি আরাম খুঁজলে ব্যবসাও আরাম খুঁজবে। তারপর গদিবাবুর মতো একটা ম্যানেজার রাখুন না, আরও আরাম। পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে রাসলীলা দেখুন, কে বারণ করছে! আমার মতো ছোকরা পেয়েছিল বলে তবু সাহা-কোম্পানি কিছুদিন চলেছিল। এই হাতে হাজার হাজার টাকা এনেছি এই বাদামতলার রাস্তা পেরিয়ে, কখনও একটা আধলা খোয়া যায়নি তবু।

গদিবাবুকে যদি বলতুম, গদিবাবু, আর এক টাকা মাইনে বাড়িয়ে দিন না।

গদিবাবু বলত, আমি কি মালিক, মালিক এলে বলিস।

তা মালিকেরই তখন যা টাকার খ্যাঁচ, আমি আর চাইব কী! চোখের সামনে সব দেখেছি তো! দিনের পর দিন, রাতের পর রাত চোখ মেলে থাকলেই দেখবে রাস্তার ওপর রাসলীলা! হাতাহাতি টানাটানি চলেছে। বাদামতলার কাণ্ড, আপনিও তো আছেন এখানে সাত বছর, সবই দেখছেন। এ আর কী! তখন ছিল নরক। ওদিকে ভবানীপুর, এদিকে কালীঘাট, দক্ষিণে টালিগঞ্জ। মাঝখানে এই বাদামতলা। দিনরাত নরক একেবারে গুলজার হয়ে থাকত। শুনেছি শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের বইতে সে-সব লেখা আছে। ছেলেবেলায় নিজের দেশ দেখেছি আর কলকাতায় এসে দেখলাম বাদামতলা। আর মাঝে মাঝে শুধু যেতে হত নিমতলায় কাঠের পটিতে। দেশে ছিল অন্য রকম। সেখানে ছিল ভারি বদ নেশা আমার। সঙ্গদোষে যা হয় আর কি!

লজ্জায় হরসুন্দরবাবুর কান দুটো যেন লাল হয়ে আসে।

বললাম, কিসের নেশা!

সে আর বলবেন না নেত্যবাবু। ভাবতেও আমার লজ্জা হয়। ভগবানের আশীর্বাদ মশাই যে সে-নেশা কাটাতে পেরেছি, কোনও মানুষের যেন অমন সর্বনাশা নেশা না হয়।

জিজ্ঞেস করলাম, কিসের নেশা, মদের ?

হরসুন্দরবাবু বললেন, না না, সে হলে তো কথা ছিল মশাই, তার চেয়েও খারাপ, সে আর আপনার শুনে দরকার নেই।

—গাঁজার ?

হরসুন্দরবাবু আরও লজ্জিত হয়ে পড়লেন। বললেন, না তাও নয়, তার চেয়েও খারাপ—

বললাম, কিসের বলুন না ?

হরসুন্দরবাবু গলাটা আরও নিচু করে আনলেন। বললেন, আজ্ঞে, কাউকে যেন বলবেন না, পাশাখেলার নেশা—

কথাটা বলে যেন মহা অপরাধের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছেন। এমনি ভাবের একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়লেন। অনুশোচনার আত্মপীড়নে খানিকক্ষণ কোনও কথাই বলতে পারলেন না।

তার পর বললেন, সেই আমার এক চরম পরীক্ষার দিন গেছে মশাই. নাকে কানে খত দিয়েছি আর ও-কর্ম করব না—তাস-পাশা-দাবার মধ্যে আর নেই, জীবন নষ্ট, ব্যবসা নষ্ট, চরিত্র নষ্ট, সব নষ্ট—

বললাম, এই যে এত লোক তাস-পাশা খেলছে. সকলের চরিত্রই কি নষ্ট হয়েছে বলতে চান ?

হরসুন্দরবাবু বললেন, যারা খেলে তারা খেলুক মশাই, বাপের টাকা, শ্বশুরের টাকা থাকে ওড়াক না যত খুশী। তাদের কথা আলাদা—যেমন সাহা-কোম্পানির ছোট-সাহা মশাই। আমরা হলাম গরিব লোক, আমাদের অল্প পুঁজি নিয়ে দোকান করতে হবে, দশজনের সামনে মাথা তুলে দাঁড়াতে হবে—

বললাম, রাসলীলার দিন কী হয়েছিল বলছিলেন হরসুন্দরবাবু ?

হরসুন্দরবাবু বলেন, চরিত্র জিনিসটা কি সোজা নেত্যবাবু ! আপনারা বুঝবেন না তিলে তিলে বড় হওয়া কাকে বলে। এ যুদ্ধের হিড়িকে বড় হওয়া নয়। টাকার জোয়ার আসা যাকে বলে, তাও নয়। এক পার্সেন্ট, দেড় পার্সেন্ট লাভে মাল বেচেছি, বিন্দু বিন্দু সঞ্চয় করে প্রতিষ্ঠা করা যে কী কষ্ট তা আপনি বুঝবেন না নেত্যবাবু।

হরসুন্দরবাবু বলতেন, চোখের সামনে চুরির পয়সা লোপাট হতে দেখেছি, আবার অগাধ পয়সা এক ফুঁয়ে তুলোবাজির মতো উড়তে দেখেছি। কিন্তু ওই-যে বাবা একদিন কান মলে দিয়ে আমায় শিক্ষা দিয়ে দিলেন তা আর ভুলিনি মশাই—

তার পর আকাশের উদ্দেশে হাত জোড় করে বলতেন, বাবা এখন গত, তিনি ছিলেন দেবতা, তেমন মনের বলও নেই আমাদের, তেমন শিক্ষাদীক্ষাও নেই, তবু এ-জীবনে যা কিছু করেছি, জানবেন সেই মহাপুরুষের আশীর্বাদের জোরেই—

বলতে বলতে হরসুন্দরবাবুর হঠাৎ যেন সম্বিৎ ফিরে আসে। ঘড়ির দিকে চাইতেই চমকে ওঠেন : পাঁচটা বাজে ! বলেন কী ! আপনার ঘড়িটা ঠিক আছে তো নেত্যবাবু ?

বলে তর তর করে বেরিয়ে যান। পাঁচটার পর আর তাঁকে আটকানো যায় না।

খদ্দের এলে বলেন, আজ নয়, কাল আসবেন। কাল কাঠের চালান আসছে আরও দু' গাড়ি, সাত-তিন, পাঁচ দেড়, ছয়-চার, যা চাইবেন সব পাবেন—

নিত্যানন্দ গল্প বলছিল। শেষে বললে, আমি তো আজ সাত বছর দোকান করেছি এখানে, এই এক ভাব দেখে আসছি হরসুন্দরবাবুর, কোনও দিন কোনও ব্যতিক্রম নেই। অথচ ব্যবসাদার হিসেবেও ভারি খাঁটি, ও'র দোকানে এক দর, খদ্দেররা সে-কথা জানে। কবে একদিন বাপ বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল পাশাখেলার অপরাধে, তার পর থেকে একেবারে নিষ্পাপ নিষ্কলুষ চরিত্রটি রেখেছেন—একেবারে নিদাগ যাকে বলে।

এতক্ষণ গল্প শুনে বললাম, না ভাই, ও'কে নিয়ে গল্প হয় না।

নিত্যানন্দ হাসল। বললে, আমিও তাই ভাবতুম। কিন্তু একদিন সত্যি-সত্যিই গল্প হয়ে গেল কিন্তু।

বললাম, কী রকম ?

নিত্যানন্দ বললে, হ্যাঁ ভাই। হঠাৎ। আর আমি তার জন্যে ঠিক তৈরী ছিলুম না, যে-লোককে নিরস কাঠের ব্যবসায়ী বলে জানতাম, হিসেব আর গজ-ফিতে আর টাকা উপার্জন নিয়েই ব্যস্ত বলে জানতাম, হঠাৎ আমার চোখে একদিন সেই মানুষই এক মহাকাব্য হয়ে উঠল ভাই।

তবু বুঝতে পারলাম না, বললাম কী রকম ? লুকিয়ে লুকিয়ে মদ খান বুঝি ?

নিত্যানন্দ হাসল। বললে, দূর, তা হলে তো চরিত্রটা মাটি হয়ে যেত !

তা হলে ?

নিত্যানন্দও হাসতে লাগল। বললে, সে কল্পনাও করতে পারিনি ভাই আমি—

বললাম, তবে কি মেয়েমানুষ— ?

নিত্যানন্দ বললে, তোমরা গল্প লেখ, তবু এমন ঘটনা তুমিও কল্পনা করতে পারবে না।

বললাম, তবে কি গান-বাজনা ?

না, তাও না।

নিত্যানন্দ বলতে লাগল, প্রথম প্রথম আমার খারাপ লাগত ভাই লোকটাকে। ভাবতাম, খালি এসে উপদেশ দেয়। বুঝি পয়সাটাই সার চিনেছে জীবনে। বিয়ে-থা করেনি, কেবল চোখ কান নাক বুজে ব্যবসাই করছে। ব্যবসা ভাল জিনিস, কিন্তু জীবনে কাঠ-ই সত্যি আর সব মিথ্যে, এমন কথা হাজার চেষ্টা করেও ভাবতে পারলুম না জীবনে, তাতে ব্যবসা হোক আর না হোক। ওদিকে হরসুন্দরবাবুর ঘরে গিয়ে দেখেছি সামনা-সামনি দুটো ছবি। এপাশে ঠিক গণেশের মূর্তির ওপরই একটা লক্ষ্মীর পট আর সামনের দেওয়ালে ওঁর বাবার একটা ফোটো।

প্রত্যেকদিন গঙ্গাস্নান করে এসে ওই গণেশ আর লক্ষ্মীকে প্রণাম সেরেই বাবার ফোটোর তলায় অনেকক্ষণ ধরে দেওয়ালে মাথা ঠেকিয়ে একমনে প্রণাম করেন।

বলেন, পিতাই তো সর্বস্ব মশাই, তিনি তো ওপর থেকে সবই দেখছেন, যখনই ঠেকায় পাড়, বাবার ছবির সামনে গিয়ে উপদেশ চাই, বলি, তোমার কথা আমি অমান্য করিনি বাবা, আমাকে আশীর্বাদ কর, যেন সমস্ত বিপদ কাটিয়ে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারি।

হরসুন্দরবাবু বলেন, আর আশ্চর্য দেখেছি মশাই, বাবাকে স্মরণ করলেই কোথা থেকে সব বিঘ্ন কেটে যায়, সব সমস্যার সুরাহা হয়ে যায়।

অদ্ভুত পিতৃভক্তি ! এত যে যুদ্ধ গেল, এত বাজার খারাপ গেল, হরসুন্দর বাবু বিপদে-আপদে কেবল বাবাকে ডেকে এসেছেন।

খদ্দেরদের বলেন, দেখুন, আমি কে ? আমি তো নিমিত্ত, ওই দেখুন বাবার ফোটো। বাবাকে স্মরণ করে আমি কারবার করি, ওপর থেকে উনিই দেখছেন। আপনাদের যে ঠকাব তারও উপায় নেই।

বলেন, বাবা ছিলেন আমার দেবতা। যা কিছু শিক্ষা দেখছেন—এই ত্যাগ, এই সংযম, এই পরিশ্রম দেখছেন, সব আমার বাবার কাছে শিক্ষা।

ছেলেরা দুর্গাপুজো, সরস্বতীপুজোর চাঁদা চাইতে এলে বলেন, এই চার আনা দিলাম ভাই, নিতে হয় নাও না-নাও নিও না—এর বেশী দেবার সামর্থ্য আমার নেই ভাই।

ছেলেরা বলে, ওঁরা সবাই দু'টাকা করে দিলেন, আর আপনি মোটে চার আনা ?

হরসুন্দরবাবু বলেন, ওই তো বললুম, ওঁদের বড় বড় ব্যবসা, ওঁরা দিতে পারেন। দু'টাকা তো সামান্য ভাই, আমি যখন তোমাদের বয়েসে সাহা কোম্পানিতে পাঁচ টাকা মাইনের কাজ করতুম, তখন দেখেছি সাহাবাবুর হাত

দিয়ে দশ টাকার কমে গলত না—পাঁচ হাতে হীরের আংটি, দান-ছত্তোর, দোল-দুর্গোৎসব, এলাহি কান্ড, টালিগঞ্জের মোড়লদের রাসের মেলায় বাঈজী-খেমটাওয়ালীর ভিড় লেগে যেত, তা সেই সাহা-কোম্পানি কি রইল ? বলো না তোমরা ? তোমরা তো আজকালকার ছেলে হে, সেই সাহা-কোম্পানির নাম শুনেছ ?

ছেলেরা বলে, না।

শোননি ? তবে শোন আমার কাছে, শুনে নাও।

বলে লম্বা ফিরিস্তি দেন সাহা-কোম্পানির কারবারের। কেমন করে সাহা-কোম্পানি আস্তে আস্তে পড়ল। কেন পড়ল। যাতে না পড়ে তার জন্যে কী কী করা উচিত তার জন্যে উপদেশ। ছেলেরা অত শুনবে কেন ? তাদের দশ জায়গায় কাজ আছে। আরও পঞ্চাশ জনের দরজায় যেতে হবে। বলে, পাগল, একেবারে বদ্ধ পাগল।

কিন্তু বাপের মৃত্যুর পর কেউ কাছা-গলায় দিয়ে সাহায্য চাইতে আসুক !

হরসুন্দরবাবু মুক্তহস্ত। বলেন, ওই দেখ আমার বাবার ছবি, এই যা কিছু দেখছ, সবই ওই ওঁর কল্যাণে। বাবার একটা ছবি ঘরে টাঙিয়ে রাখবে ভাই, রাত্রে শুতে যাবার আগে আর ঘুম থেকে উঠে প্রণাম করবে। দেখবে সব বিপদ-আপদ থেকে উদ্ধার হয়ে যাবে।

বলেন, বাপ কি সামান্য জিনিস ভাই, সেই বাপের কথাই ছোট বয়েসে শুনি-নি, ছেলেবেলায় সঙ্গদোষে বখাটে ছেলেদের সংগে মিশে বাপকে কেয়ারই করিনি, নেশা করে সর্বনাশ করেছি নিজের।

নেশা ?

হ্যাঁ ভাই, নেশা করে একেবারে উচ্ছন্নে গিয়েছিলাম।

কিসের নেশা ?

না ভাই, মদ-ভাঙ নয়, মেয়েমানুষও নয়, তার চেয়েও খারাপ নেশা। কিন্তু বাবা ছিলেন দেবতা, জানতে পেরে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলেন। এই দেখ না, চেলা কাঠের দাগ এখনও পিঠের ওপর দেখতে পাবে !

বলে পিঠটা দেখান পাশ ফিরে।

বলেন, সেই যে শিক্ষা পেলাম, সে আর জীবনে ভুলিনি,—নাক-কান-মলা খেয়ে সেই যে ও-পথ ছেড়েছি, আর নয়।

বলে আকাশের উদ্দেশে হাত জোড় করে প্রণাম করেন।

নিত্যানন্দ বললে, তা এই চরিত্র দেখে দেখে আমিও ভাই ভাবতুম, তুমি যে মেয়েদের জীবন নিয়ে গল্প লিখছ, ঠিকই করছ। মেয়েদের জীবনেই বুঝি যত রস, মেয়েদেরই জীবনে যত নাটক। পুরুষ মানুষকে খাটতে হয়, অফিসে উদয়াস্ত পরিশ্রমের পর আর কিছু থাকে না তার শরীরে কি মনে, কিংবা

ব্যবসাপত্তোর করে সারাদিন বিলের তাগাদা আর গজ-ফিতের হিসেবের তাপ লেগে রস কষ সব বুঝি শুকিয়ে যায়। তাই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনেক কথা জিজ্ঞেস করেছি হরসুন্দরবাবুকে। ওঁর জীবনের সব খুঁটিনাটি! ছোট বয়েসের ঘটনা, তারপর যখন বড় হয়েছেন। প্রাণখোলা মানুষ। সব বলেছেন আমাকে। ভাবলাম সাহা-কোম্পানির সাহাবাবুর কাছে তো বার বার যেতে হয়েছে। রাসবাড়িতে নাচওয়ালী-খেমটাওয়ালাদের বাহার দেখেছেন, কখনও কি আর কিছু ঘটেনি! সন্দেহ হয়েছিল, হয়তো চেপে যাচ্ছেন। হয়তো বয়েসে আমি কম বলে কিছু ঢাকছেন, কিন্তু বার বার চেষ্টা করেও কিছু জানতে পারিনি।

হরসুন্দরবাবু বলতেন, চরিত্রটা ঠিক না রাখলে কি আর আজকে এই দাঁড়াতে পারতাম ভাই, বড় ভাইপোকে বিলেতে ডাক্তারি পড়তে পাঠিয়েছি, মেজ ভাইপোটা এম. এ. পাস করে প্রফেসারি করছে, ছোটটাও ইস্কুলে ফার্স্ট হয়, এবার ভাইঝির একটা বিয়ে দিতে পারলেই—

বলতাম, কিন্তু আপনারও তো একদিন কম-বয়েস ছিল, সাহাবাবুর গদি-বাড়িতে যখন চাকরি করেছেন, কাঁচা পয়সা হাতে এসেছে—তখনও কিছু হয়নি?

হরসুন্দরবাবু বলতেন, ওই যে তোমাকে বললুম ভাই, বাবার ফোটোটা কাছে রেখে দিতাম আর বিপদে পড়লেই বাবাকে স্মরণ করতাম, সঙ্গে সঙ্গে সব বিপদ কেটে যেত।

কিন্তু সাহাবাবুর সঙ্গে তার মেয়েমানুষের বাড়িতেও তো যেতে হয়েছে?

তা যেতে হয়েছে বইকি। হামেশাই যেতে হয়েছে। শুধু যেতে হয়েছে? গদিবাবু ছিল তারক সরকার। সে কি কম চেষ্টা করেছে আমাকে বখাবার। সময় নেই, অবসর নেই, গিয়েছি তার হুকুমে। গিয়ে সে যা বেলেল্লাগিরি দেখেছি আবাগীদের! দেখে গায়ের রক্ত জল হয়ে এসেছে। কিন্তু তখুনি বাবার মুখখানা স্মরণ করলুম, আর সঙ্গে সঙ্গে সব বিপদ উদ্ধার হয়ে গেল।

আর রাসবাড়িতে?

হরসুন্দরবাবু বলতেন, সেখানকার কথা আর বলবেন না নেত্যবাবু, সেখানেও বাবুরা রাসলীলা করত কিনা। টাকার শ্রাদ্ধ হত সে-ক'দিন। মদ—মদের ফোয়ারা চলত মশাই সেখানে। একদিন কি হল জানেন? সকালবেলা গিয়েছি সাহাবাবুর সঙ্গে দেখা করব বলে। তা বাবুর কি আর হুঁশ আছে তখন! রাত্তিরে মদ খেয়ে আছেন, সে ঘোর তখনও কাটেনি। যতবারই দেখা করতে যাই, শুনি—দেখা হবে না, বাবু ওঠেনি। দুপুর হয়ে গেল, বসেই আছি—না-খাওয়া না-দাওয়া, ওকেই বলে চাকরি, বসে থাকতেই হবে, উঠে আসতে পারিনে, সাত টাকার চাকরিটা চলে যাবে—গদিবাবু তারক সরকার আর তা হলে আস্ত রাখবে না, শেষকালে বেলা আড়াইটে…

হরসুন্দরবাবু একটু দম নিয়ে আবার বললেন, আড়াইটে নাগাদ একটু ঢুলুনি এসেছিল আমার, হঠাৎ দেখি এক আবাগী আমাকে এসে ঠেলছে। প্রথমটায় কিছু বুঝতে পারিনি, ভাবলাম কে-না-কে! তক্তপোশটার ওপর উঠে বসলাম, ভাল করে চোখ রগড়ে চেয়ে দেখি, কখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। চারদিকে একটু ঝাপসা-ঝাপসা ভাব।

আবাগী বললে, উঠুন, উঠুন—উঠুন।

ভারি রাগ হয়ে গেল আমার, জানেন! সাহাবাবুর গদিতে চাকরি করি বলে কি সাহাবাবুর আবাগীদেরও চাকর নাকি মশাই! বললাম, কোথায় উঠব?

আবাগী বললে, নিমতলায়।

নিমতলায় কথাটা শুনেই কেমন যেন ঘুমের ঘোরটা ভাল করে ভেঙে গেল মশাই। নিমতলায় কাঠ কিনতে গদিবাবুর সঙ্গে কতবার গিয়েছি। নিমতলা আমার চেনা জায়গা।

বললাম, নিমতলায় কেন যাবে?

সে বললে, নিমতলায় আমার বাড়ি।

বললাম, তা বাড়ি যেতে হয় যাও না, আমার সঙ্গে কী! মালিকের অনুমতি নিয়েছ? সাহাবাবু চলে যেতে বলেছে?

আবাগী বললে, সাহাবাবুকে বলবেন না, বললে, আমায় ছাড়বেন না।

আমার যেন কেমন ভয় হতে লাগল মশাই। এই সব আবাগীদের নিয়ে কত সব কেলেঙ্কারী কাণ্ড হয় শুনেছি। চোখের সামনেও তো দেখেছি বাদামতলায়। দিন-রাতই তো পুলিসের হুজ্জুত লেগেই আছে। মারাপিট আর খুন জখম তো এ-পাড়ার নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার দাঁড়িয়ে গেছে।

বললাম, সাহাবাবুর সঙ্গে কি তবে তোমার ঝগড়া হয়েছে?

আবাগী বললে, আমাকে কুড়ি টাকা দেবে বলে ভুলিয়ে এনেছিল, চার দিন হয়ে গেল এখনও একটা পয়সাও দেয়নি।

তা বাবুকে বল না কেন। সাহাবাবুর তো টাকার অভাব নেই।

আবাগী বললে, সাহাবাবু তো দিয়ে দিয়েছে, নীলুবাবু সব নিজে খেয়েছে—শুধু আমি নয়, কারোর টাকাই দেয়নি।

তারা কোথায় সব?

তারা সব ঘুমোচ্ছে, আমি এই সুযোগে পালিয়ে এসেছি।

বললাম, কেন? থাক না, পাওনা-গণ্ডা বুঝে নিয়ে একেবারে যেও।

আবাগী কেঁদে ফেললে। বললে, আমার মেয়ের বড় অসুখ, বাড়িতে কেউ নেই, আমি আর থাকতে পারছিনে।

বলে সত্যি সত্যি মশাই মেয়েটা সেইখানে সেই তক্তপোশে বসে কাঁদতে লাগল আঁচলে চোখ ঢেকে। দেখুন তো মুশকিল! আমি গেছি বাবুর কাছে কাগজ-

পত্তর নিয়ে দেখাতে। সাহাবাবু সই-সাবুদ করবে তবে ছাড়ান পাব গদিবাবুর হাত থেকে, এ কী বিপদ বলুন তো ! অন্ধকার ঘর। দোতলায় সব বাবু, বাবুর মোসাহেবরা রয়েছে। আমাকে যদি দেখে ফেলে ! গদিবাড়িতে চাকরি করতে এসে এ কী ঝঞ্ঝাট বলুন তো ! পরের চাকরি তো একেই বলে। তাই তো একদিন চাকরির মাথায় দুত্তোর বলে লাথি মেরে নিজেই কাঠের ব্যবসায় নেমে পড়লাম। বললাম, আর পরের চাকরি না মশাই।

বললাম, তা সে-মেয়েটার বয়েস কত ?

হরসুন্দরবাবু বললেন, আপনিও যেমন নেত্যবাবু, আবাগীদের আবার বয়েস, ও আবাগীদের ঝাড়-বংশ বদমাইশ, ওদের কথা আমি বিশ্বাস করি ভেবেছেন ?

বললাম, তারপর কী করলেন আপনি ?

হরসুন্দরবাবু বললেন, আবাগী আমাকে গায়ের গয়না খুলে দিয়ে বলে কিনা —এগুলো আপনি নিন, আমায় দয়া করে বাড়ি ফিরিয়ে দিয়ে আসুন।

তা আমি বললাম, তুমি একলাই যাও না, আমাকে কেন ?

আবাগী বললে, আমি কলকাতার রাস্তা চিনি না, নতুন এসেছি এখানে।

জিজ্ঞেস করলাম, কোত্থেকে এসেছ ?

আবাগী বললে, ফরিদপুর, পুবের পাড়া। ওই নলিনবাবুই আমাকে নিয়ে এসেছিল।

তা আমার তখন মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল মশাই, আমার বলে চাকরির ঠেলা, আমার নিজের ঠেলাই কে সামলায় তার ঠিক নেই। সাহাবাবু যদি জানতে পারেন তো আমার চাকরি নিয়ে টানাটানি—

তা আপনি কি করলেন ?

হরসুন্দরবাবু বললেন, আমি আর কি করব, আমি তখন বাবার মুখখানা স্মরণ করলাম। যখনই বিপদ এসেছে বাবার মুখখানা স্মরণ করতেই সব মুশকিলের আসান হয়ে গেছে বরাবর। মনে মনে বললুম—বাবা, আমার মনে বল দাও, শক্তি দাও, ভরসা দাও—

তার পরে শেষ পর্যন্ত কি হল ?

কি আর হবে ! শেষকালে যা হবার তাই হল। দেখছেন তো এখন ভুলুবাবুর পাইস-হোটেল হয়েছে ওখানে। অত বড় গোলা, দিনরাত কাজকর্ম লেগে থাকত সেখানে, সেই গোলা, সেই পাঁচ পুরুষের ফলাও কারবার উঠে গেল। কোথায় গেল সাহাবাবু, কোথায় গেল তার সব মোসাহেবের দল ! আর গদিবাবু ? সেই তারক সরকার ? সেও কি ভোগ করতে পেলে ভেবেছেন ! ভেবেছিল দেশে গিয়ে গঞ্জে কাঠের গোলা খুলবে। কিন্তু কার ধন কে খায় ! মশাই, রাত পোয়াতে তর সইল না, সাপের কামড়ে প্রাণ হারাতে হল। আর আমি···

কিন্তু সেই মেয়েটা ?

হরসুন্দরবাবু বললেন, আপনি ভাবছেন আমি তার খোঁজ নিয়েছি ! রাম বলো । বাবার কাছে আমার শিক্ষা মশাই, ভোরবেলা রোজ বাবাকে প্রণাম করে কারবার শুরু করি, আমি যাব সেই আবাগীর খোঁজ নিতে ! ওই আবাগীদের মুখ দেখতে হবে বলে থিয়েটার-বায়োস্কোপে পর্যন্ত যাইনা মশাই, তা হলে আর বাবাকে মুখ দেখাতে পারব ভেবেছেন ? বাবা যে ওপর থেকে সব দেখছেন—

বললাম, তার পর ?

তারপর সাহা কোম্পানি যখন উঠে গেল, সে আজ চল্লিশ বছর আগেকার কথা, প্রথম একদিন পাঁচ-দশ টাকার বাঁশ নিয়ে বাবার নাম স্মরণ করে কারবার আরম্ভ করে দিলুম, তারপর থেকে তো দেখছেন এই কারবার, বড় ভাইপোকে বিলেত পাঠিয়েছি ডাক্তারি পড়তে, মেজ ভাইপোটিকে এম. এ. পাস করিয়ে প্রফেসারিতে দিয়েছি, ছোটটি পড়ছে, ভাবছি ভাইঝিটিকে পাত্রস্থ করে ওদের জন্যে একটা গেরস্থ-পোষা বাড়ি করে দেব, আর তারপর বাবা যদি মুখ রাখেন, মায়ের মন্দিরের পাশে কেওড়াতলার শ্মশানে এই গঙ্গার তীরেই যেন যেতে পারি মশাই ভালয় ভালয় ।

বলেই উঠলেন হরসুন্দরবাবু । বললেন, যাই, দেরি হয়ে গেল আবার ।

তারপর যেতে যেতে ঘড়ির দিকে চেয়ে বললেন, ওঃ পাঁচটা বাজে ! আপনার ঘড়ি ঠিক চলছে তো ?

তারপর ফতুয়াটা গায়ে দিয়ে চটি পরে হাতে ছাতা নিয়ে সোজা দোকান থেকে বেরিয়ে গেলেন ।

নিত্যানন্দ গল্প শেষ করে বললে, এই হল মোটামুটি হরসুন্দরবাবুর জীবনী ।

বললাম, তবু ভাই, এ নিয়ে গল্প হয় না ।

নিত্যানন্দ বললে, কিন্তু এর পরেই গল্প হল যে—শুধু গল্প নয়, মহাকাব্য হল একেবারে !

বললাম, কি রকম ?

নিত্যানন্দ বললে, তবে শোন, একদিন কি মনে হল । ভাবলাম, দেখি-না কোথায় যায় লোকটা ! দোকান আরম্ভ হওয়ার পর থেকেই দেখে আসছি কিনা, ঠিক পাঁচটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে ছাতা নিয়ে ফতুয়া পরে বেরিয়ে যান । মনে মনে অনেক কৌতূহল হয়েছে । কোথায় যান ? বিলের তাগাদায় ? কিন্তু সেজন্যে তো আলাদা সরকার আছে ; আর যদি বেড়াতে যান তো তার জন্যে আবার ঘড়ি দেখার কী দরকার ! এ যেন এক মিনিট দেরি হয়ে গেলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ওলট-পালট হয়ে যাবে ! যেন তার জন্যে কেউ অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছে ! যেন তিনি না গেলে সব আয়োজন শুধু পণ্ড নয়, লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে । কিসের এত কাজ যার জন্যে খদ্দের এলে ফিরিয়ে দেন !

খদ্দেরদের বলেন, কাল আসবেন দাদা, কাল আরও দু'ওয়াগন মাল আসছে, সাত-তিন, ছয়-চার, পাঁচ-দেড়—সব পাবেন। আজকে একটু বেরোচ্ছি আমি—

যে-লোক বার বার আমাকে উপদেশ দেন, আমার তাসখেলার খবর শুনে ভয়ে আঁতকে ওঠেন, তিনি হেন লোক কী করে ব্যবসাকে এতখানি অবহেলা করেন। তিনি-হেন লোক কী করে বিকেলবেলা দোকান ছেড়ে যান! কিসের টানে! কিসের নেশায়! কিসের আকর্ষণে!

অনেকদিন ভেবেছি। দোকানে যখন বিকেলবেলা কোনও কারণে জানলার বাইরে নজর পড়েছে, ঠিক পাঁচটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে দেখেছি হরসুন্দরবাবু দোকান থেকে বেরুলেন। আকাশের দিকে চেয়ে বোধ হয় বাবাকে স্মরণ করে ছাতাশুদ্ধ হাত দুটো জোড় করেই কাকে যেন প্রণাম করলেন। যেন মনে মনে দুর্গানাম স্মরণ করলেন। অর্থাৎ অফিস যাবার সময় সেকালের বাবুরা যেমন ইষ্ট-নাম স্মরণ করে অফিসে যাত্রা করেন এও যেন তেমনি। নিজের মেয়ের পাত্র দেখতে যাবার সময়ও কেউ এত ভক্তিভরে ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করেনা ভাই এমনি ভক্তি, এমনি নিষ্ঠা! আর এ কি একদিন, না দু'দিন! হামেশা। হামেশাই দেখি। আশেপাশের গোলদার লোকজনকে জিজ্ঞেস করলে বলে, পাঁচটা বেজেছে এখন আর হরসুন্দরবাবুকে পাওয়া যাবে না।

আর আমিও যে জিজ্ঞেস না করেছি তা নয়।

জিজ্ঞেস করতাম, কোথায় চলেছেন হরসুন্দরবাবু ?

হরসুন্দরবাবুর তখন দাঁড়াবার সময় নেই, চলতে চলতে বলতেন, কাজ আছে ভাই, চলি।

এমনি যে কতবার জিজ্ঞেস করেছি তার ঠিক নেই। প্রত্যেকবারই ওই একই উত্তর—কাজ আছে ভাই, চলি।

যখন সকালবেলা, কাজকর্ম কম, তখনও জিজ্ঞেস করেছি, রোজ পাঁচটার সময় কোথায় যান বলুন তো হরসুন্দরবাবু ? রোজ আপনার কিসের কাজ ?

হরসুন্দরবাবু প্রশ্নটা এড়িয়ে যেতেই চেষ্টা করতেন, নেহাত পিড়াপিড়ি করলে বলতেন—ভাই, কাজ কি আর একটা নেত্যবাবু, তিন ভাইপোকে তো একরকম যাহোক করে মানুষ করে দিয়েছি, এখন ভাইঝিটার বিয়ে দিতে পারলেই নিশ্চিন্ত হতে পারি। যাব আর কোথায় ভাই, এই একটু ধান্ধায় ঘুরি আর কি!

প্রথম প্রথম আমিও ভাবতাম, হয়তো তাই। ভাইঝির বয়েস হয়েছে, বি. এ. পাস করেছে। ভারি নম্র স্বভাব মেয়েটির। গড়ন-পেটন ভাল। বাদামতলার এই আবহাওয়ার মধ্যে টিনের গোলার ভেতর মানুষ বটে কিন্তু চাল-চলন ভারি চমৎকার। এখান দিয়ে হেঁটে কলেজ যেত, কোনদিকে চোখ তুলে চাওয়া নয়, কি কারও সঙ্গে দাঁড়িয়ে হাসি-গল্প করা নয়। কাকাবাবুর শিক্ষা-দীক্ষা পুরোপুরি

পেয়েছে। হরসুন্দরবাবু নিজের হাতে মানুষ করেছেন বলতে গেলে। ভাইঝিটির বিয়ের জন্যে হরসুন্দরবাবুর একটা ভাবনা ছিল জানতাম। ভাবতাম, সেই ধান্ধাতেই হয়তো ঘোরেন।

কিন্তু ভাইঝিরও বিয়ে হয়ে গেল একদিন।

ওরই মধ্যে হরসুন্দরবাবু খরচ-পত্তোর করে লোক-জন নিমন্ত্রিতদের আদর-আপ্যায়ন করলেন। দেখতে দেখতে দু-এক দিনের মধ্যে অতিথি-অভ্যাগতের ভিড়ও কমে গেল। কিন্তু অত যে কাজকর্ম তার ফাঁকেও দেখেছি, হরসুন্দরবাবু কেমন যেন পাঁচটা বাজবার সঙ্গে সঙ্গে ছটফট করছেন।

আমার ঘড়িটার দিকে নজর পড়তেই বললেন, উঃ পাঁচটা বাজে, আপনার ঘড়িটা ঠিক চলছে তো ?

বললাম, কোথাও যাবেন নাকি ?

নাঃ, কাজ তো ছিল, কিন্তু বাড়িতে লোকজন আসবে, যাই কী করে ?

বললাম, এ ক'টা দিন না-হয় একটু কাজ কামাই-ই করলেন—ভাইঝির বিয়েটা হয়ে গেল। এবার তো আর আপনার কারও দায় নেই—

তা দায় না থাকলে কী হবে ! বাড়ি একটু ফাকা হতেই দেখি, আবার সেই পাঁচটা বাজবার সঙ্গে সঙ্গেই সেই চটি-জোড়া পায়ে গলিয়ে, সাবান-কাচা ফতুয়াটা পরে, ছাতা নিয়ে হন হন করে চলেছেন। যেন তাঁর অভাবে কোথাও রাজকার্য আটকে যাচ্ছে। যেন তিনি না গেলে সব আয়োজন পণ্ড, সমস্ত লণ্ড-ভণ্ড হয়ে যাবে। যেন তাঁর যেতে দেরি হলে কোথাও কোনও অনুষ্ঠান আরম্ভ হতে পারবে না। যেন কেউ তাঁর জন্যে উদ্‌গ্রীব আগ্রহে প্রতীক্ষা করছে।

জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় চলেছেন হরসুন্দরবাবু ?

হরসুন্দরবাবুর তখন দাঁড়াবার সময় নেই। চলতে চলতেই বললেন, কাজ আছে ভাই, চলি।

বুঝলাম কোথাও একটা রহস্য আছে। যা কেউ জানে না, যা কাউকে তিনি জানাতেও চান না—অতি গোপনীয়, গূঢ় তত্ত্ব, যা সকলের কাছ থেকে তিনি গোপন করতেই চান।

পাশের গদির দয়াল পোদ্দারকে জিজ্ঞেস করলাম একদিন। দয়াল পোদ্দার এ-পাড়ায় ষোল বছর কাঠের কারবার করছেন। বললেন, আমিও রোজ দেখি যেতে বটে, ঠিক পাঁচটার সময়। আজ ক্রমাগত ষোল বছর ধরেই দেখে আসছি, কিন্তু—

মোড়ের মাথার শশী দাস মশাইকেও জিজ্ঞেস করলাম। দাস মশাই আজ তিরিশ বছর বাদামতলায় কাঠের কারবার করছেন। বললেন, আমিও আজ তিরিশ বছর অমনি দেখে আসছি বটে—পাঁচটা বাজতে-না-বাজতে কোথায় যান বুঝতে পারি না। *

শেষকালে একদিন ঠিক করলাম, দেখতে হবে কোথায় যান হরসুন্দরবাবু।

সেদিনও ফতুয়া গায়ে ছাতা নিয়ে দু'হাত জোড় করে ইষ্টনাম স্মরণ করে, বোধ হয় বাবার নামই স্মরণ করে হন হন করে চলতে লাগলেন।

আমিও তৈরী ছিলাম। পেছু নিলাম।

আগে আগে চলতে লাগলেন হরসুন্দরবাবু। এই ধর পঞ্চাশ গজ দূরে দূরে। আর পেছনে তাঁকে লক্ষ্য করে আমিও চলেছি। কিন্তু তখনও কি জানি আমি, কী অমূল্য রত্ন পাব! তখনও কি জানি হরসুন্দরবাবু শুধু কবিতা নয়, ছোটগল্পও নয়, একেবারে সাত সর্গে পূর্ণাঙ্গ একটি মহাকাব্য! আমি ভাই পূর্ণিমার রাতে তাজমহল দেখেছি, পুরীর সমুদ্রে সূর্যোদয় দেখেছি, আবু পাহাড়ের সান্-সেট্-পয়েন্টে দাঁড়িয়ে সূর্যাস্ত দেখেছি, দার্জিলিং থেকে ভোরের কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখেছি, মহাবলীপুরমের হর-পার্বতী মূর্তি দেখেছি, সাঁচীর বুদ্ধস্তূপ দেখেছি, বৃন্দাবনে সোনার তালগাছ দেখেছি, কাশ্মীরের নিশাদ্‌বাগ দেখেছি, যোধপুরের থর মরুভূমি দেখেছি—জান তো ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে কতবার কত জায়গায় কত জিনিস দেখতে গিয়েছি; কিন্তু এ এক অবাক কাণ্ড! এমন আমার জীবনে দেখিনি। এ তুমি কল্পনাও করতে পারবে না—

বললাম, কী রকম?

নিত্যানন্দ বললে, আমি তো পেছনে পেছনে চলেছি, তখন নভেম্বরের মাঝামাঝি, পাঁচটার পরই সন্ধ্যে হয়ে যায়, চারদিকে বেশ অন্ধকার ভাব, কাঠের পটি পেরিয়ে, বেঙ্গল গভর্মেন্ট প্রেস পার হয়ে সেন্ট্রাল জেল বাঁয়ে রেখে কালীঘাটের গঙ্গার উঁচু পুল। দু' পাশে মানুষজন যাবার রেলিঙ-ঘেরা সরু রাস্তা। হরসুন্দরবাবু সেই রাস্তা দিয়ে চলতে লাগলেন। আশেপাশে কোনও দিকে দৃষ্টি নেই। শুধু ছাতাটা মাটিতে ঠুকতে ঠুকতে নীচু দিকে চেয়ে হন হন করে চলেছেন। তখনও ভাবছি, কোথায় চলেছেন!

তার পর পুল পার হয়ে শনিঠাকুরের মন্দির ডান দিকে রেখে বাঁ দিকের ফুটপাথ ধরলেন। বাঁ দিকে মেথরদের বস্তি পেরিয়ে একেবারে হরিশ চ্যাটার্জির স্ট্রীট। হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রীটে তখন দোকান-পাট আলোয়-আলো। রাস্তাতেও সে-আলো এসে পড়েছে। বাঁ দিক ঘেঁষে চুন-বালি আর সুরকির গোলা, ইঁটের আর টালির কারবার। পুরনো জানলা-দরজার দোকানও আছে। আর কিছু স্যাকরাদের সোনা-রুপোর দোকান। ঠুক-ঠাক হাতুড়ি ঠোকার শব্দ। রাস্তার পাশে টিউবওয়েলের ধারে কিছু মেয়ে-পুরুষের ভিড়। তখনও হ্যাঁচকা টান দিচ্ছে আর ঝগড়া চলেছে জল নিয়ে। গরুর গাড়িগুলো খোলা পড়ে আছে। মোষ গরু রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়ে। তারই মধ্যে একটা মোটর কি ট্যাক্সি এলে পাড়া কাঁপিয়ে হর্ন বাজিয়ে ভিড় সরাতে হয়। আর ঠিক দু' পাশের গলির মুখগুলোতে ও-পাড়ার মেয়েমানুষরা সেজেগুজে পাউডার মেখে মাটির ওপরেই উবু হয়ে বসে

গেছে। কেউ কেউ ইঁট পেতে বসেছে, কেউ হেলান দিয়েছে ইঁটের দেয়ালে। রঙ্গ-রসিকতা করছে। কেউ কেউ আবার পানের দোকানের সামনে পান বিড়ি কেনবার ছুতো করে কড়া পাওয়ারের আলোর নীচে দাঁড়িয়ে নিজেদের রূপ দেখাচ্ছে। কিন্তু হরসুন্দরবাবুর সেদিকে বিশেষ নজর নেই। তিনি আপন মনেই ছাতা ঠুক ঠুক করতে করতে চলেছেন সেই নোংরা খোয়ার রাস্তা দিয়ে।

ভাবলাম, হরসুন্দরবাবু এত রাস্তা থাকতে ওই রাস্তা দিয়েই বা চলেছেন কেন! পাশেই তো পোটোপাড়ার গলি ছিল কিংবা তারও ওপাশে হরিশ মুখুজ্জে রোড ছিল। কোথায় যান! কোথায় যান রোজ! শুধু আজ নয়, গতকাল নয়—চিরকাল ধরে। অন্তত দয়াল পোদ্দার ষোল বছর ধরে বাদামতলায় কারবার করছেন। তিনি ষোল বছর ধরে এমনি দেখে আসছেন। শশী দাস তিরিশ বছর ধরে কারবার করছেন বাদামতলায়। তিনিও তিরিশ বছর ধরেই দেখে আসছেন। অথচ কেউ জানে না—কোথায় যান, কী করতে যান, কেন যান! কিসের এত আকর্ষণ! নিজের ছেলে-মেয়ে-বউ কেউ নেই, শুধু ভাইপো, ভাইঝি ভাই বউ নিয়েই সংসার তাঁর। অর্থাৎ ভূতের সংসার। নিজের ছাড়া আর সবাই তো আছে। নিজের আপন-জনকেই কেউ দেখে না, নিজের বউকেই কত লোক খেতে পরতে দেয় না, ছেলেগুলোকে গোমুখ্যু করে রাখে। নিজের জামা-কাপড়-জুতো, নিজের চুল টেরি তেল সাবান গামছা নিয়েই কত লোক ব্যস্ত! নিজের জন্যে রোজ আধপোয়াটাক মাংস বরাদ্দ, বাড়ির বউ ছেলে মেয়ে নাতি-নাতনীর জন্যে মাছ এল কি এল না দেখে না—এমন লোকও কত দেখেছি। তা এ তা-ও নয়। নিজেরই কেউ নয়, বিধবা ভাই-বউ। মরে গেল কি বেঁচে রইল দেখবার দরকার কী! বিধবা মানুষ! আবার ঝাড়া হাত-পাও নয়। চার-চারটে অপোগণ্ড। তিনটি ছেলে একটি মেয়ে নিয়ে ভাইয়ের সংসারে উঠেছে। লাথি-ঝাঁটা খেলেও কারও কিছু বলবার থাকত না। উদয়াস্ত খাটিয়ে নিয়ে একপেটা খেতে দিলেও কেউ নিন্দে করত না। কিন্তু সেই ভাই-বউকে সংসারের গিন্নী করে, তিনটি ভাইপোকে মানুষের মতো মানুষ করে, ভাইঝিটিকে সৎপাত্রস্থ করে, এই যে ব্যবসা করে যাচ্ছেন—এটাই কি কম প্রশংসার কথা এই যুগে! একে নিয়েও যদি তোমরা গল্প না লিখতে পার তো কাকে নিয়ে লিখবে? কেন, নষ্টচরিত্র না হলে কি তাকে নিয়ে গল্প লেখা যায় না? গল্পের যোগ্য হতে গেলে কি চরিত্রের স্খলন দেখাতেই হবে? নেগেটিভ চরিত্র নিয়েই তোমাদের কারবার, কিন্তু পজিটিভ চরিত্র নিয়েই বা গল্প হবে না কেন? তা হলে রামকে নিয়ে রামায়ণ লেখা হল কী করে? যুধিষ্ঠিরকে নিয়ে মহাভারতই বা লিখলেন কী করে ব্যাসদেব? কেবল ছিদ্র দেখাবার জন্যেই কি গল্প লেখা! একই চরিত্রের মধ্যে দুটো বিরোধী মনোবৃত্তির দ্বন্দ্ব দেখানোই কি তোমাদের চরম লক্ষ্য? কিন্তু আমি বলি, তা কেন হবে! অত সংকীর্ণ কেন হবে গল্প-লেখকদের দৃষ্টি!

সমস্ত মানুষ, এই গোটা মানুষটাকে নিয়েই বা গল্প লেখা হবে না কেন ! যদি পবিত্র চরিত্রই কল্পনা কর তো এমন পবিত্রতার কথা চিন্তা কর না, যা শুধু বৈরাগ্যে বা ত্যাগেই মহান নয়, যা ভোগ থেকে বিমুখ হয়ে নয়, ভোগের মধ্যে থেকেই এই আমার 'আমি'কে দূর করতে পেরেছে, ভোগের মধ্যে থেকেই যে ভোগাতীত হতে পেরেছে, সংসারের মধ্যে থেকেই যে সংসারের ঊর্ধ্বে উঠতে চেষ্টা করেছে—

তা থাক্‌গে এসব কথা ! আমি ভাই পেছনে পেছনে যাচ্ছি আর এইসব কথা ভাবছি। শেষে কি এমন একটা চরিত্রের অধঃপতনই দেখব ! হরসুন্দরবাবুর চরিত্রের সব মাধুর্যটুকু কি একটা ছোট ছিদ্র দিয়েই নিঃশেষ হয়ে যাবে শেষ পর্যন্ত !

হরসুন্দরবাবু আগে আগে চলেছেন। সেই ছাতাটি ঠুক ঠুক করতে করতে। কোনও ব্যতিক্রম নেই। সেই যেমন চালে প্রথম থেকে হাঁটতে শুরু করেছেন. সেই এক চাল। হঠাৎ পাশের একটা সরু গলিতে ঢুকলেন।

আমি দেখে যেন বিশ্বাস করতে ভয় পেলাম।

গলির মোড়ে তখন ওপাড়ার বস্তিবাসিনীরা গুলজার করে দাঁড়িয়ে। কারও মুখে বিড়ি, কারও হাতে পান, কেউ পিঁড়িতে বসে, কেউবা উঠে দাঁড়িয়ে। হরসুন্দরবাবু গলিতে ঢুকতেও কেউ চঞ্চল হল না, কেউ সচেতন হল না। তাদের সভা যেমন চলছিল তেমনিই চলতে লাগল। আর হরসুন্দরবাবুও যেমন যাচ্ছিলেন তেমনিই চলতে লাগলেন। যেন ওদের পরিচিত মানুষ ! যেন ওঁকে ওরা চেনে। এমনি ভাব। যেন বহুদিনের বহু-পরিচিত অভ্যস্ত পথ দিয়েই চলেছেন। কোনও দ্বিধা নেই, কোনও সংকোচও নেই। কেউ তাঁকে অনুসরণ করছে কিনা তা পেছন ফিরে চেয়ে দেখাও নেই ! আশ্চর্য !

আমিও পেছনে পেছনে চলেছি। রূপসীদের ভিড় পেরিয়ে গলিতে ঢুকে দেখি হরসুন্দরবাবুও তেমনি চলেছেন। তেমনি ব্যস্ত-সমস্ত ভাব। তেমনি সুবিন্যস্ত গতি।

দু'পাশে টিনের চালা। মাঝে মাঝে গ্যাসের আলো দেওয়ালের মাথায়। চালা-ঘরের সদর-দরজার সামনে ছোট ছোট দরজার পৈঁঠেতে রূপসীদের ভিড়। এত সরু গলি, তবু লোক-চলাচলের বিরাম নেই। হরসুন্দরবাবু এঁকে-বেঁকে চলেছেন, আর অনেকখানি দূরত্ব বজায় রেখে আমিও সাবধানে তাঁর অনুসরণ করে চলেছি। একবার মনে সন্দেহ হল পাশের একটা বাড়িতেই তিনি ঢুকে পড়েন বুঝি-বা, চির-অভ্যস্ত চির-পরিচিত একটি ঘরের চারটে দেয়াল আর একটি মেয়ের আশ্রয়-নীড়ে বুঝি-বা সারা জীবনের সমস্ত সাধু সংকল্পের সুখ-সমাধি রচনা করেন। আর তা যদি করেনই, তাতে দোষই বা কী দেওয়া যাবে ! অপরাধই বা তাতে কোথায় ! তাতে শুধু এইটুকু হবে যে, যে-হরসুন্দরবাবুকে নিয়ে গল্প লিখতে

বলছি, তিনি অতি সাধারণ চরিত্র হয়ে যাবেন। সে-চরিত্রের আর কোন বৈশিষ্ট্যই থাকবে না। যেমন আর পাঁচজন তেমনই। সমাজের সচরাচর আরও শতকরা নিরানব্বইটি ব্যাচিলর মানুষের মতোই একজন। তাতে কোনও বৈচিত্র্যই নেই। আর তা হলে হরসুন্দরবাবুকে নিয়ে তোমাকে গল্প লিখতেও বলতাম না।

তা এমনি করেই আমি চলেছি আর ভাবছি মনে মনে।

এবার আর একটা গলির মধ্যে ঢুকে পড়লেন হরসুন্দরবাবু। এ গলিটা আরও সরু। এ যেন গলির মধ্যে গলি। ঢুকেছিলেন যদুনন্দন লেন দিয়ে, এবারে ঢুকলেন যদুনন্দন বাই-লেনে। ইঁট-বাঁধানো গলি। একটা বাড়ির ইঁট-বার-করা দেয়ালের গায়ে গ্যাস-বাতিটা কোনাকুনি আঁটা। তাও আধখানা কাঁচ ভেঙে গেছে। গলিটা উত্তরমুখো সোজা চলে গেছে বলরাম বোস ঘাট রোডের দিকে। হরসুন্দরবাবু সেই দিকেই চলেছেন। মনে হল হরসুন্দরবাবুর গন্তব্যস্থল যেন আরও অনেক দূরে। আশেপাশের কোনও দিকে নজর নেই। হন হন করে চলেছেন। তারপর যদুনন্দন বাই-লেন যেখানে শেষ হল সেখানে সেই মোড়ের ওপরই একটু খোলা জায়গা মতন। কিছু ঘাস গজিয়েছে। অগোছালো, অবিন্যস্ত আবহাওয়া। কিছু নীচুতলার লোকের ভিড়।

একটা দিশী মদের দোকান সেখানে।

হরসুন্দরবাবু সেখানে একটু দাঁড়ালেন।

আমার বুকটা যেন ছাঁৎ করে উঠল। শেষে কি এই পরিণতি দেখব! আমার এমন সাধের মানুষটি কি এমনি করেই আমাকে এই দেখাতে এতদূর টেনে এনেছেন! এমন জানলে কে আসত এতদূর! এমন জানলে কি তোমাকে গল্প লিখতেই বলতাম ওঁকে নিয়ে!

কিন্তু তোমাকে তো বলেইছি, সেদিন যা দেখলাম সে ছোট গল্প নয়, বড় গল্পও নয়, মহাকাব্য। সাত সর্গে পূর্ণাঙ্গ এক মহাকাব্য একেবারে।

তা যাক গে, যা দেখলাম বলি।

হরসুন্দরবাবু সেই মদের দোকানের সামনেই দাঁড়ালেন বটে, কিন্তু সে এক মুহূর্তের জন্যে। বোধ হয় কোঁচার খুঁট দিয়ে একটু কপালের আর মুখের ঘাম মুছে নিলেন। তারপর ডান হাতে ছাতিটা নিয়ে আবার চলতে লাগলেন। এবার ঢুকে পড়লেন পাশের আর-একটা আরও সরু গলিতে। এবার যেন আমি আরও অবাক হয়ে গেলাম। সত্যিই কোথায় চলেছেন হরসুন্দরবাবু! কত দূর!

কিন্তু এবার আর বেশী দেরি হল না। সরু গলিটা এবার যেখানে গিয়ে শেষ হয়েছে, সেটা বেশ নিরিবিলি জায়গা। ঠিক দুটো রাস্তার কোনাকুনি একটা বাড়ি। বাড়ির ছাদটা গাড়ি-বারান্দার মতো ফুটপাতের ওপর বার করা। একটা গ্যাসপোস্ট ফুটপাতের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। গ্যাসের বাতিটাও অন্যগুলোর চেয়ে যেন একটু বেশী জোরালো। আর তার নীচেই ফুটপাতের ওপর ছেঁড়া

মাদুর পেতে চারজন লোক কী যেন একমনে করছে। নীচু দিকে চোখ, মুখে অনর্গল কথা। কিন্তু ভীষণ মনোযোগ। আর অল্প দু-চারজন লোক আশে-পাশে বসে দাঁড়িয়ে ঝুঁকে পড়ে তাই দেখছে।

হরসুন্দরবাবুও সেখানে গিয়ে দাঁড়ালেন। কোঁচা দিয়ে মুখের আর কপালের ঘাম মুছলেন একবার। তারপর পাশের নীচু রোয়াকে বসে ছাতটার ওপর ভর দিয়ে ঝুঁকে পড়ে সেইদিকে একমনে চেয়ে দেখতে লাগলেন। দেখা আর শেষ হয় না। রাস্তা দিয়ে কত লোক নিঃশব্দে নিজের নিজের কাজে চলে যাচ্ছে, কারোরই সেদিকে দৃষ্টি নেই। শুধু ওই ক'জন লোক একদৃষ্টে নীচু হয়ে কী যেন দেখছে। কারোর মুখেই কথা নেই। যেন বড় নিবিষ্ট ভাব। নীচের চারজন খুব ঘেঁষাঘেঁষি মুখোমুখি বসে আছে। বসে হাত দিয়ে কি করছে। আর আশেপাশের লোকগুলো যেন আরও নিবিষ্ট মনে তাই দেখছে কেবল। তাদের মুখেও কথা নেই। আর সবচেয়ে নিবিষ্টচিত্ত যেন হরসুন্দরবাবু। মনে হল যেন হরসুন্দর-বাবুর চোখের পলকও পড়ছে না। তাঁর চোখে যেন বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সব মুছে গেছে। বাইরের যে-চলন্ত পৃথিবীতে এত কোলাহল, এত গুঞ্জন, এত শব্দতরঙ্গ, তার বিন্দুমাত্রও তাঁর কানে পৌঁছাচ্ছে না। তিনি যেন তলিয়ে গেছেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জুনও শ্রীকৃষ্ণের বাণী এমন নিবিষ্টচিত্তে বুঝি শোনেননি। শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শনেও যেন অর্জুন এমন মন্ত্রমুগ্ধ হননি। আর দ্বাপরে কৃষ্ণের বাঁশী শুনে শ্রীরাধিকাও এত বিহ্বল হননি বুঝি।

তারপর আমি আর কৌতূহল দমন করতে পারলাম না ভাই, আমি টিপি-টিপি পায়ে পেছনে গিয়ে দাঁড়ালাম। হরসুন্দরবাবু যে রোয়াকে বসে ঝুঁকে দেখছিলেন, সেই রোয়াকে উঠে তাঁর পেছনে নিঃশব্দে গিয়ে দাঁড়ালাম। হরসুন্দর-বাবু আমাকে দেখতে পেলেন না। কিন্তু সামনে নীচের ফুটপাতের দিকে চেয়ে আমি অবাক হয়ে গেছি। দেখি আশপাশের লোকজন একদৃষ্টে চেয়ে আছে আর তাদের দৃষ্টির কেন্দ্রস্থলে বসে চারজন লোক শুধু খেলছে আপন মনে।

বললাম, কী খেলছে ?

নিত্যানন্দ বললে, পাশা।

বললাম, পাশা ?

নিত্যানন্দ আবার বললে, হ্যাঁ ভাই, পাশা। কিন্তু আমি সেই পাশাখেলা দেখলাম না, দেখতে লাগলাম, হরসুন্দরবাবুকে। হরসুন্দরবাবুকে সেই মন্ত্রমুগ্ধের মতো বসে থাকতে দেখে মনে হল, এঁকে যেন আমি চিনি না। এ যেন অন্য মানুষ। মনে হল শ্রীরাধিকাও কি কৃষ্ণের বাঁশী শুনে এতখানি তন্ময় হয়ে যেতেন, এমন করে ঘর-সংসার ভুলতে পারতেন! আমার সন্দেহ হল। মনে হল, চোখের সামনে যেন শ্রীরাধিকাকেই দেখছি, যেন অর্জুনকেই দেখছি ; মনে হল, যেন হরসুন্দরবাবু আজ সত্যিই হরসুন্দর হয়ে উঠেছেন। বাবার নাম দেওয়াও

যেন সার্থক হয়েছে আজ। হরসুন্দরবাবুকে আমার যেন প্রণাম করতে ইচ্ছে হল।

বললাম, তারপর ?

নিত্যানন্দ বললে, তারপর আর কি! রাত সাড়ে ন'টার সময় যখন খেলা ভাঙল তখন আবার সেই একই রাস্তা দিয়ে বাড়ি চলে এলেন হরসুন্দরবাবু। এমনি একদিন নয়, দু'দিন নয়, তিরিশ বছরেরও ওপর এতখানি নিষ্ঠা কি যীশুখ্রীষ্ট, বুদ্ধ, চৈতন্যদেবেরই ছিল ? আমার কিন্তু সন্দেহ হয়।

মিস্টার রামলিংগম আয়ার বললেন, আমি জানি—

মিস্টার ত্রিপাঠি বললেন, আপনি জানেন ?

আড্ডা প্রায় শেষ হবার মুখে হঠাৎ যেন আবার নতুন করে জমে উঠল। সপ্তাহে একটা দিন সকলে এসে পরস্পরের একটু দেখাশোনা করেন, এই ডাক্তারখানায় বসেন। ডাক্তার রামপাল সিংয়ের ডাক্তারখানায় সন্ধ্যেবেলা খদ্দের কেউ বড় একটা আসে না। আজমীরের গোল মার্কেটে ভিড় যা কিছু সব শেষ হয়ে গেছে। ফেব্রুয়ারি মাসের শেষের দিকে আজমীর-শরিফের মেলার ভিড়ও নেই। এতদিন দোকানপাট অনেক রাত্তির পর্যন্ত খোলা থাকত। কারবার যা কিছু সব শেষ হয়ে গেছে। এখন কিছুদিন বিশ্রাম করবার সময়।

কথাটা উঠেছিল এক বাঙালীকে নিয়ে। বাঙালী মেয়ে একটা। ধর্মশালায় এসে উঠেছিল। সঙ্গে একটা ছেলেও ছিল। তারপর হঠাৎ কি সন্দেহ হওয়াতে পুলিস তাদের ধরে নিয়ে হাজতে রাখে। তারপর খবর পেয়ে বাংলা দেশ থেকে মেয়ের বাপ এসে মেয়েকে নিয়ে চলে গেছে।

ডাক্তার রামপাল সিং বলেছিলেন, আমি মশাই তিরিশ বছর প্র্যাকটিস করছি এখানে, এরকম কেস্ যে কত দেখলুম, সব ক'টা বাঙালী মেয়ে।

মিস্টার ত্রিপাঠি বললেন, বাঙালীরা বড় রোমান্টিক, বড় এমোশন্যাল।

রামপাল সিং বললেন, তা বললে শুনব কেন মিস্টার ত্রিপাঠি, আমার কাছে মেডিক্যাল ক্যানভাসার মিস্টার দাস আসেন, দেখেছি ভারি হিসেবী, টি-এ বিল নিয়ে বেশ দর কষাকষি হয়, মিথ্যে টি-এ বিল করতে ওস্তাদ।

মিস্টার চৌহান একমনে সিগারেট খাচ্ছিলেন। বললেন, তা হলেও বাঙালীদের মাথাটা খুব পরিষ্কার, অমন তলিয়ে বুঝতে ইন্ডিয়ার কোনও জাত পারবে না।

মিস্টার ত্রিপাঠি বললেন, কিন্তু বড় আল্সে জাত, কিছুতে খেটে খাবে না, পরিশ্রমের নাম শুনলে পালাবে সেখান থেকে।

তারপর আরম্ভ হলো বাঙালী-নিন্দা। ইন্ডিয়ার সব জাতের মধ্যে অমন অস্থির জাত আর দুটো নেই। কিছুতেই সন্তুষ্ট করা যায় না ওদের। অর্ডার মানতে চায় না। আর্মিতে মিলিটারি অফিসাররা কেউ বাঙালী আরদালী রাখতে চায় না। কথায় কথায় আর্মি-কোড দেখাবে। বেশী বুদ্ধির গলায় দড়ি! দেখছেন না কেবল ধর্মঘট লেগেই আছে কলকাতায়! বেঙ্গল নিয়ে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টেরও মাথা-ব্যথা কম ছিল না, এখনও দিল্লীর মাথা-ব্যথার শেষ নেই! দেখছেন না রাজাগোপালাচারী…

আলোচনা এতক্ষণ একতরফা চলছিল। হঠাৎ মিস্টার রামলিঙ্গম আয়ার বললেন, কিন্তু একটা গুণ আছে বাঙালীদের।

সবাই ফিরে চাইলেন মিস্টার আয়ারের দিকে। মিস্টার রামলিংগম আয়ার এতদিন জয়পুর স্টেটের চীফ অ্যাকাউন্টেন্ট ছিলেন। রিটায়ার করে এখন এখানেই বাস করছেন। সত্যবাদী গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ বলে সমাজে বেশ সুনাম আছে তাঁর। সবাই একসঙ্গে জিজ্ঞেস করলে, কী গুণ?

মিস্টার আয়ার গম্ভীরভাবে বললেন, ওরাই হচ্ছে আসল প্রেমিক জাত।

কথাটা কারও যেন বিশ্বাস হলো না। বাঙালীরা প্রেমিক জাত কিনা সে নিয়ে বিশ্বাসের প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন হলো মিস্টার আয়ারের কথা নিয়ে। মিস্টার রামলিঙ্গম আয়ারকে যাঁরা এতদিন দেখে আসছেন, তাঁরা তাঁকে জটিল অংকবিদ বলেই জানেন। সকালবেলা কপালে তিলক কেটে সেই যে দরবারে গিয়ে নিজের দপ্তরের কাজ নিয়ে মেতে থাকতেন, বেরুতেন সেই সন্ধ্যের পর। যতদিন চাকরি করতেন, কেউ বাইরের সমাজে মিশতে দেখেনি তাকে! বড় কড়া লোক ছিলেন। হাসতেন কম, বকতেন বেশি। এখনও জরুরী দরকার পড়লে মহারাজা বিশেষ পরামর্শের জন্য মাঝে মাঝে ডেকে পাঠান। আজকাল আজমীর শহর থেকে দূরে পাহাড়ের কোলে বাড়ি করেছেন। সপ্তাহে শুধু একবার করে সন্ধ্যাবেলা এসে বসেন ডাক্তার রামপাল সিংয়ের ডাক্তারখানায়। মিস্টার ত্রিপাঠি আসেন, মিস্টার চৌহান আসেন, মিস্টার জয়সুরিয়া আসেন। সবাই জয়পুর স্টেটের রিটায়ার্ড কর্মচারী। নানারকম আলাপ-আলোচনার পর আবার যে-যার বাড়িতে চলে যান। সপ্তাহে এই একটি দিন।

আজকেও আড্ডা যথারীতি শেষ হয়ে যাচ্ছিল। সকলের ওঠবার পালা যখন, তখন হঠাৎ উঠল ধর্মশালার পালিয়ে-আসা বাঙালী মেয়েটার কথা। তাদের পুলিসে ধরার কাহিনী। তার বাপ-মায়ের ছুটে এসে মেয়েকে উদ্ধারের সংবাদ। সমস্ত।

মিস্টার চৌহান উঠতে যাচ্ছিলেন। মিস্টার আয়ারের কথা শুনে আবার বসে পড়লেন। বললেন, প্রেমিকের জাত কি আমরা নই? আমাদের জাতের বউরা যে মোগল আমলে জহর-ব্রত করেছে, তা কি প্রেম নয়?

মিস্টার আয়ার বললেন, তা করুক, কিন্তু তবু আপনারাও প্রেমিকের জাত নন। আমরাও নই মিস্টার চৌহান।

কেন?

মিস্টার আয়ার বললেন, আমাদের দেশে শংকরাচার্য জন্মাতে পারেন, আপনাদের দেশে রাণা প্রতাপ সিংহ জন্মাতে পারেন, কিন্তু—

কিন্তু কি?

কিন্তু চৈতন্যদেব জন্মান শুধু বাংলাদেশেই। আর চণ্ডীদাসের মতো পোয়েট

শুধু বাংলাদেশের মতন মাটিতেই জন্মানো সম্ভব।

মিস্টার চৌহান বললেন, কিন্তু আমাদের দেশেও ভাট ছিলেন, তাঁরাও মস্ত কবি সব।

মিস্টার আয়ার বললেন, কোকোনাট তো সব দেশেই জন্মায়, কিন্তু আমাদের দেশের কোকোনাটেরই বা অত নাম কেন ?

ডাক্তার রামপাল সিং বললেন, তা বাংলাদেশের লোকরাই কি প্রেমিক বেশী ?

মিস্টার আয়ার বললেন, হ্যাঁ, অন্তত আমার তাই মত।

আপনি কি বই পড়ে বলছেন, না নিজে জানেন ?

মিস্টার আয়ার বললেন, বইও পড়েছি আর আমি নিজেও দেখেছি, আমি জানি।

মিস্টার ত্রিপাঠি বললেন, কি করে জানলেন ? আপনি দেখেছেন ?

মিস্টার আয়ার বললেন, আমি নিজের চোখেই দেখেছি।

এবার সবাই অবাক হয়ে গেলেন। আগেও অনেক দিন অনেক রকম আলোচনা হয়েছে। এমন কোনও বিষয় নেই যা আলোচনা হয় না এ আড্ডায়। কিন্তু তার বেশীর ভাগই গম্ভীর আলোচনা। রাজনীতি, সমাজনীতি, অ্যাটমিক এনার্জি, হিস্ট্রি, মেটাফিজিক্স—এই সমস্ত বৈশেষিক দর্শন থেকে শুরু করে তত্ত্বজ্ঞানের সমস্ত বিভাগ নিয়ে আলোচনা চলে। আর আছে ধর্ম উপনিষদ্ বেদ গীতা—সমস্ত।

কিন্তু আজ একেবারে অভাবনীয়ভাবে এক নতুন প্রসংগ উঠে পড়েছে। একেবারে প্রত্যক্ষ বাস্তব প্রসঙ্গ।

ডাক্তার রামপাল সিং বললেন, বলুন মিস্টার আয়ার, আপনার দেখা ঘটনা বলুন।

মিস্টার ত্রিপাঠি বললেন, হ্যাঁ, বলুন মিস্টার আয়ার, এখন তো বেশী রাত হয়নি।

সবাই ঘড়ির দিকে চাইলেন। রাত অনেক হয়নি বটে। দিল্লীর লাস্ট ট্রেনটা এখনই ছেড়ে গেল। গোলবাজারের অন্য দোকানের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। আর সকলের বাড়ি অবশ্য কাছে। কিন্তু মিস্টার আয়ারকে অনেক দূর যেতে হবে। তাঁর গাড়ির ড্রাইভারের ক'দিন অসুখ হয়েছে। তিনি আজ নিজেই গাড়ি চালিয়ে এসেছেন। তবু কি যে হলো ! এই ক'জন বৃদ্ধের মনে হঠাৎ বুঝি বহুদিনের ফেলে-আসা যৌবনের গল্প শুনতে ইচ্ছে হলো। সবাই যেন আবার পুরনো দিনে ফিরে গেলেন।

মিস্টার আয়ার বললেন, আমি তখন আগ্রায়, নতুন এক চাকরিতে ঢুকেছি, আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে, তখন আমার বয়েস বোধ হয় কুড়ি কি বাইশ। চাকরি করি মেরিনা হোটেলে মেরিনা হোটেল এখন আর নেই, সে

হোটেল করে উঠে গেছে। কিন্তু তখনকার দিনে ওই হোটেলটাই ছিল সবচেয়ে কস্টলি। শুধু ইয়োরোপীয়ান টুরিস্টরা ওখানেই এসে উঠত। আমি ছিলাম ম্যানেজার।

মিস্টার ত্রিপাঠি বললেন, ওই অত কম বয়সেই ম্যানেজারের চাকরি পেয়েছিলেন?

মিস্টার আয়ার বললেন, তারও একটা ইতিহাস আছে। হোটেলের মালিক ছিলেন রবিনসন্ সাহেব, আমার সঙ্গে আলাপ হয় ত্রিবেন্দ্রামে। আমার অঙ্ক-কষা দেখে আমাকে চাকরি দিয়েছিলেন। বছর দুয়েক চাকরি করেছিলাম অ্যাকাউন্টেন্ট হিসাবে, তারপর ম্যানেজার যখন চাকরি থেকে রিটায়ার করলে তখন রবিনসন্ সাহেব আমাকে বসিয়ে দিলেন সেই চাকরিতে।

মিস্টার ত্রিপাঠি বললেন, একেবারে ম্যানেজার?

মিস্টার আয়ার বললেন, হ্যাঁ, একেবারে ম্যানেজার, আর ওই কম বয়সে। আমি সাউথ ইন্ডিয়ার লোক, আমরা তামিলিয়ান, ছেলেবেলা থেকে যেখানে মানুষ সে এক অজ পাড়াগাঁ, একেবারে অ্যারেবিয়ান সি-কোস্টের ধারে, কেবল কাজুবাদাম শুঁটকিমাছ আর নারকেলের দেশ, সেখানে থেকে যে কেমনভাবে ডাঙার দেশ আগ্রায় মেরিনা হোটেলের ম্যানেজার হয়ে গেলাম তা ভেবে আমার নিজেরও অবাক লাগল। মনে করুন সেই যুগে আমার মাইনে হলো দু'শো টাকা!

ডাক্তার রামপাল সিং অবাক হয়ে গেলেন—দু শো টাকা! মানে আজকের দিনে হাজার টাকার সমান!

মিস্টার আয়ার বললেন, কিন্তু তা হলে কি হবে, আমার স্বপ্ন তখন দু'-হাজার টাকার।

মিস্টার চৌহান বললেন, আপনি বুঝি ছেলেবেলা থেকেই অ্যাম্‌বিশাস্?

মিস্টার আয়ার বললেন, শুধু আমি নয়, আমাদের দেশের প্রত্যেকটি লোক অ্যাম্‌বিশাস্। আমরা প্লেন লিভিং-এর ভক্ত বটে কিন্তু হাই থিঙ্কিং আমাদের জাতের মজ্জাগত। শঙ্করাচার্যদেব জন্মেছেন আমাদের দেশে, তাঁর নামই শুধু আপনারা জানেন, কিন্তু আমরা প্রত্যেকেই শঙ্করাচার্যের এক-একটা ছোট্ট সংস্করণ। কিন্তু বাংলাদেশ থেকে চৈতন্যদেব এসে যেমন শঙ্করাচার্যের সব মত একদিন রসাতলে তলিয়ে দিলেন, তেমনি আমারও সব ধ্যান-ধারণা বদলে দিয়ে গেলো একজোড়া বাঙালী। একজন ছেলে আর একটি মেয়ে—

মিস্টার ত্রিপাঠি বললেন, তাতে আপনার ক্ষতি হল বলতে চান?

মিস্টার আয়ার বললেন, ক্ষতি?

তারপর একটু ভেবে নিয়ে বললেন, ক্ষতি কে কার করতে পারে বলুন মিস্টার ত্রিপাঠি, শঙ্করাচার্যের-ই কি কিছু ক্ষতি করতে পেরেছেন চৈতন্যদেব?

আমি ম্যাথামেটিশিয়ান, আমি ফরমুলায় বিশ্বাসী—ফরমুলার বাঁধন থেকে যে মুক্তি পেলাম সেদিন, সেইজন্যে সেই ছেলেটা আর মেয়েটাই বলতে গেলে দায়ী।

তার মানে ?

মিস্টার আয়ার বললেন, সেইটেই হল আমার গল্প—গল্পটা বললেই মানে বুঝতে পারবেন আপনারা।

ডাক্তার রামপাল সিং বললেন, তারা ম্যারেড, না আনম্যারেড ?

মিস্টার আয়ার বললেন, সে কথাটা বলবার আগে, আমার নিজের কথাও কিছু বলতে হবে। কারণ এটা বাঙালী ছেলেমেয়ের গল্প হলেও আসলে আমারই গল্প। তারা কেবল উপলক্ষ্য, লক্ষ্য আমিই। তারা থিওরি, আমি একজাম্পল্। তারা রুল আর আমি রুল-অব-থাম্—

তারপর একটু থেমে বললেন, সুতরাং আমার কথাই আগে বলতে হবে।

বলে খানিকক্ষণ চুপ করে কি-যেন ভাবতে লাগলেন মিস্টার আয়ার। আজমীরের গোলবাজারের সব দোকান তখন বন্ধ হয়ে গেছে। আজমীর-শরিফের দিকের চওড়া কংক্রীটের রাস্তায় আর ফেরিওয়ালার ভিড় নেই। মেলা উপলক্ষে যেসব বাঈজী এসে দোতলার ঘরগুলো ভাড়া নিয়েছিল তারাও বেশীর ভাগ আবার যে-যার দেশে চলে গেছে। সুতরাং এ-পাড়া এখন নিস্তব্ধ। মিস্টার আয়ার এতদিন এ-দেশে আছেন তবু এমন ধরনের গল্প কোনও দিন বলেননি। এমন আলোচনাও ওঠেনি আগে। মিস্টার ত্রিপাঠি সকাল-সকালই রোজ উঠে পড়েন। মিস্টার চৌহানকেও সকালবেলা মর্নিং-ওয়াক্ করতে হয় রোজ। তাই, বেশী রাত করার তিনিও পক্ষপাতী নন। মিস্টার রামলিঙ্গম আয়ারও বরাবর সব কাজে নিয়ম-নিষ্ঠা মেনে চলেন। আর সকলেরই বয়েস হয়েছে ! সুতরাং দেরি করে আড্ডা দেবার কারোর-ই মেজাজ নয়। কিন্তু আজ সবাই নিয়ম-নিষ্ঠার কথা ভুলে গেলেন। সবাই উদ্‌গ্রীব হয়ে মিস্টার আয়ারের গল্প শুনতে লাগলেন।

মিস্টার আয়ার বললেন, আপনারা সবাই জানেন আমি কি-রকম স্ট্রিক্ট প্রিন্সিপলের লোক ! এ শুধু আজ নয়, প্রায় ছেলেবেলা থেকেই। ছেলেবেলা থেকেই ভোর চারটের সময় ঘুম থেকে ওঠা অভ্যেস আমার, উঠে পুজো করি, বাড়ির সামনে নিজের হাতে আলপনা আঁকি, স্নান করি, কপালে তিলক কাটি. বরাবর নিরামিষ আহার করি—এমনি বরাবর। হোটেলে চাকরি করেও এর ব্যতিক্রম হয়নি কোনও দিন। ইউরোপিয়ান হোটেল, আর আমি তার ম্যানেজার—খাওয়া-দাওয়ার চূড়ান্ত ব্যবস্থাও সেখানে। মদ আছে সব রকম, সব রকমের মাছ মাংস—সুতরাং যদি আমার ইচ্ছে হতো সবরকম বিলাসিতারই প্রশ্রয় দিতে পারতাম আমি। কিন্তু কোনও দিন তা করিনি। আজীবন নিরামিষ খেয়ে এসেছি, আজীবন পুজো-জপ-তপ করে এসেছি, মনপ্রাণ দিয়ে চাকরি করে এসেছি, আর ফরমুলা দিয়েই জীবন-জীবিকা সমস্ত কিছুর বিচার করে এসেছি।

তারপর একটু থেমে নিয়ে বললেন, কিন্তু একদিন তার ব্যতিক্রম হল, এই সত্তর বছরের জীবনে মাত্র একদিন বে-হিসেব করে ফেললাম, একদিনের জন্যে কেবল আমার পদস্খলন হলো—

মিস্টার ত্রিপাঠি বললেন, আপনারও পদস্খলন হল ?

মিস্টার চৌহানেরও যেন বিশ্বাস হলো না। বললেন, বলেন কি, আপনার ?

হ্যাঁ, পদস্খলন হলো আমার।

বলে খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর নিজেই বললেন, হ্যাঁ, আমার পদস্খলনই হলো। কিন্তু হলো ওই একটা বাঙালী ছেলে আর একটি বাঙালী মেয়ের জন্যে—আর কারো জন্যে নয়। তারা এসে উঠেছিল মেরিনা হোটেলের সতেরো নম্বর ঘরে—

এবার কেউ-ই কোনও রকম প্রশ্ন করলেন না। প্রশ্ন করে গল্পের গতিকে আঘাত করতে আর ইচ্ছে হলো না কারও।

মিস্টার আয়ার বলতে লাগলেন, তার জন্যে অবশ্য আমি অনুতাপ করি সারা জীবন, জীবনের শেষদিন পর্যন্ত অনুতাপ করবও কিন্তু ওই একটি মাত্র দিন, ওই মাত্র একটি বার, আর কখনও নয়—

মিস্টার আয়ার আবার বলতে শুরু করলেন, আমার তখন প্রায় তিন বছর চাকরি হয়ে গেছে। তেইশ বছর বয়েস। ম্যানেজার হিসেবে আমার খুব নামও হয়েছে। রবিনসন্ সাহেবের লোক আমি, আর আমার কাজকর্মও খুব ভাল, সুতরাং বলতে গেলে হোটেল, আমিই চালাই—আমিই সব কন্ট্রোল করি, আমার কথাতেই ওঠে বসে সব স্টাফ। আগ্রায় তখন ওইটেই বেস্ট হোটেল, সবচেয়ে কস্ট্‌লি হোটেল। যত রকমের আরাম চান ওখানে পাবেন। শীতকালে গরম জল পাবেন, গ্রীষ্মকালে বরফ পাবেন, আট কোর্সের ডিনার লাঞ্চ পাবেন, নানা রকমের নানা দেশের ড্রিংক্‌স্ পাবেন, টাকা ফেললে কিছু পেতে আর বাকি থাকবে না আপনার। একাত্তরটা রুম নিয়ে হোটেলের কারবার, সবসময়েই ভর্তি থাকে। নানান দেশের লোকজন আসে। পৃথিবীর সব দেশের টুরিস্ট। জার্মান, ফ্রেঞ্চ, ব্রিটিশ। তারা বিশেষ করে তাজমহল দেখতেই আসে, তারপর আশেপাশের অন্য টুম্বসও দেখে, আবার একদিন, হোটেলের বিল মিটিয়ে দিয়ে চলে যায়। ফরেনার ছাড়া অন্য জাতের লোকও আসে—মাদ্রাজী, ভাটিয়া, গুজরাটী, পাঞ্জাবী। তারাও তাজমহল দ্যাখে। পূর্ণিমার রাতেই ভিজিটার্স বেশী হয়। এসে হোটেলে ওঠে, টাঙ্গা-ভাড়া করে, ট্যাক্সি ভাড়া করে, সমস্ত দিন তারা দেখে বেড়ায়, ফতেপুর-সিক্রি যায়, তারপর একদিন তল্পিতল্পা গুটিয়ে আবার যে-যার দেশে চলে যায়। আমার তখন সমস্ত দেখা হয়ে গেছে। যা-যা দেখতে লোক আগ্রায় আসে তা সব দেখা হয়ে গেছে। ফতেপুর-সিক্রি দেখেছি। বাদশা আকবরের রাজধানী দেখে মনে কী হয়েছে তা আপনাদের না বললেও চলবে।

অন্য লোকেরা হয়তো বাদশার ঐশ্বর্যের বহর দেখে তারিফ করেছে, আমি পাউন্ড-শিলিং-পেন্স আর টাকা-আনা-পাই দিয়ে সব বিচার করেছি। ভেবেছি এত টাকা খরচ করে এত বড় বিলাসিতা করবার কি দরকার ছিল! তাজমহল দেখে যখন সবাই সাজাহানের এস্থেটিক সেন্সের প্রশংসা করেছে, আমি আমার ফরমুলা দিয়ে তা পয়সা-নষ্টের স্বাক্ষর ছাড়া আর কিছু বলে ভাবতে পারিনি। আমি ভেবেছি একটু রঙ-চঙ কম হলে কি এমন ক্ষতি হতো! একটু গ্রানজার কম হলে কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত। তাজমহল আমার কাছে একটা শ্বেতপাথরের কবরখানা ছাড়া আর কিছুই বলে মনে হতো না। মোগল-সম্রাটের বিলাসিতার বহর দেখে বরং ঘৃণাই হয়েছে বরাবর। আমি বরাবর টাকাকে টাকা বলে ভেবেছি আর টাকার মূল্যে কেনা বিলাসিতাকে টাকা অপচয়ের নামান্তর বলেই ভেবে এসেছি। অন্তত আমার দেশে আমি যেমন ভাবে মানুষ হয়েছি, সেই ভাবেই আমার ভাবনার ডেভেলপমেন্ট হয়েছে, সেই ভাবেই আমি জীবন কাটিয়েছি, এবং এখনও পর্যন্ত আমি সেই ধারণা নিয়েই চলেছি এবং সেই ধারণা ঠিক বলে এখনও বিশ্বাস করি। আমার কাছে বিয়ে করাটা একটা প্রয়োজন ছাড়া আর কিছু নয়, প্রয়োজনের অতিরিক্ত এক ফার্দিংও নয়। টাকার মতো জীবনে বিয়ে করাটাও প্রয়োজন, এই আমি বিশ্বাস করি। আর এও সত্যি যে বিয়ে না করলেও চলে, কিন্তু টাকা না হলে চলেই না। আমার সংগে এ-বিষয়ে নিশ্চয় আপনারা একমত। শুধু আপনারা কেন, ভারতবর্ষের যত জাত আছে সবাই তাই বিশ্বাস করে। গুজরাটী, পাঞ্জাবী, ভাটিয়া, মারোয়াড়ী—সবাই। এক বোধ হয় বাঙালীরাই এ-বিষয়ে আলাদা। তাই বাঙালীরাই দেখতাম তাজমহল নিয়ে বেশী হা-হুতাশ করত। তাজমহলের পেছনে প্রেমের যে করুণ ইতিহাস আছে তা বাঙালীদের যেমন অভিভূত করত, আর কোনও জাতকে তা করতে দেখিনি। পোয়েট টেগোর শুনেছি নাকি তাজমহল নিয়ে বিরাট একটা পদ্যই ফেঁদেছেন। কি জানি, পোয়েট্রি আমি বিশেষ পড়ি না, পোয়েট্রি পড়ে আমি তেমন রস কখনও পাইনি। আমি তার চেয়ে বেশী রস পেয়েছি ক্যালকুলাস কষে, বেশী আনন্দ পেয়েছি ফরমুলা বার করে। কিন্তু একদিন—শুধু এক রাতের জন্য আমার এ মত বদলে গিয়েছিল। একদিনের জন্য আমি মতিভ্রষ্ট হয়েছিলাম, একদিনের জন্যে আমার পদস্খলন হয়েছিল। আর তার জন্যে দায়ী ওই একটি বাঙালী ছেলে আর একটি বাঙালী মেয়ে। তারা আগ্রায় এসেছিল তাজমহল দেখতে, আর মেরিনা হোটেলের সতেরো নম্বর ঘরেই তারা উঠেছিল—

মিস্টার আয়ার আবার বলতে লাগলেন, এ যেন অনেকটা সেই মহাকবি বাল্মীকির রামায়ণ লেখার মতো। আমি সেদিন যথানিয়মে সকালবেলাই অফিসে গিয়ে কাজ সুরু করে দিয়েছি। তুফান মেল আগ্রা সিটি স্টেশনে বেলা এগারোটার সময় পৌঁছয়। কলকাতা থেকে বহু টুরিস্ট ওই ট্রেনেই আসে।

আমাদের হোটেলের লোক স্টেশনে গিয়ে প্যাসেঞ্জার ধরতে যায়। কার্ড নিয়ে মতিলাল স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকে, তারপর একপাল টুরিস্ট এনে ছেড়ে দেয় আমার হেপাজতে। আমি তাদের ঘরে ঘরে স্থিতি করে দিই, সুখ-সুবিধে দেখি। কার ক'টা লাঞ্চ, ক'টা ব্রেকফাস্ট, ক'টা ডিনার—কে কত টব গরম জল ব্যবহার করলে, কে ক'টা আফটারনুন টী খেলে, সব আমার অফিসের খাতায় লেখা হয়ে যায়। তারপর যাবার সময় হিসেব মিলিয়ে দিই, টাকার পাওনা বুঝে নিই। তখন তারা আবার টাঙ্গায় উঠে চলে যায়। কেউ যায় দিল্লী, কেউ মথুরা, কেউ কলকাতা, কেউ জয়পুর, রাজস্থান, মাউন্ট্ আবু। বয়েস তখন আমার কম হলে কি হবে, সবগুলো গাইড-বুক তখন পড়ে মুখস্থ করে নিয়েছি। টপ করে কোনও টুরিস্ট যদি জিজ্ঞেস করে, আগ্রায় দেখবার কী কী আছে, সঙ্গে সঙ্গে আমায় সব জবাব দিতে হয়। বলি—তাজমহল। কাউকে কাউকে গল্পটাও বলি। একদিন বাদশা আর বেগম শতরঞ্চ খেলছিলেন। হঠাৎ মমতাজমহল জিজ্ঞেস করলেন—আচ্ছা সম্রাট, আমি যদি আগে মরি তুমি আমার জন্যে কী করবে? সম্রাট সাজাহান বলেছিলেন—যদি তেমন দুর্ঘটনাই ঘটে তো তোমার স্মৃতিরক্ষার জন্যে এমন কিছু করব, যা পৃথিবী অবাক-বিস্ময়ে চিরকাল দেখবে। আরও বলি সিকান্দ্রার কথা। ছ'মাইল দূরে লাহোর আর দিল্লীর রাস্তার ওপর বাদশা আকবরের সমাধি। আকবর নিজেই আরম্ভ করেন এটা, কিন্তু শেষ করেন জাহাঙ্গীর। ভেতরে আকবরের সমাধি ছাড়াও আছে আকবরের মেয়ে আরামবানুর কবর আর আছে জাহাঙ্গীরের ছয় মাসের এক মেয়ের কবর। আরও আছে ইৎমদ্-উ-দ্দৌলা, নুরজাহানের বাবার কবর। আরও আছে আগ্রা ফোর্ট, ফতেপুর-সিক্রি। ফতেপুর-সিক্রির লম্বা লিস্ট্ আমার মুখস্থ ছিল। বুলান্দ দরোয়াজা, হামাম, আকবরের তুর্কী বেগমের কামরা, দেওয়ান-ই-আম, মেয়েদের নিয়ে দশ-পঁচিশ খেলার জায়গা, হিরণ-মিনার, তেরো মুহুরী, যোধাবাঈয়ের গুরুর মন্দির, মরিয়ম বেগমের ঘর, সেলিম চিস্তির কবর—গড় গড় করে মুখস্থ বলে যেতাম সব। বেশ রঙ চড়িয়ে সব বর্ণনা দিতাম, যাতে আরও টুরিস্ট্ আসে, হোটেলের আরও আয় হয়।

কিন্তু হঠাৎ একদিন তুফান-মেলে অন্য যাত্রীর সঙ্গে এসে হাজির হল একটি ছেলে আর একটি মেয়ে। ছেলেটি সাড়ে পাঁচ ফুট লম্বা আর মেয়েটিও বেশ সুন্দরী। আমাদের হোটেলের এজেন্ট মতিলাল আমার অফিসে এনে হাজির করল তাদের।

মতিলাল বললে, এঁরা তিন দিন থাকবেন, তিন দিন তাজমহল দেখে চলে যাবেন।

বললাম, আপনারা কোথা থেকে আসছেন?

ছেলেটি বললে, কলকাতা।

বুঝলাম বাঙালী। মেয়েটিও বাঙালী। ভারি স্মার্ট দুজনে। সঙ্গে শুধু একটা সুটকেস। আর কিছু নেই। এমন যাত্রী আগেও এসেছে, এতে তেমন কিছু বৈশিষ্ট্য নেই। আসে, তিন-চার দিন থাকে, তারপর চলে যায়। আগ্রাতে তিন-চার দিনের বেশী দেখবার মতো কিছু নেই। ছেলেটির গায়ে দামী সুট। মুখে সিগরেট। চোখে যেন বিদ্যুৎ জ্বলছে। আমার অফিসে দুজনেই দাঁড়িয়ে কথা বলতে লাগল। সীট্-রেন্ট নিয়ে কথা হল। খাওয়া-দাওয়া নিয়ে কথা হল।

জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা তিন দিন থাকবেন, না, আরও বেশিদিন থাকবেন ?

মেয়েটি এবার কথা বললে—যেমন চেহারা তেমনি সুন্দর গলার স্বর। মাথার খোঁপায় একটা গোলাপ ফুল। বললে, তিন দিনের বেশী থাকবার মতো জিনিস আছে নাকি আগ্রায় ?

বললাম, আছে বইকি ! ফতেপুর-সিক্রি দেখতেই তো একটা দিন লাগে, ভাল করে দেখতে হলে। আর তা ছাড়া ইৎমদ্-উ-দ্দৌলা আছে, সিকান্দ্রা আছে, আগ্রা ফোর্ট আছে আর তাজমহল তো আছেই, আর তাজমহল রোজ দেখেও তো ফুরোয় না।—বলে আমার লম্বা মুখস্থ ফর্দ বলে গেলাম। কোথাকার কী ইতিহাস, কোথাকার কী রোম্যান্স, কোথায় কী কী ঘটনা ঘটেছে। ইতিহাস আর গাইড-বুকের মুখস্থ-করা বুলি সব।

বললাম, বসুন না।

সামনের চেয়ারে দুজনেই বসল। কাল রাত্রে কলকাতা থেকে ট্রেনে উঠেছে আর এখন বেলা বারোটা। সারা রাত টেনে কাটিয়েও যেন শরীরে তাদের কোনও গ্লানি নেই। বেশ তাজা ভাব। বোধ হয় ট্রেনেই স্নান, খাওয়া, টয়লেট সবই সেরে নিয়ে পোশাক-পরিচ্ছদ বদলে নেমেছে একেবারে।

আবার বললাম, আজ পূর্ণিমা তো, আজ রাত্রে তাজমহলটা দেখে আসুন।

মেয়েটি যেন কী ভাবল। একটু দ্বিধা করতে লাগল বুঝি। বললে, আজ পূর্ণিমা ?

বললাম, হ্যাঁ, আজই তো পূর্ণিমা, সেইজন্যেই তো হোটেলে এত ভিজিটার্সের ভিড়—

মেয়েটি যেন ভয় পেলে। বললে, খুব ভিড় আপনাদের হোটেলে ?

বললাম, ভিড় একটু আছে, তা আমাদের হোটেলটাই তো এখানকার মধ্যে বেস্ট কিনা, তাই যাঁরা একটু কমফর্ট চান তাঁরা আমাদের এখানেই ওঠেন, আমাদের খাওয়া একদিন থাকলেই বুঝতে পারবেন—

ছেলেটি হঠাৎ বললে, আমরা তো খেতে আসিনি এখানে।

মেয়েটিও বললে, হ্যাঁ, খাবার জন্যে আমরা গাড়ি-ভাড়া খরচ করে কলকাতা থেকে এতদূরে আসিনি।

ছেলেটি বললে, আসলে আমরা এসেছি তাজমহল দেখতে।

মেয়েটি এবার বললে, তাজমহলের জন্যেই আপনাদের হোটেলে ওঠা, হয়তো দিনের বেলা বাইরেই কোথাও খেয়ে নেব। যেখানে হয়। আমার খাওয়ার সম্বন্ধে অত বাছ-বিচার নেই।

ছেলেটি বললে, আমারও নেই, শুধু শেষরাত্রে কয়েক ঘণ্টা বিশ্রামের জন্যেই হোটেলে আশ্রয় নেওয়া আর কি।

মেয়েটি বললে, নিশ্চয়, খাওয়া-থাকার জন্যে তো কলকাতাতে বাড়ি-ঘর রয়েছেই। তার জন্যে এতদূর কষ্ট করে আসব কেন?

ছেলেটি বললে, দেখুন মিস্টার ম্যানেজার, আমাদের খাওয়ার জন্যে ভাববেন না, আমরা এখনও ইয়াং, সে-সব ভাববেন বুড়োদের জন্যে, আপনি আমাদের একটা উপকার করে দেবেন?

উদ্‌গ্রীব হয়ে বললাম, কী?

মেয়েটি হঠাৎ বললে, আমাদের ঘরে কিন্তু অ্যাটাচ্‌ড বাথরুম থাকা চাই।

বললাম, মেরিনা হোটেলে আপনাদের কোনও অসুবিধে হবে না—আপনাদের যা-কিছু দরকার সব আমাকে জানাবেন, ঘরে বসেই পেয়ে যাবেন।

মেয়েটি বললে, একটু নিরিবিলি হবে তো?

বললাম, আপনাদের জন্যে আমি সতেরো নম্বর রুম ঠিক করেছি, কোনও অসুবিধে হবে না সেখানে, দেখবেন—

তারপর বললাম, বেশী দিন থাকলে আপনাদের কিছু কনশেসন্ করা যেত—

ছেলেটি বললে, বেশী দিন থাকবার উপায় নেই—মাত্র পাঁচ দিনের ছুটি।

মেয়েটি বললে, আমারও কলেজ খুলবে তেরো তারিখে।

বললাম, তা হলে ফতেপুর-সিক্রি দেখবেন না?

মেয়েটি বললে, না।

ছেলেটিও বললে, না। আমরা তাজমহল দেখতেই এসেছি, তাজমহল দেখবার আমাদের দুজনের বহুদিনের সাধ, কিন্তু কিছুতেই আর সুযোগ হচ্ছিল না।

মেয়েটিও বললে, আমরা ঘুরে ফিরে কেবল তাজমহলই দেখব, সেইরকম ঠিক করেই এসেছি, ভোরবেলা দেখব, সকালবেলা দেখব, সন্ধ্যাবেলা দেখব, রাত্রিতে দেখব, অন্ধকারেও দেখব, চাঁদের আলোতেও দেখব, এ আমাদের দুজনের বহু-দিনের সাধ।

বললাম, সিকান্দ্রা? বাদশা আকবরের সমাধি?

মেয়েটি বললে, না।

বললাম, ইৎমদ্-উ-দ্দৌলা?

মেয়েটি বললে, না মশাই, না। তাজমহল দেখলেই আমাদের সব দেখা হয়ে যাবে।

মিস্টার আয়ার বললেন, ভাবুন বাঙালীদের কী অদ্ভুত ধারণা ! ওরা প্রেম ছাড়া আর কিছু বোঝে না। আরও অনেক বাঙালী বোর্ডার রয়েছে তো, প্রায় সকলেই ওই এক রকম। তাজমহল বলতে অজ্ঞান। কতবার দেখেছি, বাঙালীরা এসেছে হোটেলে, ঘুরে ফিরে কেবল তাজমহলই দেখেছে। ক্লান্তি নেই, তৃপ্তিও নেই। এক অদ্ভুত জাত। ফ্রেঞ্চ, জার্মান, ইংলিশ, মারোয়াড়ী, গুজরাটী, ভাটিয়া সবাই এসেছে। তারা দেখতে হয় দেখেছে, আর্কিটেক্চার বিচার করেছে, কত খরচ হয়েছে তৈরি করতে তার হিসেব করেছে—কিন্তু এত বাড়াবাড়ি কেউ করেনি।

তা সেইরকম ব্যবস্থাই হল।

ছেলেটি বললে, একটা বিশ্বাসী টাঙ্গাওয়ালা যোগাড় করে দিন, আমরা তিন দিন থাকব, তিন দিনই সে আমাদের ঘোরাবে, নিয়ে যাবে নিয়ে আসবে—

বললাম, একটা টাঙ্গাতেই চড়বেন ?

ছেলেটি বললে, হ্যাঁ। কত নেবে ?

মেয়েটি বললে, আজ এই এখন খেয়ে-দেয়ে বেরোব, ধরুন রাত আটটার সময় ফিরব, তারপর খেয়ে-দেয়ে আবার বেরোব, তারপর পূর্ণিমায় তাজ দেখে ফিরে আসব রাত বারোটার সময়, তারপর কাল ভোর পাঁচটায় আবার বেরোব, এমনি করে পরশু দিন সন্ধ্যার গাড়িতে আমরা চলে যাব।

একটা টাঙ্গাওয়ালা ডেকে সব বন্দোবস্ত করে দিলাম। পনেরো টাকা করে রোজ নেবে। ভোর পাঁচটা থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত। তিন দিনে পঁয়তাল্লিশ টাকা। ছেলেটি পনেরো টাকা অ্যাডভান্সও দিয়ে দিলে তাকে। বললে, ওকে দাঁড়িয়ে থাকতে বলুন, আমরা খেয়ে দেয়ে এখুনি বেরোব।

মিস্টার আয়ার বললেন, তখনকার মতো এই তো হলো—তারপর সতেরো নম্বর ঘরে ওদের রাখিয়ে দিয়ে আমি নিজের কাজ করতে লাগলাম—

মিস্টার চৌহান বললেন, তারপর ?

মিস্টার আয়ার বললেন, রাত বোধ হয় অনেক হলো।

ডাক্তার রামপাল সিং বললেন, তা হোক, গল্প শেষ না করে আজকে আপনাকে ছাড়ছি না।

মিস্টার আয়ার বললেন, আপনাদের তো গোড়াতেই বলেছি, এ আমার পদস্খলনের কাহিনী আমার অধঃপতনের কাহিনী, এক মুহূর্তের জন্যে হলেও বটে, এক রাত্রের জন্য হলেও বটে। আর সারা জীবন তার জন্যে আমি অনুতাপ করি। অনেকে আমাকে জিজ্ঞেস করে আমি বাঙালীদের কখনও কোনও চাকরি দিইনি কেন ? আমি কখনও উত্তর দিইনি বটে, কিন্তু মেরিনা হোটেলের সেই ঘটনাটাই তার একমাত্র কারণ। জয়পুর স্টেটে যখন ছিলাম তখন বহু জাতের লোককে চাকরি করে দিয়েছি আমার অফিসে কিন্তু বাঙালীকে কখনও চাকরি করে দিইনি। আমার মনে সেই দিনের সেই পঞ্চাশ বছর আগেকার ঘটনাটার

জন্যে কেমন একটা পাপ-বোধ পোষণ করছি আজও—

মিস্টার ত্রিপাঠি বললেন, তারপর ?

মিস্টার আয়ার বললেন, তারপর আর কি ! তারপর আমি ওদের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম কাজের চাপে। সন্ধ্যেবেলা টাঙ্গাওয়ালাকে দেখে ওদের দুজনের কথা মনে পড়ল। হোটেলের সামনে তখনও সে তেমনি দাঁড়িয়ে আছে টাঙ্গা নিয়ে।

জিজ্ঞেস করলাম, সাহেবকে তাজমহল দেখিয়েছ ?

টাঙ্গাওয়ালা বললে, না হুজুর, সাহেব তো এখনও ঘর থেকে বেরোয়নি।

সে কি ! তখুনি তো তাজমহল দেখতে যাবার কথা ছিল। আর এখন তো সন্ধ্যে হয়ে এল !

বললাম, দাঁড়াও একটু, সাহেব সারারাত ট্রেনে এসে বোধ হয় ঘুমোচ্ছে।

টাঙ্গাওয়ালা টাঙ্গা নিয়ে তেমনিই দাঁড়িয়ে রইল।

নিজের ঘরে গিয়ে খাওয়া-দাওয়া সেরে যখন বারান্দা দিয়ে বাইরে চাইলাম, দেখি টাঙ্গাওয়ালা তখনও দাঁড়িয়ে আছে।

বেয়ারাদের জিজ্ঞেস করলাম, তারা বললে, সতেরো নম্বর রুমে বিকেলের চা টোস্ট পাঠানো হয়েছিল, রাত্রের ডিনারও পাঠানো হয়েছে এখন।

বললাম, জিজ্ঞেস করো, টাঙ্গা কি দাঁড়িয়ে থাকবে ?

বেয়ারা জিজ্ঞেস করে এসে বললে, সাহেব বলেছে—টাঙ্গা এখন ফিরে যাক, কাল ভোর পাঁচটার সময় এসে যেন তৈরি থাকে, তখন সাহেব তাজমহল দেখতে যাবে।

টাঙ্গাওয়ালাকে সেই কথা বলে দিলাম। ভোর পাঁচটার সময় সে যেন টাঙ্গা নিয়ে হাজির থাকে, একটুও যেন দেরি না হয়।

টাঙ্গাওয়ালা চলে গেল। আমিও শুতে গেলাম আমার ঘরে।

তার পরদিন যথানিয়মে ভোরবেলা চারটের সময় উঠেছি। পুজো করেছি, কপালে তিলক কেটেছি। তারপর অফিসে এসে বসেছি খাওয়া-দাওয়া করে। হঠাৎ দেখি টাঙ্গাওয়ালা তখনও দাঁড়িয়ে আছে।

জিজ্ঞেস করলাম, সাহেবকে তাজমহল দেখালে ?

টাঙ্গাওয়ালা বললে, সাহেব তো যায়নি হুজুর, আমি ভোর পাঁচটা থেকে দাঁড়িয়ে আছি।

এবার আমিও অবাক হয়ে গেলাম। তবে কি ঘুমিয়ে পড়েছে দুজনে ? ঠিক সময়ে ঘুম ভাঙেনি ? কিন্তু ভোরবেলা ডেকে দেবার ব্যবস্থাও তো ঠিক ছিল। বেয়ারাকে জিজ্ঞেস করলাম। বেয়ারা বললে, চা ব্রেকফাস্ট ঘরেই দিয়ে এসেছে সকালবেলা—

বেয়ারা বললে, সাহেব বলেছে খাওয়া-দাওয়া সেরে যাবে, টাঙ্গাওয়ালা যেন দাঁড়িয়ে থাকে।

টাঙ্গাওয়ালাকে বললাম, আর একটু দাঁড়াও, সাহেব খেয়ে-দেয়ে দুপুরবেলা যাবে।

কিন্তু দুপুরবেলাও বেরোল না তারা। আমি খেয়ে নিলাম। টাঙ্গাওয়ালাও খেয়ে এল বাড়ি থেকে। অন্য সব বোর্ডার যারা বহু দূর-দূর থেকে এসেছিল, তারা একদিনে সব দেখা শেষ করে ফেললে। তাদের কেউ কেউ আগ্রা দেখা সেরে হোটেলের বিল চুকিয়ে চলেও গেল। কিন্তু দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যেও হল। তবুও না। একবার সেই ফাঁকে—চায়ের ফরমাশ হল সতেরো নম্বরের ভেতর থেকে। চা গেল ভেতরে। দু' দিন থেকে চা, ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ, ডিনার সবই ভেতরে যাচ্ছে। কিন্তু ওরা আর বাইরে আসে না। ভেতরেই কাটল ওদের দিন-রাত। বাইরে থেকে জানালা দরজা বন্ধ। শুধু খাবার দেবার সময় ওরা দরজা খুলে দেয়, তারপরেই আবার বন্ধ। ক্রমে রাত হল। রাত্রে হয়তো তাজমহলে যেতে পারে, এই ভেবে তখনও গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল টাঙ্গাওয়ালা। রাত বারোটার সময় আস্তে আস্তে টাঙ্গাওয়ালা নিজের আস্তানায় চলে গেল। আমিও সারা দিনের কাজের পর বিছানায় গিয়ে গা এলিয়ে দিলাম। কিন্তু ঘুম এল না। মনে মনে যতবার অন্য চিন্তা করি ততবার ঘুরে ফিরে কেবল ওদের কথা মনে আসে। কে ওরা ? ঘরে দরজা বন্ধ করে কী ওরা করছে ? কেন এমন করে পয়সা নষ্ট করছে টাঙ্গা বসিয়ে রেখে ? বলে দিলেই হয়, চায় না টাঙ্গা, টাঙ্গা তাদের দরকার নেই। তিরিশটা টাকা নষ্ট ! ষোল আনায় যদি এক টাকা হয়, তা হলে তিরিশ টাকায় কত আনা ! অঙ্ক দিয়ে বারবার জীবন মাপতে শিখেছি, ফরমুলা দিয়ে জীবন বিচার করতে শিখেছি ছেলেবেলা থেকে। এমন বেহিসেব দেখে আমার যেন কেমন অবাক লাগল। এমন অপব্যয় ! ঘণ্টা-মিনিটের সঙ্গে মিলিয়ে টাকা-আনা-পাইয়ের তারতম্য করতে শিখেছি আমি। তাই এমন বেচাল আমার ভাল লাগল না। নিজের অতীত, নিজের বর্তমান, নিজের ভবিষ্যৎ সমস্ত-কিছু সেই রাত্রে পরিক্রমা করেও এমন খেয়ালের কোনও তাৎপর্য বার করতে পারলাম না। এ কেমন করে হয়, এ কেমন করে সম্ভব ! এমন তো কখনও দেখিনি, এমন তো কখনও কল্পনা করিনি ! এ কোন্ জীবন ! এ কোন্ দেশের মানুষ !

সমস্ত রাত আমার ঘুম এল না। সমস্ত রাত আমি বিছানায় এপাশ-ওপাশ করেছি। ভোর রাত্রে টাঙ্গার শব্দে উঠে পড়লাম। জানালা দিয়ে চেয়ে দেখি, টাঙ্গা এসে দাঁড়িয়েছে। আজ পুরোদিন কাজ করলে পুরো পঁয়তাল্লিশ টাকাই ও পাবে বিনা পরিশ্রমে। বসে বসে।

বিছানা ছেড়ে উঠলাম। নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরে গিয়ে দাঁড়ালাম। তারপর বারান্দায় পায়চারি করতে লাগলাম। তারপর আস্তে আস্তে চলতে চলতে কখন যে সতেরো নম্বর ঘরের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি নিজেরই খেয়াল নেই। মনে

হল যেন ভেতরে জেগে আছে ওরা। মৃদু কথা শোনা যাচ্ছে ওদের। মৃদু নড়াচড়া। বোঝা যায় ভেতরে যারা আছে, তারা ঘুমিয়ে নয়—জেগে আছে।

আবার দিন এল। আবার দিনের কাজ আরম্ভ হল হোটেলের। আবার নতুন বোর্ডার, নতুন মুখ। আবার টী ব্রেকফাস্ট লাঞ্চ ডিনারের হিসেব। আবার সেই ফরমুলা। কিন্তু সেদিন যেন আমার সব গোলমাল হয়ে গেল। রোজকার মতো লেজার-বই চেক্ করতে করতে যেন কিছুতেই আর হিসেব মেলে না। কিছুতেই ফরমুলা আর খাটে না। বার বার ভুল হতে লাগল। বার বার অন্যমনস্ক হয়ে পড়লাম; ছেলেবেলা থেকে হিসেব করে করে এত সুনাম আমার, রবিনসন্ সাহেবের এত করুণা, এই হোটেলের চাকরি, আর সামনে আরও প্রমোশন, সমস্ত যেন সেদিন মিথ্যে হয়ে গেল। মনে হল, আমি কোন দূর এক দেশের ছেলে, কতদূর থেকে টাকার নেশায় এসেছি! সব মিথ্যে। মনে হল টাকাই সব নয়। ফরমুলাই সত্যি নয় শুধু। আরও কিছু আছে সংসারে, আরও কিছু সত্য। আরও কিছু মহত্ত্ব।

সেদিন দুপুরবেলা ভেতর থেকে আবার লাঞ্চের অর্ডার এল। আবার দরজা বন্ধ হয়ে গেল। আবার বিকেলবেলা টী, আটটার সময় ডিনার। ডিনারের পর বেরোল ওরা। একেবারে আমার সামনে এসে হাজির হল।

আমি ওদের চেহারা দেখে চমকে উঠলাম। কিন্তু মুখ দিয়ে আমার কোনও কথা বেরোল না। যেন ওদের দিকে ভাল করে চাইতে আমারই লজ্জা হল।

ছেলেটি হাসতে হাসতে বললে, কী হলো মিস্টার ম্যানেজার, আপনার শরীর খারাপ হয়েছে নাকি?

মেয়েটিও বললে, আপনাকে তো আর চেনা যাচ্ছে না একেবারে, কী হলো আপনার?

আমি কী বলব! আমার সমস্ত শরীর থর থর করে তখনও কাঁপছে। আমি যেন অচেতন হয়ে গেছি। আমার হৃৎস্পন্দন নেই, আমি মৃত, স্থির, নিশ্চল একেবারে।

মিস্টার চৌহান বললেন, তারপর?

মিস্টার ত্রিপাঠি বললেন, তারপর কী হল বলুন মিস্টার আয়ার। তাজমহল দেখতে গেল তারা?

ডাক্তার রামপাল সিং বললেন, তা একটা অ্যাস্পিরিন খেয়ে নিলেন না কেন?

মিস্টার আয়ার বললেন, না ডাক্তার, অ্যাস্পিরিনে আমার কিছু হতো না তখন।

ডাক্তার রামপাল সিং বললেন, নিশ্চয় হতো—অ্যাস্পিরিনে সব ঠিক হয়ে যেত।

মিস্টার চৌহান বললেন, অ্যাস্পিরিনের কথা থাক্। তারা কী করল তাই

বলুন, তাজমহল দেখতে গেল ?

মিস্টার আয়ার বললেন, আপনারা কল্পনা করুন তো কি করল তারা ?

মিস্টার চৌহান বললেন, আর একদিন রইল হোটেলে ?

মিস্টার আয়ার বললেন, না।

মিস্টার ত্রিপাঠি বললেন, তবে কি তখুনি তাজমহল দেখতে গেল ?

মিস্টার আয়ার বললেন, না, তাও না।

ডাক্তার রামপাল সিং বললেন, আপনি যদি সেই তখন দুটো অ্যাস্পিরিনের পিল খেয়ে নিতেন, দেখতেন সব সেরে যেত—সারা রাত ঘুম হয়নি কিনা।

মিস্টার ত্রিপাঠি বললেন, ও-কথা থাক্, তাদের তাজমহল দেখা হল কিনা তাই বলুন, মিস্টার আয়ার।

মিস্টার আয়ার বললেন, তারা সেই টাঙ্গাতে চড়েই রাত্রের ট্রেনে কলকাতায় চলে গেল। কিন্তু তারা তাজমহল দেখলে না কেন তা নিয়ে তখন আমার কোন মাথাব্যথা নেই। কিংবা তিন দিন ধরে দরজা-বন্ধ ঘরের ভেতর আর এক নতুন তাজমহল তৈরি করেছিল কিনা তা নিয়েও আমি মাথা ঘামাইনি। তারা চলে যাবার পরই যেন আরও অস্বস্তি বোধ হতে লাগল।

ডাক্তার রামপাল সিং বললেন, সারারাত ঘুম না হলে ও-রকম তো হবেই।

মিস্টার আয়ার বললেন, না, সেজন্যে নয়। আমার মনে হল আমি যেন জীবনে কিছুই পাইনি। হোটেলের দু'হাজার টাকা মাইনে, বিলিতী হোটেলের ম্যানেজারের পোস্ট, আজীবন অঙ্ক নিয়ে এত পরিশ্রম, সব আমার মিথ্যে। আমি প্রচণ্ড এক আঘাত পেলাম। আর সেই রাত্রেই আমার পদস্খলন হলো। জীবনে যা কখনও করিনি, তাই করলাম সেদিন—সেই রাত্রে।

মিস্টার ত্রিপাঠি বললেন, কি করলেন ?

আজমীরের সদর-রাস্তায় সমস্ত নিস্তব্ধ। কয়েকটা কুকুর শুধু ময়লা নর্দমার ধারে ধারে ঘুরে চিৎকার করছে। শেষ ট্রেনে যাত্রীদের পৌঁছে দিয়ে টাঙ্গাগুলো এখন যে যার আস্তানায় ফিরে গেছে। এত রাত পর্যন্ত কখনও ডাক্তার রামপাল সিংয়ের ভান্ডারখানা খোলা থাকে না।

মিস্টার আয়ার বললেন, মহাকবি বাল্মীকি কবে কোন্ যুগে একদিন এক ক্রৌঞ্চ-মিথুনের ব্যথায় নাকি রামায়ণখানা লিখে ফেলেছিলেন শুনেছি। জানি না তিনি কোন্ দেশের মানুষ— তিনি বাঙালী ছিলেন কিনা তাও জানি না। কিন্তু আমি আর এক কাণ্ড করলাম।

কী ?

মিস্টার আয়ার বলতে লাগলেন, আমি চুপি চুপি সেই সতেরো নম্বর ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। তখন সামনের বারান্দা অন্ধকার, সকলের আড়ালে সেই ঘরে ঢুকে চারদিকে চেয়ে দেখলাম। বিছানা বালিশ সমস্ত অগোছালো। শুধু একটা

গোলাপফুল বিছানার ওপর পড়ে আছে। ফুলটা মেয়েটির খোঁপায় লাগানো ছিল দেখেছি। সেদিকে দেখতে দেখতে হঠাৎ সেটা বড় সুন্দর মনে হল। মনে হল, লক্ষ লক্ষ টাকার চেয়েও যেন ফুলটা বেশী দামী, বেশী লোভনীয়।

তা সেদিন আমার মতিচ্ছন্ন হয়েছিল নিশ্চয়ই। নইলে আমার অমন হবে কেন! আমি সেই শুকনো ফুলটা নিয়ে ঘরে এলুম। ঘরে এসে অন্যদিন নিজের জপ-তপ করি। সেদিন তাও করা হল না। সেই ফুলটা একটা কাচের গ্লাসে রেখে সামনের চেয়ারে আমি বসলাম। তারপর হোটেলের লাইব্রেরি থেকে ফিট্জারেল্ডের 'ওমর খৈয়াম' বইখানা আনিয়ে নিলাম। তারপর চলল পড়া। জীবনে যা কখনও করিনি, তাই করলাম! সামনে সেই ফুল আর হাতে কাব্যগ্রন্থ। সমস্ত বইখানা শেষ করে ফেললাম সারা রাত্তির ধরে পড়ে। পড়তে পড়তে মনে হল, যেন সাজাহান আর মমতাজমহল আবার তিনশো বছর পরে নতুন করে জন্ম নিয়েছে এই পৃথিবীতে। এই হোটেলের সতেরো নম্বর ঘরে বুঝি আবার এক নতুন তাজমহল রচনা করে রেখে গেছে!···

মিস্টার ত্রিপাঠি বললেন, তারপর?

মিস্টার চৌহান বললেন, তারপর আপনার পদস্খলন হল কী করে, বললেন না?

মিস্টার আগ্নার বললেন, সে-কথা আজ পর্যন্ত কেউ জানতে পারেনি। শুধু পরদিন হোটেলের খাতায় একটা ব্র্যান্ডির বোতলের হিসেব আর কিছুতেই মিলল না।

সুধা সেন

লেখক-জীবনের সবচেয়ে বড় ট্রাজেডি এই যে, তাকে সারা জীবন ধরে লিখতে হবে এবং আজীবন ভালো লেখাই লিখতে হবে। একখানা ভালো বই লিখে থেমে গেলে চলবে না। একখানা ভালো বই লিখেছে বলে, পরের বইটা খারাপ লিখলেও কেউ তাকে ক্ষমা করবে না। শুধু ভালো লিখতে হবে তাই-ই নয়। আরো ভালো। আরো, আরো ভালো। উত্তরোত্তর ভালো।

এসব কথা আমার নয়। এত কথা আমি বুঝতাম না। এসব কথা আমাকে যে শিখিয়েছিল, তাকে আমার গল্পের মধ্যে কখনও টেনে আনিনি। আমার জীবনের শেষ গল্প আমি লিখবো হয়তো তাকে নিয়েই। কিন্তু সে-কথা এখন থাক্।

কিন্তু কাকে নিয়ে 'কন্যাপক্ষ' সুরু করি!

অলকা পাল, সুধা সেন, মিষ্টিদিদি, মিছরি-বৌদি, আমার মাসিমা, কালোজামদিদি, মিলি মল্লিক—কার কথা ভালো করে জানি! কাকে ভালো করে চিনেছি! আমার জীবনের সঙ্গে কে জড়িয়ে গিয়েছিল সবচেয়ে বেশি করে! ছোটবেলা থেকে কত জায়গায় তো ঘুরেছি! কত কিছু দেখেছি! সকলকে কি মনে রাখা সহজ! জব্বলপুরের সেই নেপিয়ার টাউন, বিলাসপুরের শনিচরী বাজার, কলকাতার সেই হাঙ্গারফোর্ড স্ট্রীটে মিষ্টিদিদির বাড়ি, পলাশপুরের মিলি মল্লিক—কত জায়গায় কত লোককে দেখলাম, আমার নোট-বইতে সকলের সব গল্প লিখে রাখিনি। শুধু দু'-একটা টুকরো-টাকরা টুকিটাকি স্কেচ্ সব, তাই নিয়েই এই 'কন্যাপক্ষ'।

সোনাদি বলতো, 'যা-কিছু দেখছিস টুকে রাখ্। আর্টিস্টরা যেমন স্কেচ্ করে খাতায়, তেমনি করে, তারপর যখন উপন্যাস লিখবি তখন কাজে লাগবে তোর।'

উপন্যাসের কাজে কোনোদিন লাগবে কিনা জানি না, তবু অনেকদিন ধরে যেখানে যা-কিছু দেখেছি, তার কিছু কিছু লিখে রেখেছি। এক-একটা মানুষ দেখেছি, আর যেন এক-একটা মহাদেশ আবিষ্কারের আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছি। এক-এক জন মানুষ যেন এক-একটা তাজমহল। তেমনি সুন্দর, তেমনি বিস্ময়-মুখর, তেমনি অশ্রু-করুণ!

ইচ্ছে ছিল, একদিন একখানা উপন্যাস লিখবো। এমন উপন্যাস যে, পৃথিবীর সব মানুষ তাদের নিজের ছায়া দেখতে পাবে তাতে। অসংখ্য চরিত্রের শোভাযাত্রা। হাজার হাজার মানুষের মর্মকথা মুখর হয়ে উঠবে সে-উপন্যাসে। সে হবে দ্বিতীয় মহাভারত। সে আশা আমার সার্থক হয়নি জানি। হবেও না। তবু সোনাদি

আশা দিতো, 'কেন পারবি না তুই, নিশ্চয় পারবি—নগদ পাওনার লোভ যদি ত্যাগ করতে পারিস, পুরুত হয়ে পুজোর নৈবিদ্য যদি চুরি না করিস তো, একদিন দেবতার প্রসাদ পাবি তুই নিশ্চয়ই।'

মনে আছে, ছোটবেলায় একমাত্র সোনাদির কাছেই যা-কিছু উৎসাহ পেয়েছি। যখন লুকিয়ে লুকিয়ে লিখে খাতার পাতা ভরিয়ে ফেলেছি, বাবা দেখতে পেয়ে রাগ করেছেন, বন্ধু-বান্ধবরাও ঠাট্টা করেছে—তখনও কিন্তু সোনাদি হাসেনি!

সোনাদি বলতো, 'মেয়েদের নিয়ে লেখাই শক্ত, মেয়েদেরই ভালো করে লক্ষ্য করবি। মেয়েরা যেন ঠিক মঙ্গলগ্রহের মতো, এত দূরে থাকে তবু তার সম্বন্ধে পৃথিবীর লোকের কৌতূহলের আর শেষ নেই। মঙ্গলগ্রহে পৌঁছুবার জন্যে কি মানুষের কম চেষ্টা, কম অধ্যবসায়! কিন্তু যদি কখনও পৌঁছুতে পারে সেখানে—'

জিগ্যেস করতাম, 'পৌঁছুলে কী দেখবে, সোনাদি?'

'তা কি বলতে পারি। কেউ হয়তো ঠকবে, কেউ জিতবে। হারজিত নিয়েই তো জগৎ। কিন্তু যে-মানুষের দূরত্ব নেই, তার সম্বন্ধে কোনো মানুষের কোনো কৌতূহলও আর নেই। মেয়েদের রহস্যময়ী করে সৃষ্টি করার কারণই তো তাই—'

কিন্তু সুধা সেনকে যখন প্রথম দেখি তখন সত্যিই কোনো কৌতূহল, কোনো রহস্য আমাকে আকর্ষণ করতে পারেনি। তাই পরে যখন একদিন সুধা সেনের চিঠি পেলাম, সেদিন সত্যিই চমকে উঠেছিলাম।

মনে আছে, সুধা সেনকে নিয়ে যেদিন প্রথম রাস্তায় বেরিয়েছিলাম নিজেরই কেমন লজ্জা হয়েছিল যেন। সুধা সেন এমন মেয়ে নয় যাকে নিয়ে রাস্তায় বেরোনো চলে।

ট্রাম-রাস্তার মোড়ে কারো সঙ্গে দেখা হয়, এটা ইচ্ছে ছিল না আমার সেদিন। সুধা সেন তেমন মেয়ে নয়, যাকে সঙ্গে করে বেড়ালে লোকের ঈর্ষার উদ্রেক করা যায়। বরং উলটো। বছর বাইশ বয়সের মেয়ে এমন রোগা স্বাস্থ্যহীন কেমন করে হল? কাঁধ-ঢাকা ব্লাউজের বাইরে হাত-দুটোর যে অংশ নজরে পড়ে, সেখানে সৌন্দর্যের আভা কি যৌবনের মাধুর্য এতটুকু খুঁজে পাওয়া যায় না! গলার দু'পাশে কণ্ঠার হাড়-দুটো স্পষ্ট-উচ্চারিত উদ্ধত ভঙ্গিতে আত্মঘোষণা করে। চোখের যে-দৃষ্টি থাকলে অন্তত যুবতী বলে মনের নিভৃতেও একটু চাঞ্চল্য জাগে, তাও নেই তার।

সে-দৃশ্যটা আজো আমার মনে আছে। সুধা সেন আমারই পাশে দাঁড়িয়ে আছে। নিতান্ত ঘনিষ্ঠ হয়েই দাঁড়িয়েছে আমার বাঁ-পাশে। হাতে একটা ভ্যানিটি-ব্যাগও আছে, পায়ে মাঝারি দামের স্যান্ডেলও আছে, হাতে চুড়িও আছে দু'গাছা করে। সিঁদুরের একটা টিপও দিয়েছে সুধা সেন দুটো ভুরুর মধ্যে। একটা

জমকালো রঙিন শাড়িও পরেছে। অর্থাৎ সাজবার দুর্দম স্পৃহা না থাক্, তবু অস্বীকার করবার উপায় নেই যে সুধা সেন সেজেছে।

সুতরাং এমন একটি মেয়েকে পাশে নিয়ে চলতে সেদিন লজ্জাই হচ্ছিল মনে আছে।

দুর্ভাগ্যক্রমে এই অবস্থাতেই কি মোহিতের সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে হয়!

এড়ানো সম্ভব হলে হয়তো এড়িয়েই যেতাম। কিন্তু মোহিতই আমায় দেখে ফেলেছে। এগিয়ে এসে বললে, 'কী রে, কোথায়?'

বললাম, 'একটা উপকার করতে পারো হে?'

তারপর সুধা সেনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে বললাম, 'আমার বৌদির বিশেষ জানাশোনা, বড় মুশকিলে পড়েছেন। থাকবার একটা ঘরের বিশেষ দরকার। মেয়েদের বোর্ডিং, না-হয় মেস, যেখানে হোক। একেবারে যাকে বলে নিরাশ্রয়। একটা বাসার খবর দিতে পারো?'

মোহিত নানা কাজের মানুষ। নানা দরকারে নানা জায়গায় যেতে হয় তাকে। বার দুই সিগারেটে টান দিলে। কপাল কুঁচকে একবার ভাবলেও যেন। তারপর বললে, 'আপাতত তো কিছু মনে পড়ছে না ভাই, তবে পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট বোর্ডিংএ- একবার চেষ্টা করে দ্যাখো না—'

চেষ্টা করে দেখতে আপত্তি নেই। মোট কথা আজকের মধ্যে যেখানে হোক একটা আশ্রয়ের বন্দোবস্ত করতেই হবে। সুধা সেনকে আমারই হাতে ছেড়ে দিয়েছে বৌদি। সুধা সেনের একটা থাকবার ব্যবস্থা আজ না করলেই নয়। এই বিরাট কলকাতা শহরে সুধা সেন নাকি একেবারে সহায়হীনা। আজ রাতটুকুর জন্যেও মাথা গোঁজবার আশ্রয় নেই তার কোথাও।

সুধা সেনের মুখের দিকে চাইলাম। ভারি অসহায় মনে হল তাকে! কে জানে এতদিন এই স্বাস্থ্য নিয়ে বি.এ. পাস করেছে কেমন করে, কেমন করে সাপ্লাই অফিসের অ্যাকাউন্টস্ সেক্সনে আশি টাকা মাইনের চাকরি করছে। পাড়াগাঁয়ে নাকি ছোটবেলায় মানুষ। ছোটবেলায় মানে, ম্যাট্রিক পর্যন্ত পড়েছে দেশেই। বৌদি বলে, 'ভীষণ কিপ্টে মেয়েটা, কিছুতেই পয়সা খরচ করবে না, দিন-ভোর শুধু সাত-আটবার চা খেয়েই কাটায়।'

ট্রাম এসে গিয়েছিল।

মোহিত বললে, 'হ্যাঁ, আর একটা জায়গা মনে পড়েছে, গোয়াবাগানে মেয়েদের একটা বোর্ডিং আছে, সেখানে একবার চেষ্টা করতে পারো, বোধ হয় জায়গা পেতেও পারো—'

ট্রামে উঠে পকেট থেকে নোট-বইটা বার করে ঠিকানাটা লিখে রাখলাম। কোথায় বালিগঞ্জ, কোথায় গোয়াবাগান, কোথায় হ্যারিসন রোড। শেষে যদি কোথাও জায়গা না মেলে তখন আমার কী কর্তব্য ভেবে পেলাম না। কিন্তু

সুধা সেনের মুখের দিকে চাইলে সত্যিই মায়া হয়।

বৌদি বলে, 'অফিসে একদিনও কিছু খাবে না, নেহাত যখন খুব খিদে পাবে তখন খালি এককাপ চা—তাইতো ওইরকম স্বাস্থ্য।'

একটা বসবার জায়গা পেয়েছিলাম। জানলার দিক ঘেঁষে সুধা সেন বসেছিল।

বললাম, 'বৌদি বলছিল, আপনার এক ভাই থাকে কলকাতায়—'

সুধা সেন বললে, 'এক ভাই নয়, দু'ভাই—দু'জনে দু'বাসায় থাকে।'

'আপনার আপন ভাই? তা সেখানে তাদের কাছে কোনোরকমে—'

সুধা সেন বাইরের দিকে চোখ রেখেই বললে, 'আমার টিউশানিটা যাবার পর থেকে তো ভায়েদের কাছেই আছি।'

'আপনি টিউশানি করতেন নাকি?'

সুধা সেন বললে, 'সেইখানেই তো এ-ক'বছর কাটিয়েছি, আমার সুটকেসটা এখনও সেখানে সেই বাসাতেই পড়ে আছে। একটা ছোট ছেলেকে পড়াতে হতো। তাঁরা নোটিস দিলেন। ছেলে বড় হয়েছে, এবার পুরুষ টিচারের কাছে পড়বে। লোক তাঁরা খুব ভালো। আমাকে এক মাসের নোটিস দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, —এক মাসের মধ্যে কোথাও একটা বাসা-টাসা খুঁজে নিতে!'

'তারপর?'

'একটা মাস তো দেখতে দেখতে কেটে গেল। একখানা ঘর পাওয়া গেল না যে, তা নয়। কিন্তু মেয়েদের থাকার মতো সে-ঘর নয়। আর, এক-এক জন যা ভাড়া চেয়ে বসলো! আমি তো আশি টাকা মাইনে পাই, তা থেকে দেশে মাকেই বা কী পাঠাই, আর নিজের খরচই বা কিসে চালাই!'

কল্পনা করলুম, সুধা সেন সারাদিন অফিসের চাকরি করে সকালে সন্ধ্যেয় ছাত্র পড়িয়ে বাসা খুঁজতে বেরিয়েছে। শ্যামবাজার, বউবাজার, টালা আর টালিগঞ্জ। যেখানে এতটুকু পরিচয়ের সূত্র আছে সেখানেই সন্ধান নেওয়া। তারপর ট্রামের ভিড়। সে-ভিড়ে পুরুষমানুষেরাই উঠতে পারে না তো সুধা সেন তো চেপ্টে যাবে! একটা আচমকা ধাক্কা খেয়েই তো উল্টে পড়বে রাস্তায়। হয়তো ধাক্কাও খেয়েছে অনেকদিন। সৌন্দর্যের আভিজাত্য থাকলে লোকে তবু একটু সম্ভ্রম সমীহ করে। খাতির করে। সুধা সেনের সে-সুবিধেও নেই। এইতো সেদিন দেখলাম, ভিড়ের মধ্যে বাসে উঠতে যাবার সময় একজনের চোখের সান গ্লাসটা ছিট্‌কে রাস্তায় চুরমার হয়ে গেল। কতবার রাস্তায় ভিড়ের মধ্যে যে-সব অত্যাচার অপমান সইতে হয়েছে, সে-সব কি আর সুধা সেন মুখ ফুটে বলবে?

বললাম, 'ধরুন, আজ যদি কোনো ব্যবস্থা না হয়, তাহলে কী উপায়?'

'তাহলে?—' বলে ভাবতে লাগলো সুধা সেন।

'আপনি একটা কিছু ব্যবস্থা করে দিন আমার। আপনি নিশ্চয় একটা ব্যবস্থা করতে পারবেন, আপনার বৌদির কাছে শুনেছি আপনার অনেক লোকের সঙ্গে জানাশোনা আছে।'—সুধা সেন আমার চোখের ওপর চোখ রেখে বললে।

লেডীজ্ সীটে বসেছিলাম। ইতিমধ্যে একজন মহিলা ওঠায় জায়গা ছেড়ে দাঁড়াতে হল। আমি যেন বাঁচলাম।

বৌদি বলেছিল, 'ভারি ছট্‌ফটে মেয়েটা। কেবল এ-অফিস থেকে সে-অফিস করবে। কেবল কিসে উন্নতি করবে, বেশি টাকা জমাবে সেই ইচ্ছে—মোটে খাবে না কিছু, পয়সা যেন ওর গায়ের রক্ত।'

সুধা সেনের পাশে যে মেয়েটি এসে বসলো সে পাঞ্জাবী। সুধা সেন তার পাশে যেন এতটুকু বিন্দুবৎ হয়ে গেছে। সত্যি সত্যি সুধা সেনকে দেখে মায়া হয় না, দুঃখ হয় না। হাসি পায়। সাপ্লাই অফিসের অন্য মেয়েদেরও তো দেখেছি। অনেক বিবাহিতা মহিলা, পাঁচ-ছ'ছেলের মা, অনেকেই তো চাকরি করে। আবার কারোর চাকরি করবার প্রয়োজন নেই, শুধু শখ, তাও দেখেছি। সাজগোজ পোশাক-পরিচ্ছদ, সেই পয়সায় সিনেমা থিয়েটার রেস্টুরেন্ট সবই চলে। ধর্মতলার খাবারের দোকানটাতে দুপুরবেলা মেয়েদের ভিড়ে ঢোকাই যায় না। কিন্তু সুধা সেনের মতো মেয়ে সত্যিই দেখা যায়নি এর আগে। এত রোগা মেয়ে আগে নজরেও পড়েনি আমার। বছর বাইশ বয়সের মেয়ে এমন স্বাস্থ্যহীন কেমন করে হল। সুধা সেন যখন হাঁটে, তখন মনে হয় সে যেন তার কানের পাতলা দুটো দুলের মতো টিকটিক করে দুলছে। হাঁটছে তাকে বলা চলে না ঠিক।

দু'জনের দুটো টিকিট আমি কিনেছিলাম। কিন্তু সুধা সেনের সে-সম্বন্ধে বিশেষ চিন্তার কারণ নেই। টিকিট কেনা হয়েছে কিনা, সে প্রশ্ন তার মনে উঠতে পারে না।

ধর্মতলার মোড়ে ট্রাম থেকে নামতে হল। আর একটা ট্রামে উঠতে হবে এখানে।

শ্যামবাজার ট্রামে উঠে বললাম, 'কোথায় আগে যাবেন ? গোয়াবাগানে, না পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট বোর্ডিং-এ ?'

সুধা সেন বললে, 'চলুন আগে শেয়ালদ'য়। আমার ছোড়দা ওখানে থাকে শুনেছি।'

বললাম, 'আর আপনার বড়দা ? তিনি কোথায় থাকেন ?'

সুধা সেন বললে, 'সেই বড়দার বাড়িতেই তো রাত্রে শুই, কিন্তু সেখানেও রাত বারোটার আগে ঢোকবার হুকুম নেই, তারপর ভোরবেলা অন্ধকার থাকতে-থাকতে সকলের ঘুম থেকে ওঠার আগেই বেরিয়ে চলে আসতে হয়।'

'কেন ?' সুধা সেনের কথা শুনে অবাক হবারই কথা।

সুধা সেন যা বললে, তা শুনে আরো অবাক হয়ে গেলাম। সুধার বড়দা

ফড়েপুকুরে বিয়ে করে বৌ নিয়ে সংসার পেতেছে। সেখানে থাকবার জায়গাও আছে বেশ। একখানা ঘর খালি পড়েই থাকে। ভারি ভালোমানুষ কিন্তু বড়দা। কারো মুখের ওপর কথা বলতে পারে না। কতদিন বড়দা সুধা সেনের অফিসে এসে আগে আগে খবর নিতে যেত। টাকার সাহায্য অবশ্য সুধা সেনের প্রয়োজন হয় না। তবু বৌদি কিছুতেই সুধা সেনকে সেখানে ঢুকতে দেবে না। কিন্তু বড়দা খুব ভালবাসে ছোট বোনকে। যখন বৌদি ঘুমিয়ে পড়ে, রাত বারোটার পর বড়দা চুপি চুপি দরজা খুলে দিয়ে যায়! নিঃশব্দে, আলো না জেলে সুধা সেন তার নির্দিষ্ট ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ে। আবার সকালবেলাই সকলের আগে নিঃশব্দে বেরিয়ে আসতে হয় রাস্তায়।

বললাম, 'তারপর স্নান খাওয়া, এসব?'

সুধা সেন বললে, 'স্নানটা এতদিন ছোড়দার ওখানেই করতুম। বউবাজারে একটা মেস করে আছে ছোড়দারা কয়েকজন বন্ধু মিলে···ওরা এতদিন আপত্তি করে আসছিল। সকালবেলা সবাই অফিস যাবে, আর আমি তখন কলঘর জোড়া করে থাকি—সকলের বড় অসুবিধে হয়।'

বললাম, 'শোয়া, স্নান করা তো হল—এরপর খাওয়া?'

'খাওয়ার আর ভাবনা কি? না খেলেই হয়!' সুধা সেন হাসলে।

বৌদি ঠিকই বলেছে,—মেয়েটা ভারি কিপ্টে। কিছু খাবে না, খাবে কেবল চা। কাপের পর কাপ চা। নইলে খুব খিদে আছে। যদি খায় তো বড় জোর সিঙাড়া, কচুরি নয়তো বেগুনি, ফুলুরি তেলেভাজা। এই তেলেভাজা খেয়েই এক-একদিন কাটিয়ে দেয় সুধা সেন। এক-একদিন স্রেফ কিছুই খায় না। প্রথম প্রথম নাকি কষ্ট হতো সুধা সেনের, কিন্তু আজকাল অভ্যেস হয়ে গেছে। বড়দার বাড়িতে রাত বারোটার আগে ঢোকবার হুকুম নেই, অথচ অফিস-ছুটি পাঁচটায়। এই সাত ঘণ্টা কাটাতেই বড় কষ্ট হয়। কার্জন পার্কের জনবহুল অংশটায় কাটানোই সবচেয়ে নিরাপদ। কিংবা ট্রামে চড়ে একবার ডালহৌসি আর একবার বালিগঞ্জ স্টেশনও করা যায়, কিন্তু অকারণে অনেকগুলো পয়সা খরচ। কার্জন পার্কের খোলা হাওয়ায় ঘাসের ওপর বসে দু'পয়সার চিনেবাদাম চিবিয়ে চিবিয়ে খেলে পেটটাও ভরে, খোলা হাওয়া খাওয়াও হয়, আবার সময়টাও বিনা-খরচে কাটানো যায়।

সুধা সেন বললে, 'বড়দা ছোড়দা কেউ মাকে টাকা পাঠায় না। সেখানে আমার একটা ছোট ভাই আছে, আমাকেই তার খরচ দিতে হয়।'

বড়দা নাকি বিয়ের আগে টাকা পাঠাতো। কিন্তু ইদানীং বৌদি বারণ করে দিয়েছে। শ্বশুরবাড়ির কোন লোককে দেখতে পারে না বৌদি। ছোড়দা তো দাদার সঙ্গে সমস্ত সংস্রব ত্যাগ করেছে—সুধা সেন বাধ্য হয়েই রাত্রে যায় শুতে, নইলে বৌদি দেখতে পেলে বড়দাকে তো আর আস্ত রাখবে না।

সুধা সেন বললে, 'ছোড়দার মেসটা ছিল এতদিন, তবু সকালবেলা কাপড়-কাচা, স্নান করাটা হচ্ছিল। কিন্তু দু'দিন থেকে তাও হয়নি—আজ দু'দিন স্নান করাও হয়নি আমার।'

'কেন ?'

'ছোড়দা ও-মেস ছেড়ে দিয়ে শেয়ালদ'য় একটা বড় হোটেলে উঠেছে। সেই জন্যেই বলছিলুম, আগে শেয়ালদ'য় গিয়ে ছোড়দার খোঁজটা করি—'

শেষ পর্যন্ত শেয়ালদ'র মোড়েই ট্রাম থেকে নামলাম। সুধা সেনকে নিয়ে এখানে ঢুকতে কেমন যেন লজ্জা বোধ হল।

ম্যানেজার কিন্তু চিনতে পারলেন না। বললেন, 'অমলেন্দু সেন ? না মশাই, এখানে ও-নামে কেউ থাকে না।'

সুধা সেন যেন বিমর্ষ হয়ে গেল। অথচ সে ছোড়দার মেসে গিয়ে শুনেছে, এখানেই উঠেছে ছোড়দা।

আমি বললাম, 'এখানে কোনো ঘর পাওয়া যাবে, মানে আলাদা ঘর একটা, ইনি থাকবেন।'

ম্যানেজার সুধা সেনের দিকে চাইলেন। কেমন যেন বক্র-দৃষ্টি। অন্তত সুধা সেনকে কেউ বক্র-দৃষ্টি দিয়ে দেখতে পারে, এ-ধারণা আমার ছিল না। দু'-একজন ওয়েটার, চাপরাসী ক্যাশিয়ার তারাও এসে দাঁড়িয়েছে চারপাশে। সুধা সেন আর আমাকে জড়িয়ে সবাই মিলে যেন একটা সম্পর্ক কল্পনা করে নিয়েছে। জিনিসটা আমার ভালো লাগলো না।

ক্যাশিয়ার বললে, 'কী বললেন স্যার, অমলেন্দু সেন ? হ্যাঁ হ্যাঁ, ছিলেন এখানে তিনি, কিন্তু তিনি তো···আচ্ছা, ওইখানে দেখুন তো, পাশেই যে-গলিটা, ওর শেষে একেবারে লাল রঙের দোতলা বাড়িটায় বোধ হয় তিনি আছেন—ওই হোটেলে একবার চেষ্টা করে দেখুন তো—'

সকলের কৌতূহলী দৃষ্টি পার হয়ে সুধা সেনকে নিয়ে বাইবে বেরিয়ে এলাম। বাইরে এসে যেন বাঁচলাম। আমার সম্বন্ধে কী ভাবলে ওরা কে জানে ! ব্যাপারটা সুধা সেন বুঝতে পেরেছে নাকি ? কিন্তু ওর মুখ দেখে তা বুঝবার উপায় নেই। তেমনি ভাষাহীন বিবর্ণ মুখ ওর। হাতের ভ্যানিটি-ব্যাগটি নিয়ে বেশ চঞ্চল পায়ে আমার পাশে পাশে চলতে লাগলো সুধা সেন।

লাল রঙের দোতলা বাড়িটায় ঢোকা গেল।

একটু নির্জন মনে হল বাড়িটা। ঘরগুলো তালা-চাবি দেওয়া। ছুটির দিন। সবাই বোধ হয় যে-যার দেশে চলে গেছে। রান্নাঘরের কোণে ঠাকুর থালায় ভাত বেড়ে খাবার আয়োজন করছে।

বললে, 'অমলেন্দুবাবু ? ওই সাত নম্বর ঘরে দেখুন।'

সাত নম্বর ঘর খুঁজতে অগ্রসর হচ্ছিলাম। ঠিকানা বদলালো, অথচ বোনকে

একটা খবর দেওয়াও প্রয়োজন বোধ করেনি—এ যেন কেমন। সুধা সেন কি এখানে থাকতে পারবে ? এ যেন কেমন। হেটো মেস বলে মনে হল।

এক ভদ্রলোক ভিজে গামছা পরে এক বালতি জল বয়ে নিয়ে ঘরে ঢুকছিলেন। বললেন, 'হ্যাঁ, এই ঘরেই থাকেন, কিন্তু এখন তো তিনি নেই। সকালবেলা বেরিয়ে গেছেন, আসবেন সেই রাত্রে, আবার না-ও আসতে পারেন। বলে গেছেন, ওবেলা খাবেন না।'

সুধা সেনের দিকে তাকালাম। সুধা সেনও আমার দিকে তাকালে। বুঝলাম—ছোড়দাকে পাবার আশা যেন সে করেনি। শুধু ছোড়দার আস্তানাটা চিনে রাখতেই এসেছিল। সুধা সেন নির্বিকারভাবে বেরিয়ে এল বাইরে। আমিও এলাম পেছনে পেছনে।

সুধা সেন বললে, 'ছোড়দার দেখা পাওয়া যাবে না জানতাম—ও ছোটবেলা থেকেই ওমনি ! দশ বছর বয়েসে দেশ থেকে পালিয়ে এসেছিল কলকাতায়, মাকে একটা চিঠি পর্যন্ত দেয় না।'

শুনে আমি চুপ করে রইলাম।

সুধা সেন আবার বলতে লাগলো, 'বড়দার ওপরেই মা'র বেশি ভরসা ছিল। জমি-জায়গা বেচে বড়দাকে বাবা পড়িয়েছিলেন। আর বলতেন—কমলটাই মানুষ হবে।'

বললাম, 'মানুষ তো যা হয়েছে, বুঝতে পারছি।'

সুধা সেন বললে, 'বড়দাই তো আমার পড়ার খরচ সব দিত, মাকেও টাকা পাঠাতো, কিন্তু বৌদি আসার পর থেকেই সব বন্ধ করে দিয়েছে। আমাকেও বৌদি মোটে দেখতে পারে না। বড়দা এই ব্যাগটা আমায় কিনে দিয়েছিল আমার জন্মদিনে।'

বললাম, 'এবার তাহলে পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট বোর্ডিংটা দেখা যাক—'

সুধা সেনকে নিয়েই আজ সমস্ত দিন কাটবে মনে হল। অথচ রাস্তার মধ্যে ফেলে চলে যাওয়াও যায় না। কোথাও এক রাত্রির জন্যেও যদি থাকবার একটা বন্দোবস্ত করা যেত, আমি নিশ্চিন্ত হতাম। অফিসে যে-সব মেয়েরা সুধা সেনের সঙ্গে কাজ করে তারাও কি আশ্রয় দেয় না একে ! কে জানে সুধা সেনের কোথায় গোলযোগ। নিশ্চয় একটা খুঁত আছে কোথাও সুধা সেনের চরিত্রে, যা তাকে বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়দের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।

বৌদিকে জিগ্যেস করছিলাম। বৌদি বলেছিল, 'বড় কিপ্টে মেয়েটা, না-খেয়ে ওর মতো থাকতে আর কাউকে দেখিনি।'

কিন্তু কৃপণতা কি এতবড় একটা অপরাধ নাকি যে কারো সহানুভূতি ভালবাসা বন্ধুত্ব পাবে না ? যে কৃপণতা করে সে তো নিজেকেই কষ্ট দেয়, নিজেরই স্বাস্থ্য নষ্ট করে। তাতে আর কার কী এসে গেল ! নাকি একসঙ্গে এক-

ঘরে বাস করতে গেলে কুড়িয়ে ছড়িয়ে না থাকলে কারোর সহানুভূতি আকর্ষণ, করা যায় না। কমলেন্দুকে মানুষ করতে সুধা সেনের মা যে-পরিমাণ অর্থ আর সম্পত্তি ব্যয় করেছেন, সেটা থাকলে আজ বোধ হয় সুধা সেন অন্যরকম হতো। বোধ হয় সুধা সেন পেট ভরে খেত। বোধ হয় তার স্বাস্থ্য এমন নির্জীব হতো না। হয়ত সুধা সেনকে বি.এ. পাস করতেও হতো না, চাকরি করতেও হতো না। বিয়ে করে দেশের আর পাঁচজন মেয়ের মতো সংসার পাততে পারতো।

পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট বোর্ডিং-এ বড্ড কড়াকড়ি।

দোতলায় ভিজিটার্স রুমে অনেক টেবিল, চেয়ার, বেঞ্চি। সেখানেই বসলাম দু'জনে। ঘরে আরো অনেক ছেলেমেয়ে গল্প করছে। সুপারিন্টেন্ডেন্ট-এর নাকি অসুখ, তিনি নিচে নামবেন না। আমি বসে রইলাম, সুধা সেনই ওপরে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেল।

সুধা সেন খানিক পরে আবার সেই নির্বিকার মুখ নিয়েই ফিরে এল।

বললে, 'হল না।'

চেয়ার ছেড়ে উঠলাম। তার পেছনে পেছনে চলতে লাগলাম আবার।

তারপর? তারপর কী? ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলাম। কাঁটা ঘুরে একেবারে তিনটের ঘরে চলে এসেছে। এখনও কিন্তু সুধা সেনের খিদে পাবে না। অন্তত খাবার কথার উল্লেখ না করলে আর খাবার কথা বলবে না সুধা সেন। ট্রাম-রাস্তায় এসে পড়েছি। আমার যেন আর নড়তে ইচ্ছে করছে না। সুধা সেন কিন্তু অক্লান্ত। মনে হল এখনও গভীর রাত্রি পর্যন্ত এমনি অনির্দিষ্ট ঘোরাঘুরি চালিয়ে যেতে পারবে। সুধা সেনের দিকে চাইলাম। বললাম, 'তারপর?'

সুধা সেনও আমার দিকে চেয়ে বললে, 'তারপর কী বলুন?'

তারপর যেন আর সত্যিই কিছু করবার নেই। যেন এখানেই এসে পূর্ণচ্ছেদে পরিসমাপ্তি। আর চলবে না চাকা। এখানেই নামতে হবে শেষবারের মতো। এরপর শুধু ধূসর হতাশা।

বৌদি বলেছিল, 'ভারি ছটফটে মেয়ে, আর বড্ড একগুঁয়ে, যা নিয়ে লাগবে তা শেষ পর্যন্ত করে ছাড়বে, খাওয়া নেই দাওয়া নেই, অদ্ভুত গোঁ ওর!'

শেষ পর্যন্ত বললাম, 'আসুন, কিছু খেয়ে নেওয়া যাক।'

আপত্তি করলে না সুধা সেন। বললে, 'চলুন—'

একটা ভালো রেস্তোরাঁ দেখে ঢোকা হল। ঘরময় লোক। সুধা সেনকে নিয়ে ঢুকতেই চারদিক থেকে দৃষ্টি পড়লো আমাদের ওপর। কোনও পরিচিত লোকের দৃষ্টিকেই ভয় ছিল, নইলে আর অসুবিধে কিসের। সুধা সেনকে নিয়ে যে-কোনো লোকের বিব্রত হবারই কথা। সুধা সেনের চেহারাই এমন, তার ওপর নজর না পড়ে উপায় নেই।

কোনো রকমে সুধা সেনকে নিয়ে একটা কেবিনের মধ্যে ঢুকেছি। পর্দাটা অর্ধেক টেনে দিলাম।

কোনো মেয়ে যে একজন পুরুষের সামনে অমন গোগ্রাসে খেতে পারে, সুধা সেনকে সেদিন কেবিনের মধ্যে খেতে না দেখলে বিশ্বাসই করতাম না সত্যি। নাকি সকালে ঘুম থেকে ওঠা পর্যন্ত কিছুই খায়নি! হয়তো হাতে পয়সা নেই! সেই কোন্ সকালে বড়দার বাড়ি থেকে বৌদি জাগবার আগেই বেরিয়ে এসেছে, তারপর দোকান থেকে কি আর এক কাপ চা-ও খায়নি! আমাদের বাড়িতে যখন সুধা সেন এল তখন সকাল সাড়ে দশটা। তারপর এখন বিকেল তিনটে। সত্যি সুধা সেনের ক্ষমতা আছে। সুধা সেন নিজের মনেই খাচেছ, আর আমি অপাঙ্গে তাই দেখছি। দুর্ভিক্ষের সময় ক্ষুধার্ত মুমূর্ষু ভিখিরির আহার দেখেছি, সে এক রকম। কিন্তু এই সুধা সেনের খাওয়া! বি.এ. পাস, প্রাইভেটে এম.এ. দেবে, শিক্ষিতা মেয়ের এই আহার যেমন কদর্য তেমনি কুৎসিত। সমস্ত মন আমার বিষাক্ত হয়ে উঠলো। তিন টাকা বিলের দাম চুকিয়ে দিলাম নিঃশব্দে।

বললাম, 'উঠুন।'

আরো বোধ হয় খেতে পারতো সুধা সেন। সুধা সেন যেন আজ সাত দিনের খাওয়া একদিনে খাবে বলে মনস্থ করেছে। রাস্তায় বেরিয়েই কিন্তু করুণা হল। পরিমাণে যে খুব বেশি খেয়েছে সুধা সেন, তা নয়, কিন্তু তার খাওয়ার ভঙ্গিটাই যেন বড় বিশ্রী লেগেছিল সেদিন।

যেন খানিকটা শক্তি পেয়েছে সুধা সেন। বললে, 'চলুন, একবার গোয়াবাগানে শেষ চেষ্টা করে দেখি।'

মোহিতের দেওয়া ঠিকানার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। নোট-বুকে লেখা ছিল। এবার শেষ চেষ্টা। হাতে আর আশ্রয়ের সন্ধান নেই। এবারে যদি ফিরে আসতে হয় তাহলে নিরুপায়। সুধা সেনকে বললাম, 'ট্রামে উঠুন তাহলে—'

কলেজ স্ট্রীটের মোড় থেকে গোয়াবাগান দশ মিনিটের রাস্তা। ট্রামে খুব ভিড়। কিন্তু কেন জানিনা লোকজন সুধা সেনকে দেখেই রাস্তা করে দিলে। লেডীজ্ সীট ভর্তি ছিল। একজন পুরুষ যাত্রী সুধা সেনের জন্যে জায়গাটা ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। সুধা সেনের কৃশ শরীর দেখে দয়া হওয়াই স্বাভাবিক। মনে হল, ভিড়ের মধ্যে সুধা সেনকে ছেড়ে দিয়ে যাব নাকি পালিয়ে। না-হয় খুঁজে মরুক নিজের আশ্রয়। গোটাকতক পয়সা খরচ হোক-না সুধা সেনের। তারপর লেখাপড়া জানা মেয়ে—রাস্তায় আর রাত কাটাতে হবে না। রাত্রি বারোটা পর্যন্ত কোনোরকমে রাস্তায় কাটিয়ে তারপর আশ্রয় নিক গিয়ে বড়দার বাড়িতে নিত্যকার মতো। সুধা সেনের বড়দা লোক ভালো, তিনি ঠিক রাত বারোটার সময় স্ত্রীর অজ্ঞাতে দরজার খিল খুলে দেবেন। আমার কিসের মাথা-ব্যাথা! আমার সমস্ত কাজকর্ম ফেলে আমি কেন মিছিমিছি ঘুরে বেড়াচ্ছি সুধা-

সেনের পেছনে পেছনে। আমার কিসের দায়! সুধা সেন আমার কে! অমন কত অসংখ্য মেয়ে কলকাতার রাস্তা-ঘাটে ছড়িয়ে আছে। আর অভাব? অভাব কার নেই। বি.এ. পাস করেছে, প্রাইভেটে এম.এ. দেবে, তারপর হয়তো একদিন টি-বি হবে—হয়তো তখন হাসপাতালে পাঠিয়ে দেবে কেউ দয়া করে। একটা ফ্রি বেড যোগাড় হলেও হতে পারে। তারপর কে মনে রাখবে সুধা সেনের কথা। দেশে মা হয়তো মনি-অর্ডারের আশায় মাসের পর মাস বসে থাকবে—ভাইয়ের স্কুলের পড়া বন্ধ হয়ে যাবে টাকার অভাবে। বড়দাকে মাঝরাতে উঠে আর দরজা খুলে দিতে হবে না। ছোড়দাকে বিরক্ত করতে আসবে না কেউ।—

সুধা সেন নিজেই উঠে এসেছে।

'নেমে পড়ুন, গোয়াবাগানে এসে পড়েছি যে—'

গলির ভেতর বাড়িটা খুঁজে নিতে একটু কষ্ট হল। তা হোক, পাওয়া গেল তা-ই ভালো। একটা আধপুরোনো বাড়ির অর্ধাংশ। সেই অর্ধাংশ নিয়েই মেয়েদের বোর্ডিং।

রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে বাড়িটার প্রবেশপথের একটা নিশানা খুঁজছিলাম।

'সুধাদি!'

পেছন ফিরে দেখি একটা ছোট ছেলে সুধা সেনের সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

'কিরে বিলু, তুই! এখানে কোথায়?'

ছোট হাফ্-প্যান্ট-পরা ছেলেটা চেনে সুধা সেনকে। আমার কাছে যেন হঠাৎ সুধা সেনের মর্যাদা বেড়ে গেল। সুধা সেনকে কেউ চিনবে, কেউ তাকে চিনে নাম ধরে ডাকবে, তা সে হোক-না ছোট ছেলে—এটা যেন আমার কাছে অবিশ্বাস্য ছিল। তাহলে নিতান্ত অসহায় নয় সুধা সেন। তারও এই কলকাতা শহরে পরিচয়ের স্বর্ণসূত্র আছে। সেই সূত্র ধরে সে আশ্রয়ের সপ্তম স্বর্গে পেঁছতেও পারে!

'তোরা কবে এলি রে কলকাতায়?'

'এইতো সাতদিন এসেছি মামার বাড়িতে। আমি কিন্তু তোমায় দেখেই চিনতে পেরেছি সুধাদি'—বিলু বললে।

'মা কেমন আছে রে?'

তারপর আবশ্যক অনাবশ্যক অনেক কথা। সুধা সেন যেন হঠাৎ খুশি হয়ে উঠলো। সুধা সেনের দেশের ছেলে। অনেকদিন পরে দেখা হয়ে গেছে। আমি তো আকাশের চাঁদ হাতে পেলাম। এখন কোনোরকমে সুধা সেনকে ছেলেটির হাতে গছিয়ে দিতে পারলেই নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ি ফিরে যেতে পারি। সুধা সেনের সঙ্গে পরিচয় থাকার কলঙ্ক থেকে মুক্ত হতে পারি।

সুধা সেন বললে, 'তুই দাঁড়া বিলু, এখানে যদি ঘর না পাই, তাহলে তোর মামার বাড়িতেই উঠবো একটা রাত্তিরের জন্যে।'

যাক, এতক্ষণে যেন আশার একটা ক্ষীণতম সূত্র পাওয়া গেল। তারপর সুধা সেনকে নিয়ে বোর্ডিং-এর গলির ভেতর ঢুকলাম। গলির পেছন দিকে ছোট দরজা। সুধা সেনই সামনে এগিয়ে গেল।

'আপনাদের বোর্ডিং-এর সুপারিন্টেন্ডেন্ট-এর সঙ্গে দেখা করতে পারি?'

'তিনি তো এখন নেই। কী বলবেন আমাকে বলুন।'

বেশ বয়ীয়সী মহিলা একজন। বিধবার বেশ। সরু চুলপাড় ধুতি পরনে। মাথায় একটু ঘোমটা। আমি এগিয়ে গেলাম। বুঝিয়ে বললাম সব। বললাম সুধা সেনের সত্যিকারের সবিস্তার দুর্দশার কাহিনী। আশ্রয় এখানে না পেলে আজ রাত্রে কোথায় কাটাতে হবে, তার কোনো ঠিকই নেই। সুধা সেনের কৃশ চেহারা দেখে মহিলাটির যেটুকু সন্দেহ ছিল, তাও যেন দূর হয়ে গেল। সুধা সেন বিধবা নয়—কুমারী, তবু মহিলাটির বোধ হয় মনে হল—বিধবার চেয়েও সহায়হীন সে। যে সুধা সেনের কৃশ, রুগ্ন চেহারা আমার মনে বিতৃষ্ণার উদ্রেক করেছে, তাই-ই মহিলাটির মনে সহানুভূতির সৃষ্টি করতে পেরেছে যেন।

মহিলাটি বললেন, 'এখন তো আমাদের কোনো সীট খালি নেই, তবে কয়েকদিন পরেই খালি হবে···'

তারপর খানিক থেমে আবার বললেন, 'তবে নেহাত যদি কোথাও থাকবার জায়গা না থাকে, তাহলে আমার সঙ্গে এক-ঘরে থাকতে দিতে পারি কয়েকদিনের জন্যে।'

একটা নিশ্চিন্ত আরামের নিশ্বাস ত্যাগ করলাম। মনে হল ঘাড় থেকে যেন একটা ভারি বোঝা নেমে গেল। সুধা সেনও স্বস্তির নিশ্বাস ফেললে। বিছানা সঙ্গে আনেনি সুধা সেন। তা সে কাল সকালে আনলেই চলবে। স্যুটকেসটা ছাত্রের বাড়িতে পড়ে আছে, সেটাও কাল সকালে আনলেই চলবে। ইতিমধ্যে একটা মাদুর বা ছেঁড়া শতরঞ্জি কি আজকের রাতটার জন্যে কারোর কাছে ধার পাওয়া যাবে না? বালিশ সুধা সেনের দরকার হয় না। মাথার ওপর একটা ছাদ, চারদিকে চারটে দেওয়াল, আর ছেঁড়া একটা মাদুর—এর বেশি কোনো দিন কিছু চায়নি সুধা সেন। সুধা সেনকে সেইখানে রেখে আমি আর সুধা সেনদের দেশের সেই ছেলেটি চলে এলাম। গলির বাইরে এসে একটা মুক্তির নিশ্বাস পড়লো। সারা দিনটার এমন অপব্যয় আর কখনও করিনি এর আগে। সুধা সেন আমার কাঁধ থেকে নামলো শেষ পর্যন্ত সেই-ই আমার সৌভাগ্য!

শুধু এইটুকু ঘটনা হলে এ গল্প লেখবার প্রয়োজন হতো না। কিন্তু ঘটনা-চক্রে যে বিপরীত চরিত্রের আর একটি মেয়েকে আর-একদিন অন্য পটভূমিকায় দেখতে পাব, সে কথা কি আমিই জানতুম!

সুবোধ এসেছিল কলকাতায়। নতুন-দিল্লীতে বড় কনট্রাকটার সুবোধ রায়

আবার বহুদিন পরে কলকাতায় এল।

সুধা সেনকে ভুলেই গিয়েছিলাম। মনে রাখবার মতো মেয়ে তো সুধা সেন নয়। বহুদিন পরে বৌদিকে জিগ্যেস করেছিলাম, 'তোমাদের সুধা সেনের খবর কি বৌদি ?'

বৌদি বলেছিল, 'তোমায় তো বলেছি, সে চাকরি ছেড়ে দিয়ে ধানবাদে চলে গেছে, সেখানে পাঁচ টাকা মাইনে বেশি পাবে নাকি। আমরা অফিসের সব মেয়েরা অনেক করে বললাম, কিছুতেই থাকলো না। বললে,—এ মাইনেতে আর কুলোতে পারছিনে।'

সুধা সেনকে অনেক কষ্টে বাসা যোগাড় করে দিয়েছিলাম, ওইটুকুই শুধু মনে ছিল। কিন্তু পাঁচ টাকা বেশি মাইনের লোভে কলকাতার বাসা সে ত্যাগ করবে, তা আগে জানলে সেদিন অত কষ্ট স্বীকার করতাম কিনা সন্দেহ।

কিন্তু আমার বন্ধু সুবোধ রায়ের ও-সব সমস্যা নেই। বছরের মধ্যে বার-দুই-তিন কলকাতায় আসতে হয় সুবোধ রায়কে এবং বরাবর কলকাতার নাম-করা হোটেলেই এসে ওঠে। সেখানে রুমের যত অভাবই হোক, সুবোধ রায়ের জন্যে সবচেয়ে ভালো ঘরটাই ব্যবস্থা করা হয়—তেতলার সবচেয়ে দামী দক্ষিণমুখো একটা ঘর। আলো-হাওয়া প্রচুর। ঘরের দক্ষিণমুখো ব্যাল্‌কনি থেকে সামনের পার্কটা দেখা যায় ; হু হু করে হাওয়া আসে দিন-রাত। দুটো ফ্যান। বাথরুম পাশেই। বাথরুমে গরম কলের-জলের ব্যবস্থা। শাওয়ার বাথ্‌। মোজেয়িক-করা মেঝে। দুটো চাকর অনবরত অ্যাটেন্ড করে। হোটেলের সর্বোত্তম সুখ-সুবিধে ওই ঘরটাতেই আছে। তার জন্যে চার্জ যা করা হয়, কন্‌ট্রাক্‌টার সুবোধ রায়ের পক্ষে তা কিছুই না। ও-ঘরটার বিশেষ দরের জন্যে ওটা এমনিতে সাধারণত খালি পড়েই থাকে।

নিয়মমতো সিঁড়ি দিয়ে উঠে একেবারে তেতলায় চলে গেছি। ছুটির দিন দেখেই গেছি। কিন্তু নির্দিষ্ট ঘরটিতে এসে হঠাৎ বাধা পেতে হল।

'কাকে চাই, সাব্‌ ?'—একটা চাপরাসী উঠে দাঁড়াল।

'সুবোধ রায়। দিল্লী থেকে এসেছেন।'

'তিনি দোতলার কামরায় আছেন, ওখেনে খোঁজ করুন।' চাপরাসীটা বললে।

'এখানে তবে কে আছেন ?' আবার প্রশ্ন করলাম।

'মেমসাহেব।'

মেমসাহেব! যেন বিতাড়িত, অপমানিত বোধ করলাম। মনে হল—সুবোধ রায়কে তার চির-অধিকৃত ঘর থেকে যেন গলাধাক্কা দিয়ে বার করে দেওয়া হয়েছে।

নিচে গিয়েই দেখা হল। বললাম, 'একি! কী হল ? এ ঘরে ?'

সুবোধ রায়ের মুখের চেহারা দেখে বুঝলাম সে-ও কম বিরক্ত হয়নি।

সুবোধ বললে, 'কে একটা খুব বড়লোকের মেয়ে এসেছে—ওই ঘরেই আছে।'

'বাঙালী নাকি ?' জিগ্যেস করলাম।

'হ্যাঁ, বাঙালীই তো শুনেছি। দু'হাতে পয়সা খরচ করছে। চাকর-বাকর, চাপরাসী, আয়া সকলকে বকশিশ দিয়ে এরই মধ্যে হাত করে ফেলেছে। ভালো ভালো ডিশ্ যা-কিছু সব অর্ডার দিচ্ছে। সকালে ব্রেকফাস্টে ডিম একদিন বাসী ছিল বলে কমপ্লেন করেছে। শুধু তাই নয়, ব্রেকফাস্ট লাঞ্চ ডিনার কোনো কিছুতে একটুকু ত্রুটি ঘটলে নাকি অনর্থ ঘটাবে মেয়েটি। দু'চারজনের ইতিমধ্যে ফাইনও হয়ে গেছে। ম্যানেজার থেকে শুরু করে জমাদার পর্যন্ত সবাই সন্ত্রস্ত। এতটুকু ত্রুটি যাতে না ঘটে সেই দিকেই সকলের লক্ষ্য। গেটে দারোয়ান একদিন সেলাম করতে ভুলে গিয়েছিল বলে শাস্তিও নাকি হয়েছে তার। এখন হোটেলের মালিকের কানে যাতে না যায় সেই চেষ্টাই করছে ম্যানেজার ; নইলে যে-সব ত্রুটি এ-পর্যন্ত ঘটে গেছে তা তাঁর কানে গেলে ম্যানেজারের চাকরি নিয়ে টানাটানি পর্যন্ত হতে পারে।

আবার কেউ কেউ বলছে—'কোনো এক নেটিভ স্টেটের ছোটরানী লুকিয়ে এসে এখানে রয়েছে।'

সুবোধ বললে, 'মেয়েটাকে দেখিনি কখনও ভাই। বিয়ে হয়েছে কি হয়নি জানিনে—তবে খায় খুব—সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই দেখতে পাই সিঁড়ি দিয়ে ওয়েটাররা ডিশের পর ডিশ্ নিয়ে যাচ্ছে। ডিনারেও তিনটে কোর্সে কুলোয় না।'

অনেকদিন আগেকার সুধা সেনকে মনে পড়লো। সুধা সেন খেত না। খাবার জায়গাও ছিল না বটে, তা ছাড়া পয়সাও ছিল না সুধা সেনের। তারপর সেই রেস্তোরাঁর কেবিনে ঢুকে গোগ্রাসে খাওয়া ! সেদিন সুধা সেনের খাওয়া বড় বিশ্রী লেগেছিল মনে আছে।

দেখলাম হোটেলের চাকর-বাকররা যেন চঞ্চল হয়ে উঠেছে। বেশি গোলমাল না হয় কোথাও। ওপর থেকে নিচে পর্যন্ত সিঁড়ি ধোয়ামোছা—পরিষ্কার ঝক্‌ঝক্ তক্‌তক্ করছে। কয়েকটা পাম, অর্কিড আর ফুলগাছের টব দিয়ে সাজিয়েছে সারা বাড়িটা। কে এসেছে যে তার জন্যে এত ব্যস্ততা, এত আয়োজন !

সুবোধ রায়ের সঙ্গে দেখা করতে দু'চারদিন গিয়েছি, কিন্তু সেইদিনই প্রথম দেখা হয়ে গেল। দেখে অবাক হলাম। দারার কাটা মুণ্ড দেখে সাজাহানও এত বিস্মিত হয়েছিলেন কিনা সন্দেহ !

সুধা সেন !

পেছনে পেছনে দুটো ওয়েটার চলেছে সুধা সেনের। সিঁড়ির আশেপাশে যারা ছিল তারা উঠে দাঁড়িয়ে সেলাম করতে ব্যস্ত!

একনিমেষে নিজেকে আড়াল করে নিয়েছি। বিস্ময়ের আর অবধি ছিল না আমার। সেই সুধা সেন! সেই কৃশ মেয়ে! উপোস করে না-খেয়ে-খেয়ে পয়সা বাঁচায়! সারা শহর খুঁজে বেড়ায় একটু আশ্রয়ের জন্যে। বড়দার বাড়িতে রাত বারোটার পর গিয়ে লুকিয়ে শুয়ে পড়ে, আর স্নান করতে যায় ছোড়দার মেসবাড়িতে। একবার মনে হল ভুল দেখছি না তো! সমস্ত যেন কেমন তালগোল পাকিয়ে গোলমাল হয়ে গেল।

পরদিনই বৌদির বাড়িতে গেলাম।

এ-কথা সে-কথার পর বললাম, 'তোমার সেই সুধা সেনের খবর কি বৌদি?'

বৌদি বললে, 'হঠাৎ সুধা সেনের কথা জিগ্যেস করছো যে?'

বললাম, 'না, এমনি আজ ট্রামে সুধা সেনের মতো একটা মেয়েকে দেখলাম কিনা, সেবার বলেছিলে তো যে ধানবাদে গেছে সুধা সেন। পশ্চিমে গিয়ে মোটা-সোটা হল? খবর পেয়েছ কিছু?'

বৌদি খবর দিতে পারলে না। বুঝলাম সুধা সেন কাউকেই খবর দেয়নি কিছু।

দিন সাত-আট পরে একদিন সন্ধ্যেবেলা সেই হোটেলে ঢুকছি এমন সময়ে সামনেই দেখি সুধা সেন। কিন্তু আমি এড়িয়ে যাবার আগেই সুধা সেন আমায় দেখে ফেলেছে।

আমাকে দেখে সুধা সেন যেন আকাশ থেকে পড়লো। চারদিকে চাকর-বাকর চাপরাসীর ভিড়। সবাই বকশিশ পাবার জন্যে ব্যস্ত। সুধা সেনকে দেখে মনে হল যেন সে হোটেল ছেড়ে আজ চলে যাচ্ছে। সুটকেস বিছানা বাক্স সব সামনে নামিয়েছে। ট্যাক্সি হাজির।

সুধা সেন সকলকে বকশিশ দিয়ে একপাশে সরে এসে চুপি-চুপি বললে, 'আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, ভালোই হল। আপনার সঙ্গে আমার বিশেষ একটা দরকার আছে।'

তারপর সুধা সেন মালপত্র ঠিক আছে কিনা দেখে নিয়ে বললে, 'আসুন।'—

সুধা সেন গিয়ে ট্যাক্সিতে উঠলো। আমিও পেছন পেছন গিয়ে উঠলাম। কে জানে কোথায় আবার যাবে সুধা সেন! বৌদির কথাটা মনে পড়লো। সুধা সেন সত্যিই কি ব্যালেন্স হারিয়ে ফেলেছে, না, যুদ্ধের কল্যাণে কোনো অজ্ঞাত কারণে অনেক টাকা তার হাতে এসে পড়েছে, কে বলতে পারে!

ট্যাক্সি চলতে শুরু করতেই সুধা সেন আমার দিকে চেয়ে বললে, 'আমাকে আপনি বাঁচান!'

আমি বিস্মিত হয়ে তার মুখের দিকে চাইলাম। কিছু বুঝতে পারলাম না কী সে চাইছে।

সুধা সেন আবার বললে, 'একটা রাতের জন্যে আমার একটা থাকবার ব্যবস্থা করে দিন, আমি একেবারে নিরাশ্রয়।'

তবুও যেন কিছু বুঝতে পারছিলাম না! তবে এই ঐশ্বর্য, এই বকশিশ দেওয়ার বহর, এই হোটেলের সবচেয়ে সেরা ঘর নিয়ে থাকা, এই ব্রেকফাস্ট লাঞ্চ ডিনার···

সুধা সেন বললে, 'আপনাকে আমি সব খুলেই বলছি, আমায় বিশ্বাস করুন। আমার কাছে আর একটা টাকাও নাই। এতদিন না-খেয়ে-খেয়ে যা কিছু টাকা জমিয়েছিলাম, সব নিঃশেষ হয়ে গেছে। আমি আবার আজ নিরাশ্রয়। এই ট্যাক্সি ভাড়া করেছি বটে, কিন্তু কোথায় যাব কিছুরই ঠিক নেই!'

আমার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হয়েছে। আমি প্রাণশূন্য দৃষ্টি দিয়ে সুধা সেনের দিকে চেয়ে রয়েছি। আমি কি আবার সুধা সেনের জন্যে আশ্রয় খুঁজতে চলেছি! আবার সেই হোস্টেল, মেস আর বোর্ডিং-এর দরজায় দরজায় বে-হিসেবী সুধা সেনের জন্যে ধর্না দিতে চলেছি! তারপর এই ট্যাক্সি-ভাড়া, তা-ও কি আবার আমাকেই দিতে হবে!

সুধা সেন তার কাঠির মতো আঙুল দিয়ে আমার হাতটা চেপে ধরলে: 'আপনাকে একটা জায়গা খুঁজে দিতেই হবে আমার জন্যে! আপনি যে সেই বলেছিলেন আপনার কোন্ এক বন্ধু আছে—চলুন না এখন তার ওখানে—যদি থাকতে দেয়।'

সেদিন বলেছিলাম বটে। কিন্তু সুখেন্দুর বাড়ি তো এখানে নয়। বেল-গাছিয়ার একেবারে শেষপ্রান্তে সে-বাড়ি। তা ছাড়া তার এক দিদির একপাল ছেলেমেয়ে নিয়ে আসবার কথা ছিল। যদি তারা এসে থাকে, তাহলে কি আর জায়গা পাওয়া যাবে সেখানে! রাগে দুঃখে ধিক্কারে আমার সমস্ত মন বিষিয়ে উঠলো।

সুধা সেনের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললাম, 'আচ্ছা চলুন, দেখি—'

ট্যাক্সি চললো। হাওয়ার মতো উড়িয়ে চললো। সুধা সেনের চুলগুলো উড়ে পড়ছে তার কালো মুখের ওপর। কে জানে কোথায় এ-যাত্রার শেষ! শেষ পর্যন্ত আশ্রয় আজ মিলবে কিনা ঠিক কী! কলেজ স্ট্রীট, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট পেরিয়ে ডান দিকে চললো ট্যাক্সি। বেলগাছিয়ার পুল পেরিয়ে আরো ভেতরে গিয়ে গাড়ি দাঁড়াল গলির সামনে।

গাড়ি থেকে নেমে বললাম, 'আপনি বসুন, আমি দেখে আসছি।'

অন্ধকার গলি। গলির শেষপ্রান্তে বাড়িটা। রাত তখন বেশি হয়নি। নির্দিষ্ট বাড়িটার সামনে আসতেই বাড়ির ভেতর থেকে ছোট ছেলেমেয়েদের

কলরোল কানে এলো। এ বাড়িতে তো ছোট ছেলেমেয়েদের বালাই ছিল না। তবে কি সুখেন্দুর দিদি শ্বশুরবাড়ি থেকে এসেছে নাকি! ডাকবো কিনা ভাবছি। যদি সুধা সেনের উপকার হয়। কিন্তু মনটা আমার বিষিয়ে উঠলো। বে-হিসেবী সুধা সেনের পরিচয় তো আমি ভালো করেই পেয়েছি। বন্ধুকে আর ডাকলাম না। গলির এপ্রান্তে ট্যাক্সির কাছে আর ফিরেও এলাম না। ওপ্রান্ত দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে পড়লাম আর একটা সমান্তরাল বড় রাস্তায়। তারপর কোনো দিকে দৃষ্টিপাত না করে ওদিক দিয়ে ঘুরে গিয়ে উঠে পড়লাম ধর্মতলার ট্রামে। তারপর চলন্ত ট্রামের জনবহুল একটি কোণে নিজেকে আড়ালে রেখে নিশ্চিন্তে দাঁড়িয়ে রইলাম। থাক্ সুধা সেন ট্যাক্সিতে বসে। ট্যাক্সির ভাড়া যদি না দিতে পারে তাতে আমার কি আসে যায়! সুধা সেন প্রতীক্ষমাণ ট্যাক্সিতে বসে মুহূর্তের পদধ্বনি শুনতে থাক্, আমি ততক্ষণে বাড়িতে পৌঁছে গিয়ে নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে নিবিড় ঘুমের মধ্যে গা গড়িয়ে দেব। আমার এত কিসের ভাবনা সুধা সেনের জন্যে!

কয়েকদিন পরে বৌদিকে সুধা সেনের কথা জিগ্যেস করতেই বৌদি বললে,—একদিন নাকি হঠাৎ রাত বারোটার সময় সুধা সেন ট্যাক্সি করে বৌদিব বাড়িতে এসে হাজির। সে-রাতটা বৌদির বাড়ির সিঁড়ির ঘরের ভেতর কাটিয়ে সকালবেলাই চলে গেছে আবার—কোথায় চলে গেছে বলে যায়নি। সুধা সেনের চাকরিও চলে গেছে অফিস থেকে।

সুধা সেন! ভাবলেই সুধা সেনের চেহারাটার কথা মনে পড়ে। সেই কৃশ স্বাস্থ্যহীন চেহারা, নিষ্প্রভ দৃষ্টি, হয়তো কলকাতা শহরের জনতার ভিড়ে মিশে গেছে আবার। নয়তো ফিরে চলে গেছে দেশে—মা'র নিশ্চিন্ত নির্ভয় আশ্রয়ের নীড়ে। শহরের অশান্ত প্রতিযোগিতার ক্লান্তি থেকে অনেক দূরে—যেখানে অবারিত মাঠ, দিগন্ত-বিসারী আকাশ, আর স্নেহকোমল ছায়া-নিবিড় নীড়। চারটে দেয়াল আর একটা ছাদের আবরণে সেখানে শরীর কৃশ আর আয়ু ক্ষীণ হয়ে আসে না। সুধা সেন সত্যি-সত্যি আবার সেইখানেই ফিরে গেছে কিনা কে বলতে পারে!

মিষ্টিদিদি

মিষ্টিদিদি আমার আপন দিদিও নয়, দূরসম্পর্কের দিদিও নয়।

তবু মিষ্টিদিদি ছিল বুঝি আমার আপন দিদির চেয়েও বড়। বলতো, 'যে-ক'টা দিন বেঁচে আছি, তুই আমার কাছে থাক্, জানিস?'

মিষ্টিদিদি সময় পেলেই চুপচাপ শুয়ে থাকতো। পাতলা পলকা শরীর, ধবধবে রং। ফিনফিনে সিল্কের শাড়ি গায়ের ওপর থেকে খসে খসে পড়তো। ইজি-চেয়ার থেকে উঠে গিয়ে স্প্রিং-এর খাটে শুতো একবার, তারপর হয়তো তখনি আবার উঠে গিয়ে বসতো বাগানের দোলনায়। তারপরেই হয়তো খেয়াল হল—আর তখুনি গাড়িটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল গঙ্গার ধারে।

জামাইবাবু আমাকে দেখিয়ে বলতো, 'ওকে সঙ্গে নিয়ো মিষ্টি—কোথাও যদি হঠাৎ টলে পড়ে যাও, তখন—'

মিষ্টিদিদিও মাঝে মাঝে বলতো, 'তোদের সবাইকে খুব কষ্ট দিচ্ছি রে আমি—'

আমি বলতাম, 'বাঃ, কষ্ট কিসের!'

মিষ্টিদিদি বলতো, 'না, তোর জামাইবাবুর দেখ্ তো, কখনও কোনো অসুখ হতে দেখিনি। আমার জন্যেই তো কোথাও যেতে পারে না, আমার জন্যেই তো এত চাকর-বাকর রাখা। শঙ্করকেও দূরে পাঠাতে হল তো শুধু আমার শরীরের জন্যেই।'

মিষ্টিদিদির ঝি অবশ্য থাকতো সঙ্গে। মিষ্টিদিদির সঙ্গে দিনরাত পালা করে একটা-না-একটা ঝি থাকেই। রাত্রে যদি মিষ্টিদিদির ঘুম না আসে, ওই একজন ঝি পায়ে হাত বুলোতে বুলোতে ঘুম পাড়াবে। শাড়ি যদি কাঁধ থেকে হঠাৎ খসে যায় মিষ্টিদিদির, তো একজন ঝি কাপড়টা তুলে দেবে যথাস্থানে। খেয়ালের তো অন্ত নেই মিষ্টিদিদির। কখন কী খেয়াল হবে মিষ্টিদিদি তা নিজেও বলতে পারে না আগে থেকে। হয়তো রাত্তির দশটার সময়েই মিষ্টিদিদির তপ্সে মাছ ভাজা খেতে ইচ্ছে হতে পারে। আশ্বিন মাসের দুপুরবেলাতেই ল্যাংড়া আম খেতে ইচ্ছে হতে পারে। জামাইবাবু হয়তো তখন অফিসে যাচ্ছে, মিষ্টিদিদি বললে, 'আমার বুকটা কেমন করছে, তুমি আজ কোথাও যেয়ো না গো!'

জামাইবাবু তখন কোটপ্যান্ট পরে তৈরি। নিচে গাড়ি স্টার্ট দিয়েছে। বললে, 'আমার যে আজ একটা জরুরী কাজ ছিল।'

মিষ্টিদিদি বলতো, 'তা বলে কাজটাই তোমার বড় হল?'

জামাইবাবু কেমন যেন অপ্রস্তুত ব্যস্ততায় বলতো, 'আমি বরং গিয়ে ডাক্তার সান্যালকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

মিষ্টিদিদির পাতলা শরীর যেন কান্নার ফুলে ফুলে উঠতো। বলতো, 'আমি আর ক'দিন! আমি মরে গেলে তুমি যত খুশি কাজে বেরিয়ো-না, কাজ তো তোমার পালিয়ে যাচ্ছে না।'

সত্যিই তো তখন আমাদেরও মনে হত মিষ্টিদিদি আর ক'দিনই বা বাঁচবে। কলকাতার হার্ট-স্পেশালিস্টরা কেউ রোগ ধরতে পারতো না মিষ্টিদিদির। কতবার কলকাতার বাইরে থেকে ডাক্তার এসেছে। ভিয়েনা থেকে এসেছে। আমেরিকা থেকে এসেছে। জামাইবাবু মোটা মোটা টাকা দিয়ে সবরকম চিকিৎসা করিয়েছে। কেউ রোগ ধরতে পারেনি। কিন্তু একটা বিষয়ে সবাই একমত হয়ে বলে গেছে, রোগীর মনে কোনোরকম উত্তেজনা হতে দেওয়া উচিত নয়। একটু উত্তেজনা হলেই আর বাঁচানো যাবে না রোগীকে।

মিষ্টিদিদি বলতো, 'আমি মরে গেলে তুমি যেমন খুশি যেখানে ইচ্ছে ঘুরে বেড়িয়ো, আমি দেখতেও আসবো না। কিন্তু যে দুটো দিন বেঁচে আছি, আমাকে দয়া করে শান্তিতে বাঁচতে দাও।'

তা মিষ্টিদিদিকে শান্তিতে বাঁচতে দেবার জন্যে জামাইবাবুও কি কসুর করতো কিছু!

দুটো দিন—

অথচ 'দুটো দিন' 'দুটো দিন' করে কতদিন যে বেঁচে থাকবে মিষ্টিদিদি, আমি কেবল তাই ভাবতাম। তবে অপূর্ব স্বাস্থ্য বটে জামাইবাবুর। একটা দিনের জন্যে অসুখ করেনি, একদিন সর্দি হল না। চল্লিশ বছরের জামাইবাবুকে যেন পঁচিশ বছরের ছোকরা মনে হত দেখে। ভোরবেলা উঠতো। উঠে সামনের সমস্ত বাগানটা জোরে জোরে হেঁটে নিত দশ-পঁচিশ বার। একদিনও শুনিনি যে জামাইবাবুর মাথা ধরেছে। কখনও ডাক্তারের কাছে সঁপে দিতে হয়নি নিজেকে। কবে যে ওষুধ খেয়েছে তা মনেই পড়ে না জামাইবাবুর। এমনি অটুট স্বাস্থ্য। এমনি আঁট শরীর।

কিন্তু তবু জামাইবাবুকে গঞ্জনা শুনতে হত মিষ্টিদিদির কাছে।

রবিবার। খাবার টেবিলে হয়তো সবাই খেতে বসেছি। জামাইবাবুও খাচ্ছে একমনে।

মিষ্টিদিদি বললে, 'ওমা, ওই অতগুলো মাংস তুমি সত্যি-সত্যি খাবে নাকি?'

কেমন যেন লজ্জিত হয়ে পড়ল জামাইবাবু। কী বলবে যেন ভেবে পেলে না। তারপর মাংসের প্লেটটা পাশে ঠেলে দিয়ে বললে, 'তাইতো, আমাকে বড্ড বেশি মাংস দিয়েছে দেখছি ঠাকুর।'

মিষ্টিদিদিকে আমি লক্ষ্য করেছি তখন। ঝাল ডাঁটা-চচ্চড়ি একরাশ নিয়েছে পাতে। বার বার চেয়ে-চেয়ে ভাতও নিয়েছে এক হাঁড়ি। পোনা মাছের কালিয়ার সবটাও শেষ করে ফেলেছে! কাঁটাগুলো পর্যন্ত চিবিয়ে চিবিয়ে গুঁড়ো

করে ফেলেছে মিষ্টিদিদি। তারপর নিঃশব্দে কখন মাংসের প্লেটটা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুর আরো মাংস দিয়ে গেছে সেদিকে খেয়াল নেই। আমাদের দুজনের ডবল খেয়ে কখন শেষ করে হাত গুটিয়ে বসে বসে ডাঁটা চিবোচ্ছে মিষ্টিদিদি। জামাইবাবু লক্ষ্য না করুক, আমি তা করেছি।

তবু মিষ্টিদিদি ডাঁটা চিবোতে চিবোতে বললে, 'বেশি খেয়ো না বলে দিলাম, ওতে মানুষের স্বাস্থ্য ভালো থাকে না।'

জামাইবাবু বললে, 'কই, আমি তো বেশি খাইনি।'

মিষ্টিদিদি বললে, 'এক এক জনের ধারণা, একগাদা খেলেই বুঝি শরীর ভালো থাকে। ওটা ভুল।'

জামাইবাবু বললে, 'নিশ্চয়।'

এমন সময় ঠাকুর বললে, 'মা, আমড়ার চাটনি করেছিলুম, দিতে ভুলে গেছি।'

মিষ্টিদিদি বললে, 'ভুলে গেছ ভালোই হয়েছে—ওঁকে আর দিয়ো না। আমার এই প্লেটে বরং একটুখানি দাও, কেমন রেঁধেছ চেখে দেখি।' তারপর আমার দিকে চেয়ে বললে, 'তুই নিবিনাকি একটু?'

বললাম, 'তা দিক্ একটুখানি।'

মিষ্টিদিদি বললে, 'না না, থাক্ তোকে আর নিতে হবে না। এই বয়েস থেকে বেশি খাওয়া অভ্যেস করিসনে তোর জামাইবাবুর মতো। পেট ভরে খাবি না কখনও, এই বলে রাখলুম। একটু খালি রেখে খেতে হয়।'

তা ঠাকুর শুধু আমড়ার অম্বলই দিলে না। পুরনো ঠাকুর জানে সব! শুধু অম্বল মিষ্টিদিদি খেতে পারে না। সঙ্গে দুটি ভাত চাই। ঠাকুর ভাতও এনে দিলে মিষ্টিদিদিকে।

ঠাকুর বললে, 'আর দুটো ভাত দেবো, মা?'

তখন সব ভাত নিঃশেষ হয়ে গেছে। মিষ্টিদিদি বললে, 'না না, পাগল হয়েছ ঠাকুর। একে দেখছ আমার শরীর খারাপ—আমাকে কি তুমি খাইয়ে-খাইয়ে মেরে ফেলতে চাও নাকি!'

কী জানি আমার কেমন জামাইবাবুকে দেখে মনে হত তার যেন পেট ভরেনি। এক গ্লাস জল ঢকঢক করে খেয়ে উঠে পড়তো জামাইবাবু।

মিষ্টিদিদি বলতো, 'খেয়ে উঠে যেন এখনি আবার শুয়ো না গিয়ে ঘরে।'

'না না, শোব কেন, এখন আমার কত কাজ।'

মিষ্টিদিদি বলতো, 'না, তোমার ভালোর জন্যেই বলছি, খেয়ে উঠে শুলেই যত অম্বল আর চোঁয়া ঢেকুরের উৎপাত।'

জামাইবাবু তারপর নিজের ঘরে চলে যেত। আর মিষ্টিদিদির তখন নিজের স্প্রিং-এর খাটে শুয়ে থাকবার পালা। বলতো, 'আমার যে কী কপাল! ইচ্ছে

না হলেও মটকা মেরে পড়ে থাকতে হবে বিছানায়।'

সেবার জামাইবাবুর একটা মস্ত প্রমোশন হল আপিসে। শুধু প্রমোশন নয়। সমাজে, পাড়ায়, অফিসে সর্বত্র সেটা হিংসে উদ্রেক করার মতো প্রমোশন। অর্থবান মানুষ জামাইবাবু। একসঙ্গে দু'তিনখানা গাড়ি রাখবার মতন অবস্থা। ব্যাঙ্কের আর্থিক স্ফীতিটাও উল্লেখযোগ্য। অথচ সমস্ত নিজের চেষ্টায়। অল্প অবস্থা থেকে শুধু কর্তব্যনিষ্ঠা আর পুরুষকারের জোরে বাড়ি গাড়ি আর মিষ্টিদিদির মালিক হতে পেরেছে।

বিয়ের আগে মিষ্টিদিদিকে চিনতাম না। তবে শুনেছি মিষ্টিদিদির কথা।

মা বলতো, 'সে রীতিমতো লড়াই বেধে গিয়েছিল মিষ্টির বিয়ের সময়ে। পটল বলে, আমি বিয়ে করবো, চাইবাসার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট অরুণ বললে, আমি বিয়ে করবো—দিনরাত মনোহরদার বাড়ি দশ-বিশটা ছেলের ভিড়—টেনিস খেলা চলে ওদের, আর মিষ্টি বাগানে একটা বেতের চেয়ারে বসে বসে খেলা দেখতো।'

আমি জিগ্যেস করতাম, 'মিষ্টিদিদি খেলতো না, মা?'

'হ্যাঁ, ও আবার খেলবে কী! ও তো কেবল ওর শরীর নিয়েই ব্যস্ত। ওর জন্যে মনোহরদা পর্যন্ত ফতুর হয়ে গেল শেষ পর্যন্ত, কেবল ডাক্তার আর ওষুধ —কী যে রোগ কেউ বলতে পারে না, বিশ্রাম নিতে হবে। ওই মেয়েকে নিয়ে মনোহরদাকে কি কম ভুগতে হয়েছে! শেষে মনোহরদা সকলকে ডেকে বললে— আমার মেয়েকে যে বিয়ে করবে তাকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে, মেয়েকে কখনও খাটাবে না, কখনও কাজ করাতে পারবে না। ভালো ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা করাতে হবে যেমন আমি করছি। শুনে সবাই রাজী, বড় বড় লোকের ছেলে সব—বড় বড় চাকরি করে, হাজার দেড়-দুই টাকা করে সব মাইনে পায়। শুনে আমরা তো চাইবাসার মেয়েরা সব হেসে বাঁচিনে! ওই তো পাতলা হাড়-জিরজিরে চেহারা, ক'দিন আর বাঁচবে, একটা ছেলে হলেই হাড্ডিসার হয়ে যাবে—তা কী যে সব আজকালকার ছেলেদের পছন্দ জানিনে মা, সবাই বলে রাজী।'

বাবা বলতেন, 'তা রোগা হওয়াই তো ভালো, খাবে কম!'

মা বলতো, 'হ্যাঁ, খাবে নাকি কম, কথা শোনো, দিনরাতই যে খাচ্ছে কেবল, কী করে হজম করে মা, কে জানে! মনোহরদা তো ওই মেয়ের জন্যেই দেউলে হয়ে গেল শেষকালে, কাঠের ব্যবসা ছিল মনোহরদার। তা মেয়ের খাওয়ার জ্বালায় দেনা হল চারদিকে। সকাল থেকে উঠেই মেয়ের খাওয়া। মুখে একটা-না-একটা কিছু লেগেই আছে। চকোলেট, বিস্কুট, লজেঞ্জ, মাংস, মাছ, শাক, খাদ্য-অখাদ্য কিছু তো আর বাদ নেই!

বাবা বলতেন, 'তা যদি হজম করতে পারে, ক্ষতি কী?'

মা বলতো, 'তুমি আর ঠেস দিয়ে কথা বোলো না বাপু, এই তো এতদিন এসেছি তোমার সংসারে, কেউ বলুক দিকিনি আমার জন্যে ক'টা পয়সা তোমার

খরচ হয়েছে ডাক্তারের পেছনে ?'

বাবা হেসে উঠতেন হো-হো করে। আর মা থেমে যেতো গম্ভীর হয়ে।

আমি বাধা দিয়ে বলতাম, 'মা, তারপর কী হল ?'

মা বললে, 'তা, তারপরই গোল বাধলো। সবাই যখন রাজী তখন মনোহরদা উপায় না দেখে বললে,—মিষ্টি যাকে বেছে নেবে তার সঙ্গেই ওর বিয়ে দেব। তা ওদের মধ্যে পটলই ছিল সবচেয়ে মজবুত, দৌড়তে পারতো, কম বয়েস, নিজের চেষ্টায় মানুষ হয়েছে, কুস্তি করা চেহারা। মিষ্টির বরাবর রাগ ছিল পটলের ওপরে—'

জিগ্যেস করলাম, 'রাগ ছিল কেন, মা ?'

'তা, রাগ থাকবে না ? মিষ্টি নিজে হাওয়ায় উড়ে যায়, একটু কাজ করলে মাথা ঘোরে, ঘুম না পাড়ালে ঘুম আসে না, তার চোখের সামনে অত মজবুত চেহারার মানুষকে ভালো লাগবে কেন ? তা মিষ্টি শেষ পর্যন্ত পটলকেই বিয়ে করতে রাজী হল।'

এসব ছোটবেলায় মা'র কাছে গল্প শুনেছিলাম। তারপর যখন ম্যাট্রিক পাস করে কলকাতায় পড়বার কথা হল, তখন পটল-জামাইবাবুই লিখলে, 'ওকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিন, এখানে থেকেই লেখাপড়া করবে ও, কোনো অসুবিধে হবে না।'

আসবার সময় মা বলে দিয়েছিল, 'বাড়িতে যেন বেশি গোলমাল কোরো না বাবা—একটি মাত্র ছেলে শংকর, তাকে পর্যন্ত কাছে রাখেনি পটল, পাছে মিষ্টির শরীর খারাপ হয়—'

আমি যখন মিষ্টিদিদির বাড়িতে প্রথম এলাম, তখন শংকর থাকতো দেরাদুনে। হাঙ্গারফোর্ড স্ট্রীটে বাড়ি করার পেছনেও ওই সেই একই কারণ। এ-পাড়ার অধিকাংশ অধিবাসী সাহেব-সুবো। বিরাট দশ বিঘে জমির ওপর বাড়ি। ঘন গাছপালা। বাড়ি থেকে রাস্তা বা পাশের বাড়ি পর্যন্ত দেখা যায় না। কোনোরকম শব্দ আসে না এখানে। নিঝুম নির্জন-আবহাওয়া। শুধু এক এক বার এক-একটা পাখির ডাক দুপুরবেলার শান্তি ভঙ্গ করে। শংকর যখন জন্মাল, সেই প্রথম দিনটি থেকে তার ভার নিয়েছিল নার্স। দিনের মধ্যে এক-এক বার মাত্র কিছুক্ষণের জন্যে মিষ্টিদিদির কোলে রাখা হত। কিন্তু জামাইবাবুর হুকুম ছিল—শংকর কাঁদলেই দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে, একেবারে মিষ্টিদিদির কানের এলাকার বাইরে। ভয় ছিল, ছেলের কান্না শুনলেই মিষ্টিদিদির হার্ট-ফেল হতে পারে। মিষ্টিদিদি যদি থাকতো দক্ষিণের ঘরে, শংকরকে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে একেবারে সুদূর উত্তরে। হয়তো একেবারে বাগান পেরিয়ে ওদিকের মালীদের ঘরে। যেখানে ছেলে ককিয়ে কাঁদলেও মিষ্টিদিদির স্বাস্থ্যহানির আশংকা নেই। সেই ছেলে ক্রমে একবছর বয়সের হল। দু'বছরের হল। বড় জ্বালাতন করতে লাগলো তখন ; হুড়মুড় করে দৌড়ে বেড়ায়, কান ঝালাপালা হয়ে যেত। সেই গোলমালে

একদিন মিষ্টিদিদি হার্ট-ফেল করে আর কি ! ভীষণ অবস্থা। ডাক্তার এলো। নার্স এলো। অক্সিজেন গ্যাস এলো। জামাইবাবু দু'রাত ঘুমোলো না।

অনেক কষ্টে অনেক অর্থব্যয়ে, ডাক্তার সান্যালের অনেক চেষ্টায় সে-যাত্রা টিকে গেল মিষ্টিদিদি ! কিন্তু জামাইবাবু আর দায়িত্ব নিলে না। শেষকালে কী হতে কী সর্বনাশ হয়ে যাবে !

মিষ্টিদিদি সেরে ওঠার পর জামাইবাবু বললে, 'শঙ্করকে আমি দেরাদুনে পাঠিয়ে দিই, কী বলো ? ওখানে ওরা ট্রেনিংটা ভালো দেয়। আর ওরা যত্নও করে খুব ছোট ছোট ছেলেপিলেদের।'

মিষ্টিদিদি ছলছল চোখে বললে, 'কী কপাল দ্যাখো আমার, নিজের ছেলেকে পর্যন্ত কাছে রাখতে পারবো না, আদর করতে পারবো না !'

'তাতে কী হয়েছে, তুমি সেরে উঠলেই—'

মিষ্টিদিদি বলতো, 'আর সেরেছি, বেশিদিন আর নেই আমার বুঝতে পারছি, বড় জোর দিন পনরো—তারপর আমি মরে গেলে···, ওকে কিন্তু তুমি বাড়িতে নিয়ে এসে তোমার কাছে-কাছেই রেখো গো—'

তারপর কত পনরো দিন কেটে গেছে, পনরো বছর কাটতে চললো, কিন্তু কিছুই হয়নি মিষ্টিদিদির। প্লেট-প্লেট মাংস খেয়েছে, বাটি-বাটি আমড়ার অম্বল খেয়েছে, ঝাল ডাঁটা-চচ্চড়ি খেয়েছে, পোনা মাছের কালিয়া খেয়েছে। দামী দামী বিস্কুট কেক্ লজেঞ্জ খেয়েছে, দামী দামী গাড়ি চড়েছে ! মিষ্টিদিদির শোবার ঘর এয়ারকন্ডিশন্‌ড্ করা হয়েছে। ওষুধ, বিশ্রাম, আরাম, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সব যুগিয়েছে জামাইবাবু। তবু অসুখ সারেনি মিষ্টিদিদির।

অথচ কত সাবধানতা, কত সতর্কতা মিষ্টিদিদির জীবনের জন্যে। পাশের গাছের ডালে একটা কাক পর্যন্ত ডাকলে বুক ধড়ফড় করতো মিষ্টিদিদির ! হাঁ-হাঁ করে তাড়িয়ে দিতে হত। ঝড়বৃষ্টির দিনে যদি জোরে মেঘ ডেকে উঠতো তো আপিস থেকে টেলিফোনে খবর নিতো জামাইবাবু—মিষ্টি কেমন আছে। খবরের কাগজটা আগে নিজে পড়ে তবে জামাইবাবু পড়তে দিতো মিষ্টিদিদিকে। অনেক খুন-জখমের খবর থাকে ওতে। সে-সব পড়ে যে-কোন মুহূর্তে হার্ট-ফেল হতে পারে। কতবার কত প্রমোশনের সুযোগ এলো জামাইবাবুর। এমন সচরাচর আসে না কারোর। উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জে গেলে মাইনে হত পাঁচহাজার টাকা। ওখানকার মাটির তলায় খনির সম্বন্ধে গবেষণা করতে জামাইবাবুকেই পাঠানো ঠিক করলো ইন্ডিয়া গবর্নমেন্ট। মাইনে ছাড়া টি-এ আছে অনেক।

কিন্তু প্রত্যেকবার মিষ্টিদিদি বলেছে, 'আর দু'টো দিন আমার জন্যে সবুর করো, আর বেশিদিন কষ্ট দেব না তোমাদের।'

অপ্রস্তুত হয়ে গেছে জামাইবাবু।

'আর দুটো দিন, শুধু দু'দিন, তার পরে তোমাকে আমি মুক্তি দিয়ে যাব—

তখন তুমি যেখানে খুশি যেয়ো।'

এসব আজ থেকে প্রায় পনরো-বিশ বছর আগেকার ঘটনা। কিন্তু সেই অল্প বয়েসেও আমার যেন কেমন সন্দেহ হয়েছে, এ ধাপ্পাবাজি ছাড়া আর কিছু নয়। বড় স্বার্থপর মনে হয়েছে মিষ্টিদিদিকে। এই আরাম, এই বিশ্রাম, এই অর্থ-অপচয়, বিলাসিতা থেকে পাছে বঞ্চিত হয়, পাছে পরিশ্রম করতে হয় মিষ্টি-দিদিকে—তাই যেন এই ছলনা।

শঙ্কর যখন পুজোর আর গরমের ছুটিতে আসতো বাড়িতে, জামাইবাবু যেন কেমন সন্ত্রস্ত হয়ে উঠতো। বলতো, 'ওদিকে যেয়ো না শঙ্কর, তোমার মা'র শরীর খারাপ, জানো তো—'

শঙ্করও যেন কেমন বিব্রত হত। ও-বয়সের ছেলেদের স্বাভাবিক ধর্ম হৈ-চৈ করা, খেলা, চিৎকার করা। কিন্তু পদে পদে বাধা পেয়ে পেয়ে কেমন যেন ম্রিয়মাণ হয়ে গিয়েছিল শেষকালে। যেন কলকাতায় আসতে ভালো লাগত না তার। আবার স্কুলে ফিরে যাবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠতো। কেবল বলতো, 'কবে যে ছুটি ফুরোবে!'

মনে আছে একবার বলেছিল, 'এখানে আমার বড় মন-মরা লাগে, ভালো লাগে না মোটে।'

'কেন!'

শঙ্কর বলেছিল, 'কী জানি।'

আপন যারা, তারা এত কম বয়সে পর হয়ে যায় কেমন করে তা ভেবে আমারও অবাক্ লাগতো। আমারও মা ছিল। যখন ছুটিতে বাড়ি গেছি, সে অন্য-রকম। আমাকে আদর করবার জন্যে কতরকম আয়োজন—কত রান্না, কত কী উৎসব আনন্দ হত। আর এ-ও তো মিষ্টিদিদির ছেলে! বড়লোকের ছেলে। আরো আনন্দ হওয়া উচিত বৈকি।

কিন্তু হঠাৎ যদি কখনও ভুলে হো-হো করে হেসে উঠতো, কোথা থেকে ঝি এসে বলতো, 'চুপ করো খোকাবাবু, মার বুক কেমন করছে।'

মায়ের ঘরের দিকে অন্যমনস্ক হয়ে যদি শঙ্কর কোনদিন ঢুকে পড়তো, অম্‌নি দশজন ঝি-চাকর হাঁ হাঁ করে উঠতো, 'এদিকে না—এদিকে না—'

বাড়িটা যেন হাসপাতাল। অথচ যে রোগী সে দিব্যি ঘুরে বেড়ায় খায় দায়, সাজ-পোশাক করে। মিষ্টিদিদি বিকেলবেলা স্নান করে। স্নানের শেষে এসে বসে আয়নার সামনে। দুজন ঝি আসে এগিয়ে। তখন বেরোয় রুজ, লিপস্টিক, তেল, সেন্ট, পাউডার—আরো কত কি! ভালো ভালো পোশাকী শাড়ি বেরোয়। ব্লাউজ বেরোয়। আলতা বেরোয়। একঘণ্টা ধরে সাজিয়ে-গুজিয়ে ফিটফাট করে দেয়। তারপর ইজি-চেয়ারটা বারান্দার সামনে রেলিং-এর গা ঘেঁষে রাখা হয়। সেই সাজ, সেই পোশাক পরে মিষ্টিদিদি তখন আস্তে আস্তে ইজি-চেয়ারে

গিয়ে বসে। কোনো কথা নেই, কোনো কাজ নেই—শুধু বসে থাকা, আলস্যের ঢেউয়ে গা এলিয়ে দেওয়া। এত আলস্য যে কী করে সহ্য করে মিষ্টিদিদি, কে জানে। কিন্তু সবাই ভাবতুম—আর তো মাত্র দুটো দিন, হয়তো আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা,—তারপরেই তো শেষ!

ছুটির সময় দেশে গেলে মা সব শুনে বলতো, 'ও মেয়ে মনোহরদাকেও অমনি করে জ্বালিয়েছে, ও পটলকেও জ্বালিয়ে ছাড়বে, দেখিস।'

কিন্তু জামাইবাবুর অদ্ভুত ধৈর্য। স্ত্রীর জন্যে হাসিমুখে এমন আর্থিক, শারীরিক, মানসিক ক্ষতি স্বীকার করতে আর কাউকে দেখিনি আমি। অথচ স্ত্রৈণ বলবো কেমন করে! কোথায় যেন মিষ্টিদিদির ব্যবহারে কিংবা চেহারায় একটা যাদু ছিল।

রোজই সকালবেলা জামাইবাবু একবার করে মিষ্টিদিদিকে জিগ্যেস করতো, 'আজ কী খাবে তুমি? কী খেতে ইচ্ছে করছে তোমার?'

মিষ্টিদিদি কোনদিন বলতো, 'আজকে ফাউল-আনতে বলে দাও ঠাকুরকে—'

কোনোদিন বলতো, 'আজ মাটন্—'

আবার কোনোদিন বলতো, 'আজ টোস্ট আর ফাউল কাট্‌লেট করতে বলো ঠাকুরকে।'

কোনো কোনো দিন আবার বলতো, 'চলো আজ হোটেলে গিয়ে খেয়ে আসি, বাড়ির রান্না আর ভালো লাগছে না।

এমন কোনোদিন হল না যেদিন মিষ্টিদিদি বলেছে,—আজ শরীরটা খারাপ, কিছু খাবো না।'

জামাইবাবু যদি কোনোদিন বলতো, 'এত শীতে আর না-ই বা বেরোলে, যদি ঠাণ্ডা লেগে যায়?'

মিষ্টিদিদি বলতো, 'আর তো মাত্র ক'টা দিন—যে ক'দিন বাঁচি করে নিই।'

তা এসব হল পনরো-বিশ বছর আগের ঘটনা।

মিষ্টিদিদির বাড়িতে থেকে আই.এ. পাস করেছি, বি.এ. পাস করেছি—এম.এ. পাস করেছি। করে চাকরি-সূত্রে তখন বিলাসপুরে আছি। খবর পেয়েছিলাম, মিষ্টিদিদি তখনও বেঁচে আছে। একদিনের জন্যেও কখনও জ্বর হতে শুনিনি, একদিনও উপোস করতে শুনিনি। আর শুনেছি মিষ্টিদিদির জন্যে জামাইবাবু নিজের প্রমোশন, নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সমস্ত ত্যাগ করে হাঙ্গারফোর্ড স্ট্রীটের বাড়িতেই আছে।

কিন্তু হঠাৎ মা'র চিঠিতে সেবার জামাইবাবুর মৃত্যুর খবর শুনে চমকে উঠেছিলাম।

জামাইবাবুর তো কখনও অসুখ হতে দেখিনি। সে-মানুষ এমন হঠাৎ মারা গেল! জ্বর নয়, রোগশয্যায় দীর্ঘদিন পড়ে থাকা নয়, হঠাৎ নাকি হার্ট-ফেল

করেছে।

কিন্তু ভয় হয়েছিল মিষ্টিদিদির জন্যে।

মিষ্টিদিদি এ-শোক কেমন করে সহ্য করবে কে জানে! জামাইবাবুর মৃত্যুর খবর শোনা-মাত্রই তো মিষ্টিদিদির হার্ট-ফেল করার কথা!

সমবেদনা জানিয়ে মিষ্টিদিদিকে একখানা চিঠিও দিয়েছিলাম মনে আছে। কিন্তু সে-চিঠির কোনো উত্তর পাইনি বহুদিন।

সেবার যখন কলকাতায় এলাম, দেখা করলাম গিয়ে।

ঠিক সেইরকম ইজি-চেয়ারে মিষ্টিদিদি বসে। রুজ, পাউডার, লিপস্টিক, সিল্ক, সেন্ট, সাবান, ওষুধ—কোনো কিছুরই ব্যতিক্রম নেই। পাশেই ঘনিষ্ঠ হয়ে ডাক্তার সান্যাল বসে ছিলেন।

ডাক্তার সান্যাল বলেছিলেন, 'অনেক কষ্টে তোমার মিষ্টিদিদিকে বাঁচিয়ে রেখেছি। খুব শক্ পেয়েছিলেন, তিন দিন সেন্স ছিল না একেবারে।'

বললাম, 'শঙ্কর কোথায়? শুনলাম সে নাকি কলকাতায় ফিরে এসেছে?'

ডাক্তার সান্যাল বললেন, 'এই তো বেরোল যেন কোথায়, তাকেও বারণ করেছি বেশি কাছে আসতে—এত উইক হার্ট, কোনো এক্সাইট্মেন্টই সহ্য হবে না—কনস্টান্ট্ কেয়ার নিতে হচ্ছে।'

মিষ্টিদিদি বলেছিল, 'চলো একটু গঙ্গার ধারে হাওয়া খেয়ে আসি। গাড়িটা বার করতে বলো।'

ডাক্তার সান্যাল আপত্তি করলেন, 'এ অবস্থায় যাওয়া ঠিক নয় আপনার—উইক হার্ট নিয়ে—'

মিষ্টিদিদি উঠলো। বললে, 'আর তো দুটো দিন—দুটো দিন হয়তো মোটে বাঁচবো—সারা জীবনই তো ভুগছি, এখন আর ভালো লাগে না—যা হয় হবে—'

মনে আছে, যে দু'দিন ছিলাম হাঙ্গারফোর্ড স্ট্রীটে, ডাক্তার সান্যাল দিনরাত মিষ্টিদিদির পাশে পাশে থাকতেন! কিন্তু আমার যেন কেমন ভালো লাগত না। মিষ্টিদিদির পোশাক পরিচ্ছদেও তখন কোনো পরিবর্তন দেখিনি। শাড়ি, গয়না, সিল্ক, সেন্ট—তা-ও পুরোমাত্রায় রয়েছে। একবার মনে হল, হয়তো স্বাস্থ্যের জন্যেই ও-সব পরেছে। হঠাৎ বৈধব্যের সাজ পরলে হয়তো জামাইবাবুর কথা বেশি করে মনে পড়ে যাবে! সঙ্গে সঙ্গে শক্ লাগবে হার্টে। হয়তো সেইজন্যেই। হয়তো সেইজন্যেই জামাইবাবুর মস্ত অয়েল-পেন্টিংখানাও হল্ থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে।

সে-রাত্রে মিষ্টিদিদির বাড়িতেই ছিলাম। শঙ্কর এলো সন্ধ্যের পর।

আমাকে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেছে। বললে, 'ছোট-মামা, তুমি—'

বললাম, 'কোথায় ছিলি এতক্ষণ?'

'কোথাও না—'

'সেই দুপুরবেলা বেরিয়েছিলি, আর এলি এখন—এতক্ষণ কী করছিলি ?'

শংকর যেন আগের চেয়ে অনেক গম্ভীর হয়ে গেছে দেখেছিলাম। বলেছিল, 'কিছু ভালো লাগছিল না, চৌরঙ্গীর ধারে মাঠে গিয়ে একটা বেঞ্চির ওপর শুয়ে ছিলাম একলা-একলা।'

এ-বয়েসের ছেলের পক্ষে এমন করে সময় কাটানো কেমন যেন অস্বাভাবিক।

বললাম, 'আজকাল খেলাধুলো করিস তুই ? সেই টেনিস-খেলা কেমন চলছে তোর ?'

'এখানে এসে পর্যন্ত ও-সব ছুঁইনি, ছোট-মামা।'

সেদিন খাবার টেবিলে ডাক্তার সান্যালও আমাদের সঙ্গে বসেছিলেন মনে আছে। মিষ্টিদিদির পাশেই তাঁর চেয়ার। ডাক্তার পাশে বসা দরকার। কখন মিষ্টি-দিদির কি বিপদ হয় !

শংকর চুপচাপ বসে খাচ্ছিল।

মিষ্টিদিদি এবার বললে, 'ঠাকুর, তোমার বুদ্ধি তো বেশ, খোকাকে অত গুচ্ছের মাংস দিয়েছ কেন শুনি ?'

শংকর অন্যমনস্ক হয়ে খাচ্ছিল। হঠাৎ মুখ তুলে বললে, 'আমাকে বলছ, মা ?'

'হ্যাঁ, তোমাকেই তো বলছি। অত খাও কেন, খাওয়াটা হবে লাইট, পেটে চাপ যেন না পড়ে—ঠাকুর না হয় ইডিয়ট্, কিন্তু তুমি তো লেখাপড়া শিখেছ—তোমাদের স্কুলে এতসব শেখায়, হাইজিন শেখায় না ?'

ডাক্তার সান্যাল বললেন, 'আপনি অত উত্তেজিত হবেন না, মিসেস সেন।'

মাছের একটা মুড়ো চুষতে চুষতে মিষ্টিদিদি বললে, 'আমি আর ক'দিন ডাক্তার সান্যাল ? কিন্তু ছোট ছেলেরা যদি এই বয়েসেই স্বাস্থ্যের গোড়ার কথাগুলো না শেখে তো কবে শিখবে ?'

ডাক্তার সান্যাল বললেন, 'আমি আপনাকে বারবার তো বলেছি মিসেস সেন, এইসব সাংসারিক খুঁটিনাটি সম্বন্ধে মোটে ভাববেন না, ওতে আপনার হার্ট আরও উইক হয়ে যাবে।'

মিস্টিদিদি ডাঁটা-চচ্চড়ি চিবোতে চিবোতে বললে, 'ঠাকুর, আজকে চচ্চড়িতে ঝাল দিতে ভুলে গেছ তুমি ?'

ঠাকুর দাঁড়িয়ে ছিল পেছনে। বললে, 'কই, ঝাল তো দিয়েছি, মা।'

'ছাই ঝাল দিয়েছ। ডাঁটা-চচ্চড়ি ঝাল না হলে খাওয়া যায় ?'

তারপর আমাকে সাক্ষী মেনে মিষ্টিদিদি বললে, 'হ্যাঁ রে, তুই-ই বল তো,—ঝাল হয়েছে চচ্চড়িতে ?'

বললাম, 'আমি তো চচ্চড়ি খাইনি।'

'কেন ? তুই চচ্চড়ি খাস না ?'

ঠাকুর বললে, 'ওটা শুধু আপনার জন্যেই করেছিলাম, মা।'

মিষ্টিদিদির গলা একটু চড়ে উঠলো, 'কেন ? শুধু আমার জন্যে কেন ? তুমি বুঝি আমাকে খাইয়ে-খাইয়ে মেরে ফেলতে চাও ? আমি মরে গেলেই তোমরা বুঝি সবাই বাঁচো, না ?'

ঠাকুর রীতিমতো অপ্রস্তুত। শঙ্করও দেখলাম খাওয়া বন্ধ করে মুখ নিচু করে আছে। আমিও কম অপ্রস্তুত হলাম না। আমাকে চচ্চড়ি না দেওয়াতেই এই কাণ্ড।

মিষ্টিদিদি বললে, 'আমার যেমন কপাল—যার হার্ট দুর্বল তার যে কেন বেঁচে থাকা !'

তারপর মাংসের বাটিটা শেষ করে বললে, 'অথচ যাঁর থাকবার কথা তিনি কেমন টপ্ করে চলে গেলেন, আর আমি-ই কেবল মরতে পড়ে রইলুম।'

ডাক্তার সান্যাল মিষ্টিদিদির মুখের কাছে মুখ এনে বললেন, 'আঃ, আমি বার-বার আপনাকে বলছি না মিসেস সেন, ও-সব কথা মোটেই মনে আনবেন না, ওতে মিছিমিছি দুর্বল হার্টটাকে আরো দুর্বল করা—'

তারপর ঠাকুরকে বললেন, 'তুমি এখান থেকে যাও তো ঠাকুর, আর আমাদের কিছু দরকার নেই। তোমরা সবাই মিলে দেখছি ওঁর রোগটাকে বাড়িয়ে দেবে কেবল।'

খানিক পরে আমার কানে কানে বললেন, 'শঙ্করকে নিয়ে তুমি চুপি চুপি টেবিল থেকে উঠে যাও তো, দেখছো তোমার মিষ্টিদিদি এক্সাইটেড হতে শুরু করেছে—যাও শিগ্‌গির—'

তখনও খাওয়া শেষ হয়নি আমার। শঙ্করেরও খাওয়া শেষ হয়নি। কিন্তু মিষ্টিদিদির মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম তার পাতলা শরীরে যেন আগুন জ্বলছে, কান দুটো ঠিক যেন করমচার মতো লাল হয়ে উঠেছে। সত্যিই বোধহয় হার্টের প্যালপিটেশন হলে ওইরকম হয়।

সেদিন নিঃশব্দে শঙ্করকে নিয়ে উঠে এসেছিলাম খাবার টেবিল থেকে, মনে আছে।

মনে আছে, পরে ডাক্তার সান্যাল বলেছিলেন, 'মিস্টার সেনের শোকটা উনি এখনও ভুলতে পারছেননা কিনা—ওইটেই দিনরাত ভোলাবার চেষ্টা করছি—দেখছ না মিস্টার সেনের অয়েল-পেন্টিংখানা পর্যন্ত তাই সরিয়ে ফেলেছি ঘর থেকে।'

আর একদিন বলেছিলেন, 'ওঁরা তো ছিলেন আইডিয়াল হাসব্যান্ড-ওয়াইফ্, তাই শোকটা অত লেগেছে মিসেস সেনের। উনি তো মাছ-মাংস খাওয়াই ছেড়ে দিয়েছিলেন। আমি দেখলুম এই স্বাস্থ্যের ওপর যদি আবার খাওয়া-দাওয়ার অত্যাচার চলে তাহলে তো আর বাঁচাতে পারবো না আমি। শেষে অনেক বুঝিয়ে-

সুঝিয়ে তবে—'

যে-ক'দিন হাঙ্গারফোর্ড স্ট্রীটে ছিলাম, সে-ক'দিন কেবল মনে পড়তো জামাইবাবুর কথা! সত্যিই তো, তাঁর তো যাবার কথা নয় এত শিগ্‌গির। কিন্তু এক-এক বার মনে হত জামাইবাবু মরে গিয়ে বোধহয় বেঁচেছেন।

শঙ্কর আর আমি এক ঘরে, এক বিছানায় শুতাম। অনেক রাত্রে ঘুম ভেঙে গিয়ে মনে হত যেন পাশে উসখুস করছে শঙ্কর!

ডাকতাম, 'শঙ্কর!'

'উঁ!'

'ঘুমোসনি এখনও?'

'ঘুম আসছে না যে, ছোট-মামা।'

'কেন ঘুম আসছে না রে, দুপুরবেলা ঘুমিয়েছিলি বুঝি?'

'না, কোনও দিন রাত্তিরে ঘুম আসে না আমার।'

'কেন?'

'কী জানি।'

বারো বছরের শঙ্কর সেদিন তার ঘুম না-আসার কোনো কারণ বলতে পারেনি। আমিও যেন কারণটা পুরোপুরি বুঝতে পারিনি সেদিন।

একবার ডাক্তার সান্যাল মিষ্টিদিদির জন্মোৎসব অনুষ্ঠান করেছিলেন মনে আছে।

মিষ্টিদিদি বলেছিল, 'আমার আবার জন্মদিন কেন? আর ক'দিনই বা বাঁচবো!'

ডাক্তার সান্যাল বলেছিলেন, 'আপনার জন্মদিনটা তো একটা উপলক্ষ, মিসেস সেন। লক্ষ্য, আপনাকে একটু আশা দেওয়া, আপনার জীবনটা যে মূল্যবান এইটে মনে করিয়ে দেওয়া। আপনি যেন এতে আপত্তি করবেন না, মিসেস সেন।'

মিষ্টিদিদি বলেছিল, 'কিন্তু আমি কি অত হৈ-চৈ গোলমাল উত্তেজনা সহ্য করতে পারবো? আমার হার্টের যা—'

ডাক্তার সান্যাল বলেছিলেন, 'আমি তো আছি, মিসেস সেন, ভয় কি? আপনার দীর্ঘ-জীবনের কামনা নিয়েই তো এই উৎসব। সংসারের খুঁটিনাটি থেকে মনকে কিছুক্ষণের জন্যে দূরে সরিয়ে রাখা—এতে হার্ট বরং ভালোই হবে, আমি বলছি। আপনি কোনো 'কিন্তু' করবেন না, আপনি যেমন রোজ ইজি-চেয়ারটায় বসে থাকেন তেমনি বসে থাকবেন শুধু, আমরা পাঁচজনে আপনার দীর্ঘ পরমায়ু কামনা করবো।'

তা হলও তাই। ফুলের তোড়া দিয়ে সাজিয়ে দেওয়া হল মিষ্টিদিদির ঘর। বিছানা, ফার্নিচার, ড্রেসিং টেবিল—যেদিকে মিষ্টিদিদির চোখ পড়তে পারে

সবদিকে শুধু ফুল আর ফুল। শান্ত গম্ভীর পরিবেশের মধ্যে পালিত হয়েছিল মিষ্টিদিদির সেই প্রথম জন্মোৎসব। মিষ্টিদিদি যেমন করে সেজেগুজে বসে থাকতো সেদিনও তেমনি করেই বসে ছিল। সন্ধ্যেবেলা শুধু আমরা তিনজন—আমি, শঙ্কর আর ডাক্তার সান্যাল আমাদের উপহারগুলো সামনের টেবিলের তেপায়ার ওপর গিয়ে রেখেছিলাম। ডাক্তার সান্যাল দিয়েছিলেন দামী হীরে সেট্-করা একটা ব্রোচ্। এখন মনে হয়, সে-জিনিসের দাম তখন ছিল খুব কম করেও আট-ন'শো টাকা!

মিষ্টিদিদি দেখে বলেছিল, 'এত দামী জিনিস কেন দিলেন আমাকে—আমি আর ক'দিন বা পরতে পারবো এসব!'

ডাক্তার সান্যাল বলেছিলেন, 'ওইসব কথা দয়া করে আজকের দিনে আর মুখে আনবেন না, মিসেস সেন!'

আমি আর শঙ্কর দিয়েছিলাম নিউমার্কেট থেকে কেনা রজনীগন্ধার দুটো ঝাড়।

মিষ্টিদিদি দেখে বলেছিল, 'ফুল-ই আমার পক্ষে ভালো রে—ফুলের মতোই দু'দিন শুধু আমার পরমায়ু।'

বলতে বলতে কেমন করুণ হয়ে উঠেছিল মিষ্টিদিদির চোখ। পাতলা শরীর যেন থরথর করে কেঁপে উঠেছিল একটু। কিন্তু ডাক্তার সান্যাল ছিলেন, তাই খুব সামলে নিয়েছিলেন সেদিন।

তাড়াতাড়ি স্মেলিং-সল্টের শিশিটা মিষ্টিদিদির নাকের কাছে দিয়ে আমাদের বলেছিলেন, 'যাও শঙ্কর—তোমরা এখান থেকে শিগ্‌গির চলে যাও! মিসেস সেনের অবস্থা যা দেখছি—'

মিষ্টিদিদির সেই প্রথম জন্মদিনের অনুষ্ঠানটা সেদিন সেখানেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। তারপর প্রতিবছর যেখানেই থাকি, মিষ্টিদিদির জন্মদিনে কখনও চিঠি, কখনও টেলিগ্রাম গেছে আমার কাছে। আর প্রত্যেকবারই আমি এসেছি। কিন্তু ভুলেও কখনো ফুল উপহার দিইনি। ফুল মিষ্টিদিদির ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে পারতো না। ফুল দেখলেই নাকি তার মনে পড়তো, ফুলের মতোই তার ক্ষণস্থায়ী জীবন—ফুলের মতোই তার পরমায়ু ক্ষণিক। ও-কথাটা মনে পড়া হার্ট-ডিজিজের রোগীদের পক্ষে তো মারাত্মক।

মিষ্টিদিদির জন্মোৎসব প্রত্যেক বছরেই হত। শুধু মাঝখানে বছর-দুই বন্ধ ছিল। সে-সময় ডাক্তার সান্যাল মিষ্টিদিদিকে নিয়ে ভিয়েনা গিয়েছিলেন চিকিৎসা করাতে।

মিষ্টিদিদি নাকি প্রথমে রাজী হয়নি। বলেছিল, 'আর তো ক'টা দিন—তার জন্যে কেন মিছিমিছি কষ্ট করা।'

ডাক্তার সান্যাল বলেছিলেন, 'তবু একবার শেষ চেষ্টা করে দেখবো আমি।'

আমি তখন স্থান থেকে স্থানান্তরে বদলি হয়ে চলেছি। কোনো খবর রাখতে পারিনি মিষ্টিদিদির। বিলাসপুর থেকে যাচ্ছি জব্বলপুরে। জব্বলপুর থেকে নাইনিতে। নাইনি থেকে এলাহাবাদে। শুনেছিলাম হাংগারফোর্ড স্ট্রীটের বাড়িতে শংকর থাকতো একলা। কেমন যেন মায়া হত ওর কথা ভেবে। জন্মের পর থেকে বাপ-মায়ের প্রত্যক্ষ স্নেহ ভোগ করবার অবকাশ হয়নি জীবনে। নিঃসংগ নির্ভর-হীন শৈশব কৈশোর কাটিয়ে যৌবনে তখন সবে পা দিয়েছে শংকর। মনে হত, এবার শংকরের একটা বিয়ে দিলে ভালো হয়! কিন্তু কে দেবে?

সেবারে কথাটা পেড়েছিলাম মিষ্টিদিদির কাছে।

বলেছিলাম, 'এবার শংকরের একটা বিয়ে দিয়ে দাও, মিষ্টিদিদি।'

মিষ্টিদিদি বলেছিল, 'আর ক'টা দিন, তারপরেই তো আমার ইহলীলা শেষ। তখন সবাইকে ছুটি দিয়ে যাবো আমি, শংকরও বিয়ে-থা করে সুখে থাকতে পারবে। আর দুটো দিন আমার জন্যে ও সবুর করতে পারবে না?'

ভিয়েনা থেকে ফিরে আসার পর যেবার মিষ্টিদিদির জন্মদিনে আবার নিমন্ত্রণ হল, সেবার ভেবেছিলাম স্বাস্থ্য বোধ হয় ফিরেছে মিষ্টিদিদির। কিন্তু গিয়ে দেখলাম, সেই একই অবস্থা। তেমনি ইজি-চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছে আগেকার মতো।

আমার আনা উপহারটা সামনের টেবিলে রেখে জিগ্যেস করেছিলাম, 'কেমন আছ, মিষ্টিদিদি?'

মিষ্টিদিদি তেমনি সিল্ক, সাটিন, জর্জেট, স্নো-পাউডারে মুড়ে বসে ছিল।

বললে, 'আমার আর থাকা—আর বোধ হয় বেশিদিন নয়— !'

বললাম, 'বাইরে গিয়েও সারলো না শরীর?'

মিষ্টিদিদি বললে, 'এ মরবার আগে আর সারছে না রে!'

বলে চকোলেট চুষতে লাগলো।

কিন্তু শরীর সারাবার জন্যে মিষ্টিদিদির চেষ্টারও তা বলে অন্ত ছিল না। ডাক্তার সান্যাল মিষ্টিদিদিকে নানা জায়গায় ঘুরিয়ে আনতেন। কখনও পুরী, কখনও চিল্‌কা, কখনও অন্য কোথাও। ডাক্তার সান্যাল কবে একদিন চিকিৎসা করতে এসেছিলেন মিষ্টিদিদিকে। সে কোন্ যুগে। জামাইবাবু তখন বেঁচে। তারপর কতদিন কেটে গেল। রোগও সারলো না মিষ্টিদিদির, আর ডাক্তার সান্যালও গুরু দায়িত্ব থেকে বুঝি মুক্তি পেলেন না।

হঠাৎ সেবার শংকরের আত্মহত্যার খবর পেয়ে মনে আছে দৌড়ে এসেছিলাম কলকাতায়।

এমন আকস্মিকভাবে ঘটনাটা ঘটলো, যেন বিশ্বাসই করতে পারিনি প্রথমে।

ভয় হয়েছিল এবার আর মিষ্টিদিদিকে কেউ বাঁচাতে পারবে না। শংকরের এমন শোকে নিশ্চয়ই মিষ্টিদিদি হার্ট-ফেল করবে। সেবার জামাইবাবুর শোক

মিষ্টিদিদি যদিও বা ভুলতে পেরেছে ডাক্তার সান্যালের চেষ্টায়, শংকরের অপমৃত্যুর আঘাত নিশ্চয়ই অসহ্য হয়ে উঠবে। হয়তো গিয়ে দেখবো শংকর তো নেই-ই, মিষ্টিদিদিও বেঁচে নেই আর।

অত্যন্ত ভয়ে হাংগারফোর্ড স্ট্রীটের বাড়িতে এসে পৌঁছলাম। শংকরের এমন পরিণতি হবে ভাবতেই পারিনি। একবার ভেবেছিলাম শংকর হয়ত মিষ্টিদিদিকে আঘাত দেবার জন্যেই এই পথ বেছে নিয়েছে। হয়তো শংকর ভেবেছিল, এইভাবেই একমাত্র মিষ্টিদিদির ওপর প্রতিশোধ নেওয়া যায়।

কিন্তু শংকর তো জানতো না মিষ্টিদিদির লোহার হার্ট।

ভেতরে ঢোকবার রাস্তাতেই বাইরের ঘরে ডাক্তার সান্যাল বসে ছিলেন।

বললেন, 'এসেছ তুমি —শুনেছ বোধ হয় খবরটা— ?'

বললাম, 'শংকর কেন এমন করলো ? কী হয়েছিল ?'

ডাক্তার সান্যাল সে-বৃত্তান্ত বললেন। বরাবর নির্বাক নির্বিরোধ শংকর, মাথা-খারাপ হয়ে গিয়েছিল নাকি ! মনে আছে ডাক্তার সান্যাল বলেছিলেন, 'যদি সুইসাইড না করতো শংকর তো নিশ্চয়ই পাগল হয়ে যেত শেষকালে—দেখতে—'।

বললাম, 'মাথা-খারাপই বা হল কেন ?'

ডাক্তার সান্যাল বললেন, 'ডাক্তারী শাস্ত্রে একে বলে 'মেনিয়া'। বেশি ব্রুডিং নেচারের লোক হলে এরকম হয়। হয় সুইসাইড করে, নয়তো পাগল হয়ে যায় শেষ পর্যন্ত।'

তারপর বললেন, 'তোমার মিষ্টিদিদিকে যেন এ-খবরটা বোলো না আবার। ওঁকে জানানো হয়নি এখনও।'

'মিষ্টিদিদি জানে না ?'

'না, জানানো হয়নি, জানালে এ-যাত্রা আর বাঁচাতে পারতুম না। মিস্টার সেনের বেলায় জানি কিনা—হাজার হোক মায়ের প্রাণ তো, ছেলের মৃত্যু কোনো মা-ই সহ্য করতে পারে না, তার ওপর মিসেস সেনের হার্ট-এর অবস্থা এখনও খারাপ, যে-কোনো দিন যে-কোনো বিপদ ঘটতে পারে।'

সেদিন সিঁড়ি দিয়ে মিষ্টিদিদির ঘরে ওঠবার সময় মনে আছে আমার যেন খুন চেপে গিয়েছিল।

মনে হয়েছিল শংকরের অপমৃত্যুর খবরটা আমিই শোনাবো মিষ্টিদিদিকে। দেখি পরখ করে মিষ্টিদিদির হার্ট-ফেল হয় কিনা ! যদি হয়, তাতেও আমার দুঃখ নেই। মনে হয়েছিল—মিষ্টিদিদির নাম কে রেখেছিল জানি না, কিন্তু মিষ্টিদিদির কোনোখানটাই যেন আর মিষ্টি নয়।

কিন্তু সমস্ত সংকল্প আমার মিষ্টিদিদির সামনে গিয়ে ভেসে গেল।

সেই সিল্ক, সেন্ট, জর্জেট, স্নো, পাউডার ! সেই ইজি-চেয়ার, সেই শরীর-খারাপের অভিযোগ। সেই চকোলেট চোষা। সেই ঝিকে দিয়ে মিষ্টিদিদির পায়ে

হাত বুলিয়ে নেওয়া।

সত্যিই, কিছু বলতে পারলাম না সামনে গিয়ে।

মিষ্টিদিদি বললে, 'আর ক'টা দিন, তারপর তোদের সবাইকে মুক্তি দেবো।' বলে চকোলেট চুষতে লাগলো মিষ্টিদিদি।

হাঙ্গারফোর্ড স্ট্রীট থেকে তার পরদিন দেশে গিয়েছিলাম। মা বললে, 'শংকর আমাদের সোনার টুকরো ছেলে তাই অপঘাতী হল, নইলে অন্য ছেলে হলে মাকেই খুন করতো। মনোহরদা বেঁচে থাকলে ও-মেয়েকে গুলি করে মারতো, দেখতিস।'

বুঝতে পারলাম না। বললাম, 'কেন?'

'তা না তো কি, কোথায় ছেলের বিয়ে দিয়ে বউ আনবে, তা নয়, বিধবা মাগী বিয়ে করে বসলো। শংকর কি সাধ করে অপঘাতী হয়েছে ভাবিস!'

বললাম, 'কে বিয়ে করেছে?'

'ওই মিষ্টি, ডাক্তারকে কিনা বিয়ে করে বসলো অত বড় ছেলে থাকতে!'

তা এসব ঘটনাও প্রায় পনরো বিশ পঁচিশ বছর আগেকার। তারপর প্রতি বছরেই মিষ্টিদিদির জন্মদিনটিতে কলকাতায় গেছি। উপহার দিয়ে এসেছি যথারীতি! ডাক্তার সান্যাল প্রতিবারের মতো মিষ্টিদিদির স্বাস্থ্যের জন্যে সতর্কতা নিয়েছেন—কোনো উত্তেজনা না হয় কোনো অশান্তি না হয় মনে! তাহলেই মিষ্টিদিদিকে আর বাঁচানো যাবে না। ডাক্তার সান্যাল বার বার বলেছেন, মিষ্টি-দিদির হার্টের যা অবস্থা তাতে যে-কোনো দিন যে-কোনো মুহূর্তে যে-কোনো দুর্ঘটনা ঘটতে পারে! কিন্তু গত পনরো বিশ পঁচিশ বছর কত কোটি মুহূর্ত নিঃশব্দে মহাকালে গিয়ে লয় হয়েছে, কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি। তারপর যেবার ডাক্তার সান্যালেরও মৃত্যু-সংবাদ পেলাম সেবারও ভালো করে জানতাম কিছুই ঘটবে না মিষ্টিদিদির। বেশ জানতাম, মিষ্টিদিদির লোহার হার্ট! ভালো করে জানতাম, মিষ্টিদিদি আর যা-ই হোক—মিষ্টি নয় মোটেই। তবু গেছি মিষ্টিদিদির বাড়িতে। মিষ্টিদিদির জন্মদিনের নিমন্ত্রণ আমি এড়াতে পারিনি কখনও।

এই গত বছরেও আবার মিষ্টিদিদির জন্মদিনে কলকাতায় এসেছিলাম।

ভালো করেই জানতাম—মিষ্টিদিদি তেমনি ইজি-চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে থাকবে। পায়ে সুড়সুড়ি দেবে ঝি। সিল্ক, সেন্ট, জর্জেট, স্নো-পাউডারে মুড়ে সেজেগুজে চুপ করে থাকবে। তেমনি প্রতিবারের মতোই উপহার দেবো গিয়ে। উপহারটা রাখবো গিয়ে তেপায়া টেবিলের উপর। বলবো 'কেমন আছ, মিষ্টিদিদি?'

মিষ্টিদিদি তেমনি করেই বলবে, 'আমার আর থাকা, আর তো দুটো দিন!

দুটো দিন পরেই তোদের ছুটি দিয়ে যাবো রে !'

বলে মিষ্টিদিদি তেমনি করেই ইজি-চেয়ারে হেলান দিয়ে চকোলেট চুষবে আর আরামে গা এলিয়ে দেবে প্রতিবারের মতো। সত্যি, সৃষ্টিকর্তা যেন মিষ্টিদিদিকে অক্ষয় পরমায়ু দিয়ে পাঠিয়েছিল এ-সংসারে !

কিন্তু গতবারের জন্মদিনে মিষ্টিদিদি সত্যি সত্যিই আমাকে অবাক করে দিয়েছিল।

হাঙ্গারফোর্ড স্ট্রীটের বাড়িতে গিয়েও প্রথমে টের পাইনি।

তেমনি চাকর-বাকর-ঝি মালী সবই ছিল। কিন্তু সেই পরিচিত ইজি-চেয়ারটা খালি।

একজন ঝিকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'মিষ্টিদিদি কোথায় ?'

ঝি বললে, 'ঘরে শুয়ে আছেন—অসুখ করেছে।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'অসুখ কবে হল ?'

ঝি বললে, 'কাল থেকে। হঠাৎ পড়ে গেছেন কাল।'

তা সত্যি অসুখ হয়েছিল মিষ্টিদিদির ! ঘরে গিয়ে দেখি চিত হয়ে শুয়ে আছে খাটের ওপর। সমস্ত দেহটা অসাড়। নড়। ধরে পাশ ফেরাতে হয়। মুখ তুলে খাইয়ে দিতে হয়। সমস্ত অঙ্গ শিথিল হয়ে গেছে। প্যারালিসিসে একেবারে পঙ্গু করে দিয়েছে মিষ্টিদিদিকে। তবু তারই মধ্যে কেউ বুঝি পাউডার, স্নো, রুজ, লিপস্টিক মাখিয়ে সাজিয়ে-গুজিয়ে রেখেছে। পায়ে কোনো সাড় নেই। তবু একজন ঝি পায়ে সুড়সুড়ি দিচ্ছে নিচেয় বসে বসে।

বরাবরের অভ্যেস মতো বলেছিলাম, 'কেমন আছ মিষ্টিদিদি ?'

মিষ্টিদিদি আমার দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে ছিল, কিছু কথা বলতে পারেনি ! শুধু ঠোঁট দুটো যেন ঈষৎ নড়তে লাগলো। মনে হল যেন বলতে চাইছে,—আমার আর থাকা-থাকি···আর ক'টা দিন পরেই তোদের ছুটি দিয়ে যাবো···এবার সত্যি আর বেশিদিন নয় রে···

মিষ্টিদিদির চোখ দিয়ে জল পড়ে পাউডার-স্নো ধুয়ে গেল ! মিষ্টিদিদির চোখে সেই প্রথম জল দেখলাম জীবনে। কিন্তু তবু আমার মনে হয়েছিল—মিষ্টিদিদি যেন এখনও মিথ্যেকথা বলছে, ধাপ্পা দিচ্ছে আমাদের—এ-ও যেন ভান, এ-ও যেন মিষ্টিদিদির নতুন একরকমের ছল। একেবারে না মরলে আর মিষ্টিদিদিকে যেন বিশ্বাস নেই।

আমার মাসিমা

মাসিমা আর মেসোমশাইয়ের সম্পর্কটা আমার কাছে বড় বিচিত্র লাগতো বরাবর।

মা বলতো, 'আহা! কী কপাল করেই যে এসেছিল রাঙাদি—'

সত্যিই হিংসে করবার মতো কপালই বটে রাঙা মাসিমার। খুব ছোটবেলায়, মনে পড়ে, রাঙা মাসিমার বাড়ি গেছি। তখন ভাড়াটে বাড়ি ছিল। রাঙা মাসিমা নিজের হাতে রান্না করা, ময়লা কাপড় সেদ্ধ করা, যাবতীয় কাজ করেছে মেসোমশাই পর্যন্ত কখনও মুড়ি ছাড়া আর কিছু জলখাবার পায়নি।

আমাকে দেখিয়ে মেসোমশাই বলেছে, 'ওকে দুটি মুড়ি দাও না।'

মাসিমা বলেছে, 'ওরা আর মুড়ি খায় না আমাদের মতন।'

তারপর হাতের কাজ করতে করতে বলেছে, 'ওর বাবা তোমার মতো আর অকম্মা লোক নয়—ওদের তিনজনের সংসার, তবু চার সের দুধ নেয় ওর মা, তা জানো?'

মেসোমশাই বলেছে, 'তা মুড়ি কি খারাপ জিনিস গা। বর্ষাবাদলের দিনে তেল নুন মেখে মুড়ি খেতে তো বেশ লাগে আমার।'

রাঙা মাসিমা রেগে গিয়ে বলেছে, 'তোমার মতো লোকের হাতে পড়ে মুড়ি ছাড়া যে আর কিছুই জুটবে না তা আমি জানি। যেমন ফুটো কপাল আমার!

তখনও মেসোমশাই জজ্ হয়নি। সামান্য উকিল মাত্র। বউবাজারের একটা গলিতে সে যে কী বাড়িতে থাকত! একখানা মাত্র শোবার ঘর। তার মধ্যে ঢালোয়া বিছানা। তিন-চারটে ছেলেমেয়ে নিয়ে সেই একটা ঘরের মধ্যে থাকা! আর রান্নাঘরটায় গোলপাতার ছাউনি। সেই এক-চিলতে রান্নাঘরের মধ্যে দিনরাত কাটতো মাসিমার! কিন্তু তবু কত যে পরিপাটি কাজ! রান্না সারা হয়ে গেছে, খাওয়া-দাওয়া চুকে গেছে, ছেলেমেয়েরা ইস্কুলে, মেসোমশাই কোর্টে—তখন যত রাজ্যের কাজ মাসিমার। বড়ি শুকোতে দিয়েছে রোদ্দুরে, ক্ষার কাচতে বসেছে, কিংবা চাল বাছতে শুরু করেছে কুলো নিয়ে। অথচ একটা ঝি নেই, চাকর নেই!

মেসোমশাই কতবার বলেছে, 'একটা বিধবা মেয়েমানুষ আছে, ওরা বলছিল—মাইনে নেবে না, শুধু খাবে—রাখলেও তো পারো।'

রাঙা মাসিমা ঝাঁজিয়ে উঠত, 'থামো তুমি, তোমার মতো অকম্মা লোকের হাতে যখন পড়েছি, তখন জানি আমার কপালে কষ্ট আছে—জিজ্ঞেস করো ওকে, ওদের তিনজনের সংসার, তবু ওর মাকে কখনো নিজে রাঁধতে হয়নি।'

মেসোমশাই বলতো, 'তা বলে তোমার একটা অসুখ বিসুখ করলে তখন ?'

মাসিমা বলতো, 'অসুখ-বিসুখ হলে তো বেঁচে যাই, আমাকে আর ভূতের বেগার খাটতে হয় না তোমার সংসারে।'

মেসোমশাইকে দেখেছি ভোরবেলা উঠে নিজের হাতে নিজের জামাকাপড় কেচে ঘর পরিষ্কার করে বাইরের ঘরে কাজ নিয়ে বসে গেছে। তারপর চট করে এক ফাঁকে মক্কেলকে বসিয়ে রেখে বাজারও করে এনেছে।

মাসিমা দেখতে পেয়ে হৈ-হৈ করে উঠেছে।

'ওকি, মাছের থলি আর আনাজের থলি একাকার করে ফেললে যে, ছিষ্টি আঁশ করে ফেললে যে তুমি, অমন বাজার করবার মুখে আগুন—নাও, হাত ধোও।'

নিজেই জলের ঘটি নিতে যাচ্ছিল মেসোমশাই।

আবার হৈ-হৈ করে উঠেছে মাসিমা।

'এই দ্যাখো, আমার হেঁশেল শুদ্ধ আঁশ করে দেবে নাকি! কী অকম্মা লোকের হাতেই পড়েছি মা! বলি আঁশ হাতে যে হেঁশেলের ঘটি ছুঁচ্ছিলে তুমি!'

মেসোমশাই হয়তো তখন সত্যিই বড় ব্যস্ত। বাইরের ঘরে মক্কেল বসিয়ে রেখে এসেছে। একটু যেন গলা চড়িয়েই বললে, 'তা আমার হাতে একটু হাত ধোবার জল দাও, মক্কেলরা বসে আছে যে সব—'

মাসিমা রান্নাঘর থেকে বলে, 'তা তোমার মক্কেলরাই বড় হল গা তোমার কাছে! ওলো, কর্তার কথা শোন্ তোরা, শুনেছিস অনাছিষ্টির কথা—' বলে সাক্ষী মানতো ছেলেমেয়েদের।

আমায় লক্ষ্য করে মেসোমশাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে মাসিমা কতদিন বলতো, 'এই আমা-হেন গিন্নী পেয়েছিলে বলেই এ-যাত্রা টিঁকে গেলে তুমি- যা বলবো—'

তারপর একটু থেমে বলতো, 'একবার ইচ্ছে হয় দেখতে আমি দু'দণ্ড চোখ বুঁজলে তুমি কেমন করে চালাও সব।'

আমরা তখন অতি ছোট। সব জিনিস বোঝবার বয়েস হয়নি। দেখতাম, মাসিমার কথা শুনে মেসোমশাই কেমন নিরুত্তর হয়ে থাকতো। অত যে অভিযোগ অনুযোগ, সেদিকে কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। মেসোমশাই নির্বিকার চিত্তে আদালতের নথিপত্র পড়ছে। নিজে উদয়াস্ত পরিশ্রম করে টাকা এনে সংসারে তুলে দিচ্ছে মাসিমার হাতে। মাসিমা আবার সে-টাকা আঁচলে গেরো বেঁধে রাখছে কিন্তু একটা কোনো খরচের জন্যে টাকা চাইলেই মাসিমা আগুন। বলতো, 'কোত্থেকে টাকা পাবো সে-হিসেব রাখো ?—টাকা কোথায় পাবো—টাকা আমার হাতে নেই।'

মেসোমশাই বলতো, 'তা ছেলেটার জ্বর, ওষুধ তো আনতে হবে—'

মাসিমা তখন সে-দৃশ্য থেকে দূরে সরে গেছে।

মেসোমশাই রান্নাঘরের দরজা পর্যন্ত গিয়ে বললে, 'ওষুধটা তাহলে এনে, দিয়ে যাই—'

'তা যাও না, কে বলছে যে ওষুধ এনো না?'

'টাকা দাও দুটো।'

মাসিমা বললে, 'টাকার কি গাছ আছে আমার, না আমি পুরুষমানুষ, চাকরি করে টাকা আনবো। তা আমি যদি পুরুষমানুষ হতুম, তো সংসারের এমন দশা হত না! জিজ্ঞেস করো ওকে, ওদের তিনজনের সংসার, তবু ক'টা ঝি আর ক'টা চাকর রেখেছে ওর বাবা।'

ঝি-চাকর আসে। মেসোমশাই বলে-কয়ে দশজনকে খোসামোদ করে বাড়িতে আনে। চাকরকে লুকিয়ে লুকিয়ে বলে যায়, 'একটু যদি বকুনি-টকুনি দেয় তোর মা, তো কিছু মনে করিসনি বাবা, তোকে আমি আলাদা বকশিশ দেবো। যদি ভাত খেয়ে পেট না ভরে তো আমাকে বলিস—আমি তোকে পয়সা দেবো, দোকান থেকে কিনে খেয়ে নিস্।'

কিন্তু অশান্তি আরো বেড়ে যেতো তাতে।

মক্কেলদের সঙ্গে কাজের কথা বলতে বলতে এক এক বার কানে তালা লেগে যাবার অবস্থা হয়। চাকরের সংগে মাসিমার বচসার আর অন্ত থাকে না।

মাসিমা বলে, 'ডাক্ তো তোর বাবাকে। সুখের চেয়ে সোয়াস্তি ভালো—বেশ ছিলাম সুখে, চাকর-বাকর বাড়িতে ঢুকিয়ে এ এক 'কাল' হল। দুটো মানুষের ভাত খাবে অথচ কাজের বেলায় এত ফাঁকি: এ তো চাকর আনা নয়, আমাকে জ্বালানো—যেমন হয়েছে কর্তা, তেমন হয়েছে কর্তার চাকর!'

তারপর যথারীতি একদিন কোর্ট থেকে ফিরে এসে দ্যাখে সব নিস্তব্ধ।

মেসোমশাই জিজ্ঞেস করে, 'হরি কোথায় গেল?'

মাসিমা বোধ হয় এই প্রশ্নেরই অপেক্ষা করছিল। বললে, 'যেমন তুমি অকম্মা বাবু, তেমনি তোমার অকম্মা চাকর। ও কাউকেই আমার দরকার নেই। আমার যেমন কপাল, তোমার মতন লোকের হাতে যখন পড়েছি, তখনই জানি অদেষ্টে আমার অনেক কষ্ট। জিজ্ঞেস করো ওকে, ওদের তিনজনের সংসার, তবু—'

এসব কথা যখনকার তখন আমরা খুব ছোট। তারপর বউবাজারের বাড়ি ছেড়ে মেসোমশাই কলেজ স্ট্রীটের ওপর সদর রাস্তায় বাসা নিয়েছে। আয় বেড়েছে। ছেলে-মেয়েদের বয়েস হয়েছে। খুকুর বিয়ে হয়ে গেছে এক বড় ঘরে। খুকুর বিয়েতে মেসোমশাই জাঁকজমক করেছিল খুব। সে-বিয়েও মেসোমশাইয়ের এক মক্কেলের কল্যাণেই। একটা পয়সা নেয়নি পাত্রপক্ষ। মক্কেলরা গাদা-গাদা জিনিসপত্তোর দিয়ে গেছে বাড়িতে বয়ে। ধন্য ধন্য করেছে সব আত্মীয়-স্বজন নতুন কুটুম দেখে। বরকর্তা বলেছে, জিতেনবাবু এমন সজ্জন লোক, তাঁর মেয়ের

বিয়েতে আমরা টাকা নেবো না।' কেবলমাত্র মেসোমশাইকে দেখেই পাত্রী পছন্দ করেছে তারা। এমন সাধু লোকের মেয়ে ঘরে আনতে পারাও যেন বহু পুণ্যের ফল।

মাসিমা কিন্তু তখনও সেই ভিড়ের মধ্যে বলেছে, 'ও'র সাধ্যি কি ওই মেয়ে পার করেন, যা দেখেছো মা, সব এই আমি হেন মেয়ে ছিলাম বলে—কোনো যুগ্যিতা নেই তো ও'র।'

গায়ে-হলুদ দেখে সব লোক অবাক। মেয়েকে দিতে আর কিছু বাকি রাখেনি।

মাসিমাও গরদের জোড় পরে বললে, 'দেখছ তো মা তোমরা ওই অকম্মা মানুষটিকে, সেই মেয়ে-দেখার সময় থেকে এই পর্যন্ত যা কিছু সব আমাকে করতে হচ্ছে, একটা কাজ তো ও'কে দিয়ে হবার উপায় নেই।'

মেসোমশাই সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল।

মাসিমা বললে, 'হাসছ কি, এই তো সবাই সাক্ষী আছে, বলুক দিকি কেউ তুমি কোন্ কাজটা করেছ, যে-কাজটা আমি দেখবোনা সব তো পণ্ড করবে, এমন কপাল আমার মা, যে একা হাতে সব কাজ করতে হবে!'

সত্যি মাসিমাও মেসোমশাইকে দেখে এক এক বার অবাক হয়ে যেত। বলতো, 'আমার একবার কাছারিতে গিয়ে দেখে আসতে ইচ্ছে করে, তুমি কেমন করে কাজ চালাও সেখানে।'

উকিল থেকে আস্তে আস্তে মেসোমশাই জজ্ হল। ভবানীপুরে মস্ত বাড়ি কিনলে। মন্টু তখন ডাক্তারি পাস করে রেলে চাকরি নিয়েছে। মেজ ছেলে ইঞ্জিনিয়ার হয়েছে কাশী থেকে। জম-জমাট সংসার। তিনটে চাকর, দুটো ঝি। আত্মীয়-স্বজন, নাতি-নাতনী, বিধবা-সধবা গলগ্রহের কল-কোলাহলে বাড়ি পূর্ণ। তার মধ্যে সকাল থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত মাসিমার কেবল ওই এক কথা!

'হলে কি হবে মা, আমি যেদিকে দেখব না, সেইদিকেই তো চিত্তির! যেমন হয়েছে বাড়ির অকম্মা কর্তা, তেমনি সবাই, একটা মানুষ যদি কাজের···সবাই এ-বাড়ির কর্তার ধারা পেয়েছে!'

গৃহ-প্রবেশের দিনে আত্মীয়-স্বজন সকলের নিমন্ত্রণ হয়েছে।

গিয়েই মাসিমার গলা শুনতে পেলাম। বলছে, 'আচ্ছা, তুমি একটা অকম্মা মানুষ, তুমি আবার কাজের ভিড়ের মধ্যে কেন শুনি—'

মেসোমশাই বুঝি নিজের গামছার খোঁজে এসেছিল অন্দরমহলের ভেতর। মাসিমার মন্তব্য শুনে আবার যেমন এসেছিল তেমনি চলে গেল। কোনো বিরক্তি নেই, বিরাগ নেই—সদাশিব ধীর স্থির শান্ত মানুষটি বরাবর। সামান্য অবস্থা থেকে নিজের ধৈর্য, সাহস, কর্তব্যনিষ্ঠা, একাগ্রতা দিয়ে অক্লান্ত উদয়াস্ত পরিশ্রম করে বিত্তশালী হয়েছে, কিন্তু কোনো হিংসা, ক্ষোভ, দুর্ব্যবহার নেই কারো ওপর।

মাসিমা বলে, 'এও বলে রাখছি বাপু তোমাদের (তোমরা এখন বড় হয়েছ, সব বুঝতে পারো), এই আমার মতো গিন্নী পেয়েছিল বলেই তোমার মেসোমশাই এই বাড়ি-ঘর-দোর করতে পারলে কলকাতায়।'

পুত্রবধূদের ডেকে বলে, 'এই শোনো বৌমারা, এই আজ আমাকে দেখছ তোমরা এমনি, এই আমিই একদিন ছেলেমানুষ করা থেকে এই কলকাতায় বাড়ি করা পর্যন্ত সব একা করেছি। আমি না থাকলে ওই ছেলেরাও মানুষ হত না, মেয়েদেরও বিয়ে হত না। ওই অকম্মা মানুষ শুধু মাসে মাসে ক'টা টাকাই এনে তুলে দিয়েছে আমার হাতে, আর তো কোন যুগ্যিতা ছিল না ও-মানুষের!'

যে-মানুষের কোনো যোগ্যতা ছিল না, সে-মানুষ সামান্য অবস্থা থেকে এত বড় কেমন করে হল এ-প্রশ্ন কেউ কোনোদিন করেনি মাসিমাকে। দিনে দিনে বাড়ি হয়েছে, গাড়ি হয়েছে ; পুত্র, পৌত্র, ধন, জন কিছুরই অভাব থাকেনি মাসিমার। সে মুড়ি খাওয়া এখন উঠে গেছে। এখন সংসারে দৈনিক পাঁচ সাত সের দুধ খরচ হয়। নাতনীদের এক খেপে গাড়ি করে ইস্কুলে পৌঁছে দিয়ে তারপর কর্তাকে কোর্টে পেঁছে দেয়। মেসোমশাই গরমের ছুটিতে মাসিমাকে পাহাড়ে বেড়াতে নিয়ে যায়। সংসার জ্বলজ্বল করছে। চারিদিকে সাফল্য, চারিদিকে সাচ্ছল্য! পাড়ার পাঁচ দশজন লোক রোজ এসে কুশল প্রশ্ন করে যায়। দেশের দশ-বিশটা ব্যাপারে মেসোমশাইয়ের ডাক পড়ে। কত অসংখ্য প্রতিষ্ঠানে দাতব্য করতে হয়। সময় পায় না মেসোমশাই সব জায়গায় যেতে।

তবু ক'জন আমায় পীড়াপীড়ি করছিল ক'দিন ধরে, মেসোমশাইকে গিয়ে তাদের প্রতিষ্ঠানের সভাপতি হতে বলবার জন্যে। আমিও মাসিমাকে দিয়ে বলাবো ভাবছিলাম।

মাসিমা শুনে বললে, 'ও-মানুষকে তো চিরটা কাল দেখে আসছি, বিয়ে হওয়া এস্তোক আমাকে জ্বালিয়েছে। ওঁকে দিয়ে তোদের কাজের কী সুসার হবে বল তো?'

মাসিমা সত্যিই হেসে বাঁচে না!

বলে, 'ওঁকে সভাপতি করবে, তবেই হয়েছে—তোরা আর লোক পেলিনে রে—'

কথায় কথায় মাসিমা খোঁটা দেয়, 'ওই তো দাঁড়িয়ে রয়েছে ও, জিজ্ঞেস করো না ওকে, ওদের তো তিনজনের সংসার, এখন না হয় ওর বউ ছেলেমেয়ে হয়েছে, কিন্তু ওর মা কোন্ দিন সংসারের কোন কুটোটা নেড়েছে—বলুক ও।'

কখনও কখনও রেগে বিরক্ত হয়ে গিয়ে বলে, 'পারব না আমি এত দেখতে, তোমার সংসার তুমি দেখ, আমি পারব না। বিয়ে হয়ে এ-বাড়িতে ঢোকা ওবধি এক দণ্ডও ফুরসুত পেলাম না মা—। কেন, কী আমার দায় পড়েছে। হোক্‌গে সব লণ্ড-ভণ্ড, তুমি নিজে দেখতে পারো ভালো, নইলে রইলো সব পড়ে—সব

আপচো-নষ্ট হোক আমি ফিরেও দেখবো না আর।'

বলে মাসিমা নিজের শোবার ঘরে বিছানায় উঠে গিয়ে বসে।

বড় বউমা লোক ভালো। মন-রাখা কথা বলতে জানে।

বলে, 'মা, আপনি এখানে বসে থাকলে কেমন করে কী করবো, আমরা ছেলে-মানুষ, কী বুঝি—আপনি সামনে বসে দেখিয়ে দিন, আমরা শিখে নিই।'

মাসিমা বলে, 'কেন, উনি কোথায়, তোমার শ্বশুর—'

'তিনি তো বাইরের ঘরে।'

'ডাক তাঁকে, ডেকে আনো, দেখুক না এসে সংসারে হুজ্জতটা কত!'

'তা কি আর কেউ জানে না মা, সবাই জানে, আপনি তবু একবার চলুন নিচেয়।'

'না, তুমি যাও বউমা, আমি যাবো না, একদিন ও-মানুষ দেখুক কাজটা কী হয় সংসারে, বাইরে বাইরে শুধু গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরে বেড়ানো তো নয়, তোমার শ্বশুরের কথা বলছি, সারা জীবনটা আমায় এমনি করে হাড়ে হাড়ে জ্বালিয়েছে বউমা, একটা দিনের তরে শান্তি পাইনি আমি, এমন অকর্মা লোকের হাতে পড়েছি শুনি না!'

বলতে বলতে মাসিমার চোখ সত্যিই ছলছল করে ওঠে।

সাধারণত মাসিমা কাক-কোকিল ডাকবার সঙ্গে সঙ্গে ঘুম থেকে ওঠে। সেই সুরু হয় চরকির মতো পাক খাওয়া। কে কী খাবে, কোথায় অপচয় হচ্ছে, কার কী প্রয়োজন, সমস্ত জিনিস খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখবে। যেখানকার যে-জিনিস সেখানে না থাকলেই অনর্থ। রান্নাঘরের পাশে উঠোনের ঝাঁটাটা কাত হয়ে পড়ে আছে। মাসিমা সৌরভীকে ডেকে দু'কথা শুনিয়ে দেবে, 'হ্যাঁ গা মেয়ে, উঠোনের ঝাঁটাটা যে বড় কাত হয়ে পড়ে আছে, এ কেমনধারা অনাছিষ্টি কাজ গা—সবাই কি বাড়ির কর্তার ধারা পেয়েছে!'

এদানি মাসিমা পুজোর সময় প্রতিবছরেই একটা-না একটা গয়না গড়াত। বউদের যা হবার তা তো হয়ই। সেবার কাজের ভিড়ে স্যাকরাও সময়মতো জিনিসটা গড়িয়ে দিয়ে যেতে পারেনি। বার বার লোক দিয়ে তাগাদা দিয়েও মহালয়া পেরিয়ে গেল।

মাসিমা সেদিন একেবারে মেসোমশাইয়ের সদরে গিয়ে হাজির। মেসোমশাই কাগজপত্র নিয়ে ব্যস্ত ছিল। মাসিমাকে দেখে অবাক। মেসোমশাই মুখ তুলে চাইতেই মাসিমা বললে, 'বলি, তোমাকে তো বলা বৃথা,—তুমি তোমার রাজ-কাজ্য নিয়েই ব্যস্ত!'

'কি, হল কী?'

'বলি, সংসারের তো তুমিও একজন, না তুমি সংসার ছাড়া? সংসারে থাকতে গেলেই দু'চার কথা বলতে হয় তাই বলি, নইলে আমার আর কী?

যেদিন মরে যাবো, দু'চক্ষু বুজবো, সেদিন তোমাকে বলতে আসবো না—তুমিও নিশ্চিন্তে রাজকাজ্য করবে। তা ভেবো না, তোমাকে আমি দুষছি; দোষ তোমারও নয়, দোষ আমারই পোড়া কপালের। তা নইলে এত লোক থাকতে তোমার মতো অকম্মা লোকের হাতেই কিনা আমায় পড়তে হয়—'

মেসোমশাই কিছু বুঝতে না পেরে বললে, 'কী, হল কী, বুঝতে পারছিনে তো।'

মাসিমা বললে, 'হ্যাঁ গা, আমার কপালেই কি যত অকম্মা জুটতে হয়! চাকর, ঝি, বউদের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, তারা না হয় কেউ আপনার জন নয়, কিন্তু গয়লা, স্যাকরা এদেরও কি বেছে বেছে পাঠিয়ে দাও আমার কাছে জ্বালিয়ে খাবার জন্যে?'

সেদিন গয়লা এলে তাকে সোজা শুনিয়ে দিলে মাসিমা, 'তোকে আর দুধ দিতে হবে না বাছা, কত্তার রক্ত জল-করা পয়সা, আর তুই এমনি করে ঠকাবি! কত্তা না হয় মানুষ নয়, তা আমরাও কি চোখের মাথা খেয়ে বসেছি?'

কতদিন ছেলে-মেয়ে নাতি-নাতনী আমাদের সকলের সামনে মাসিমা দুঃখ করে মেসোমশাইকে বলেছে, 'তোমার হাত থেকে যে কবে নিষ্কৃতি পাবো কে জানে, আর জন্মে কত পাপই করেছি!'

মাসিমা বলতো, 'সেই এগারো বছর বয়েসে বউ হয়ে ঢুকেছি এ-বাড়িতে আর এখন বুড়ী হয়ে গেলুম, সুখ যে কী দ্রব্য তা জানলুম না এ-জীবনে।'

মা বাবাকে বলতো 'পড়তে তুমি দিদির হাতে তো বুঝতে ঠেলা, অমন দেবতার মতো স্বামী, তা-ও উঠতে-বসতে গঞ্জনা!'

বাবা বলতো, 'তোমার দিদি বুঝবে মজা একদিন—কর্তা মারা যাওয়ার পর ছেলেরা কী করে দেখো।'

আমাদের জ্ঞান হওয়া থেকে দেখে আসছি মাসিমাকে ওই একই রকম! আগে যখন মেসোমশাইয়ের অবস্থা খারাপ ছিল তখনও অভিযোগের অন্ত ছিল না। তারপর সংসারী মানুষের যা কিছু কাম্য, কিছু আর পেতে বাকি ছিল না মাসিমার। ঐশ্বর্য, সম্পদ, সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, সচ্ছলতা, পরিজন, দাসদাসী। তারপর ভবানীপুরের প্রাসাদতুল্য বাড়ি। মেসোমশাইয়ের বাড়ি নয় তো—রাজপ্রাসাদ! সমস্তই মেসোমশাইয়ের নিজের চেষ্টায়, নিজের সৎ উপার্জনে। জীবনে কারো ক্ষতি করেননি, কারো ওপর হিংসা নয়। দূরের কাছের যে-কেউ আত্মীয়-স্বজন বাড়িতে এসেছে, আদর এবং অভ্যর্থনা পেয়েছে, বাড়ির একজনের মতো থেকেছে। দিনে দিনে পরিজনের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। এ-সমস্তর মূলে একজনের অক্লান্ত অধ্যবসায় পরিশ্রম আর মানুষের সংসারে প্রতিষ্ঠালাভ করার ঐকান্তিক নিষ্ঠা। সমাজে মেসোমশাইয়ের প্রতিষ্ঠা বেড়েছে দিন দিন, কোর্টে পসার বৃদ্ধি পেয়েছে, পদোন্নতি হয়েছে। সম্মানের সর্বোচ্চ শিখরে উঠেছে একদিন। কিন্তু যখন দিন

গেলে পাঁচ টাকা এনে মাসিমার হাতে তুলে দিয়েছে তখনও যা, যেদিন পাঁচ হাজার এনে তুলে দিয়েছে সেদিনও তাই। সে-টাকায় সংসারেরই শুধু সমৃদ্ধি হয়েছে, ছেলে-মেয়েদের পোশাক-পরিচ্ছদের বাহার বেড়েছে কিন্তু মেসোমশাইয়ের পরিশ্রমের হ্রাস-বৃদ্ধি হয়নি। মাসিমার কাছে কোনোদিন কোনো মর্যাদারও তারতম্য হয়নি। মাসিমা ছেলে-মেয়েদের খাওয়ার তদারক যতখানি করেছে ততখানি করেনি মেসোমশাইয়ের!

মাসিমা সন্ধ্যে হতেই হুকুম দিয়েছে, 'খোকাবাবু তাজ লুচি খাবে, মনে থাকে যেন ঠাকুর, আর মন্টুর মাছের তরকারিতে যেন ঝাল দিয়ে বোসো না।'

ঠাকুর হয়তো বলেছে, 'বাবুর খাবারটা আগে দিয়ে দেবো, মা?'

মাসিমা ঝাঁঝিয়ে উঠে বলেছে, 'বাবুর খাবার পরে হবে, খোকাবাবু ঘুমিয়ে পড়লে আর খেতে চায় না, জানো না?'

বড়ছেলের বিয়েতে নিমন্ত্রিত বহু লোকজন এসে খেয়েদেয়ে গেল। হাজার লোকের খাওয়ার আয়োজন হয়েছিল। রাত তখন বারোটা। সবাই খেয়েদেয়ে ঘুমোতে যাবার আয়োজন করছে। হঠাৎ কে যেন বললে, 'বড়বাবু তো কই খাননি।'

খবর পেয়ে সবাই লজ্জিত সঙ্কুচিত।

মাসিমা খাবার ঘরের সামনে এসে অত লোকের সামনে চেঁচিয়ে উঠল, 'হ্যাঁ গা, তোমায় অকম্মা বলি কি সাধে, খেতে ভুলে গেলে কী বলে তুমি? এইটুকু উপকার তোমায় দিয়ে হয় না, আমার কি একটা কাজ, আমি একলা মানুষ কত দিকে নজর দেবো?'

কত জায়গায় একে একে বদলি হল মেসোমশাই। মেসোমশাইয়ের কোর্টে যাবার কথা কিন্তু কারো মনে থাকে না সচরাচর। ঠিক সময়ে খাবার দেওয়ার কথাও কেউ ভাবে না। ঠিক সময়ে তৈরি হয়ে এসে মেসোমশাই দ্যাখে খাবারের কোনো আয়োজনই হয়নি।

মাসিমা এসে হাজির হয়। বলে, 'যখন একলা এই শরীরে সংসার ঠেলেছি, তখন তো কই ভাত দিতে কখনও দেরি হয়নি, এখন কেন হয়?'

মেসোমশাই বলে, 'কেন হয় তা তুমিই জানো।'

মাসিমা বলে, 'আমার জানতে বয়ে গেছে, তুমিই দেখ, গাদা গাদা লোক রেখেছ, বোঝ এখন যে আমার মতো গিন্নি পেয়েছিলে বলেই তুমি এ যাত্রা টিঁকে গেলে। তুমি কি ভেবেছ চিরটা কাল তোমার সংসারে বাঁদীগিরি করবো বলেই জন্মেছি, আমার আর নিজের সুখ-আহ্লাদ বলে কিছু নেই? পারবো না আমি দেখতে তোমার ভূতের সংসার, তুমি থাকো তোমার সংসার নিয়ে, আমি পারবো না। যতদিন গতর ছিল দেখেছিলাম, আর নয়, ঢের হয়েছে, সংসার করার সাধ আমার খুব মিটে গেছে—।'

সংসারে শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মাসিমারও শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে দেখতাম। মাসিমাকে দেখলেও আর চিনতে না পারার কথা। নাতি-নাতনী, পুত্র-পৌত্র পুত্রবধূদের ঘিরে বিকেলবেলা মাসিমা যখন বারান্দায় বসে, তখন সে এক দৃশ্য। এক বউমা মাসিমার চুল বেঁধে দিচ্ছে, আর একজন সামনে বসে তরকারি কুটছে শাশুড়ীকে জিজ্ঞেস করে করে।

'মন্টুর কপির তরকারিতে গরমমসলা দিতে বারণ করো, ছোট বউমা।'

'খুকুর বাটিতে আজ যেন দুধ রেখো না, ক'দিন থেকে পেটের অসুখ করেছে, তোমরা তো কেউ দেখবে না—'

'ভোলা আজ লুচি খাবে না বলেছে, ওর জন্যে তিজেল-হাঁড়িতে একমুঠো ভাত করে দিয়ো।'

'পল্টুর দুধটা একটু ঘন করবে ঠাকুর, পাতলা দুধ খেতে পারে না ও, জানো তো।'

এমনি তদারক চলে মাসিমার সারাদিন ধরে।

হঠাৎ হয়তো কেউ বললে, 'মা, কর্তাবাবু কোর্টে চাবি নিয়ে যেতে ভুলে গেছেন।'

মাসিমা বলে, 'জানিনে বাপু, সারাদিন কোন্ রাজকার্য করেন ভগবান জানেন। আমার শতেক কাজ, এত ঝঞ্ঝাটের মধ্যে কর্তার চাবির কথা সে-ও আমাকেই ভাবতে হবে, পারবো না আমি অত। সংসারের একটা কুটো নেড়ে তো ও-মানুষের উপকার নেই, বাইরে বাইরে কেবল গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়াচ্ছেন, আর আমার ঘাড়ে সংসার চাপিয়ে দিয়ে মজা দেখছেন! পারবো না আমি, যার যা খুশি করুক, খবরদার, আমাকে কেউ কিছু বলতে আসিসনে, ভালো হবে না।'

তা এমনি করে মাসিমার দাম্পত্য-জীবন কত বছর চলতো কে জানে। সংসার তখন জম-জমাট। মেসোমশাই প্রতিষ্ঠার সু-উচ্চ শিখরে উঠেছে। মাসিমারও চুল পেকে গেছে। সম্পদ আর ঐশ্বর্যের সীমা নেই! এমন সময় মেসোমশাই হঠাৎ রোগে পড়ল। ভীষণ রোগ। সকালবেলা কলঘরে গিয়ে কী যে হল আর বেরোয় না। শেষে জানা গেল কপালের শিরা ছিঁড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছে। আত্মীয়-স্বজন যে-যেখানে আছে সবাই ছুটে গেল।

মাকে সঙ্গে নিয়ে আমিও ছুটে গেলাম খবর পেয়ে।

সমস্ত বাড়িতেই একটা থমথমে ভাব। ঝি-চাকর, নাতি-নাতনী সবাই সন্ত্রস্ত। শুনলাম মাসিমা সেই যে মেসোমশাইয়ের পাশে গিয়ে বসেছে আজ দু'দিন, আর ওঠেনি। নাওয়া-খাওয়া নেই! কারো কথা শুনবে না। সবাই বলে বলে হার মেনেছে।

মাকে দেখে মাসিমা উঠে এলো। চোখে জল নেই। শুকনো খট্‌খটে। রাগে যেন চোখ দুটো শুধু লাল জবাফুল হয়ে আছে। বললে, 'এসেছিস তুই, দেখে যা

ও-মানুষের কাণ্ড, সংসারের একটা উপকার করা দূরে থাক, এই অসুখে পড়ে আমাকে একেবারে জ্বালিয়ে খাচ্ছেন! ও মানুষ কি সোজা মানুষ ভেবেছিস, আমার ঘাড়ে সংসার চাপিয়ে দিয়ে নাচতে নাচতে এখন পালাবার মতলব ওঁর।'

মা বললে, 'রাঙাদি, তুমি নিজের শরীরটার দিকে একবার চেয়ে দ্যাখ।'

মাসিমা বললে, 'আমার নিজের শরীরের কথা যদি ভাববো, তাহলে যে আমার সুখ হবে রে—। আমার সুখ দেখলে ও-মানুষের বরাবর পিত্তি জ্বলে যায়, আমার হবে সুখ, বিয়ে হওয়া এস্তোক চিরটা কাল আমায় জ্বালিয়েছে ও-মানুষ। সুখ বলে কী দ্রব্য জীবনে জানতে পারিনি—সুখের আমার হবে কি বোন, সারাটা জীবন আমায় জ্বালিয়েছেন, এখন মরে গিয়ে পর্যন্ত আমায় জ্বালাবার মতলব ওঁর—উনি কি সোজা মানুষ ভেবেছিস?'

মাসিমার শেষজীবনটাও আমরা দেখেছি। মেসোমশাই মারা যাবার আগে তার যাবতীয় সম্পত্তি মাসিমার নামে লিখে দিয়েছিল। ভবানীপুরের বিরাট বাড়ি। নগদে আর স্থাবর-অস্থাবরে মিলিয়ে প্রায় সাত লক্ষ টাকার সম্পত্তি! ছেলেদের আগেই মানুষ করে গিয়েছিল মেসোমশাই। সব মেয়েদের বিয়েও দিয়ে দেওয়া হয়েছিল শেষ পর্যন্ত। কোথাও কোনো ত্রুটি নেই।

মাসিমা বলতো, 'মরণ আমার, সারাজীবন এক দণ্ড সুখ দেয়নি যে মানুষ, ওঁর সম্পত্তি নিয়ে আমি রাজা হব, দেখিস, আমি ওঁর সম্পত্তির একটা পয়সা ছুঁয়েছি কিনা, হাত দিয়ে, আমার সোনার টুকরো ছেলেরা বেঁচে থাকুক, ছেলেরা থাকতে কর্তার পয়সায় আমার দরকার নেই মা, আমি কর্তার পয়সার কখনও পিত্যেশ করিনি, আর কখনও করব না।'

তা সত্যিই, মাসিমা মেসোমশাইয়ের পয়সা। প্রত্যাশা করেনি।

আমাদের দেশে যখন যাই, বড় হাসপাতালটার দিকে চেয়ে আমার সব কথা মনে পড়ে যায়, মেসোমশাইয়ের নামেই হাসপাতাল। মেসোমশাইয়ের সেই প্রাসাদ তুল্য বাড়িটা মায় সমস্ত সাত লাখ টাকার সম্পত্তি, সব মাসিমা দান করে গিয়েছিল। শেষজীবনটা ছেলেদের ছোট বাড়িতে কেটেছে তার। অতবড় বাড়িতে ঐশ্বর্যের মধ্যে এতদিন কাটিয়েও এখানে কোনও অসুবিধে হত না।

মেসোমশাইয়ের নামে হাসপাতাল যেদিন প্রতিষ্ঠা হল সেদিনও মাসিমা একবার দেখতে গেল না। যাঁর টাকা তাঁরই নামে হাসপাতাল। প্রকাণ্ড মিটিং হল। মেসোমশাইয়ের গুণকীর্তন করে কত লোক কত কী বক্তৃতা দিলে। সামান্য অবস্থা থেকে কেমন করে ধনী হয়েছিলেন সেই ইতিহাস। এতটুকু অহংকার ছিল না, বিদ্বেষ ছিল না। অনলস কর্মপ্রাণ মহাপুরুষ। কর্মই ছিল তাঁর ধ্যান জ্ঞান নিদিধ্যাসন। জীবনে একমুহূর্তের জন্যে তিনি অলস হননি। প্রতিটি মুহূর্ত তাঁর কর্ম-সাধনায় কেটেছে। তিনি কর্মপ্রাণ, কর্মপ্রতীক, কর্মবীর মানুষ। শেষে তাঁর বিধবা স্ত্রীর দানশীলতা ও অচলা পতিভক্তির জন্যে ধন্যবাদ জানিয়েও একটা

প্রস্তাব পাঠ করা হল সভায়। আদর্শ হিন্দু রমণী হিসেবে মাসিমার নামও লেখা রইল হাসপাতালের খাতায়।

তবু হাসপাতালটার দিকে চাইলেই আমার কেবল মনে পড়তো মাসিমার কথাগুলো, 'সারাজীবন আমাকে জ্বালিয়ে খেয়েছে রে সে-মানুষ, আর তাঁর টাকা ছোঁবো আমি, ওই অকম্মা লোকের হাতে পড়ে আমার সারাজীবন জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে গেছে, আমার সোনার টুকরো ছেলেরা বেঁচে থাক, তাদের খুদকুঁড়ো যা জোটে তা-ই খাবো, তবু সে-মানুষের টাকা আমি ছুঁচিছনে, দেখে নিস তুই—'

চল্লিশ বছরের বিবাহিত জীবন আর একুশ বছরের বিধবা-জীবন—এই এত-দিনের একনিষ্ঠ পতিনিন্দার পরে যথারীতি একদিন সকালে মাসিমার মৃত্যুর খবর শুনে চমকেও উঠেছিলাম মনে আছে।

যে গল্প লেখা হয়নি

মাত্র দু'রতি ওজনের একটুকরো হীরে। তাই নিয়েই একটা গল্প মাথায় এসেছিল। গল্পটা লেখবার আগে উষাপতিকে একটা চিঠি লিখেছিলাম তার অনুমতি চেয়ে।

উষাপতি উত্তরে লিখেছিল, 'সতীকে নিয়ে গল্প তুই লিখতে পারিস, তাতে আমার কোনও আপত্তি নেই, কিন্তু দেখিস ভাই, যাতে সতীর কোনো দুর্নাম হয় বা বদনাম হয় আমাদের, এমন কিছু লিখিসনে। জানিস তো, মেয়েমানুষের মন, চট করে এমন কাণ্ড করে বসবে—'

আরো অনেক কথা লিখেছিল। উষাপতি তখন ছিল পলাশপুরের স্টেশন-মাস্টার। এখন বদলি হয়েছে রায়গড়ে। মাইনেও অনেক বেড়েছে। দু'পয়সা এদিক-ওদিক থেকেও আসে। নিজেও বেশি খরচে স্বভাবের লোক নয়। কিন্তু চিঠির শেষে লিখেছে, 'তোদের ওখানে যদি ভালো কোনো ডাক্তার থাকে, একটু খবর দিয়ে জানাস, সতীকে চিকিৎসা করাতে চাই। অনেক ডাক্তার, বদ্যি, হাকিম, সাধুকে দেখালাম—খরচও হচ্ছে প্রচুর—কিন্তু কিছুই হচ্ছে না—'

উষাপতির অনুমতি নিয়ে গল্পটা লিখতে আরম্ভ করেছিলাম বটে। কিন্তু লিখতে গিয়ে হঠাৎ কেমন হাসি এলো। সতীকে নিয়েই গল্পটা বটে! উষাপতিকে অবশ্য জানাইনি দু রতি ওজনের হীরের কথা। জানিয়েছিলাম সতীই আমার গল্পের নায়িকা। কিন্তু আসলে তো জানি যে, সতী আমার গল্পের উপনায়িকা ছাড়া আর অন্য কিছুই নয়। শকুন্তলার যেমন প্রিয়ংবদা! কিন্তু সেই রাত্রের অন্ধকারে আমার ঘরে কে এসেছিল? এ গল্পের নায়িকা না উপনায়িকা?

সত্যি সেই রাত্তার মধ্যেও যেন কিছু মোহ ছিল। সেটা বুঝি ফাল্গুনী পূর্ণিমার রাত। জীবনে কতদিন জীবিকার জন্যে রাতের পর রাত কাটিয়েছি তার হিসেব নেই। অফিসের চারটে দেওয়ালের মধ্যে কাজ করতে করতে অনেকবার বাইরে চেয়ে দেখেছি। কেমন করে রাতের গাঢ় অন্ধকার পাতলা হয়ে নীল হয়, সেই নীল কেমন করে সাদা হয় তাও লক্ষ্য করেছি। কিন্তু তবু মনে হয়েছে রোজই যেন নতুন দৃশ্য দেখছি। দশ বছর আগের সেই রাতটা যেন আজো আমার জীবনে অনন্য আর একক হয়ে রয়েছে। পলাশপুরের স্টেশন-মাস্টারের বাঙলোর সেই সংগীহীন ঘরে সারারাত তো আমার অনিদ্রাতেই কেটেছিল। তবু সকালবেলা জলখাবার খেতে বসে উষাপতি অবাক হয়ে গিয়েছিল আমার চেহারা দেখে।

বলেছিল, 'রাত্রে তোর ঘুম হয়নি নাকি?'

বলেছিলাম, 'না।'

উষাপতি বলেছিল, 'আমারও হয়নি।'

কী জানি কেমন যেন সন্দেহ হয়েছিল। বলেছিলাম, 'কেন, তোর হয়নি কেন ?'

উষাপতি চায়ে চুমুক দিতে দিতে বলেছিল…

কিন্তু যা বলেছিল, তা বলবার আগে গোড়া থেকে সমস্ত ঘটনাটাই বলা দরকার।

উষাপতি তখন সবে বদলি হয়েছে পলাশপুরে। নতুন বিয়ে করে সংসার পেতেছিল ওখানে। ওর অনেকদিনের সাধ ছিল আমাকে ওর বউ দেখায়। চিঠিতে লিখেছিল কতবার। নাকি বেশ নিরিবিলি জায়গা। অন্তত কলকাতার চেয়ে নিশ্চয়ই নিরিবিলি। চার-পাঁচটা কোলিয়ারীর সাইডিং শুধু বেরিয়ে গেছে স্টেশন থেকে। কোলিয়ারী ছাড়া স্টেশনের আর কোনো উপযোগিতাও ছিল না। মাঝে মাঝে চিঠি লিখতো আমাকে, 'এবার শীতকালে নিশ্চয়ই আসিস। তোর জন্যে সব ব্যবস্থা করে রেখেছি।'

কিন্তু যাওয়া আমার হয়ে ওঠেনি। উষাপতি যখনই ছুটিতে এসেছে, দেখা করেছে আমার সঙ্গে। বলেছে, 'আমার ওখানে গেলি না তো একবার!'

বিশেষ করে, স্টেশন মাস্টারের বাড়িতে অতিথি হওয়ার একটা লোভও ছিল বরাবর। মুরগি, মাছ, ডিম, ঘি—সবই স্টেশন-মাস্টারের প্রায় বিনা-পয়সায় প্রাপ্য। আকারে-প্রকারে উষাপতি আমাকে জানিয়েও দিয়েছে সে-কথা। কিন্তু নিজের কোটর ছেড়ে নড়া-চড়া করার সুবিধে কখনও হয়ে ওঠেনি বলে যাওয়াও হয়নি ওর কাছে।

কিন্তু সেবার বম্বে যাবার পথে কেমন করে যে কাটনী স্টেশনে হঠাৎ নেমে পড়লাম, তা নিজেই জানি না। কাটনী থেকে কয়েকটা স্টেশন গেলেই পলাশপুর। ব্রাঞ্চ লাইনের ট্রেন। একটা রাত থাকবো ওখানে, তারপর পরদিন আবার ফিরবো। এই-ই মতলব।

যখন গিয়ে পলাশপুরে পৌঁছলাম তখন বিকেল।

স্টেশনে দাঁড়িয়ে ছিল উষাপতি। সাদা গলাবন্ধ কোট পরলেও চিনতে কষ্ট হল না। আমাকে দেখেই একেবারে জড়িয়ে ধরেছে।

বললাম, 'কিন্তু কালকেই আমাকে ছেড়ে দিতে হবে ভাই, ভীষণ কাজ—'

'সে হবে না' বলে কাকে যেন হুকুম দিলে আমার মালপত্তোর বাড়িতে নিয়ে যেতে।

তা পলাশপুর বেশ বড় স্টেশন। সব গাড়ি জল নেয় এখানে। বাইরে বিরাট একটা খেলার মাঠ। জাফরি-দেওরা বড় বড় বাঙলো। রাস্তায় ফিরিঙ্গী সাহেব-মেমদের ভিড়। সাইকেল-রিকশার চলন আছে বেশ এদিকে। বিকেলবেলার গাড়ি দেখতে প্ল্যাটফরমে টাউনের লোক এসে জুটেছে। গাড়ি চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আবার সব চলে গেল প্ল্যাটফরম থেকে। ফাঁকা স্টেশন।

উষাপতির হাজার কাজ। দশজনকে হুকুম দিতে হয়। দশজনকে শাসন করতে হয়।

কাজের ফাঁকে একবার বললে, 'আর একটু বোস, একসঙ্গে যাবো বাড়িতে— আর এই কাজটা সেরে নি'।

শেষ পর্যন্ত একসময় কাজ সেরে উঠলো উষাপতি। বললে, 'আর পারিনে কাজের ঠেলায়! এই দ্যাখ্ না, তুই এলি, তোর সঙ্গে একটু ভালো করে কথা পর্যন্ত বলতে পারলাম না—যা হোক, তারপর কাল কিন্তু তোর যাওয়া হবে না বলে রাখছি—ওসব ওজর আপত্তি শুনছিনে।'

বললাম, 'তা হয় না রে। ওদিকে একদিন দেরি হলে ভারি অসুবিধে হবে আবার—'

'সে কৈফিয়ত দিস তুই মিলির কাছে, তার হাতে তোকে ছেড়ে দিয়ে আমি খালাস, ভাই—বাড়ির ব্যাপারে আমি নাক গলাই না। বাড়ির মধ্যে ঢুকেছ কি আমার এলাকার বাইরে চলে গেলে—সেখানে মিলির কথাই ফাইন্যাল।'

বললাম, 'পুরোপুরি ডিভিসান-অব-লেবার দেখছি।'

উষাপতি সিগ্রেট টান দিতে দিতে বললে, 'না করে উপায় ছিল না, ভাই। আমার অফিসের এত কাজ যে, এর পরে আর বাড়ির কোনো ব্যাপারে মাথা ঘামাবার ফুরসুত পাই না, ওটা মিলি নিজেই ঘাড়ে নিয়েছে, বলেছে,—বাড়ির ব্যাপারে আমায় সম্পূর্ণ স্বরাজ দিতে হবে। তা এমনকি, ওর চিঠি পর্যন্ত আমি খুলে পড়তে পারবো না, ও-ও আমার চিঠিপত্র খুলবে না।'

তারপর একটু থেমে বললে, 'এই যে তুই এলি, কী খাবি না-খাবি—সমস্ত ভাবনা তার। কোথায় শুবি, কী করবি—ও নিয়ে আমায় আর মাথা ঘামাতে দেবে না।'

বললাম, 'এরকম স্ত্রী পাওয়া তো সৌভাগ্যের কথা রে।'

উষাপতি হাসলো। বেশ যেন পরিতৃপ্তির হাসি। বললে, 'তা জানিনে। তবে যারা এসেছে বাড়িতে, দেখেছে মিলিকে, তারা বলে,—আমার নাকি স্ত্রীভাগ্য ভালো। তবে বিয়ে তো একটাই করেছি, তুলনামূলক বিচার করতে পারবো না ভাই।'

উষাপতি আবার বলতে লাগলো, 'আমি অবশ্য তোদের অনেক পরে বিয়ে করেছি, বলতে পারিস একটু বুড়ো বয়সেই। মনে একটা ভয় ছিল বরাবর, এ-বয়েসে বিয়ে করে হয়তো আর-একজনকে কষ্ট দেবো—কিন্তু'...

'কিন্তু' বলে কথাটা আর শেষ করলো না উষাপতি। আত্মতৃপ্তির এক বাঙ্ময় হাসিতে আবার ভরে উঠলো উষাপতির মুখ। সে-হাসি গোপন করতে চেষ্টা করলো না উষাপতি।

বললাম, 'তাহলে বিয়ে করে খুব সুখী হয়েছিস বল্—বিয়ে করবো না বলে

যেরকম পণ করেছিলি তুই—'

উষাপতি আবার হাসলো। বললে, 'সুখী ?···তবে আমি মিলিকে বলেছিলাম বি. এ. পরীক্ষাটা দিয়ে দিতে, কারণ বরাবর ফার্স্ট ডিভিসনে পাস করে এসেছে —শেষকালে আমাকে না দোষ দেয় যে, তোমার জন্যে আমার ডিগ্রীটা পাওয়া হল না ! তা কী বলে জানিস— ?'

বললাম, 'কী বলেন ?'

'মিলি বলে···'

কিন্তু মিলি কী যে বলে তা আর বলা হল না। হঠাৎ ল্যাজ নাড়তে নাড়তে একটা বিলিতী টেরিয়ার কুকুর এসে আপ্যায়ন জানাতে লাগলো উষাপতিকে। উষাপতি বললে, 'আরে, তুই ঠিক টের পেয়েছিস দেখছি !'

বললাম, 'তুই আবার কুকুর পুষেছিস নাকি ?'

'আরে আমি পুষতে যাবো কেন ? মিলির। মিলির ছোটবেলাকার কুকুর, বিয়ের পর এ-ও এসেছে সঙ্গে···যাক্‌গে যে-কথা বলেছিলাম—' বলে উষাপতি আবার পুরনো প্রসঙ্গে ফিরে এল।

গলা নিচু করে হাসতে হাসতে বললে, 'কালকে আমাদের বিয়ের বার্ষিকী গেছে কিনা—খুব খাওয়া-দাওয়া হয়েছিল, কুকুরটা খুব খুশী আছে তাই, তা সেই উপলক্ষে হীরে-বসানো নেকলেস একটা দিয়েছি ভাই মিলিকে—আনিয়েছি কলকাতা থেকে। তুই একবার দেখিস তো—বেটারা ঠকালো, না ঠিক দাম নিয়েছে।'

বললাম, 'কত দাম নিলে ?'

'চোদ্দশো টাকা নিয়েছে অবশ্য, তা নিক্‌গে, সেজন্যে কিছু নয়। উপরি পয়সা ওয়াগন পিছু কিছু-কিছু পাওয়া যায়, কোলিয়ারী যদ্দিন আছে ভাই, টাকার অভাবটা নেই তদ্দিন। তারপরে যদি বদলি করে কখনও কোনো খারাপ স্টেশনে তখন দেখা যাবে—'

কথা বলতে বলতে উষাপতির বাঙলোর সামনে এসে গিয়েছিল্যম। উষাপতির আভাস পেয়ে বুঝি তার স্ত্রীও এসে দাঁড়ালো সামনে। আমাকে অবশ্য আশাই করছিল। কারণ আমার স্যুটকেস, বিছানা আগেই পৌঁছে গেছে এখানে।

কিন্তু উষাপতির স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে কেমন যেন থম্‌কে গেলাম। আমাকে দেখে যেন কালো হয়ে এল তার মুখখানা।

তবে এক মুহূর্তের জন্যে ! এমন কিছু নজরে পড়বার মতো নয়।

উষাপতি এগিয়ে গিয়ে বললে, 'এই দ্যাখো, কাকে এনেছি। আমাদের দলের হীরো এ—আর ইনি—'

আলাপ হল। এবার হাসিমুখে অভ্যর্থনা করলেন মিলি দেবী। টেবিলে গিয়ে বসলাম। চায়ের সরঞ্জাম তৈরি ছিল।

চা তুলে নিয়ে উষাপতি বললে, 'কিন্তু ও কী বলছে জানো, ও নাকি কালই চলে যাবে।'

মিলি দেবী হঠাৎ অবাক হয়ে আমার দিকে চাইলেন, 'সেকি! তা বললে শুনছি না, কাল আপনার যাওয়া চলবে না।'

উষাপতি বললে, 'এখন তোমার হাতে ভার দিয়ে দিলাম—আমার আর কিছু করবার নেই। যা ভালো বোঝ করো।'

মিলি দেবী হাসতে হাসতে বললেন, 'তাই নাকি?'

বললাম, 'ক্ষমা করবেন এবার। পরের বার বরং থাকবো যতদিন বলেন, এবারে বিশেষ জরুরী কাজে—

মিলি দেবী বললেন, 'বাড়িতে যখন আমার এলাকার মধ্যে এসেছেন, তখন আপনাকে দু'দিন থেকে যেতেই হবে···আমরা বিদেশে পড়ে থাকি, একটু বুঝি দয়া-মায়া নেই আপনাদের!'

উষাপতি হাসতে লাগলো।

হাসতে লাগলাম আমিও।

মিলি দেবীও হাসতে লাগলেন।

কথা বলতে বলতে উষাপতি হঠাৎ বললে, 'তোমার নেকলেসটা দাও তো একবার, দেখাই।'

বললাম, 'আমি তো এখান থেকেই দেখতে পাচ্ছি বেশ—ও'র গলাতেই তো মানাচ্ছে ভালো। কেন আর—'

উষাপতি বললে, 'না না, তা কি হয়। হারটা খুলে দাও—বেটারা ঠকালো কিনা জেনে নেওয়া ভালো। ও আমাদের ভালো সমঝদার একজন, ওদের ফ্যামিলিতে এসব জিনিস আছে অনেক।'

মিলি দেবী নেকলেসটা খুললেন। বেশ চমৎকার জিনিসটা মনে হল। দেখে মনে হল, ন্যায্য দামই নিয়েছে। নতুন ডিজাইনের জড়োয়ার-কাজ-করা হার। ঠিক লকেটের ওপর একটা দু'রতির হীরে জ্বলজ্বল করছে।

হারটা ফিরিয়ে দিয়ে বললাম, 'বড় সুন্দর জিনিস—আপনার পছন্দ আছে বউদি।'

মিলি দেবী খানিক পরে চলে যাবার পর উষাপতি বললে, 'বেশি বয়েসে বিয়ে করলে এইসব গুনোগার দিতে হয় ভাই।'

বললাম, 'কেন? এ কথা বলছিস কেন?'

উষাপতি সে-প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে কী একটা কাজে পাশের ঘরে চলে গেল। আমিও এদিক ওদিক চেয়ে দেখতে লাগলাম। বড়লোক হয়েছে উষাপতি এখন। জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুন্দরী স্ত্রী পেয়েছে। শুধু সুন্দরী স্ত্রী নয়, সুশিক্ষিতা বিদুষী বলা চলে। হয়তো উষাপতি নিজের ঐশ্বর্য দেখাতেই আমাকে

এতবার আসতে নিমন্ত্রণ করেছিল। তবু খুশি হলাম দেখে যে, তার জীবন সার্থক হয়েছে। বিয়ে করে সুখী হয়েছে সে। বাপ-মা-মরা উষাপতি। বড় গরীব ছিল আমাদের দলের মধ্যে। বরাবর ওর উচ্চাশা, একদিন আমাদের সমান পর্যায়ে এসে দাঁড়াবে। এতদিন পরে তা সফল হয়েছে। দেখে আনন্দই হল।

অনেকদিন আগেকার কথা। ভালো করে সব মনে নেই। শুধু মনে আছে বেশ আনন্দে, হাসিতে, গল্পে কেটে গেল সে-সন্ধ্যেটা। আরো মনে আছে বার বার মিলি দেবী কেবল বলেছেন : 'কাল আপনার যাওয়া হবে না তা বলে, আর একটা দিন থাকতেই হবে।'

সেই রাত্রেই ঘটনাটা ঘটলো।

ঠিক কত রাত্রে বলতে পারবো না। নতুন জায়গায় ঘুম আসছিল না। মনে হল ভেজানো দরজাটা খুলে কে যেন ঘরে ঢুকলো। নিস্তব্ধ রাত। শুধু মাঝে মাঝে রেলের ইঞ্জিনের ফোঁসফোঁসানি আর আক্রোশের গর্জন কানে আসে।

বললাম, 'কে ?'

ছায়ামূর্তি বললে, 'আমি—'

বিছানার ওপর সটান উঠে বসেছি। অস্পষ্ট হলেও অনুমান করে নিতে কষ্ট হল না।

বললাম, 'আপনি ! হঠাৎ ?'

মিলি দেবী বলে উঠলেন, 'আপনি এখানে আসতে পারেন হঠাৎ, আর আমি আসতে পারি না ? এ আমার বাড়ি, আমার স্বামীর ঘর, আমি এখানে খুব সুখে ছিলাম—কেন তুমি এলে ? বলো, সত্যি কথা বলো—কে তোমাকে এখানে পাঠিয়েছে ?'

হতচকিত নির্বাক বিস্ময়ে আমার কণ্ঠরোধ হয়ে এল।

বললাম, 'কী বলছেন আপনি !'

'চীৎকার কোরো না, পাশের ঘরে আমার স্বামী শুয়ে আছেন। তুমি ললিতকে বোলো, মিলি তাকে ভুলে গেছে। কাঁসারিপাড়া লেন-এর সে-বাড়িটা সে-ঘরটা আমার আর মনে নেই, আমি এখন মিলি মল্লিক—আমি এখন পরস্ত্রী…'

আবার বললাম, 'আমি কিছু বুঝতে পারছি না।'

'মিথ্যে কথা বোলো না, আমি তোমাদের সবাইকে চিনি। ললিত তোমার ভাগ্নে নয় ? বোটানিক্যাল গার্ডেনে পিক্‌নিক্ করতে আমাদের সঙ্গে যাওনি তুমি ? ইন্টারমিডিয়েট টেস্ট পরীক্ষা দিয়ে ট্যাক্সি করে কারা ঘুরিয়েছিল আমাকে ! আমরা গরীব ছিলুম, তাই তোমাদের সাহায্য আমরা তখন নিয়েছি। কিন্তু এখন তো আমি বড়লোকের স্ত্রী ! এখন তোমাদের প্রয়োজন আমার মিটে গেছে ! এখন শাড়ি দিতে এলেও নেব না, গয়না দিতে এলেও নেব না আমি, সিনেমা দেখাতে এলেও যাবো না তোমাদের সঙ্গে—কেন এসেছ তুমি ? একজনকে পাগল করে দিয়েছ বলে

ভেবেছ আমাকেও করবে ? সত্যি বলো তো, কিছু মনে পড়ছে না ?'

ললিত নামে কোনো ভাগ্নে দূরে থাক, ও-নামের কোনো বন্ধুও আমার কোনও কালে ছিল না। কী জানি কী খেয়াল হল, বললাম, 'পড়েছে।'

'ললিত তোমায় পাঠিয়েছে ? সত্যি কি না বলো ?'

এবারও বললাম, 'হ্যাঁ।'

'আমি তোমাদের সকলকে চিনি, জানতাম না আমার স্বামীর সঙ্গে তোমার বন্ধুত্ব আছে—কিন্তু তোমাদের পায়ে পড়ি, আর কখনও এসো না এখানে, যাও, কাল সকালেই চলে যেয়ো এখান থেকে—বুঝলে ?'

বললাম, 'যাবো।'

'হ্যাঁ, তাই যেয়ো।'

শরীরটাতে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে মিলি দেবী যেমন এসেছিলেন তেমনি চলে গেলেন।

তারপর সমস্ত রাত আমার আর ঘুম এল না। মনে হল—কার ভুল ? আমার, না, মিলি দেবীর ? আর কখনো কোথাও ওকে দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না। কে ললিত ! কার ভাগ্নে ! কবে কার সঙ্গে বোটানিক্যাল গার্ডেনে ঘুরেছেন ! কবে ঘুরে বেড়িয়েছেন ট্যাক্সিতে ! আমার চেহারার সঙ্গে কি অন্য কারো চেহারার বা নামের মিল আছে ? নিজের স্মৃতির অলি-গলি-ঘুঁজি সমস্ত তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কোনো কিনারা করতে পারিনি।

ভোরবেলাই বিছানা ছেড়ে উঠেছি।

উষাপতি তারও আগে উঠেছে। চায়ের টেবিলে পোশাক পরে তৈরি সে। এখনি বোধ হয় ডিউটিতে যাবে। পাশে কালকের মতো মিলি দেবীও বসে। কিন্তু চেহারার মধ্যে কোনো বৈলক্ষণ্য নেই যেন।

উষাপতি আমাকে দেখেই বললে, 'কাল রাত্রে তোর ঘুম হয়নি নাকি ? এরকম চেহারা কেন রে ?'

বললাম, 'না, নতুন জায়গা বলে হয়তো।'

উষাপতি বললে, 'আমারও হয়নি'।'

জিগ্যেস করলাম, 'কেন ?'

উষাপতি বললো, 'সতী কাল রাত্রে বড় বিরক্ত করেছে।'

'সতী ! সতী কে ?' জিগ্যেস করলাম।

মিলি দেবী চা ঢালতে ঢালতে বললেন, 'আমার দিদি।'

উষাপতি বললে, 'হ্যাঁ, মিলির দিদি। মাথাটা সম্প্রতি খারাপ হয়েছে, পাগলের মতো লক্ষণ, আমার এখানেই রয়েছে এখন।'

হঠাৎ যেন কেমন সন্দেহ হল। মিলি দেবীর মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম। শান্ত, পরিতৃপ্ত, স্নিগ্ধ দৃষ্টি। কাল রাত্রে তবে কি ভুল দেখেছি ! পাগলের প্রলাপ শুনেছি কেবল ?

উষাপতি আবার বললে, 'মাঝে মাঝে বেশ থাকে, কাল রাত থেকে আবার হঠাৎ কিরকম মাথাটা বিগড়ে গেছে—সারা বাড়িময় ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছে, চীৎকার করেছে, বকেছে—কেঁদেছে—'

উষাপতি আমাকে নিয়ে গিয়ে দেখালে। একটা ঘরের ভেতরে বন্ধ। অবিকল মিলি দেবীর মতো দেখতে। বয়সে দু'-এক বছরের ছোট-বড় হয়ত। ঘরের মধ্যে আপন মনেই বিড়বিড় করে বকছে।

উষাপতি বললে, 'এখন ওইরকম কিছুদিন থাকবে, তারপর আবার কিছুদিন ভালো হয়ে যাবে—স্বামী নেয় না, তারপর থেকেই···কিন্তু তুই আজকে থাকছিস তো ?'

বললাম, 'না ভাই, আজ পারবো না থাকতে।'

উষাপতি মিলির দিকে চেয়ে বললে, 'ও কী বলছে শোনো—থাকবে না নাকি আজ।'

মিলি দেবী তেমনি স্নিগ্ধ হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন। বললেন, 'তা হবে না, থাকতেই হবে কিন্তু—'

চা খেতে খেতে হঠাৎ উষাপতি একবার স্ত্রীর দিকে কৌতূহলী হয়ে যেন কী দেখতে লাগলো। কাছে গিয়ে গলার নেকলেসটা দেখে বললে, 'একি ! তোমার লকেটের হীরে কোথায় গেল ?'

'কই দেখি ? কী সর্বনাশ !'

আমিও দেখলাম।

মিলি দেবীও নেকলেসটা খুলে দেখে অবাক হয়ে গেছেন। তাই তো ! কাল সন্ধ্যেবেলাও তো ছিল সেটা ! কোথায় গেল একরাত্রের মধ্যে। খোঁজো তো বিছানাটা। বিছানাটা খোঁজা হল। খোঁজা হল ঘর-দোর। এখানে-ওখানে। ব্যস্ত হয়ে পড়লো উষাপতি। ব্যস্ত হয়ে পড়লেন মিলি দেবী। কোথাও তো যাওনি ? দ্যাখো তো বাথরুমটা ! যাবে কোথায় ? হাওয়ায় উড়ে যেতে পারে না। শোবার ঘর, হলঘর, আর নয়তো বাথরুম !

কিন্তু বৃথা চেষ্টা ! সেদিন কোথাও সেই দু'রতি ওজনের হীরে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। উষাপতি আর মিলি দেবীর কাছে আজ পর্যন্ত সেটা নিরুদ্দেশ হয়েই আছে হয়তো !

মনে আছে সেদিন কারো অনুরোধ উপরোধ না-শুনেই চলে এসেছিলাম পলাশপুর থেকে !

ফিরে এসে গল্পটা সমস্ত লিখে পাঠিয়েছিলাম উষাপতির কাছে। আপত্তির কিছু আছে কিনা জানতে। উত্তরে উষাপতি লিখেছিল, 'মিলিও তোর গল্পটা মন দিয়ে পড়েছে। বলেছে,—গল্পটা ভালো হয়েছে, কিন্তু যেন অসম্পূর্ণ মনে হল লেখাটা। দু'রতি হীরের কথাটা গল্পের পক্ষে নাকি অবান্তর হয়ে গেছে।

গল্পের সঙ্গে ওর যোগাযোগ কী বোঝা গেল না, আমি অবশ্য সাহিত্যের কী-ই বা বুঝি—যা হোক সেই হীরেটা এখনও পাওয়া যায়নি, পাওয়া যাবেও না বোধহয়।'

আজ এক এক বার ভাবি, মিলি দেবীকে চিঠি একটা লিখবো নাকি! লিখবো নাকি হীরেটা আমার কাছেই আছে। জানিয়ে দেবো নাকি যে সেদিন ভোরবেলা নিজের হাতে বিছানাটা বাঁধবার সময় আমার শোবার ঘরেই সেটা কুড়িয়ে পেয়েছিলাম আমি! সেই দু'রতি ওজনের হীরেটা। কিন্তু আবার ভাবি, থাক্ না। উষাপতি স্ত্রী নিয়ে সুখে ঘর-সংসার করছে। ওদের সংসারে আগুন জেবলে লাভ কি! আমার এ গল্প যদি অসম্পূর্ণ থাকে তো থাক—আমি জীবনে আরো অনেক সম্পূর্ণ গল্প লিখতে পারবো, কিন্তু ওরা সুখে থাকুক। আমার একটা সামান্য গল্পের চেয়ে ওদের জীবন যে অনেক দামী।

সরবতী বাঈ

সুচেতা চট্টোপাধ্যায় সুচরিতাসু—

তোমার চিঠি পেলাম। তোমাকে নিয়ে গল্প লিখতে বলে আমাকে ভারি বিপদে ফেলেছ। আমি ফরমায়েসি গল্প কিছু লিখেছি বটে, কিন্তু এ তো জুতো নয় যে যতবার ফরমায়েস করবে ততবারই বানিয়ে দেবো। আর তোমার ঠিকানাও দাওনি চিঠিতে খামের ওপর। পোস্ট-অফিসের ছাপ খুঁজে ঠিকানা বার করতে গিয়ে দেখলাম, লেখা রয়েছে—শিবপুর।

শিবপুর! শিবপুর কি এখানে! তবু ঠিকানা মিলিয়ে তোমার সন্ধান করতে বেরোব তা মনে কোরো না যেন। যেটুকু তুমি লিখেছ তাতেই আমি বুঝে নিয়েছি। বুঝেছি নিতান্ত অসহায় হয়েই আমায় চিঠি লিখেছ। যদি আমি কিছু সাহায্য করতে পারি! আমার দ্বারা তোমার কতটুকু সাহায্য হবে জানি না।

কিন্তু তোমার চিঠি পড়তে পড়তে আমার একটা লাভ হয়ে গেল। বহুদিন আগের আর একজনের কাহিনী মনে পড়লো। সে সরবতী বাঈ নয়, বনলতা। বনলতার কাহিনী।

বনলতা আমার নিজের কেউ নয়। তোমার মতোই একদিন তার ছাব্বিশ বছর বয়সে এক ভীষণ সমস্যার উদয় হয়েছিল। সত্যিই ছাব্বিশ বছর বয়েসের সমস্যার বুঝি তুলনা নেই। তুমি লিখেছ যে-ছেলেটি তোমাকে ভালবাসে তার বয়েস তোমার চেয়ে তিন বছরের ছোট। অর্থাৎ তেইশ। ছাব্বিশ বছরের জ্বালা তেইশ কী করে বুঝবে বলো!

ছাব্বিশ বছরের বনলতা একদিন বলেছিল—আপনার তো আস্পর্ধা কম নয়!

তেইশ বছরের সুধাময় বলেছিল—পেথম দেখে আমরা মনুর চিনতে পারি কিনা—

বনলতা বলেছিল—তাহলে এবার আরো ভালো করে চিনুন—

বলে কথা নেই বার্তা নেই পায়ের চটিটা খুলে সুধাময়ের গালে সপাং সপাং করে বসিয়ে দিয়েছে। বনলতার জুতোর শুকতলাটা সুধাময়ের গালে গিয়ে পড়ে ফেটে চৌচির হয়ে গেল।

ততক্ষণে মেডিকেল কলেজের নার্স ডাক্তার ছাত্র ছাত্রী সবাই দৌড়ে এসেছে। ভিড় জমে গেছে কলেজের অপারেশন-থিয়েটারের সামনে। মেথর, জমাদার, হাউস-সার্জেন, কেউই বাদ নেই। কী হলো! কেন মারলে? কেন জুতো মারতে গেল হাউস-ফিজিশিয়ানকে! সামান্য একজন নার্সের এই কাণ্ড! কী হয়েছে মেট্রন! হৈচৈ—তুমুলকাণ্ড একেবারে।

বনলতা তখন রাগে ফুলছে। পারলে যেন আরো দু'ঘা মেরে দিত হাউস-

ফিজিশিয়ানের গালে। এক ঘায়ে যেন ঠিক সায়েস্তা হলো না !

মেট্রন জিজ্ঞেস করলে—কী হলো মিস রায় ?

বনলতা বললে—

কিন্তু সে-কথা এখন থাক ! ছাব্বিশ বছরের সে-জ্বালা আর কেউ না বুঝুক তুমি হয়তো বুঝবে। তুমিই বুঝবে বনলতা রায়ের সেই অপমান। তেইশ বছরের ছেলে সুধাময় সেদিন অন্যায় করেছিল কি অন্যায় করেনি, তা-ও তুমি বুঝতে পারবে ! কিন্তু সে-কথা পরে বলবো।

তুমি লিখেছ—তেইশ বছরের একটি ছেলে তোমাকে নিয়ে ঘর-বাঁধতে চায়। তা হলোই বা তোমার চেয়ে তিন বছরের ছোট ! ঘর-বাঁধতে কি বয়েস লাগে ! ঘর তো যে-কোনও বয়সেই বাঁধা চলে। বিশেষ করে তেইশ বছরে ভালো করেই চলে। তেইশ বছর ক্লান্তি জানে না। তেইশ বছর ঘুম জানে না। তেইশ বছরেব যে অক্লান্ত ক্ষমতা ! তেইশ বছর কি সামান্য জিনিস !

তবে গোড়া থেকে বলি শোন। অনেকদিন আগে একবার ওখাপোর্টে গিয়েছিলাম। রাজপুতানা পেরিয়ে ভারতবর্ষের একেবারে শেষ প্রান্তে। মেহ্‌শানা, আমেদাবাদ, জামনগর। মহাত্মা গান্ধীর জন্মস্থান পোরবন্দর অতিক্রম করে একেবারে ভারত মহাসমুদ্রের ধারে। যেখানে দাঁড়ালে ভারত সমুদ্রের ওপাবে আফ্রিকার চালানী নৌকোগুলোকে দেখা যায়। দেখা যায় পালতোলা নৌকোর সার। যেখান থেকে বাণিজ্য করতে যায় এপারের মাঝি-মাল্লারা। আর ওপারে সওদা বেচে অন্য কোনও সওদা কিনে নিয়ে আসে এখানে বেচতে। এই তাদের ব্যবসা। সমুদ্রের ধারে ধারে জেলে-মালোদেব বাস। এধার থেকে ওধার পর্যন্ত। সমস্ত জায়গাটা জুড়ে।

পাণ্ডা ঈশ্বরীপ্রসাদ বলেছিল—তীর্থস্থান বলেই বাবু-মহাজনেরা এখানে আসে হুজুর—নইলে সবই তো ওই মাঝি-মাল্লা কেবল—

জিজ্ঞেস করেছিলাম—তোমাদের এখানে বাঙালী কেউ নেই ?

বাঙালী ! ঈশ্বরীপ্রসাদ মনে করতে চেষ্টা করলে। বললে—একজন বাঙালী এখানে ছিল হুজুর, এখানকার বাতি-ঘরে কাজ করতো, তিনি বদলি হয়ে গেছেন তিন বছর আগে—আর একজন—

বলতে গিয়েই যেন মনে পড়ে গেল। বললে—আর একজন এখনও আছে হুজুর—

বললাম—কে ?

ঈশ্বরীপ্রসাদ বললে—তা সেও এখান থেকে তেত্রিশ মাইল দূরে—এক ডাক্তার—

বাঙালী ডাক্তার ডাক্তারী করতে এসেছে হাজার-হাজার মাইল দূরে এই অজ গ্রামের মধ্যে ! মাঝি-মাল্লারা পয়সা দিতে পারে !

ঈশ্বরীপ্রসাদ বললে—আপনাকে আমি নিয়ে যেতে পারি সেখানে, মস্ত হাসপাতাল করে দিয়েছে ডাক্তার-মা—একটা পয়সা নেয় না হুজুর—

জিজ্ঞেস করলাম—নাম কী ?

ঈশ্বরীপ্রসাদ বললে—বনলতা মিত্র—লোকে ডাক্তার-মা বলে ডাকে—

বনলতা মিত্র ! বহু দিন বহু বছর অতিক্রম করে মেডিকেল কলেজের একটা ঘটনার কথা হঠাৎ মনে পড়লো। তার নামও বনলতা রায়। এমন নাম সচরাচর সব মেয়ের থাকে না।

জিজ্ঞেস করলাম—কী রকম দেখতে বলো তো ?

আমি যে-বনলতাকে দেখেছিলাম তার তখন তোমার মতোই ছাব্বিশ বছর বয়স হবে। সে-ও কি আজকের কথা ! তখন আমার কত আর বয়েস। মেডিকেল কলেজে প্রত্যেক দিন যেতাম সন্ধ্যেবেলা। টুকু মাসিমা গলস্টোন অপারেশন করতে হাসপাতালে শুয়ে থাকতো। আমি বাড়ি থেকে টিফিন-কেরিয়ার নিয়ে খাবার দিয়ে আসতাম। সেখানেই প্রথম বনলতা দেবীকে দেখি। নার্সের পোশাক পরা হাতে থারমোমিটার নিয়ে এ-ঘরে ও-ঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কী নিরীহ চেহারা ! ছাব্বিশ বছর বয়েস হলে কী হবে, মাসিমা বলতো—ভারি যত্ন করে রোগীদের জানিস্—

ঈশ্বরীপ্রসাদ বলতে লাগলো—ওখানকার মাঝি-মাল্লাদের বড় পারা-রোগ আছে কিনা—সেই পারা-রোগের হাসপাতাল করে দিয়েছে ডাক্তার-মা। এক পয়সা খরচপত্তোর লাগে না—সেবা-যত্ন হয় ভালো—ডাক্তার-মা ভারি যত্ন করে রোগীদের—

মনে আছে যখন সব দেখা হয়ে গেল, রুক্মিণীর মন্দির, দ্বারকার মন্দির, ওখা-বন্দর, আর কিছু দেখতে বাকি নেই, তখন গরুর গাড়ি ভাড়া করে একদিন গিয়েছিলাম ডাক্তার-মা'র হাসপাতাল দেখতে। ওখা-বন্দর থেকে স্থলপথে তেত্রিশ মাইল ভেতরে। রাস্তা খারাপ। মোটর যেতে পারে না। গরুর গাড়ির ঝাঁকুনি খেতে খেতে যাওয়া—আমি আর পাণ্ডা ঈশ্বরীপ্রসাদ। ঈশ্বরীপ্রসাদ সারা রাস্তা গল্প করতে করতে চলেছে।

বনলতা দেবীকে নিয়ে গল্প অবশ্য হয় না। বনলতা দেবীর জীবনে আরম্ভও যা শেষও তাই। অন্তত আমার তাই মনে হয়েছিল। মনে হয়েছিল বনলতা দেবীর জীবনের প্রশ্নের মতো তার উত্তরও বড় সরল। সোজা সমতল ভূমির মতো সরল। চড়াই যদিই বা থাকে, সেটা শুধু শুরুতে, শেষে আর কিছু নেই। প্রশ্ন যেমনই হোক উত্তর যার কঠিন নয় তাকে নিয়ে গল্প লেখা তো বিড়ম্বনা।

সেদিনও যথারীতি কাঁটায় কাঁটায় চারটে বাজতে হাসপাতালে গেছি। সেই চারপাশের সার-সার রোগীদের বিছানা, কাতর চাউনি !

হঠাৎ ঘরে ঢুকতেই টুকু মাসিমা বললে—আজকে এখানে এক কাণ্ড হয়ে গেছে জানিস ?

জীবনের তিনটি বৃহৎ ঘটনার মধ্যে অন্তত দুটি নিত্যনৈমিত্তিক হাসপাতালে ঘটে থাকে। জন্ম আর মৃত্যু এখানে চিরাচরিত। তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। তাকে কাণ্ড বলেই কেউ ভাবে না।

বললাম—কী কাণ্ড !

টুকু মাসিমা বললে—আমাদের এখানকার নার্স এক ডাক্তারকে জুতো মেরেছে !

—কোন্ নার্সটা ?

—ওই যে ! ওই……

বনলতা দেবীকে সেদিন দেখেছিলাম। মাথায় স্কার্ফ আঁটা। হাতে একটা জ্বরের চার্ট। অমন মেয়ে যে একজন পুরুষকে জুতো মারতে পারে, দেখে তা মনে হলো না। সবাই তাকে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখছে বলে যেন মনে হলো।

—আর সেই ডাক্তার ?

ডাক্তার সুধাময়কে আমি দেখিনি। কিন্তু হাসপাতালের এ-কোণে ও-কোণে সব জায়গায় কেবল ওই একই আলোচনা। গুজুর-গুজুর ফুস-ফুস সব কথা। যেন আলোচনার একটা বিষয় পাওয়া গেছে।

টুকু মাসিমা আরো প্রায় এক মাস ও-হাসপাতালে ছিল। পরে সব শুনেছি। জানতে আর কারো বাকি ছিল না। ডাক্তার, হাউস-সার্জেন, মেট্রন, সুপারিন্টেন্ডেণ্ট সব্বাই।

সুধাময় সেদিন সেই কথাই বলেছিল বনলতা দেবীকে।

বলেছিল—আমার আর কারো কাছে মুখ দেখাবার উপায় নেই—আপনি আমার খুব ক্ষতি করলেন।

বনলতা বলেছিল—আর আমারই কি মুখ দেখাবার উপায় আছে ভেবেছেন !

সুধাময় বলেছিল—আপনি মেয়েমানুষ, আপনার ঘর থেকে না বেরুলেও চলে। কিন্তু আমার ?

ছকু খানসামা লেন-এর একটা পাঁচ-ঘর-ওয়ালা বাড়ির একখানা ঘর নিয়ে থাকতো তখন বনলতা। সেইখানেই রান্না খাওয়া সেরে দরজায় চাবি দিয়ে ডিউটিতে যেতো। আবার ফিরতো ছোট এটাচি কেসটা নিয়ে। হাসপাতালের কারো জানা ছিল না এ-ঠিকানা। কোনওদিন গল্প করতেও বনলতা কাউকে নিয়ে আসেনি এ-বাড়িতে। কিন্তু এ-বাড়ির ঠিকানা সুধাময় কেমন করে যে যোগাড় করলো কে জানে।

দরজার কড়া নাড়ার শব্দ পেয়ে দরজা খুলে দিতেই সুধাময়কে দেখে বনলতা কেমন অবাক হয়ে গেলো। খানিকক্ষণ যেন মুখ দিয়ে কথাও বেরোল না তার।

সকালবেলা যাদের ঝগড়া হয়ে গেছে, দু'দিন পরে তারাই কী করে যে এত ঘনিষ্ঠ হয়ে কথা বলতে পারে, তা লোক চরিত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা থাকলে কেউ আর অবাক হবে না।

পরস্পরের ক্ষমা চাওয়ার পালা শেষ হলো, তখন সুধাময়ই প্রথমে কথা বললে। বললে—আমি তাহলে উঠি এখন—

বলে উঠতেই যাচ্ছিল। বনলতা বললে—একটা কাজ করতে পারবেন আমার ?

সুধাময় ঘুরে দাঁড়াল। যেন অবাক হলো। বললে—কাজ! কী কাজ বলুন ?

বনলতা বললে—আমার এ-মাসের কুড়ি দিনের মাইনে পাওনা আছে—ওটা এনে দিতে পারবেন ?

—কেন, আপনি নিজেও তো আনতে পারেন!

বনলতা বললে—আমি চাকরি ছেড়ে দিয়েছি!

তারপর একটু থেমে বললে—যে ঘটনা ঘটলো তাতে আর ওখানে আমার চাকরি করা চলে না।

সুধাময়ের তখনও বিস্ময়ের ঘোর কাটেনি। একটু সম্বিৎ ফিরে পেয়ে বললে—কিন্তু আমিও যে ছেড়ে দিয়েছি! আর তো যাই না কলেজে—

এবার বিস্ময়ের পালা বনলতার, কিন্তু একটু পরেই বললে—আপনার ভাবনা কি, আপনি ডাক্তারি পাস করে গেছেন, অন্য কোথাও চাকরি নিয়ে চলে যেতে পারবেন—

সুধাময় বললে—সেইজন্যেই তো ক্ষমা চাইতে এসেছি—

বনলতা বলেছিল—না, ক্ষমা আপনার চাইবার দরকার ছিল না, অপরাধ তো আমারও কম ছিল না—সকাল থেকে মেজাজটা আমার ভালো ছিল না। তারপর দু'মাস বাড়ি-ভাড়া বাকি পড়ে গেছে···আপনি ঠিক আমাদের অবস্থা বুঝতে পারবেন না—

সুধাময় আবার একটু বসলো। বললে—আপনিও ঠিক আমার অবস্থা বুঝবেন না—সেই ঘটনার পর থেকে আর বাড়ি ফিরিনি, জানেন—

বনলতা বললে—তাহলে দু'দিন কোথায় ছিলেন ?

সুধাময় বললে—এই রাস্তায়, পার্কে···খবরের কাগজে খবরটা বেরোবার পর কোনও বন্ধুর বাড়িতে যেতেও লজ্জা করছে···

তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললে—আচ্ছা উঠি এখন—

বনলতা বললে—কোথায় যাবেন ?

সুধাময় বললে—জানি না, বাড়িতে তো যেতে পারবো না, হোস্টেলেও না,—

—তাহলে ?

সুধাময় বললে—ডাক্তারি পাশ করেছি, একেবারে উপোস করবো না জানি, কিন্তু টাকাও আমার হাতে নেই যে ট্রেনে উঠে চড়ে বসি বা কোথাও চলে যাই—টাকা থাকলে কোথাও চলে যেতুম আজই—

সুধাময় এবার উঠে সত্যি-সত্যিই চলে যাচ্ছিল। বনলতা চুপ করে চেয়ে দেখল তার দিকে। তারপর যখন সুধাময় সিঁড়ি দিয়ে একেবারে নেমে গেছে নিচে, তখন ডাকলে—সুধাময়বাবু, শুনুন—

সুধাময় ওপর দিকে চাইলে। বললে—আমাকে ডাকছেন ?

বলতে বলতে পরে এসে দাঁড়াল আবার। বনলতা দরজা ধরে দাঁড়িয়ে ছিল। বললে—একটা কথা রাখবেন আমার—

—কী ?

তাড়াতাড়ি হাতের একগাছি চুড়ি খুলে নিয়ে বনলতা সুধাময়ের হাতে গুঁজে দিয়ে বললে—এটা গিলটী নয়, খাঁটি সোনার, আপনার বোধহয় উপকার হতে পারে—

সুধাময় সত্যিই অবাক হয়ে গেছে। মুখ দিয়ে কিছু কথা বেরোল না তার।

বনলতা বললে—আপনার বয়েস কম,—নিতে আপত্তি করবেন না—

সুধাময় বললে—এর চেয়ে আর একবার জুতো মারুন না—এখানে তো কেউ নেই, আমি তা-ও সহ্য করবো—

বনলতা এবার চোখ নামালো। বললে—আমারও যে খুব ভালো অবস্থা তা নয়, কিন্তু···

সুধাময় বললে—তা হলে খেসারৎ দিচ্ছেন বুঝি ?

বনলতা বললে—ধরুন-না কেন তাই! আমি হয়তো খুঁজে-পেতে অন্য কোথাও একটা চাকরি যোগাড় করে নেব—কিন্তু আপনার এই বয়েস, এখনও যে অনেক বাকি—

সুধাময় বললে—তা হোক, তবুও আপনি ফিরিয়ে নিন্—

বলে চুড়ি-গাছা বনলতার হাতের মুঠোয় গছিয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছিল।

কিন্তু বনলতা খপ্ করে হাতটা ধরে ফেলেছে। বললে—আপনার দুটি হাত ধরে বলছি, নিন্—

সুধাময় অবাক হয়ে বনলতার মুখের দিকে স্পষ্ট করে চাইলে। মুখখানা এতবার দেখেছে, কিন্তু মেয়েটির মুখে যেন অন্য ভাষা অন্য অর্থ দেখতে পেলে আজ প্রথম। সুধাময় আর হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করলে না। বললে—আপনি নিতে বলছেন ?

বনলতা বললে—আমি আপনার চেয়ে বয়েসে বড়—আমার কথা শুনতে হয়—

সুধাময় বললে—কিন্তু আপনারও তো দু'মাসের বাড়ি-ভাড়া বাকি ?

বনলতা বললে—আমি মেয়েমানুষ, আমরা পুরুষের চেয়ে বেশি সহ্য করতে

পারি—

বলে নিজের ঘরের মধ্যে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল।

তুমি মেয়েমানুষ। তুমি হয়তো বনলতার এই আচরণ বুঝতে পারবে। তারপর ঘরে ঢুকে বনলতা বিছানায় মুখ গুঁজে কেঁদেছিল কিনা তা কেউ জানে না।

ঈশ্বরীপ্রসাদ বললে—তা নাহারগড়ে এক বাঙালী ডাক্তার যখন এল—তার আগে অসুখ হলে লোকে জলপড়া খেত, মানৎ করতো ঠাকুর দেবতাকে—আর যাদের পয়সা ছিল, তারা দেখাতো বৈদ্যকে—রাজার বৈদ্য, তার নজর-ই লাগতো পনেরো টাকা, দাওয়াইয়ের দাম আলাদা—

ঈশ্বরীপ্রসাদ বলতে লাগলো—নাহারগড় ছোট শহর হলে কী হবে, নাহার-গড়ের রাজা খানদানী রাজা। রাজার তিন রানী। ফি রানীর তেরোটা ঝি। ছাত্রশটা পর্দায়েৎ, আর লোক-লস্কর, খোজা, রাজকুমার, লালজী-সাহেব সব আছে।

আজমীর স্টেশনে একদিন ভোরবেলা এক ছোকরা ডাক্তার এসে ট্রেন থেকে নামলো। সঙ্গে না আছে স্যুটকেস, না আছে বিছানা। দেখে মনে হয় তেইশ-চব্বিশ বছর বয়েস।

যখন আজমীরে ছিলাম, তখন খানিকটা কাহিনী সদানন্দবাবুর কাছেও শুনেছিলাম।

সদানন্দবাবু বলেছিলেন—মশাই, এই যে রাজপুতানা দেখছেন, যার কোথাও জায়গা নেই এইখানে তার ঠিক জায়গা মিলবে!

বাঙালী-মিষ্টির দোকান করেছেন সদানন্দবাবু। বাঙালী কেউ আজমীরে এলে ওখানে আসতেই হবে। বাঙলাদেশ ছাড়িয়ে এতদূরে ছানার খাবার, দুটো বাঙলা কথা, মাছের ঝোল-ভাত ওইখানে পাবেন। বিকানীর, যোধপুর, জয়পুর, চিতোর চারধারে। মাঝখানে এই আজমীর।

সদানন্দবাবু বলেছিলেন—নাহারগড়ের রাজবাড়িতে বিয়ে—সন্দেশ রসগোল্লার অর্ডার হয়েছে আমার ওপর—আরও হুকুম হয়েছে মেজরানীকে রসগোল্লা তৈরি শিখিয়ে দিতে হবে—গিয়ে দেখি রাজবদ্যি ওখানকার বাঙালী। ছোকরা বয়েস—দেখেই চিনতে পারলুম—বললাম—আপনি এখানে?

অনেকদিন আগের কথা। এক ছোকরা মানুষ স্টেশনে নেমে সোজা আমার কাছে এসে হাজির। আমি তখন ভিয়েন করতে যাচ্ছি। আমাকে জিজ্ঞেস করলে—এখানে ধর্মশালা আছে কোথাও স্যার?

জিজ্ঞেস করলাম—কোত্থেকে আসছেন?

বললে—কলকাতা থেকে—

—সঙ্গে আর কে কে আছে?

ব্ঝলাম একলা যখন এসেছে তখন তীর্থযাত্রী-টাত্রী কেউ নয়।

আবার জিজ্ঞেস করলাম—আপনি কী করেন—

বললে—আমি ডাক্তার।

ডাক্তার শ্নেই যেন অবাক হ'য় গেলাম। ডাক্তারি করতে বাঙলাদেশ ছেড়ে এখানে কেন? নিশ্চয়ই কোথাও গোলমাল আছে! জিজ্ঞেস করলাম—সঙ্গে টাকা-কড়ি কিছ্ আছে?

বললে—আছে।

ব্ঝলাম মিথ্যে কথা। কাছে টাকা থাকলে ম্খের অন্যরকম চেহারা হতো। বাড়ির কারো গয়না চ্রি করে এনেছে হয়তো। এরকম কত ছেলেই তো এসেছে। আমিও একদিন মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করে এই মর্ভ্মির দেশে পালিয়ে এসেছিলাম। আমারই মতন কেউ হবে বোধহয়। হাতে তখন ছানার বারকোশটা, সেটা পাশের ঘরে গিয়ে রেখে আসতে হবে। বললাম—ত্মি একট্ বোসো, আমি আসছি—

ব'লে খানিক পরেই ফিরে এসেছি দোকানে। কতই বা দেরি হয়েছে! এই দ্'মিনিট কি তিন-মিনিট! এসে দেখি ভোঁ-ভাঁ! কেউ কোথাও নেই। বোধহয় আমার জিজ্ঞেস করবার ধরন দেখে সন্দেহ হয়েছে। রাস্তায় বেরিয়ে এদিক-ওদিক দেখলাম। ওই যেখানে এখন সিন্ধিদের দোকানগ্লো হয়েছে, ওখানে তখন ফাঁকা ছিল সব। সামনে রেলের লাইনগ্লো দেখা যেত। সেদিকে একবার পালিয়ে গেলে আর পাত্তা পাওয়া ম্শকিল। শেষে আর তার পাত্তা পাইনি।

তা নাহারগড়ে গিয়ে আবার সেই ছোকরার সাক্ষাৎ পেলাম মশাই। রাজা দলজিৎ সিং-এর খাস রাজবদ্যি! উঠতে বসতে ডাক পড়ে রাজবদ্যির!

বললাম—চিনতে পারেন?

কিন্ত্ তাকেই মশাই আর চেনবার উপায় নেই তখন। নাহারগড় স্টেট আপনার কেউ কেটা নয়। শহর ছোট হলে কী হবে, নাহারগড়ের রাজা খানদানী রাজা, রাজার তিন রানী। তিন রানীর তেরোটা করে ঝি, ছত্রিশটা পর্দায়েৎ আর লোকলস্কর, খোজা, রাজক্মার, লালজী-সাহেব, লালজী-বাঈ—সব আছে। সেই রাজার নেকনজরে পড়া সোজা কথা নাকি!

চোখে-ম্খে কথা সদানন্দবাব্র। বলেন—লোকে বলে বাঙালীর ছেলে ঘর-ক্নো—তা দেখে আস্ন রাজপ্তানা ঘ্রে, যত স্টেটের দেওয়ান, নায়েব, ডাক্তার, ল-অ্যাডভাইসার সব তো বাঙালী! আর নাহারগড়ে আগে রাজবদ্যি ছিল এক বেহারী, কারো অস্খ হলে দিত হরত্কির বড়ি, ডাক্তার মিত্তির যাবার পর থেকে আর বদ্যির বড়ি কেউ খেতে চায় না—

জিজ্ঞেস করলাম—তা রাজাকে পটালে কী করে ডাক্তার?

ডাক্তার বললে—মেজরানী যশোদা-বাঈএর অস্খ হয়েছে, রাজবদ্যি দেখেছে,

মোটে সারে না—মরো-মরো অবস্থা, আর আমি তখন আজমীর থেকে টো-টো করে ঘুরতে বেরিয়েছি, বেরিয়ে নাহারগড়ে আছি। রাজবাড়ির পাইক-বরকন্দাজ দোকানে আসে, সিনেমায় ছায়াবাজি দ্যাখে, পথেঘাটে দেখি। তাদের কাছে কথাটা শুনে বললাম—আমি সারিয়ে দিতে পারি যশোদা-বাঈকে।

কিন্তু দেখবো কী করে। রাজার অন্দরমহলে ঢুকি কী করে। রাজার পাঞ্জা চাই। অন্তত দিলখুশা সিং-এর পাঞ্জা চাই। দিলখুশা সিং হলো অন্দরমহলের খোজা। সারা অন্দরমহলের একমাত্র প্রহরী। সর্বত্র তার গতিবিধি। রানীসাহেবা থেকে সুরু করে বড়রানী লালজীবাঈ, বাঁদী, নোকরানী পর্যন্ত কারোর অন্দর-মহলের বাইরে আসতে গেলে দিলখুশা সিং-এর পাঞ্জা চাই!

বললাম—তা হলে কী হবে?

তাঁরা বললেন—আপনি রেসিডেন্ট সাহেবের সংগে দেখা করুন—

রাজপ্রাসাদের পশ্চিমে বিরাট লেক্-এর পাড়ে রেসিডেন্ট সাহেবের বাঙলো। একদিন ভোরবেলা তার সংগে গিয়ে দেখা করলাম। দেখা কি হয়! দেখা কি করতে চায়? বেংগল থেকে আসছে শুনেই তখনকার সাহেবরা ভাবতো টেরারিস্ট। রেসিডেন্ট অসবর্ন সাহেব বার কয়েক দেখলে আমার দিকে। মেডিকেল ডিগ্রীটা হাতে নিয়ে পড়লে কতবার। তাতেও কি সন্দেহ যায়! জিজ্ঞেস করলে—এখানে তুমি কী করতে এসেছ বাবু?

বললাম—মেজরানী যশোদা-বাঈয়ের অসুখের খবর শুনে এসেছি—যদি সারাতে পারি, যদি রাজার নেকনজরে পড়ে ভাগ্য ফেরাতে পারি, তাই—

তা রেসিডেন্ট সাহেব লিখে দিলে একটা চিঠি রাজার নামে!

রাজাসাহেবের সঙ্গেও দেখা হওয়া সোজা ব্যাপার নয়। রাজা তো রাজা! রাজা দলজিৎ সিং বাহাদুর। পারিষদ আমলা কর্মচারীরা বলে আসমুদ্র হিমাচল ব্যাপী তাঁর রাজ্য। মোগল সরকারের সঙ্গে যুদ্ধ করে সম্রাট আকবরের কাছে বীরত্বের জন্যে বাহবা পেয়েছিলেন নাহারগড়ের পূর্বপুরুষ রাজা হিক্‌মৎ সিং বাহাদুর। পুরুষানুক্রমে এখন সে-বীরত্বের খেতাব পেয়েছেন রাজা দলজিৎ সিং। কিন্তু আর কিছু বীরত্ব দেখাবার এখন আর দরকার হয় না। দরকার হলে শুধু রেসিডেন্ট সাহেবকে নিয়ে কিম্বা বড়লাট বাহাদুরকে নিয়ে শিকার করতে যান। আমলা-কর্মচারীরা ঢাক পিটিয়ে বিট্ দিয়ে বাঘ-ভাল্লুক তাড়িয়ে নিয়ে আসে রাইফেলের আওতার ভেতরে আর তিনি হাতীর পিঠের হাওদায় চড়ে ফায়ার করেন। তা মেজরানীর অসুখে তিনিও মনমরা হয়ে ছিলেন। তারপর রেসিডেন্ট অসবর্ন সাহেবের চিঠি পেয়ে আর দ্বিধা করলেন না। পাঞ্জা পাস করে দিয়ে আমলাদের হুকুমনামা দিয়ে দিলেন। রোগী দেখে ডাক্তার বেরিয়ে আসবে, তারপর সে-পাঞ্জা কেড়ে নেওয়া হবে। যতদিন না রোগ সারে ততদিন!

যথারীতি পাঞ্জা দেখাতে হলো অন্দরমহলের গেটে! খোজা দিলখুশা সিং

পাঞ্জা পরীক্ষা করে নিয়ে গেল মেজরানীর মহলে। মহলের পর মহল অতিক্রম করে, কত সুড়ঙ্গ, কত গলি, কত বিচিত্র ঘাগরা ওড়না, সুরমা-আঁকা চোখের অপাঙ্গ দৃষ্টি পেরিয়ে তবে আসতে হয়। ঝালর ঘেরা মশারির ভেতর মেজরানী যশোদা-বাঈয়ের ঘর। মশারির আড়ালে যশোদাবাঈ শুয়ে ছিলেন। দিলখুশো সিং-এর কথায় ওপাশ থেকে বাঁদী মশারির বাইরে মেজরানীর হাতটা বাড়িয়ে দিলে। পরীক্ষা হলো অসুখ। জিজ্ঞাসাবাদ হলো। কী খাচ্ছেন না খাচ্ছেন সব প্রশ্নের উত্তর হলো ওপার থেকে বাঁদী মারফত।

এইরকম তিনদিন। তিনবার যাওয়া-আসা করতে হলো ডাক্তারকে। ওষুধও চলছে। আজমীর থেকে ওষুধ আনিয়ে খেতে দিল। দিলখুশো সিংকে ভালো করে বুঝিয়ে বললে। তারপর রাজার পাঞ্জা দেখিয়ে রাজকোষ থেকে টাকা নিতে হলো।

কিন্তু এতেও তখন অত তাজ্জব কিছু হয়নি।

হলো হঠাৎ। রাজার কাছে খবর গেল নতুন বাঙালী ডাক্তারসাহেব মেজরানীকে ভালো করে দিয়েছে। এবার তলব হলো রাজার আম-দরবারে।

সদানন্দবাবু বললেন—একেই বলে ভাগ্য মশাই—হয়তো মায়ের একগাছা সোনার চুড়ি চুরি করে নিয়ে এসেছিল—শেষে হয়ে গেল রাজবদ্যি! পুরোনো রাজবদ্যির খেলাত গেল। শুধু জায়গীরটা রইল। কার ভাগ্যে তিনহাজারী জায়-গীর পেলে, রাজা-রাজড়ার ব্যাপার, কখন কার ভাগ্যে ফুলের মালা আর কার ভাগ্যে জুতোর মালা জোটে—কে বলতে পারে!

জিজ্ঞেস করলাম—তা ডাক্তারি পাস করেছেন আপনি, আপনার চাকরির ভাবনা কী? বাঙলাদেশে একটা জোটাতে পারেননি এতদিন?

ডাক্তার বললে—বাঙলাদেশে মুখ দেখাবার অবস্থা ছিল না আর, তা নইলে এখানে আসি—

জিজ্ঞেস করলাম—কেন, কী হয়েছিল?

ডাক্তার চুপ করে গেল। রাজাসাহেব বিরাট প্রাসাদ করে দিয়েছে ডাক্তারের জন্যে। সামনে বাগান। আর শুধু তো রাজত্বই নয়, রাজ কন্যাও—

—কী রকম?

সদানন্দবাবু বললেন—তবে শুনুন—

সে-এক ইতিহাস বটে! আমাদের চোখে তো বটেই। নাহারগড়ের ইতিহাসেও। নাহারগড়ের রাজা ভারি বিলাসী মানুষ। কাজ-কম্ম তো নেই মশাই, কেবল বিলাস। নইলে রসগোল্লা তৈরি করতে গিয়ে আমি মাঝখান থেকে পাঁচটা হীরের আংটি, একটা গরদের জোড় আর সাতশো টাকা ইনাম নিয়ে এলাম! রাজবাড়ির আমলা-মহকুমা দরবারের লোক খেয়ে একেবারে বাহোবা-বাহোবা করতে লাগলো। এমন মেঠাই খায়নি কখনও—বড়রানী নিজে তাঁর হাতের পান্নার আংটি দিয়ে তারিফ পাঠালেন। অথচ রসগোল্লা তৈরি করতে ছাই শিখেছে! রসগোল্লা

তৈরি কি অত সহজ মশাই, তাহলে তো সবাই পারতো—তা শেষে রাজাসাহেবের পেয়ারের লোক হয়ে উঠলো ডাক্তার। রোগ কারো হোক আর না-হোক, ডাকো ডাক্তারসাহেবকে! দুপুরবেলা গরমে ঘুম আসছে না, ডাকো ডাক্তারসাহেবকে! অন্দরে ভালো সরবৎ বানিয়েছে, ডাকো ডাক্তারসাহেবকে! এমনি যখন-তখন ডাক! আর ডাক্তারেরই বা কী কাজ! রাজবৈদ্য হয়েছে, তিনহাজারী জায়গীর পেয়েছে, রাজার হুকুমে হাজির হওয়াই তো রাজ-বদ্যির আসল কাজ!

তবু যখন সময় থাকে হাতে, যখন একলা ঘরে মরুভূমির গরমে ডাক্তার রাত্রে শুয়ে থাকে আর ঘুম আসে না তখন মনে পড়ে আর একজনের কথা। আসবার দিন জোর করে হাতে গুঁজে দিয়েছিল একগাছা সোনার চুড়ি।

সুধাময় বলেছিল—ঋণশোধ করে দেবো একদিন, সেই প্রতিশ্রুতি দেওয়া ছাড়া আর আমার কিছু বলবার মুখ নেই—জানো—

বনলতা বলেছিল—একে ঋণ না-ই বা বললে—ধরো না কেন, তোমাকে দিলাম আমি ওটা—

সুধাময় খুব হেসেছিল সেদিন কথাটা শুনে।

বনলতা বলেছিল—অত হাসছো যে?

সুধাময় বলেছিল—আমাকে জুতো মারার ব্যাপারটা তুমি এখনও ভুলতে পারোনি দেখছি—আমি কিন্তু ভুলেই গেছি—

বনলতা কিন্তু হাসেনি। বলেছিল—যারা এত সহজে সব ভুলে যায় তাদের নিয়ে কিন্তু ভয়ের কথা!

সুধাময় তখন বনলতার হাতটা ধরেছিল নিজের হাত দিয়ে। বললে—আমাকে নিয়ে কিন্তু তোমার অত ভয় করবার দরকার নেই—অপমানটাই সহজে ভুলি, তা বলে ভালবাসাও ভুলবো এমন পাষণ্ড নই আমি—

বনলতা বলেছিল—চিঠি দেবার কথা মনে করিয়ে দিতে হবে কি?

পাশের বাড়ির মেয়েরা বলতো—আজ তোমার ডিউটি নেই বনলতাদি?

একটি দিনের মধ্যে একটা বিপ্লব ঘটে গেছে যেন পৃথিবীতে। একদিন আগেও যে-ছিল নেহাতই পর, হাওড়া ষ্টেশনে সেই সুধাময়ের গাড়িটা দেখার পর কেমন যেন ফাঁকা লাগলো সমস্ত কিছু। অথচ সুধাময় তার কে-না-কে? একই হাসপাতালের একজন ছাব্বিশ বছর বয়েসের নার্স আর একজন সদ্য-পাস-করা ডাক্তার। চেহারাতেও কত ছোট দেখায়!

বনলতা শুধু বলেছিল—আমার জন্যেই তোমার আত্মীয়-স্বজন সকলকে ছেড়ে যেতে হলো—

সুধাময় বললে—আত্মীয়-স্বজনকে ছেড়ে আমার লাভ হলো কি লোকসান হলো তা এখনো বলার সময় আসেনি—

বনলতা বলেছিল—সে-সময় আর কি আসবে?

সুধাময় বলেছিল—না এলে তোমার জুতো মারাও যেমন মিথ্যে হবে, তেমনি তোমার চুড়ি দেওয়াও মিথ্যে হবে, আমার লাভ-লোকসান সবই মিথ্যে হয়ে যাবে—

গিয়ে অবশ্য সুধাময় একটা চিঠি দিয়েছিল। লিখেছিল—রাজপুতানার মরুভূমির দেশে এসে এখনও ওয়েসিসের সন্ধান পাইনি। রাস্তায়-রাস্তায় চানা-ভাজা খাই আর কুয়োর জল ভরসা। তোমার চুড়ি-গাছা আজো খরচ করতে ভয় হয়, ওটা কাছে রেখে দিই সব সময়, তুমি যে আছ তার উপলব্ধিতে সান্ত্বনা পাই—

চিঠিটার কোথাও বনলতাকে যেতে বলার অনুরোধ নেই। বার-বার চিঠিটা পড়লে বনলতা। তারপর চিঠিটা আঁচলে বেঁধে রেখেই উনুনে ভাত চড়িয়ে দিলে। ছাব্বিশ বছর বয়েস তো, সত্যিকথাটা লিখতে আত্ম-অহমিকায় বাধলো। চাকরি জোটেনি তবু লিখলে—নতুন একটা হাসপাতালে চাকরি নিয়েছি, কলকাতা থেকে দূরে, সময়মতো উত্তর না-পেলে কিছু মনে কোরো না—

দুপুরবেলা ভাত খেয়ে উঠে মেঝেতেই গড়িয়ে পড়লো বনলতা। সুধাময় তো দেখতে আসছে না।

কিন্তু রাজপুতানা কলকাতা নয়। নাহারগড়ও কলকাতা নয়।

আর ডাক্তার সুধাময়ের বয়েসও তেইশ। সে কী করে বুঝবে ছাব্বিশের ব্যথা। সকাল থেকে উঠে প্রথম কাজ সাজ-গোজ করা। দরবারে গিয়ে রাজা দলজিৎ সিং বাহাদুরকে কুর্নিশ করে বসে থাকতে হয়। তারপর দরবার শেষ হতেই বাড়ি এসে খেয়ে নিয়ে দৌড়তে হয় রাজপ্রাসাদের তয়খানাতে। দিবানিদ্রার পর রাজাসাহেব তখন দাবা খেলতে বসেন। আগে অন্য সংগী ছিল, এখন ডাক্তার। এককালে রাজমন্ত্রীজী, দেওয়ানজী, রানীজী, পর্দায়েৎজী, পাশোয়ানজী সবাইকে সঙ্গে নিয়েছেন দাবা-খেলায়। এখন হয়েছে ডাক্তার।

রাজাসাহেব জিজ্ঞেস করেছিলেন—দাবা-খেলা আসে ডাক্তার ?

মহারাজার সামনে 'না' বলতে নেই। বললে—জানি হুজুর—

এককালে দাবা খেলেছে সুধাময়। তখন ছিল আড্ডার নেশা। এখন চাকরি বাঁচাতে দাবা খেলতে হয়। এই দাবা খেলতে খেলতেই একদিন সুধাময়ের জীবনে চরম আত্মোপলব্ধি এল। আবার আত্মবিভ্রমও এল বলা চলে। এই দাবা খেলতে না বসলে বনলতার জীবনেও এই দুর্দৈব আসতো না। আর গল্প-লেখক হিসেবে আমিও সরবতী বাঈয়ের কাহিনী জানতে পারতুম না।

সদানন্দবাবু বলেছিলেন—আমি গিয়েছিলাম রসগোল্লা বানাতে আর শুনে এলুম সরবতী বাঈয়ের গল্প—

রাজ-অন্দরমহলের ব্যাপার। কখনও তো দেখিনি। না-দেখলে তা বোঝবার সাধ্য নেই কারো। গোলাপী ওড়না আর অসূর্যম্পশ্যাদের চকিত চাউনির ভিড়।

এখানে সুড়ঙ্গ, ওখানে কটাক্ষ। নানা তোষামোদ আর হাহাকারের ভিড়, ঘাগরা আর সুরমা-কাজলের রহস্য। বাইরের জগতেব বিশ্ব-পৃথিবীর খবর এখানে পৌঁছোয় না। এখানেই জন্ম আর এখানেই মৃত্যু হয়েছে এমন নারীর ইতিহাসই এখানে বেশি। শেঠ আর বেনেদের ঠাকুরানীরা আসে উৎসব-পার্বণে, দোল-যাত্রায়। কেউ ফিরে যায়, কেউ রাজাসাহেবের নজরে পড়ে গিয়ে আর ফিরতে পারে না। কারো কারো উচ্চাকাঙ্ক্ষা তালকটোরার বন্দীশালায় ধূলিসাত হয়। রাজার নজরে একবার পড়ে গেলে জীবনেব কোনও সাধ আর অপূর্ণ থাকবার নয়। তার জন্যে, কত সাধ্য-সাধনা। খোসামোদ করতে হয় মহারানীকে, মাজী-সাহেবাকে, পর্দায়েৎ, পাশোয়ানজীকে, আর সকলের চেয়ে বেশি খোসামোদ করতে হয় একমাত্র প্রহরী খোজা দিলখুশা সিংকে। কিন্তু সরবতী বাঈ তাদের মধ্যে একজন হলেও —ঠিক তাদের মতো নয়।

খেলায় রাজাসাহেবই বেশিবার হারেন। হারলেই তো খেলে আনন্দ। ভারি উৎসাহ রাজাসাহেবের।

সদানন্দবাবু বলেছিলেন—সেকালের রাজা মহারাজাদের কাজ-কর্ম ছিল, যুদ্ধবিগ্রহ ছিল, এখনকার রাজাদের আছে কী মশাই! শুধু কোথায় সুন্দরী মেয়ে আছে নিয়ে এস, কার সুন্দরী বউ আছে ধরে আনো। এমনি করে অসংখ্য মেয়েমানুষে ভরে গেছে অন্দরমহল। সেখানে একমাত্র পুরুষ হলো রাজা সাহেব। তা সব সময়েই কি আর সে-সব ভালো লাগে! মাঝে মাঝে তাই শিকার-টিকার করেন, দাবা-টাবা খেলেন। তা নাহারগড়ের রাজার আবার বয়েসটাও কম। তিন রানী, সেই রানীর বয়েসও আবার রাজার বয়েসের চেয়ে বেশি! মহারাজার বয়েস যখন বারো, বড় রানীর বয়েস তখন কুড়ি, মেজ রানীর বয়েস তখন ষোলো, ছোট রানী তখনও আসেইনি। আবার প্রত্যেক রানীর সঙ্গে বাপের বাড়ি থেকে যৌতুক-পাওয়া তেরোটা-চোদ্দটা করে ঝি, তাদেরও এইরকম যোয়ান বয়েস। তা ছাড়া আছে রানীদের সখীরা, আছে বাইরের উপহার পাওয়া মেয়ে, কেউ এসেছে ইচ্ছে করে, কাউকে আনা হয়েছে ভুলিয়ে-ভুলিয়ে। রাত্রে গান-বাজনার উৎসবে তাদের কাউকে চোখে লেগে গেল তো তার বরাত খুললো। কাউকে আবার ষড়-যন্ত্র করে গুম্ করে ফেলা হলো তালকটোরার ঘরে। সারা জীবন আর রাজা-সাহেবের নজরে না পড়তে পারে। তা সুন্দরী মেয়েদের ভাগ্যে বিড়ম্বনাই বেশী কিনা। আমি যে অন্দরমহলে ঢুকলাম, মেজরানীকে রসগোল্লা তৈরি করতে শেখালাম, কাউকে একপলকের জন্যে দেখতেও পাইনি, খোজাসাহেবের আইন এমনি কড়া!

কিন্তু ডাক্তারের ব্যাপার আলাদা। রাজবদ্যি, তায় রাজাসাহেবের পেয়ারের লোক।

ডাক্তার বলে—হুজুর, গজ বন্দী হলো আপনার!

রাজাসাহেব বলেন—তোমার মন্ত্রীর কী দশা করি দেখ ডাক্তার—

প্রাসাদের তয়খানা একেবারে মাটির নিচেয় তৈরি। গরমের দিনে ভারি আরাম সেখানে। ভেতরের অন্দর-মহল থেকে সুড়ঙ্গপথে আসা-যাওয়ার রাস্তা আছে। দরকার হলে রাজাসাহেব হাততালি দেন আর সঙ্গে সঙ্গে হুকুম তামিল হয়। ঘাগরাপরা দাসী-বাঁদী আসে। জল দরকার হলে জল, সরবৎ দরকার হলে সরবৎ, যা চাই সব।

রাজাসাহেব আমলাদের বলেন—ডাক্তারের মাথা খুব সাফ্—

শুধু মাথা নয়, ডাক্তারের সবই ভালো। ডাক্তার কাছে এলেই হাসি বেরোয় মুখে। যে-কাজ কেউ আদায় করতে পারছে না, ডাক্তারকে বললেই তামিল হয়ে যাবে। ডাক্তারের কথায় 'না'-বলবার সাধ্য মহারাজার নেই। সম্মানে উঁচু-নিচু হলেও বয়েসটা দুজনেরই এক। তা সাধে কি বলে বাঙালীর বুদ্ধি! বুঝুন, সেই কোন্ দূর বাঙলাদেশ থেকে খালি-হাতে এসে একেবারে সর্বস্ব দখল করে নিলে। সাধে কি আর মশাই সবাই চটে গেছে আমাদের ওপর ?

বললাম—তারপর কী হলো বলুন ?

সদানন্দবাবু বললেন—তারপরেই তো সরবতী বাঈ এল। দুপুর থেকে খেলা চলেছে। পর-পর দুবার হার হয়েছে রাজাসাহেবের, এবারও হারবার মতো অবস্থা। কিস্তী মাৎ হবো-হবো। ডাক্তারের কাছে পারবার উপায় নেই। এমন সময় এক কাণ্ড ঘটলো !

ভীষণ গরমের দিন। হলেই বা তয়খানা। পাকা চোৎ মাস। বাইরে তো লু চলে। আকাশের তলায় আইঢাই করে প্রাণ। তেষ্টায় গলা শুকিয়ে চিঁ চিঁ করে। ডাক্তারের জল-তেষ্টা পেয়ে গেল !

ডাক্তারের ও-সব আরক-মোদক কিছুই চলে না। বললে—এক গ্লাস জল চাই—জল !

রাজাসাহেব হাততালি দিলেন। সে-হাততালির মানে যারা বোঝে তারা বোঝে ! হাততালির ইঙ্গিত পেতেই পেছনের সুড়ঙ্গের পথ দিয়ে বেরিয়ে এল সরবতী বাঈ !

খেলা ফেলে ডাক্তার চেয়ে রইল সেই দিকে। গোলাপী বুটিদার ঘাগরা, বুকে সোনালী এক-চিলতে কাঁচুলি আর পাতলা ফিনফিনে জাফরানী জরিদার ওড়না। গায়ে আর কোথাও কিছু নেই। মাথায় সোনার ঘড়া। দু'হাতে ঘড়াটা আলতো করে ধরে ঘরে এসে দাঁড়ালো। হেঁটে এল না সরবতী-বাঈ, যেন ভেসে এল। ডাক্তার জল খেয়ে আবার দাবার চাল দিলে। কিন্তু আর যেন জমলো না।

রাজাসাহেবও অবাক হয়ে গেছেন। সেই প্রথম হার হলো ডাক্তারের।

ওঠবার সময় রাজাসাহেব মাথায় পাগড়ি পরে বললেন—তোমায় আমি একটা উপহার দেব ডাক্তার !

—উপহার ?

রাজাসাহেব বললেন—তুমি তো বিয়ে করোনি ?

ডাক্তার বললে—না—

—তবে এবার তুমি বিয়ে করো !

ডাক্তার অবাক হয়ে গেছে। বললে—কাকে ?

—সরবতীকে তোমার হাতে দেবো—

ভাবুন একবার ! ইতিহাসে এমন ঘটনা কেউ কখনো শোনেনি, দ্যাখেনি। মোগল-সরকারের আমলে অবশ্য বিয়ে হয়েছে। কিন্তু সে তো রাজনীতি। লালজীসাহেব, বাঈলালজীদের কারো কারো এমন দুর্দৈব ঘটেছে। কিন্তু রাজ-অন্তঃপুরের বে-ওয়ারিশ কোনও মেয়ের ভাগ্যে এমন ঘটনার কথা ইতিহাসে নেই। সাজ-সাজ রব পড়ে গেল। কোন বাঈলালজীর বিয়েতেও এত ঘটা হয় না। বায়না চলে গেল এখানে-সেখানে। জুতোওয়ালা জুতো তৈরি করতে বসলো। মেঠাই-ওয়ালা মেঠাই বানাতে লাগলো। এখান-ওখান থেকে কুটুম্বরা আসবে। এলাহি কাণ্ড। যাদের বিয়ে তাদের বুক দুর-দুর করে কাঁপছে।

দিলখুশা সিং পিঠ চাপড়ে দিলে সরবতী বাঈয়ের। যা, বেঁচে গেলি বেটি ! তোর দেমাগ্ খুশ্ হবে এবার !

আর ডাক্তার ! ডাক্তার সুধাময়। কলকাতার মেডিকেল কলেজের এম-বি ডাক্তার তারও আবার ভয়। রাত্রে বিছানায় শুয়ে শুয়ে ঘুম আসে না ডাক্তারের চোখে। অনেক মাইল দূরে একটি মেয়ে এই রাত্রে হাসপাতালে ডিউটি করতে করতে হয়তো একবার অন্যমনস্ক হয়ে গেল। কেউ কোথাও নেই তার—কোথাও নেই আশ্রয়। একগাছি সোনার চুড়ি দিয়ে একজন নিরুদ্দেশ যাত্রীকে একদিন সাহায্য করেছিল। তারপর হয়তো আবার অন্য কোথাও চাকরি নিয়ে মেতে আছে।

চিঠি লেখে বনলতা। লেখে—চাকরিতে মোটে সময় পাই না। সময়মতো চিঠি না দিতে পারলে ভেবো না, নতুন দেশ, দুধ খাবে আর ও-দেশে তো খাঁটি ঘি পাওয়া যায়—তার ব্যবস্থা কোরো, এখানে ইলিশমাছ উঠেছে, তোমার জন্যে মন কেমন করে—

ছাব্বিশ বছর বয়েসের দৌর্বল্য থাকে বনলতার চিঠিতেও। যেন উপদেশ দেয়, যেন উঁচুতে দাঁড়িয়ে নিচের দিকে চাওয়া। ঠিক সমানে-সমানে নয়।

সুধাময়ের চিঠিও আসে। লেখে—তোমার সোনার চুড়িটা আর বেচবার দরকার হবে না, তবু কাছে রাখি, মনে হয় তুমি কাছাকাছি আছ, একেবারে হৃদয়ের কাছাকাছি—

বার-বার চিঠিগুলো পড়ে বনলতা। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পড়ে। রান্না করবার ফাঁকে ফাঁকে পড়ে। কই, কোথাও তো যেতে লেখেনি তাকে ! হয়তো এখনও

ভালো করে গুছিয়ে বসেনি সুধাময়। ভালো করে ঘর সাজাতে হবে, ভালো করে ব্যবস্থা করতে হবে। বনলতাকে তো যেমন-তেমন করে রাখা যায় না। যেখানে-সেখানে ! নিজে মুখ ফুটে কি বলা যায়—আমি যাচ্ছি ! যেতে তো কই লেখে না ! তেমন করে কই লেখে—তুমি চলে এসো বনলতা, আমি তোমার জন্যে ঘর সাজিয়ে বসে আছি। ছাড়ো তোমার চাকরি, আমি তো আছি, চাকরি তোমায় আমি আর করতে দেবো না—

এ-হাসপাতাল থেকে ও-হাসপাতাল। কোথাও গিয়ে বনে না বনলতার।

একটু অসুবিধে হলেই বলে—দেখুন, আপনাদের মতো নয় আমার, আমার চাকরি না করলেও চলে—

সরলাদি বলে—হ্যাঁ বনলতাদি, তুমি নাকি এক ডাক্তারকে জুতো মেরেছিলে ?

চমকে ওঠে বনলতা। —কে বললে ?

এখানে হাওড়াতেও তাহলে কথাটা প্রচার হয়ে গেছে। বলে—তোমার সুপারিনটেন্ডেন্টকে বোলে দিয়ো, দরকার হলে তাঁকেও জুতো মারতে বাধবে না· আমার—

সরলাদি বলে—কাজ কি ভাই ও-সব ভেবে, চাকরি করতে যখন এসেছি, চাকরি না করে কি চলবে আমাদের ? এই তো আমাদের কপাল—

বনলতা বলে—তোমাকে তাহলে সত্যিকথাই বলি সরলাদি চাকরি আমি করবো না বেশিদিন।

সরলাদি যেন অবাক হয়। বিশ্বাস করে না।—বলে—চাকরি না করে কী করে চালাবে বনলতাদি ?

বনলতা বলে—কলকাতা ছেড়ে চলে যাবো !

—কোথায় !

বনলতা বলে—যেখানে হোক—আমরা কাজ জানি, কাজ জানলে খাবার জায়গার অভাব—

সরলাদি বলে—আমাকেও সঙ্গে নিয়ো বনলতাদি, আমারও আর ভালো লাগে না, খবর-কাগজ খুলে তাই কেবল চাকরি-খালির বিজ্ঞাপনগুলো দেখি—

বনলতা বলে—যাবে আমার সঙ্গে—সে কিন্তু অনেক দূর—

—অনেক দূর ! কোথায় শুনি ?

—নাহারগড়।

সরলাদি বলে—নাহারগড় আবার কোথায় ভাই, নাম শুনিনি তো ? সে কোথায় ?

—রাজপুতানায় !

সরবতী বাঈ বলেছিল—বাঙলাদেশ, সে কোথায় ?

সুধাময় বলেছিল—সে অনেক দূরে।

অনেক দূরত্বটা আন্দাজ করতে গিয়ে সরবতী বাঈয়ের চোখ-দুটোও বড় হয়ে আসে। অনেক দূরের মানুষকে যেন ভয় হয়। সরবতী বাঈয়ের চোখে যেন কেবল ভয়ের ছায়া। রাজাসাহেব কোনও ত্রুটি রাখেননি। আজমীর, বিকানীর, যোধপুর, জয়পুর থেকে আত্মীয়-কুটুম্বরা এসেছে! অন্দর-মহলে এসে ঢুকেছে। রাজপুরোহিত এসে মন্ত্র পড়িয়ে বিয়ে দিয়েছে। ও বিয়ে যখন, তখন বাঙালী-মতে-ই হোক আর রাজপুত-মতেই হোক—হলেই হলো!

বিয়ে ফুলশয্যা বউভাত সবই রাজোচিত।

রাজাসাহেব জিজ্ঞেস করেছিলেন একবার—তোমার আত্মীয়-স্বজন কাউকে নেমন্তন্ন করতে হবে না ?

কিন্তু আছে কে যে নেমন্তন্ন করবে! বিয়ে যারা দেবার লোক তারা সবাই আছে সুধাময়ের কিন্তু সম্পর্ক যখন রাখেনি কেউ তখন আর দরকার কী। আর রাজাসাহেব একাই তো একশো। এক রাজাসাহেব থাকলে আর কারো সাহায্য চায় কে!

সরবতী বাঈ ফুলশয্যার রাত্রেই বলেছিল—আমাকে ছুঁয়ো না—

হয়তো প্রথম লজ্জার ভান! কিন্তু রাজ-অন্দর-মহলে মানুষ, যৌবন নিয়ে যত রকম বেসাতি আছে সব তো তার নখ-দর্পণে থাকা উচিত। চোখের সামনেই তো দেখেছে যৌবন কী করে বিশ্বজয় করে। সামান্য চাষার গরীব মেয়ে কী করে একদিন মহারানীর চেয়েও উঁচু পদ পেয়ে যায়।

ছোটবেলায় বাবা একদিন বলেছিলেন—এবার চাকরিতে ঢুকে পড়ো, আর আমি তোমায় পড়াতে পারবো না—

সুধাময় তখন সবে আই-এস্-সি পাস করেছে। বললে—কেরানীগিরি আমি করবো না—

রেগে গিয়েছিলেন বাবা। বলেছিলেন—তা হলে তোমার যা ইচ্ছে করো—আমার আর পড়াবার ক্ষমতা নেই—

কাকাদের কাছে গিয়েও দরবার করতে হয়েছিল—। তাঁরা বলেছিলেন—ডাক্তারি পড়া তো চারটিখানি কথা নয়—শুধু টাকা হলেই তো চলবে না, মাথাও চাই—

বাবা অবশ্য তার ডাক্তারি পাস করা দেখতে পাননি। মা ও না। দেখেছিলেন কাকাবাবু। কিন্তু তারপরেই তো লজ্জায় কলঙ্কে দেশ ছেড়ে পালাতে হলো। বাঙলাদেশের সঙ্গে তার আর সম্পর্কই রইল না। ক্ষীণ একটু সম্পর্ক রইল যার সঙ্গে, সে বনলতা। কিন্তু বনলতাকে এ-খবরটাই বা জানানো যায় কেমন করে। রবিবার দিন সকালবেলাই একটা চিঠি এসেছিল বনলতার। লিখেছে—চাকরিতে বড় ব্যস্ত থাকতে হয়—মোটে সময় পাই না—ভাবছি অন্য হাসপাতালে চাকরি নেব, এখানে মেট্রন সুবিধের লোক নয়—

থাক্। বনলতা তার চাকরি নিয়েই ব্যস্ত থাক্।

আর সুধাময় এখানেই থাকুক। সরবতী বাঈ আছে, রাজাসাহেব আছেন, ভয় কী তার!

সুধাময় জিজ্ঞেস করেছিল—তোমার কী ভয় করছে?

কোনও উত্তর দেয়নি সরবতী বাঈ! গোলাপী বুটিদার ঘাগরা, এক চিলতে কাঁচুলি আর জাফরানী রঙের পাতলা ওড়নার আড়ালে নিজেকে যেন সুন্দর করে রেখেছিল সে। যেন স্পর্শ করলে জাত যাবে তার।

কিন্তু সত্যিই শেষ পর্যন্ত জাত যায়নি সরস্বতী বাঈয়ের।

বলেছিল— তুমি আমাকে সাদী করলে কেন বাবুজী?

সুধাময় জিজ্ঞেস করেছিল—কেন, তুমি কি সুখী হওনি?

তখন রাজাসাহেব মারা গেছেন। তিন রানী বিধবা হয়েছে। ভোল বদলে গেছে রাজ্যের। ডাক্তারের আগেকার প্রভাব প্রতিপত্তি কমে গেছে। শুধু আছে জায়গীরী। তিনহাজারী থেকে পঞ্চাশ-হাজারী করে গিয়েছিলেন রাজা-সাহেব, তাই আছে! সরবতীয়ার তখন শোচনীয় অবস্থা। তাকে আর স্পর্শ করা যায় না। ইনজেকশনের পর ইনজেকশন দেয় সুধাময়। রাতদিন তার ঘুম নেই। বড় বড় বই আনায় সুধাময়। ডাক্তারী শাস্ত্রে এত ওষুধ আছে, এ-রোগের চিকিৎসা হবে না, এ-রোগ আরোগ্য হবে না, তা কি হতে পারে! আস্তে আস্তে ঘায়ের ওপর মলম লাগিয়ে দেয় সুধাময়। সরবতী বাঈয়ের সেই রূপ, সে কোথায় গেল। এখন চোখ-মুখ ধুইয়ে মুছিয়ে দিতে হয়। যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করে সরবতী বাঈ!

সরবতী বাঈ কাতর চোখে জিজ্ঞেস করে,—আমাকে তুমি কেন সাদী করেছিলে বাবুজী?

কিন্তু তখন আর কার কাছে কৈফিয়ত চাইবে সুধাময়! যার কাছে চাইবার তিনি আর তখন নেই। রাজাসাহেব তখন লালজী-সাহেবদের ষড়যন্ত্রে খুন হয়ে গেছেন। তাঁর প্রেতাত্মা তখন অন্তঃপুরের মহলে-মহলে, তালকটোরার কুঠরীতে-কুঠরীতে সুড়ঙ্গের গলিতে-গলিতে, অলিন্দে-অলিন্দে আর মাজী-সাহেব, মহারানী পর্দায়েৎ পাশোয়ানজীদের কক্ষে কক্ষে নিঃশব্দে হাহাকার করে বেড়ায়।

ফুলশয্যার রাত্রে নির্জন ঘরে সরবতী বাঈয়ের সেই উন্মত্ত রূপ আবার ঝড় ওঠালো। সুধাময় আবার সেই দিকে চেয়ে উন্মত্ত হয়ে উঠলো। সেই দাবা খেলার সময় যেমনভাবে উন্মাদ হয়ে উঠেছিল। বাইরে মরুভূমির রাত্রি যেন যাদুমন্ত্রে মদির হয়ে উঠেছে। রাজার আদেশে এ-ঘরে আজ সমারোহের সীমা নেই। আতর গোলাপজল, ফুল, পানীয়—কিছুরই অভাব রাখেননি তিনি। অন্তঃপুরের মহিলারা উৎসবের শেষ সমবেত-গানটি গেয়ে বিদায় নিয়েছে। বাইরে উৎসবের বাকি অংশ এখনও চলছে, কানে ভেসে আসছে সে-সুর।

সরবতী বাঈ চীৎকার করে উঠলো—পায়ে পড়ি বাবুজী, আমাকে ছুঁয়ো না—

—কেন ?

বিয়ের ইতিহাসে নববধূর এ-আচরণ কখনও শোনা যায়নি। অন্ততঃ সুধাময় কখনও শোনেনি। তবু সে-রাত্রি তেমনি করেই কেটে গেল। দুজনেই জেগে। একজন পালঙ্কের ওপর, আর একজন পালঙ্কের নীচে। রাত্রের ফুল সকাল হলেই শুকিয়ে এলো। আতর-গোলাপজলের তীব্র সুগন্ধও কখন মরুভূমির শুকনো হাওয়ায় মিলিয়ে এল। ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে সরবতী বাঈ সুড়ঙ্গের পথ দিয়ে অন্তঃপুরের দিকে চলে গেল আর বাইরের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল সুধাময়।

আজ থেকে কত বছর আগেকার এসব ঘটনা, এসব শোনা কাহিনী মনে পড়তো না, যদি না তোমার চিঠি পেতাম। এ কাহিনী সেই বনলতার-ই। সরবতী বাঈ এ-কাহিনীর কিছু না। তবু বনলতার কাহিনী বলতে গেলে সরবতী বাঈয়ের কাহিনী না বললে চলবে না।

বনলতা তোমারই মতো একদিন ছিল ছাব্বিশ বছরের মেয়ে। তোমারই মতো চাকরি করতো সে। আর তোমারই মতো মুখ ফুটে মনের কথাটা বলতে লজ্জা পেত। তোমারই মতো সুধাময়ের সব আবদারে সন্দেহ করে দূরে সরে থাকতে চাইত। বয়েসে বড় হওয়ার জ্বালা তো আছেই। তাই তো বলি সেই জ্বালা ঢাকবার জন্যে লজ্জা আরো খারাপ।

সরলাদি বলতো—কা'র সোয়েটার বুনছো বনলতাদি ?

সুধাময়ের নামটা করতে যেন লজ্জা করতো বনলতার। বলতো—কেউ-না-কেউ আসবেই, তখন তাকেই দেবো—

সরলাদি বলতো—কেউ এলে এখনই আসতো—আমাদের বয়েস তো হু হু করে বেড়ে চলেছে ভাই—

এক এক দিন সরলাদি বলতো—রাজপুতানায় যাবে বলেছিলে, যাবে না ?

বনলতা বলে—দূর, ও তোমাকে এমনি বলেছিলাম—

তবু তন্ন তন্ন করে সুধাময়ের চিঠিগুলো পড়েও কোথাও তাকে আহ্বানের কোনও ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। চিঠির কোথাও এতটুকু হা-হুতাশ নেই। একলা থাকবার হা-হুতাশ ! কোথাও কোনও ইঙ্গিতও নেই তার। লেখে—চাকরি করতে গেলে ও-সব একটু সহ্য করতেই হয়, সহ্য করবে মুখ বুজে। তোমার সেই সোনার চুড়িটা এখনও কাছে রেখে দিয়েছি। ওটা তোমায় ফেরত পাঠাবো না—। ওটা কাছে রেখে দিয়ে শান্তি পাই—মনে হয় তুমি আমার কাছাকাছি আছ—

তারপর ?

তারপরেও পড়ে দ্যাখে বনলতা। কোথাও তো এ-কথা লেখা নেই—'তুমি

চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে এসো, চাকরি করবার দরকার নেই তোমার—'। এ-কথা স্পষ্ট করে কেন লেখে না সুধাময়।

রাত্রের নির্জনে আবার দেখা হয় সরবতী বাঈয়ের সঙ্গে। একদিনেই যেন চেহারা করুণ হয়ে উঠেছে। রাজার প্রাসাদের অন্তঃপুর ছেড়ে সুধাময়ের বাড়িতে এসে উঠেছে সরবতী বাঈ। রাজাসাহেব দুজনের একটা বিরাট অয়েল-পেন্টিং করে দিয়েছেন। সেটা দেয়ালে টাঙানো হয়েছে। চমৎকার মানিয়েছে সরবতী বাঈকে। তবু সুধাময়ের মনে হলো সরবতী বাঈ যেন ঘোমটা দিয়ে মুখ ঢেকে থাকে ইচ্ছে করে।

হাত ধরতেই সরবতী বাঈ সরে গেল। বললে—আমাকে ছুঁয়ো না তুমি বাবুজী!

নিজের স্ত্রীকে ছুঁতে পারবে না সুধাময়, এ-কেমন অনুরোধ!

সরবতী বাঈ বললে—না, আমার অসুখ আছে।

অসুখ! সত্যিই এক-পা পেছিয়ে এল সুধাময়। অসুখ যদি সরবতী-বাঈয়ের তো সেও তো ডাক্তার। কী অসুখ! কেমন অসুখ! সব অসুখের ওষুধ আছে। অসুখ সারিয়ে দেবে সুধাময়। অসুখের জন্যে ভয় কী! কিন্তু ডাক্তার রোগীকে ছোঁবে না, এ-কেমন কথা।

সরবতী বাঈ বললে—আমাকে ছুঁলে তোমারও অসুখ হবে বাবুজী!

সুধাময় এবার সোজা হয়ে প্রশ্ন করলে—কী অসুখ?

সরবতী বাঈ বললে—ওরা সবাই তোমাকে জব্দ করবার জন্যে তোমাদের দাবা খেলার আসরে আমাকে পাঠিয়েছিল—তোমার ওপর ওদের খুব রাগ—

সুধাময় জিজ্ঞেস করলে—রাগ কেন?

সরবতী বাঈ বললে—রাজাসাহেব যে তোমার হাতের মুঠোর মধ্যে ছিল বাবুজী!

—তা আমাকে জব্দ করবে কী করে শুনি?

সরবতী বাঈ বললে—তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়ে—তোমার জীবন বরবাদ্ করে দিয়ে?

সুধাময় বললে—তোমার সঙ্গে বিয়ে হলে আমার জীবন বরবাদ্ হবে কেন?

সরবতী বাঈ বললে—হ্যাঁ বাবুজী, আমার জীবনও বরবাদ্ হয়ে গিয়েছে—

সব শুনে অবাক হয়ে গেল সুধাময়। সরবতী বাঈ বললে—আমার মতো আরো অনেক মেয়ে আছে বাবুজী, কাউকে জব্দ করতে গেলে তাদের দিয়ে মন ভুলিয়ে জওয়ানী বরবাদ্ করে দেওয়া যায়,—

—আর তারা?

সরবতী বাঈ বললে—তারা ওখানেই একদিন যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করে কুষ্ঠ হয়ে মারা যায়—

সুধাময় বললে—রাজাসাহেব জানেন এসব কথা ?

সরবতী বাঈ বললে—হুজুর সব ব্যাপার জানেন, শুধু আমার ব্যাপারটা জানেন না, এ খোজা দিলখুশা সিং-এর মতলব, লালজী-সাহেবের চক্রান্ত আর বড় রানী চন্দ্রাবতীর পরামর্শ—

এসব অনেকদিন পরের কথা। পরদিন সকালেই সুধাময় দরবারে গিয়ে রাজা-সাহেবের সঙ্গে দেখা করবার অনুমতি চাইলে। আমলারা বললে—রাজাসাহেব তো আজ দরবার করবেন না হুজুর—

—কেন ?

—সে তাঁর খুশী !

কিন্তু পরদিনও রাজাসাহেব এলেন না। কিন্তু খবরটা তার পরদিন বেরুল। রেসিডেন্ট সাহেব এলেন, তদারকি চললো কিছুদিন। অনেক জল গড়িয়ে গেল আরাবল্লীর গিরি খাত দিয়ে, অনেক মোহর, অনেক টাকা, অনেক ইনাম সুড়ঙ্গের অন্ধকার গলিতে গিয়ে আত্মগোপন করলো। সারা-রাজ্যময় তোলপাড় পড়ে গিয়েছিল সেদিন। কত গুজবের সৃষ্টি হলো, কত কাহিনী। কেউ বলে—এ লালজী-সাহেবের কাজ।

কেউ বলে—রানী চন্দ্রাবৎজীর পরামর্শ—

কেউ বলে—দিলখুশা সিং-এর হাত আছে এতে—

রেসিডেন্টের রিপোর্ট গেল দিল্লীতে—নাহারগড়ের রুলিং প্রিন্স হার্ট-ফেল্ করে মারা গেছেন—

সরবতী বাঈ বললে—আমার জন্যে কেন তক্‌লীফ করছেন বাবুজী,—

বেশী কথা বলে না সরবতী বাঈ। শুধু বড় বড় চোখ মেলে তাকিয়ে থাকে। গোলাপের পাপড়ির মতো ঠোঁট-দুটো শুধু এক এক বার কাঁপে। বলে—ও-সাদী আমাদের সাদী নয় বাবুজী ! আমাকে ভুলে যান আপনি—

সুধাময় বই খুলে তখন পড়ছে। দিনরাত বই পড়ে আর জিজ্ঞেস করে। বলে —তোমার ভুখ্ আছে ?

আবার কখনও পড়তে পড়তে কী একটা সন্দেহ হয়। বলে—আমার কাছে লজ্জা কোরো না, আমি ডাক্তার, যা যা জিজ্ঞেস করি বলো তো···

অদ্ভুত জীবন। এত অদ্ভুত জীবনের পরিচয় সুধাময় তার ডাক্তারী বইতেও কখনও পড়েনি। কোথাকার সব বাছাই-করা মেয়ে। কাউকে কিনে আনা, কাউকে চুরি করে আনা। গ্রামের সব মেয়ে। হয়তো জল তুলতে এসেছিল কুয়োর ধারে, তারপর আর কেউ তার সন্ধান পায়নি। একদিন নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে অকারণে। তারপর এসে তাদের তুলে দিয়েছে দিলখুশা সিং-এর হাতে। তারপর যারা বেশি সুন্দরী, তাদের মধ্যে থেকে বেছে বেছে রোগের বীজ ঢুকিয়ে দিয়েছে শরীরে। যখন কাউকে জব্দ করতে হবে, কারুর জীবন বরবাদ্ করে দিতে হবে, তাকে

উপহার দেওয়া হয় এক-রাত্রির জন্যে। তারপর রোগের জীবাণু শরীরের কোষে কোষে রক্তকণিকায় মিশে গিয়ে বিষাক্ত করে দেয় সমস্ত। তারপর যন্ত্রণা। কঠোর যন্ত্রণায় জীবনের অবসান হয় এক-রাত্রির বিভ্রমে।

সরবতী বাঈ বলে— আমাকে তুমি কেন সাদী করলে বাবুজী?

অনেক দিন আগের কথা!

একদিন রাত্রে হঠাৎ অন্দর-মহলের দরজা খুলে গেল। খবর গেল দিলখুশা সিং-এর কাছে। একদিন মোগল আমলে এখানে যুদ্ধ-বিগ্রহের দিনে সশস্ত্র পাহারা বসেছে। মহারাজা যুদ্ধে গেছেন সৈন্য-সামন্ত নিয়ে। খবর এসেছে পরাজয়ের। মোগল-সৈন্য দলে দলে ছুটে আসছে নাহারগড় লক্ষ্য করে। সড়কী, ঢাল, তলোয়ার, ঘোড়া, উট নিয়ে তৈরি হয়ে আছে এখানকার প্রহরীরা। ভেতরে অন্তঃপুরে সংবাদ দেওয়া হয়েছে। খোজা-প্রহরীরা কান পেতে আছে। মোগল সৈন্য অন্তঃপুরে ঢোকবার আগেই সব শেষ হয়ে যাবে। আগুনের কুণ্ড তৈরি হবে, একে-একে সারি দিয়ে দাঁড়িয়েছে মাজী-সাহেব, বড়রানী, মেজরানী, ছোটরানী, সখী, পর্দায়েৎ, পাশোয়ানজী, দাসী, বাঁদী, কেউ আর বাকি নেই। এক এক করে আগুনে ঝাঁপ দিতে হবে। মোগল-সৈন্য যেন দেহ স্পর্শ না-করতে পারে। সবাই জহর-ব্রত করবে! কিন্তু সে-দিন আর এখন নেই!

তবু আজো তেমনি দাঁড়িয়ে আছে প্রহরী। দিলখুশা সিং নিজেই এসেছে মশাল নিয়ে।

বললে—মুখটা দেখি— ?

মুখটা দেখে খোজা দিলখুশা সিং-ও অবাক হয়ে গেল। এত কম বয়েসের মেয়ে আর এত রূপ!

দিলখুশা সিংয়ের হাতে ছেড়ে দিয়ে লোক দুটো আবার অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেল। ইস্পাতের দরজা আবার বন্ধ হয়ে গেল সশব্দে। তারপর মহলের পর মহল পেরিয়ে চললো দিলখুশা সিং আর ছোট একটি মেয়ে। শেষে এসে পৌঁছুল একটা ঘরে। দিলখুশা সিংয়ের ঘর। ঘরের কোণ থেকে বেরোল একটা লাল কাপড়ে বাঁধা খাতা। খাতার পাতাগুলো খুলতে খুলতে বললে—নাম কি তোমার ছোকরি?

ছোকরি বললে—মোহর বাঈ—

নামটা লিখে নিলে দিলখুশা সিং। তার পর নিয়ে গেল বড়রানীর কাছে। ঘরে তাকিয়া হেলান দিয়ে বড়রানী তখন আলবোলায় তামাক খাচ্ছিলেন। আফিং-এর নেশাও করা ছিল। পাশে কয়েকজন সখী বাঁদী সেবা করছে। সামনে পানের বাটা।

দিলখুশা সিংয়ের অবাধ গতি। ঘরের সামনে গিয়ে ডাকলে—চন্দ্রাবৎজী—

চন্দ্রাবৎজী চন্দ্রাবৎ বংশের মেয়ে। বললেন—কে?

দিলখুশো সিং সামনে গিয়ে মোহরকে এগিয়ে দিলে। বললে—সেলাম করো—

—কে এ ?

—নতুন এসেছে আজ। নাম—মোহর বাঈ—

বড়রানী ভালো করে চোখ তুলে চাইলেন। সখীরাও দেখলে, বাঁদীরাও দেখলে ভালো করে। দেখে, হেসে গড়িয়ে পড়লো তারা। বললে—ওমা, একেবারে ঠাণ্ডি সরবতের মতো চেহারা যে—

সব দেখে-শুনে মোহর বাঈ আরো তাজ্জব হয়ে গেছে। এ-কোথায় এল সে। রাজার বাড়ি দেখাবে বলে তারা বাপকে একশো এক টাকা দিয়ে কিনে নিয়ে এল। বললে—মেয়ে তোমার সুখে থাকবে শেঠজী—খেয়ে প'রে বাঁচবে, তারপর রাজা-সাহেবের নজরে যদি একবার পড়ে যায় তখন আর পায় কে ! তারপর গরুর গাড়ি চড়ে এখানে এনে কোথায় পৌঁছিয়ে দিয়ে গেল তারা ! এ-যেন পরীদের দেশে এসে পড়েছে সে।

হঠাৎ বড়রানীর গলার শব্দে তার যেন জ্ঞান ফিরে এল।

বড়রানী বললেন—ঠাণ্ডি সরবতের মতন চেহারা—ওর নাম থাক্ সরবতী বাঈ—

সরবতী বাঈ অন্তঃপুরের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। এ-মহল থেকে সে-মহল। দোলের দিনে ফাগ মাখে, বিয়ে-সাদীতে মেঠাই খায়। দেওয়ালীতে নতুন জামা পরে। যাত্রা-ছায়াবাজি এলে দ্যাখে। গান শোনে। অভিনয় দ্যাখে। পুজো পার্বণে যোগ দেয়। আর সবাইকার মতোই একজন।

তারপর একদিন বয়েস হলো। দিলখুশো সিং বলে—সরবতীয়াজী, অত দুষ্টুমি করে না, এখন তোমার বয়েস হয়েছে—

বয়েস সত্যিই হলো একদিন। সেই বয়েস হওয়াই কাল হলো তার। পায়ে জরির জুতো উঠলো। বুকে কাঁচুলি উঠলো, মাথায় ওড়না উড়লো। চুলের বেণী ঝুললো, পায়ে মল, কানে ঝুমকো, গলার হার—সব। এসব রাজবাড়ির নিয়ম। এ-নিয়ম চলে আসছে অনাদি কাল থেকে। এখন যারা পর্দায়েৎ হয়েছে—তারাও এককালে এমনি করে এসেছে। পৃথিবীর সংগে সমস্ত সম্পর্ক ঘুচিয়ে এসেছে। তাদের কাছে পুরুষ একমাত্র রাজাসাহেব। আর কোনও পুরুষ নেই। এ-জগতে একজন পুরুষ আর সব নারী। ওই পুরুষটির মনোরঞ্জনের জন্যেই এই অসংখ্য নারীর জীবন-যৌবন-মান-সম্ভ্রম সমস্ত কিছু।

কিন্তু হঠাৎ এক দুর্দৈব ঘটলো সরবতী বাঈয়ের জীবনে।

হোলির উৎসব হচ্ছে। চারিদিকে ঝাড়-লন্ঠন, ফুল, পাতা, লাড্ডু-মেঠাইয়ের ছড়াছড়ি। নতুন কাপড়, জামা, জুতো, ওড়না, ঘাগরার আমদানী হয়েছে। সবাই আসতে শুরু করেছে। দূরে দূরে খানদানী ঘরে নেমন্তন্ন গেছে। তাদের ঝি-ঝিউড়ি, বউ, বহিন সব এসেছে। কিন্তু সবাই সরবতী বাঈয়ের দিকে চেয়েই

চমকে যায়— ! এত রূপ ! এত রূপও হয় ! যেন সকলকে হারিয়ে দেবে আজ। রাজাসাহেবের সামনে আজ সবাইকে হার মানতে হবে। সকলের পোশাক-পরিচ্ছদ, গয়না, সাজাগোজা সব ব্যর্থ। এক সরবতী বাঈ আজ সকলকে কানা করে দেবে।

সবাই বলে—ও কে বহিন ?

—ও সরবতী বাঈ—

সর্বনাশ ! রাজাসাহেবের চোখে পড়তে দেওয়া উচিত হবে না এমন রূপকে। এমন রূপসীকে আড়ালে না সরালে আজ সকলকে কানা করে দেবে ! দিলখুশা সিংকে চুপি চুপি ডেকে পাঠালেন বড়রানী চন্দ্রাবৎজী ! তারপর কী কথা হলো কেউ জানে না। কেউ শোনেনি সে-কথা। শুধু যখন উৎসব হলো তখন সরবতী বাঈকে কেউ আর দেখতে পেলে না সেদিন। সরবতী বাঈ তখন তালকটোরার বন্দীশালার অন্ধকারে চুপ করে বসে আছে।

তারপর কত বছর কেটে গেছে। উৎসবে সরবতী বাঈয়ের অধিকার নেই বটে। কিন্তু অধিকার আছে অন্য কাজে। আরো গুরুতর কাজ ! রাজ্যের ভালো-মন্দ, মঙ্গল-অমঙ্গলের কাজে তাকে ব্যবহার করা হবে। এমন রাখতে হয়। যখন রাজার শত্রুতা করছে কেউ, ষড়যন্ত্র করছে রাজ্যের বিরুদ্ধে, তাকে খাতির আপ্যায়ন করে এনে বসিয়ে আরক খাইয়ে অসাড় করে ওইসব রূপসী নারীদের এগিয়ে দেওয়া হয়। এই-ই তাদের কাজ। জীবন বরবাদ্ করে দেওয়া হয় শত্রুদের। তাদের ধ্বংস করা হয় এইভাবেই।

শুধু কি সরবতী বাঈ ! ও-মহলে ওই কাজের জন্যে আছে মতিয়া বাঈ, আখতারি বাঈ, গোলাপী বাঈ। বেশিদিন বাঁচে না তারা। তবু জীইয়ে রাখতে হয়। খেতে পরতে দিতে হয়। ভালো-ভালো সাজ-পোশাক দিতে হয়। তারপর অনেক রাত্রে একদিন দিলখুশা সিং মশাল নিয়ে এসে দরজার চাবি খোলে আর আধা-অন্ধকার ঘরে টুপ করে ঢুকে পড়ে একটা বিকলাঙ্গ মূর্তি ! এসে জড়িয়ে ধরে সাপের মতো। তারপর রাত্রির রোমাঞ্চ কাটাতে পাঁচ কি সাত দণ্ড লাগে মাত্র। দিলখুশা সিং আবার তাকে বার করে নিয়ে যায়। তারপর আবার। তার পরাদনও আবার। ভালো করে রক্তের অণু-পরমাণুতে মিশে যাক জীবাণু। ভালো করে অস্থি-মাংস-মজ্জায় শেকড় গাড়ুক। কোথাও কোনও ফাঁক না থাকে !

মতিয়া বাঈ, আখতারি বাঈ, গোলাপী বাঈ সকলেরই জীবনে এমনি ঘটেছে। সরবতী বাঈয়ের জীবনেও ঘটলো।

বড়গাজীর শেঠ খানদানী লোক। কিন্তু ভেতরে ভেতরে তার অনেক মতলব। রতনগড়ের নবাবের কাছে গিয়ে নাহারগড়ের রাজাসাহেবের কুৎসা করে। জমিদারীর প্রজাদের ওপর হামলা করে। গরু-ঘোড়া-উটের পাল চুরি করে নিয়ে যায়। এর মূলে ছিল বড়গাজীর শেঠ। তাকেই জব্দ করতে হবে। রেসিডেন্ট সাহেবের কাছে দরখাস্ত করে আপীল-আদালত যা-কিছু সে তো হবেই, কিন্তু

শেঠজীকে জব্দ করা দরকার। একদিন ডেকে আনা হলো খাতির করে। খাওয়ানো হলো পেট ভরে। আরক এল। বাঈজী এল। আর রাত্রি গভীর হলে, এল গোলাপী বাঈ। গোলাপী বাঈয়ের সঙ্গে এক-বিছানায় রাত কাটালো শেঠজী! আর শেঠজীর অস্থি-মাংস-মজ্জায় গোলাপী বাঈয়ের সমস্ত কামনা প্রতিশোধ হয়ে প্রতিহিংসা হয়ে চিরস্থায়ী হয়ে গেল। তারপর চার কি পাঁচ বছর! রাজা-সাহেবের সব শত্রু নিপাত হয়েছে এমনি করে।

সরবতী বাঈ শুধু কাতর চোখে চায় আর ক্ষীণ কণ্ঠে বলে—আমাকে তুমি সাদি করলে কেন বাবুজী, আমরা সাদির জন্যে নয় যে—

এবার কিন্তু অন্য ঘটনা। রাজাসাহেবও জানে না। এ দিলখুশা সিং বড়রানী আর লালজী-সাহেবের কাণ্ড! তিনহাজারী থেকে পঞ্চাশ-হাজারী জায়গীর পেয়ে গেল বাঙালী ডাক্তার চালাকী করে। রাজাসাহেব ডাক্তার-সাহেবের কথায় ওঠেন। তাকে জব্দ করতে হবে। রোজ দাবা খেলতে বসে তয়খানায়। যখন জলের জন্যে রাজাসাহেব হাততালি দেবেন জল নিয়ে যাবে সরবতী বাঈ!

সকাল থেকে দিলখুশা সিং অনেক পোশাক-আশাক দিয়ে গেছে। কুমকুম, বাস-তেল, ফুল, পৈঁছা-কঙ্কন, কপালের টিপ। ভালো করে সাজো, ভালো করে ঘষে-মেজে মোহিনী মূর্তি ধরো, খেলার মোহ ভাঙাও—। আপত্তি করলে চলবে না, রাজ্যের ভালো-মন্দের জন্যে সব স্বার্থ ত্যাগ করতে হবে। কাঁদলে চলবে না!

তারপর মোহিনী মূর্তিতে সাজিয়ে তয়খানার পাশের ঘরে রেখে এল সরবতী বাঈকে।

দিলখুশা সিং বললে—রাজাসাহেব তিনবার হাততালি দিলেই বুঝবে জল চাইছেন, দুবার হাততালি দিলে আরক, আর একবার দিলে বুঝবে তামাক—

রাজাসাহেব হাততালি দিলেন তিনবার।

সদানন্দবাবু বলেছিলেন—পরে আর একবার গিয়েছিলাম মশাই নাহারগড়ে। সেবারও ওই রসগোল্লার বায়না, সরবতী বাঈয়ের বিয়ের সময় রসগোল্লা খেয়ে খুব ভালো লেগেছিল, আবার তাই হুকুম হয়েছে। তা গেলাম! তখন দলজিৎ সিং মারা গেছে, খোজা দিলখুশা সিং আবার বড়রানী চন্দ্রাবৎজীর রাজত্ব। বড় কুমারসাহেব গদীতে বসেছে। ডাক্তারের আর সে-খাতির নেই। ডাক্তার তখন এক কাণ্ড করে বসেছে।

সদানন্দবাবু বলেন—ভীষণ কাণ্ড। সারা-জীবনেও মশাই এমন কাণ্ড কেউ শোনেনি।

জিজ্ঞেস করলাম—আর বনলতা?

—কে বনলতা? —সদানন্দবাবু চিনতে পারলেন না।

বললেন—দেখলাম বটে একজন মহিলাকে—

—কী রকম চেহারা?

চেহারা বনলতা রায়ের এমন কিছু ভালো নয়। পাঁচ-পাঁচি একরকম। লোকে বলতো—মুখের গড়নে কী যেন একটা আছে। ওইজন্যেই একদিন সুধাময় বোধ হয়, একটা রসিকতা করবার লোভ সামলাতে পারেনি। তার মূল্যও সেদিন দিয়েছে সে! সারা জীবন ধরে সে-মূল্য দিতে হয়েছে তাকে। আর সে-মূল্য কি কম মর্মান্তিক!

সরবতী বাঈ যেদিন মারা গেল সেদিন সুধাময় নদীর ধার থেকে সোজা নিজের ঘরে এসে বসলো। সেই-যে ঘরে ঢুকলো, জীবনে সে-ঘর থেকে বেরোয়নি আর। কখন সকাল হয়েছে, কখন সন্ধ্যে হয়েছে, কখন রাত হয়েছে, কখন সারা নাহারগড় ঘুমে অচেতন হয়ে গেছে খবর রাখতো না। কেউ কেউ দেখেছে। রাস্তার পাশ দিয়ে যেতে যেতে দেখা গেছে, ডাক্তার ঘরের ভেতর বসে-বসে কী সব লিখছে পাতার পর পাতা। লোকের রোগ হয়েছে, ডাক্তারের কাছে এসেছে রোগের ওষুধ নিতে।

জিজ্ঞেস করেছে—ডাগদার-সাব্ হ্যায়?

চাকর এসে বলেছে—না, সাহেব ডাক্তারী করেনা আর—

অনেক রাতে বই পড়তে পড়তে পাতার ওপর চোখ-দুটোকে স্থির করে দেয়। যেন ধ্যানে বসেছে সুধাময়। সরবতী বাঈ মারা গেছে যন্ত্রণায়। ডাক্তারের ওষুধ তাকে বাঁচাতে পারেনি। ডাক্তারী বিদ্যে কোনও কাজে লাগেনি। পৃথিবীর কোনও ওষুধ তাকে সারাতে পারেনি। এক এক দিন সরবতী বাঈয়ের পাশে বসে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে শুধু দেখেছে তাকে। জিজ্ঞেস করেছে—আজ কেমন আছ?

সরবতী বাঈ শুধু চোখ দিয়ে কথা বলেছে। কথা বলবার শক্তি ছিলনা শেষ পর্যন্ত। যেন বলতে চেয়েছে—আমাকে কেন সাদী করলে বাবুজী!

সুধাময় বললে—আর একটা ইনজেকশন দিচ্ছি—এটা নিয়ে কেমন থাক দেখি—

একটার পর একটা ওষুধ এনেছে কলকাতা থেকে, বোম্বাই থেকে আর খাইয়েছে সরবতী বাঈকে। বইয়ের পর বই কিনেছে আর পড়েছে। এ বুঝি মরুভূমির জগতে এক আজব রোগ। এ রোগের কথা কেউ লেখেনি আগে। সরবতী বাঈয়ের সমস্ত শরীর আস্তে আস্তে ভাঙতে শুরু করলো। তারপর কথা বন্ধ হলো, তারপর চোখ অন্ধ হলো। সে-যন্ত্রণা আর চোখ দিয়ে দেখা যায় না। তবু সরবতী বাঈয়ের সারা দেহখানা নিজের দু'হাতে তুলে ধরে তাকে ধুইয়ে দিতে হয়। সমস্ত গায়ে দুর্গন্ধ। এত যে সুন্দরী, এরই সৌন্দর্য দেখে একদিন সুধাময় অবাক হয়ে গিয়েছিল, এখন আর সে-কথা ভাবা যায় না। কয়েক মাস বেশ ভালো ছিল, আবার রোগ হলো, আবার ভালো হলো, তারপর আবার সেই!

সমস্ত বাড়িটা সেদিন যেন থমথম্ করছে। চারিদিকে নিস্তব্ধ। পশ্চিম

দিকের খেজুরগাছের পাতায় শুধু শুকনো বাতাসের খস্ খস্ শব্দ আসছে একটু। একটা পাখি নিঃশব্দে উড়ে যেতে যেতে বুঝি হঠাৎ ডানা ঝাপটিয়ে দিক পরিবর্তন করলো। সরবতী বাঈ যে-ঘরটায় শুয়ে থাকতো সেটা আজ ফাঁকা। তবু সেইদিকে চেয়ে সুধাময়ের মনে হলো, কেউ যেন কাঁদছে। সরবতী বাঈয়ের কান্নার শব্দ। ঠিক সেইরকম গলা। বলছে, কেন আমাকে সাদী করলে, বাবুজী! অস্ফুট স্বর যেন আস্তে আস্তে আবার অনেক দূরে মিলিয়ে গেল। সমস্ত নাহারগড় যেন স্থির হয়ে আছে। নতুন রেসিডেন্ট এসেছে লেকের ধারে বাঙলোতে। নতুন সাহেব। রাজপ্রাসাদ থেকে নতুন করে দামী ভেট্ গেছে সাহেবের কাছে। রাজাসাহেবও নতুন, রেসিডেন্টও নতুন। তবু বড়রানী আছে, খোজা দিলখুশো সিং আছে। রাজপ্রাসাদের সমস্ত চক্রান্ত সাহেবের চোখ থেকে আড়ালে রাখতে হবে। সরবতী বাঈ গেছে, মোতিয়া বাঈ, আখতারি বাঈ, গোলাপী বাঈও হয়তো গেছে। তাদের জায়গায় আবার হয়তো এসেছে অন্য কোনও বাঈ। সরবতী বাঈয়ের ঘরে অন্য কোনও মেয়ে এসে আবার হয়তো বন্দী হয়েছে। আবার যদি রাজাসাহেবকে কেউ হাত করে ফেলে আবার সরবতী বাঈ সেজে সোনার ঘড়ায় জল নিয়ে হাজির হবে তয়খানাতে। তা হলে মুক্তি কোথায়! সরবতী বাঈ, আখতারি বাঈ, গোলাপ। বাঈদের মুক্তি কোথায়?

ডাক্তারী বই পড়তে পড়তে হঠাৎ সুধাময় উঠলো। ক'দিন ধরে দাড়ি কামানো হয়নি। টিম্ টিম্ করে আলো জ্বলছে ঘরে, সমস্ত মুখটা বীভৎস হয়ে উঠলো আয়নার ছবিতে। হঠাৎ যেন সরবতী বাঈ অলক্ষ্যে কথা বলে উঠলো—আমাকে তুমি কেন সাদী করলে বাবুজী?

এই 'কেন'র উত্তর দেওয়া হলো না সুধাময়ের। সরবতী বাঈয়ের সমস্ত শরীর পঙ্গু হয়ে গেছে তখন। কথা বলতে পারে না। লোক চিনতে পারে না। চোখ মুখ নাক কান সব বিকল হয়ে গেছে। সেই রূপ কোথায় গেল? কোথায় গেল সরবতী বাঈ! অন্ধকার রাতগুলোতে সরবতী বাঈয়ের বিকৃত রূপ চোখের সামনে ভেসে ওঠে। শুধু দেয়ালের অয়েল-পেন্টিংখানা নির্বাক হয়ে চেয়ে থাকে।

সেদিন সকালবেলাই মাধোলালকে ডেকেছে ডাক্তার।

বললে—আজ থেকে যে আসবে, বলবি আমার সঙ্গে দেখা হবে না—

মাধোলাল বললে—যদি রাজাসাহেব এত্তেলা দেয়?

সুধাময় বললে—তবু না—

—যদি রানীসাহেবা এত্তেলা পাঠায়?

—তবু না—

—যদি…

কেউ না, কেউ নেই সুধাময়ের। সরবতী বাঈ ছাড়া ইহলোকে পরলোকে কেউ তার নেই।

তেত্রিশ মাইল রাস্তা গরুর গাড়ি ঝাঁকুনি দিতে দিতে চলেছে। রাত থাকতে বেরিয়েছি। বাবলাকাঁটার ঝোপ-ঝাপ পেরিয়ে মেটে রাস্তা ধরে চলা। ছায়া-ছায়া দিন। ভারত মহাসাগরেরর ধারে ধারে নুনে জমাট বাঁধা খাল-বিল। রোদ লেগে চিক্ চিক্ করছে। পাণ্ডা ঈশ্বরীপ্রসাদ গল্প বলে চলেছে শুধু।

এ-ও আজ থেকে কতদিন আগের কথা। সব স্পষ্ট মনে নেই।

আজ তোমার চিঠির উত্তর দিতে গিয়ে আবার সব মনে করবার চেষ্টা করছি, সুচেতা। আজমীরের সদানন্দবাবুর কাছে সুধাময় ডাক্তারের সবটা শোনা হয়নি। সদানন্দবাবু সবটা জানতেনও না। রসগোল্লার বায়না পেয়ে নাহারগড়ে গিয়ে ডাক্তারকে যেমন-যেমন দেখেছিলেন তেমনি বলেছিলেন আমাকে। প্রথমটা শুনি টুকু-মাসিমার কাছে কলকাতায়। তারপর আজমীরে। বার বার ভাগে ভাগে গল্প শুনে একটা আধা-সম্পূর্ণ কাহিনী পেয়েছিলাম। আর আজ শুনছি শেষটা। বনলতা রায় কেমন করে বনলতা মিত্র হলো, সেই গল্প।

ঈশ্বরীপ্রসাদ বললে—পয়সা তো ডাক্তার-মা নেয় না—ডাক্তার-মা'র হাসপাতালে কারো পয়সা লাগে না—

অথচ পয়সার একদিন কী অভাবই ছিল বনলতার।

সরলাদি বলেছিল—সব কেনা-কাটা হলো বনলতাদি ?

বনলতা বললে—আর পয়সা নেই ভাই—

সরলাদি বলেছিল—গিয়ে চিঠি দিয়ো কিন্তু—

কিন্তু, সরলাদি চলে যেতেই মনে পড়ে গেল। সুধাময়ের জন্যে কাপড় কিনেছে। ভাইফোঁটার আগের দিন পেঁছিবে নাহারগড়ে। ট্রেনভাড়া বাদ দিয়ে হাতে আর কিছু নেই। হঠাৎ মনে পড়লো একটা কথা। আবার দোকানে যেতে হলো। বললে—সিঁদুর দিন তো এক প্যাকেট—ভালো সিঁদুর—

দোকানী একবার বনলতার সিঁথির দিকে চেয়ে দেখলে। তারপর প্যাকেটটা দিয়ে কেমন যেন অবাক হয়ে গেল। দাম নিতে গিয়ে বনলতার মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে দেখলে কিছুক্ষণ! বনলতা তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে নিলে। তার মুখ-চোখও কি সিঁদুরের মতো লাল হয়ে গেছে! জানতে পেরেছে নাকি সবাই!

মুখের কথার প্রতীক্ষায় নির্ভর করে আর বনলতার দেরি করা চলে না তখন। তখন ছাব্বিশ ছাব্বিশে গিয়ে পেঁছিছে। রাত্রে ডিউটি করতে গিয়ে ঘুম এসে পড়ে। সারাদিন ঘুমে ঢোলে চোখ। আর শুধু কি চোখ! মনেও বুঝি ক্লান্তি নেমেছে। ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে আছে সমস্ত দেহ। তবু কোথায় যেন বিরাট অসম্পূর্ণতা। নিঃসহায়, নিরবলম্ব অপার শূন্যতা। বনলতা ট্রেনে উঠে বার বার ভাবতে চেষ্টা করলে—কোনও অন্যায় সে করতে যাচ্ছে না। তার বয়েস ছত্রিশ আর সুধাময়ের তেত্রিশ। আজকের এই তেত্রিশ মাইল পথের মতোই দীর্ঘ। ছায়া

আছে কিন্তু প্রখর রোদের তেজে কি কখনও ছায়ার আশ্রয় খোঁজেনি সুধাময় ! কখনও ছায়া-নিবিড় আশ্রয়ের সন্ধানে আকুল হয়নি ! তবে কেন সে চিঠি-লেখা ছেড়ে দিলে। বনলতার একটা চিঠিরও জবাব সে দেয়না কেন ?

মাধোলাল প্রথমে বাঙালী মেয়ে দেখে আপত্তি করেছিল— । বলেছিল—দেখা হবে না—

বনলতা বলেছিল—দেখা হবেনা কেন ?

—ডাগদারবাবুর হুকুম—

বনলতা বলেছিল—তুমি বলো, আমি দেখা করবোই, আমি অনেক দূর থেকে এসেছি—কলকাতা থেকে—

মাধোলাল বলেছিল—ডাগদার-সাহেব কারো সঙ্গে দেখা করেন না হুজুর,—শুধু ওষুধ খান—আর লেখেন—

—কী লেখেন ?

মাধোলাল বলেছিল—লিখে লিখে খাতা ভর্তি করেন, খাতায় বোঝাই হয়ে গেছে ঘর—

ঈশ্বরীপ্রসাদের সঙ্গে ডাক্তার-মা'র হাসপাতালে যেদিন গিয়েছিলাম, সেদিন বনলতা মিত্র আমাকে দেখিয়েছিলেন সে-সব খাতা। বনলতা মিত্রকেও সেদিন বহু বছর পরে প্রথম দেখেছিলাম। সমস্ত চুল সাদা হয়ে গিয়েছে। থান কাপড়, সাদা সেমিজ। হাসপাতালের সমস্ত রোগীদের ওপর তাঁর নজর। রোগীরা সবাই বনলতাকে ডাক্তার-মা বলে ডাকে। দূরে সমুদ্রের জল চিক্ চিক্ করছে। বনলতার বসবার ঘর থেকে বাইরের সে-দৃশ্যটার সঙ্গে ডাক্তার-মা'র চেহারারও কোথায় যেন একটা সাদৃশ্য ছিল। যেন তেমনি প্রশান্ত, তেমনি প্রশস্ত।

বনলতা দেবী বললেন—ডাক্তার মিত্র ওইসব খাতায় নিজের সমস্ত অভিজ্ঞতা লিখে গেছেন প্রথম দিনটি থেকে, সমস্ত খুঁটিনাটি, অনেক খাতা কপি করিয়ে পাঠিয়েছি জার্মানীতে, তা থেকে নতুন তথ্য আবিষ্কার হবে বলে তাঁরা চিঠি লিখেছেন—এই দেখুন সে-চিঠি—

আমাদের জলখাবার এল। দেখলাম, বনলতার জীবনে যেন এতদিনে স্থৈর্য এসেছে। যেন এতদিন এই সত্য-সাধনা, এই পরিপূর্ণতার দিকেই তিনি একাগ্র-চিত্তে এক লক্ষ্যে এগিয়ে এসেছেন। প্রথম যৌবনের সেই প্রমত্ততার কোনও লক্ষণ আর নেই সেখানে। যেদিন প্রথম নাহারগড়ে এসেছিলেন সেদিনও চিত্ত তার স্থির ছিল না।

সুধাময় বলেছিল—কেন তুমি এলে বনলতা ?

বনলতা বলেছিল—আমি যে বড় দেরি করে ফেলেছি—আর অপেক্ষা করতে পারছি না—কবে তুমি আমাকে আসতে বলবে তার প্রতীক্ষা যে আমার অসহ্য হয়ে উঠলো—

—কিন্তু আমি যে···

বনলতা বলেছিল—আমি তোমার কোনও কথা শুনবো না, আমি কলকাতা থেকে একেবারে সিঁদুর কিনে এনেছি—

বলে সুধাময় আপত্তি করবার আগেই তার হাতটা চেপে ধরলে বনলতা।

সুধাময় একবার বলতে গেল—আমাকে ছুঁয়োনা বনলতা—

কিন্তু তার আগেই বনলতা সুধাময়ের হাত দিয়ে তার নিজের সাদা সিঁথিতে জোর করে সিঁদুর লাগিয়ে দিয়েছে। তারপর সুধাময়ের পায়ে হাত দিয়ে মাথায় ছুঁইয়ে বলেছে—তোমাকে দিয়ে জোর করে নিজের সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে নেওয়াতেও আর আমার লজ্জা নেই—লজ্জা করবার সময়ও নেই—

সুধাময়ের হাতের আঙুল তখন একটু একটু করে খসতে শুরু করেছে। সারা গায়ে ঘা বেরিয়ে পুঁজ বেরোচ্ছে। তখন চোখেও আর ভালো দেখতে পায় না। দু'দিন বাদে হয়তো কানেও আর শুনতে পাবে না। তবু সুধাময়ের চোখের কোণে যেন একটু ক্ষীণ হাসি ফুটে উঠলো। বললে—তুমি এত দেরি করে কেন এলে বনলতা ?

বনলতা সুধাময়ের হাত-দুটো ধরে বললে—তা হোক, আরো দেরি করিনি—সেই আমার ভাগ্য—

সুধাময় বললে—কিন্তু ওই তুচ্ছ সিঁদুরটুকু ছাড়া যে আর কোনও সম্পর্ক তোমার সঙ্গে আমার থাকবে না—

—কে বললে থাকবে না ?

সুধাময় বললে—সত্যিই থাকবে না, থাকলে আমার সমস্ত তপস্যা মিথ্যে হয়ে যাবে যে—সরবতী বাঈ যেমন করে যত কষ্ট পেয়ে মরেছে, সেই সমস্ত কষ্ট-টুকু আমি নিজে পেয়ে মরতে চাই—আর আমার এই লেখাগুলো যদি পারো, বিলেতে কিম্বা জার্মানীতে কোথাও পাঠিয়ে দিয়ো, তারা হয়তো সরবতী বাঈদের আবার বাঁচাতে পারবে—

ঈশ্বরীপ্রসাদ বললে—তারপর সেই পঞ্চাশ-হাজারী জায়গীর বেচে দিয়ে ডাক্তার-মা এইখানে এসে হাসপাতাল করলেন—যত পারা-রোগী আসে সবাইকে নিজে চিকিৎসা করার ব্যবস্থা করেছেন বিনা-খরচে। ডাক্তার আছে—নিজের তো ও-বিদ্যে জানাই ছিল—যেমন করে ডাক্তার সুধাময়কে সেবা করেছেন তাঁর মরার শেষ-দিনটি পর্যন্ত, তেমনি করেই এখানকার রোগীদের সেবা করেন, বাঙলা-দেশের কথা ভুলেই গেছেন, এইটেই দেশ হয়ে গেছে এখন ডাক্তার-মা'র—

ঈশ্বরীপ্রসাদকে জিজ্ঞেস করেছিলাম—কিন্তু সরবতী বাঈয়ের রোগ ডাক্তারের হলো কী করে ?

ঈশ্বরীপ্রসাদ বলেছিল—ডাক্তার যে ইচ্ছে করে ইন্‌জেকশন নিয়েছিল নিজের শরীরে—

—কিসের ইন্‌জেকশন ?

ঈশ্বরীপ্রসাদ বললে—ওই পারা-রোগের !

জানি না, তোমাকে আজ যে চিঠি লিখছি এতে তোমার জীবনের পরিণতির কিছু আভাষ পাবে কিনা। কিন্তু একটা কথা আমি নিজেই বুঝতে পারিনা আজো। আজো এতদিন পরে মনে আছে সেদিনকার সেই ওখাপোর্ট থেকে বাবলাকাটার মেটে রাস্তা দিয়ে গরুর গাড়িতে চড়ে চলতে চলতে আর ঈশ্বরী-প্রসাদের গল্প শুনতে শুনতে নিজের মনকেও আমি এই প্রশ্নই করেছিলাম।

সুধাময় কেন নিজের শরীরে সরবতী বাঈয়ের রোগের ইন্‌জেকশন নিয়েছিল ?

সে কি পৃথিবী থেকে সিফিলিস দূর করবার সাধনায়, না সরবতী বাঈয়ের যন্ত্রণা নিজের শরীরে তুলে নিয়ে সুস্থ সুন্দর সরবতী বাঈকেই পাবার জন্যে ! যাক্‌গে, আমার এ-গল্প যে কাকে নিয়ে তাও আমি ঠিক বলতে পারবো না আজ। কে এর নায়িকা ? সরবতী বাঈ না বনলতা দেবী ! সাধারণ পাঠক যা খুশী ভাবুক—তোমারও কি সে-সম্বন্ধে কোনও সংশয় আছে ?

এ-গল্প এখানে শেষ হয়ে গেলেই ভালো হতো হয়তো। কিন্তু সে-গল্প আমার-গল্প হতো না। তাই যখন চলে আসছি বনলতা দেবী বললেন—আর একটা জিনিস দেখাতে বাকি আছে আপনাদের—দেখবেন আসুন—

আমাকে পাশের একটা ঘরে নিয়ে গেলেন বনলতা দেবী। ঈশ্বরীপ্রসাদ তখন সমুদ্রের ধারে হাত-মুখ ধুতে গেছে। এ-ঘরটা আরো প্রশস্ত। আরো সাজানো। নানা জিনিস সযত্নে সাজানো।

বনলতা দেবী বললেন—এই দেখুন, এখানে ডাক্তার মিত্রের সব জিনিসপত্র সাজিয়ে রাখা হয়েছে। যে-জুতো ব্যবহার করতেন, যে-কাপড়, যে-জামা ব্যবহার করতেন—সমস্ত। তাঁর যাবতীয় জিনিস। তাঁর চিরুনি, তাঁর চশমা, তাঁর বাঁধানো দাঁতটি পর্যন্ত—

—আর ওই দেখুন—ডাক্তার মিত্রের ছবি !

চেয়ে দেখলাম দেয়ালের গায়ে বিরাট একটা অয়েল-পেন্টিং। সোনালি ফ্রেমে বাঁধানো। একপাশে ডাক্তার সুধাময়, মাথায় পাগড়ি পরা। বরের পোশাক। আর তার পাশেই সরবতী বাঈয়ের ছবি। জাফরানী ওড়না, গোলাপী ঘাগরা। রাজপুতদের বধূ-বেশ। যে ছবিখানার কথা শুনেছি সদানন্দবাবুর কাছে। নাহার-গড়ের রাজাসাহেব যে-ছবি তৈরি করিয়ে দিয়েছিলেন তাঁদের বিয়ের দিন।

আমি সেই দিকে চেয়ে দেখছিলাম এক-মনে।

বনলতা দেবী বললেন—আমাকে চিনতে পারছেন ?

কেমন অবাক হয়ে গেলাম।

বনলতা বললেন—ডাক্তার মিত্রের পাশে—ও তো আমিই—

বললাম—আপনাকে তো চেনা যায় না ?

বনলতা বললেন—তখন তো বয়েস কম ছিল, সে-বয়েসে আমায় দেখতেও খুব ভালো ছিল, অনেক ফরসা ছিলাম, রাজাসাহেবের ভারি সখ আমি রাজপুত মেয়েদের পোষাক পরে ছবি তুলি, রাজাসাহেবই দাঁড়িয়ে থেকে আমাদের বিয়ে দিয়েছিলেন কিনা—

একবার মনে হলো জিজ্ঞেস করি—সরবতী বাঈকে আপনি চেনেন ?

কিন্তু আমার মুখ-চোখের ভাব দেখে বোধ হয় তাঁর সন্দেহ হলো। বললেন—আর তাছাড়া দু'জনেরই বয়েস তখন কম ছিল যে—

আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার চাইলেন।

কিন্তু এক মুহূর্তেই নিজেকে আবার সামলে নিলেন।

বললাম—কত ?

বনলতা দেবী বললেন—ওঁর তখন সবে ছাব্বিশ আর আমার তেইশ—